পরীতলা

গুরু বিশ্বাস

রেসনস
৯৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ ঃ
বৈশাখ, ১৩৬১

প্রকাশক ঃ
কালবেলা
৬৫, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলকাতা-৬

মুদ্রণ
শ্রী রণজিৎ কুমার জানা
নিউ গঙ্গামাতা প্রিন্টিং
১৯ডি / এইচ / ২৬ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

অগ্রজ শ্রী বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মমতাময়ী বৌদি শ্রীমতী প্রফুল্লরানী দেবীকে

শ্রদ্ধায়

লেখকের প্রকাশিত উপন্যাস :

মতিন মিয়ার মরিফত
পরাজিত পদাতিক
পাতাল কলকাতা
অসংখ্য কমলেশ
উদাসী বাউল
বানভাসি
আবছায়া
কান্তায়স
দেশকাল
অমিতা
পোকা
বইশি
স্বর্গ

॥ প্রসঙ্গত বলি ॥

এ উপন্যাসের ব্যাপারটা গোলমেলে। যে বাস্তব কাঠামোর ওপর এ কাহিনীর বিস্তার সেটি সংগ্রহ করা খুবই দুরূহ। বাক্‌দেবীর এই গ্রন্থিত শরীরটি নির্মাণ কলকাতার অতিখ্যাত বারাঙ্গনা পল্লীর জনারণ্য থেকে। একদিকে পুলিশ অপরদিকে এলাকার প্রহরী বাহিনী—এই দুই শাসকমণ্ডলীর শ্যেনদৃষ্টি ও রক্তচক্ষুর আড়াল দিয়ে ভেতরে ঢুকে সেই জগতের বাহ্যিক রূপ হয়ত দেখে আসা যায়, অভ্যন্তরের যে রূপ যাতে সেখানকার নিত্যকথা লেখা থাকে, অস্থায়ী আনন্দের এবং ব্যথা-বেদনার কথা, তা জানা যায় না। জীবনকে বিক্রি ক'রে যারা জীবন ধারণ করে তাদের দিনরাতের মুহূর্তগুলোকেও দেখা যায় না। এখানে যারা কেবল নিজের শরীরটাকে পণ্য ক'রে শরীরকে ধরে রাখে, তারা জীবনের সকল মাধুর্য বিসর্জন দিয়ে মেকি সুখের মিথ্যে স্বপ্নের নেশায় থাকে মেতে।

এ এক এমন জগৎ যেখানে কেবল যৌবনের কালটুকুই জীবন। জীবন যে অনেক বড় নানা সময় জুড়ে তার যে নানা রূপ, ভিন্ন ভিন্ন রঙ ও মাধুর্য, এই জগতে তা একান্তই অনুপস্থিত। অনেকদিন ধরেই সমাজের এই প্রাচীন পেশা ও তার পরিমণ্ডলকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনবো ভেবেছিলাম। 'পাতাল কলকাতা' উপন্যাস লেখবার পর সে বাসনা অত্যন্ত বেগবতী হয়েছিল। কিন্তু এ গোপন পৃথিবী—যা লুকানো থাকে সর্পিল গলিগুলোর অন্ধকারে, স্যাঁতসেঁতে বাড়ীর ভিজে ভিজে কুঠরিগুলোতে, তা উদ্ধার করা কঠিন। আগন্তুক যদি এই রাতের হাটের খদ্দেরও হয় জানবে সে সামান্য পরিমাণ। যতটুকু তার স্বার্থ তারই সামান্য অংশ, তবু নিরানব্বই ভাগ সত্য অজানা থাকবে। সম্পূর্ণ জানতে হ'লে এই আজব দেশের দিন রাতের বাসিন্দা হ'তে হবে এবং সে বাসিন্দা হবে এদের অনুভবের সঙ্গী। তবে সে যদি হৃদয়বান ও অনুসন্ধিৎসু হয় তবেই তার পক্ষে সবটা দেখা সম্ভব হবে। আমাদের দেশের সাহিত্যসেবকের সে সুযোগ এখনও নেই। তাই টেলিস্কোপেই গ্রহ নক্ষত্রের অন্তর্লোকের সন্ধান ক'রতে হয় তাদের।

পাতাল কলকাতা লেখার সময় থেকে আমার এই অনুসন্ধিৎসু যাত্রা চলছিল কিন্তু আধিয়া-দের জানতে আমার এতটা সময় লেগে গেল; তাও প্রভূত সাহায্য পেয়েছি নীলমনি মিত্র স্ট্রীটের প্রাচীন বাসিন্দা শ্রীঅরুণকুমার দাস মহাশয়ের কাছে আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া ছাড়াও সহযোগিতা ক'রেছেন তরুণ সমাজসেবী যিনি আত্মপরিচয় দেন ডি. আশিস নামে। অরুণবাবু সহযোগী মানুষ, একালে যেমনটি পাওয়া যায় না তিনি তাই। এসব মানুষকে ধন্যবাদ জানানো অন্যায়. ওঁকে স্মরণে রেখেই আনন্দ।

রাতে এখানে পরীদের বাজার বসে সে বাজারের কেনাবেচা রাতেই শেষ। দিনে তার আর কোনই চিহ্ন থাকে না।

এ বইয়ের বাস্তব ঘটনা কেবল এইটুকুই। আর স্থান ও পাত্রপাত্রীদের নামগুলো কল্পনা ক'রে বসানো, গল্প বলার ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে। অসংখ্য মানুষ, নাম তো সীমাবদ্ধ তাই কোথাও কোন নাম কোনও চরিত্রের সঙ্গে দৈবাৎ মিলে থাকলে তাকে আকস্মিকতাই বলতে হবে।

গুরু বিশ্বাস

যে দেশের গল্প এটা সে অনেকটা রূপকথার সেইসব স্বপ্নপুরীর মতই। সে দেশে সবই আছে, অসংখ্য পরী আছে, নানারঙের রানী আছে, রাজা—হ্যাঁ তাও আছে। তাদের লোকলস্কর, সৈন্য সামন্ত, অস্ত্র শস্ত্র তো থাকবেই। যাদের জীবনে তেমন দিদিমা ঠাকুমার কোল মিলেছে অথবা যাদের জীবনে গল্প বলা কাজলা দিদির পরশ ছিল তারা সবাই হয়ত স্বপ্নলোকের স্বাদ পেয়েছে, সেইসব মতিমালা কাঞ্চন-মালার রূপের জ্যোতিতে মুগ্ধ হয়েছে কিন্তু যাদের জীবনে সে সৌভাগ্য ছিল না তারা রূপকথার দেশ তো দেখেই নি, জানেও না তার সন্ধান। স্বপ্নপুরীর সন্ধান জানা ঠাকুমা দিদিমা রাঙা পিসিমারাই তো অনেকদিন জীবন থেকে হারিয়ে গেছেন তাই এখন যদি আমি হঠাৎ নতুন ক'রে বলি সেই রূপকথার রাজ্য আমি দেখাব বলে বসেছি তবে হয়ত অবিশ্বাস আমাকে উড়িয়ে দিতে চাইবে, চৈত্র শেষের দমকা বাতাস যেমন ক'রে উড়িয়ে নিয়ে যায় মাঘ ফাগুনের ঝরাপাতা, রুক্ষ ধুলোর কাঁড়ি। আমি অবশ্য দক্ষিণারঞ্জন নই খেরোখাতার গেরো খুলে বিশ্বের ছোট্ট মানুষদেরকে 'ঠাকুমার ঝুলি' উপহার দিতে পারব না, তবে হ্যাঁ রূপকথার দেশের দিশা আমি সকলকেই দেব যারা ছেলেবেলায় ঠাকুমার ঝুলির সন্ধান পেয়েছে তাদের এবং যাদের সে সৌভাগ্য হয়নি, তাদেরও।

রূপকথার কল্পলোকের মুস্কিল এই যে সবাই সেখানে পৌঁছাতে পারে না। যারা পারে তারাই কেবল জানে তার সন্ধান, যারা জানে তারাই মানে যে হ্যাঁ চিরতরুণ বৃদ্ধ এই পৃথিবীতে আমাদের একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দিনে দাঁড়িয়ে গণরাজ্যের বাসিন্দা হয়ে যদি বলি রাণীরা সব বহাল তবিয়তে রাজসুখের নিত্যসঙ্গী, পরীরা রোজরাতে এসে মানুষকে সুখের স্বর্গে নিয়ে যায়, রাজারা গণতন্ত্রের দিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শাসন চালায় তবে কি কেউ বিশ্বাস করবে আমার কথা? কিন্তু একথায় কোন অতিরঞ্জন নেই, অবাস্তবতা তো নয়ই; সত্য। তবে যদি কেউ মায়াবাদীদের মতানুসারে বলেন সবই মায়া তবে আর আমার কিছু করবার থাকবে না। মায়া তো বটেই, এই আছে এই নেই, রাতে সব সত্য দিনে নেই—ভোজবাজীর মত। এ তো যারা জানে তারা জানেই যে পরীরা সব রাতেই এসে মর্তলোকে নামে, দিনের আলোয় তারা ডানা মেলে দেয়, কোন অলীক লোকে যে লুকিয়ে পড়ে কেউ তার খোঁজ পায় না। পুরানো দিনের দিদিমা ঠাকুমা আর কাজলা দিদিরা দেখতেন তারার আলোর মায়া মেখে পরীরা সব মাঠে ঘাটে কল্পনার রঙে রাঙা নীল পাহাড়ের পিঠের ওপর নামত।

এখনও নামে। স্বপ্নের নীল পাহাড়ে নয় বাস্তব বসতিতে। আমার এইগল্পের

গাছ তলাটিতে। হ্যাঁ গাছতলার গল্পই তো বলব বলে বসেছি এবং হলফ ক'রে বলছি যে গাছতলার কথা বলব সে কোন সবুজ পাতার গাছ নয় যা গ্রীষ্মের তাপে হলুদ হয়ে যায়, বা শীতের বাতাস লেগে ঝরে ঝরে নিঃস্ব করে দেয় ডালপালা-গুলোকে—এ গাছ স্বর্ণবর্ণ—। তাই বা বলি কেন এ গাছ কখনও নিঃস্ব হয়না কারণ সোনার গাছ, হ্যাঁ তাই তো লোকে বলে। আমি আর জানব কি করে, লোকে বলে বলেই তো জেনেছি। আর এই সোনার গাছতলাতে সন্ধে হলেই পরীরা সব নামে, নেমে আসে স্বপ্নের রাণীরা সব সারি সারি। সারাটা সপ্তাহ যে হাটতলা ফাঁকা কুঁড়ে ঘরের ছাউনি মাত্র, অলস দুপুরে দু একটা ছাগল কেবল ঘোরাঘুরি করে, হাটের দিন যেমন তার চেহারা একেবারেই বদলে যায় তেমনি ক'রে সন্ধেবেলার গাছতলাটা গমগম করে পরী অপ্সরীদের ভিড়ে। যেন কোন যাদুবলে সব বদলে যায়, মনে হয় কোন ভোজবাজীর খেলা চলছে।

সব কথারই একটা পূর্ব কথা থাকে যাকে বলে ইতিহাস। সেটা রূপকথার কাহিনীর বেলাতে হয় মুখবন্ধ, কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা। রূপকথার গল্পের সেই গৌরচন্দ্রিকা হয় এক যে ছিল রাজা দিয়ে আর আমি শুরু ক'রছি—বাংলার অনেক গ্রামের একটা অজানা খুবই অখ্যাত গ্রাম শ্যামানন্দপুর। নামটা বেশ বড়সড় হলেও আয়তনে খুবই ছোট আর জনসংখ্যার হিসেবে তাকে বড় গ্রামের একটি পাড়ার সঙ্গেই তুলনা চলতে পারে। কখনও কোন দূর অতীতে শ্যামানন্দপুরে আনন্দ কিছু থেকে থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে তা নিশ্চিহ্ন। গ্রামের একেবারে দক্ষিণ দিকের বাসিন্দা মধু গণাই মারা যাওয়ার পর তার মেজোছেলে হুলি হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল অভাবের জ্বালা সইতে না পেরে। একদিন অকস্মাৎ একটি জোয়ান ছেলে এসে মধু গণাই-এর বাড়ী খুঁজে তার বউকে জানাল হুলি কলকাতায় একটা দোকানে কাজ ক'রছে। ভাল আছে। হুলির মা খবরটা শুনে তো আহ্লাদে আটখানা। হারানো ছেলের জন্যে দুঃখ যতটা হয়েছিল আনন্দ হ'ল তার অনেক বেশি, কারণ খবর এসেছে ছেলে 'কাজ' করছে। এ গ্রামের মেয়েরাও জানে বাস্তবে কাজ পাওয়া কল্পনার স্বর্গ পাবার চেয়ে বড়। যে ছেলেটি হুলির খবর এনেছে তাকে যে কি ক'রে অভ্যর্থনা করে মধু গণাই-এর বউ তা ভেবেই পেল না। রোজকার ভাতের চাল রোজ জোগাড় ক'রে আনে বড় ছেলে, নইলে সে নিজেও কোন কিছু কাজ ক'রে জোগাড় করে। ভাতের সঙ্গে খাবার জন্যে লবণ দিয়ে শাক সেদ্ধ অথবা কোনদিন মেয়েটা যদি কোন ডোবা থেকে দৈবাৎ চুনো মাছ-টাছ দুচারটে পায় তো রাজভোগ হ'ল। বেশির ভাগ দিন ভাত মানে শুধু লবণ আর ভাত। এইভাবেই দিন যাপন সেক্ষেত্রে বাইরের কাউকে আপ্যায়ণ করবার কোন কথাই ওঠে না। আর্থিক অভাব যতই থাকনা কেন, শরীরের সঙ্গে মনও শুকিয়ে থাকলেও প্রকৃতির দেওয়া হৃদয় বৃত্তি

তো কখনই সম্পূর্ণ শুকোয় না। হুলির মার তাই ছেলেটিকে দেখে খুবই মায়া লাগল। আহা রে কি সুন্দর ছেলে! হুলির খবর এনেছে বলে নয় এমনিতে দেখতেও বড় 'সুন্দর'। চেহারা পোষাকআসাক দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে বড় লোকেদের ছেলে। মায়ায় পড়েই জানতে চাইল, ইদিকে কোথায় এয়েছিলে বাবা?

খুবই সম্প্রতিভ ছেলেটি উত্তর দিল, কোথাও না। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম। রামুও তো আসবে বলছিল শেষ সময়ে বলল, তুমিই যাও আমি পরে যাব।

রামু শুনে হুলির মা থমকে গেল, কার কথা বলছে ছেলেটি? কে আসবে বলেছিল? জানতে চাইল, কার কথা বললে বাবা?

ছোকরার মনে পড়ল রামু বলে দিয়েছিল আমার নাম রাম বললে কেউ চিনবে না বাড়ী গিয়ে বলবে হুলি। তাই বলল, ওই আপনাদের হুলি।

হুলির মা জানতে চাইল, আসবে যদি তবে এল না কেন?

কি জানি?

তা তুমি বাছা এলে আমি কোথায় থাকতে দিই বল তো!

একথার জবাব দেওয়া তো বহিরাগতের পক্ষে সম্ভব নয়। সে সব অবস্থা দেখে নিজেই বুঝেছিল এখানে থাকার জায়গা নেই।

হুলির মা ভাবল ছেলেটা যদি এর মারফৎ খবর যেমন পাঠিয়েছে তেমনি দশ বিশটা টাকা অন্তত পাঠাতো তাহ'লেও না হয় কিছু খাবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যেত। এইসব ভেবে জানতে চাইল, ও কোন টাকা দেয়নি বাবা? তোমার নামই-বা কি জানা হ'ল না তো!

আমার নাম রাজতিলক। তিলুয়া বললেই মহল্লার সবাই চিনবে।

তিলুয়া শব্দটির সঙ্গে হুলির মার পরিচয় না থাকায় সে তিলক বলেই ধরে নিল। বলল, দেখ বাবা, তুমি গিয়ে হুলোকে ব'লো সে যেন কিছু কিছু টাকা পাঠায়।

রাজতিলক কথাটির উত্তর দেবার আগেই চমকে উঠল হঠাৎ একটি মেয়ে এসে জিজ্ঞাসা ক'রল, কাকী মায়া আছে?

মেয়েটির যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য তেমন ফর্সা। ফর্সা কথাটাই কেবল যথেষ্ট নয় গায়ের রঙ যেন সোনার মত। রাজতিলক অবাক হয়ে গেল। পরণের শাড়ীখানা দেখে বোঝা যায় হত দরিদ্র অবস্থা, অতি সস্তা শাড়ী তারও রঙ চটে গেছে।

চাঁপার চোখে পড়ল কে একটি ছেলে কাকীর সঙ্গে কথা বলছে, অজানা অচেনা এবং এ গাঁয়ের মানুষই নয়। কি সুন্দর জামা গায়ে, এমন প্যাণ্টের কাপড়ও কোনদিন এ গাঁয়ের লোক চোখে দেখেছে কি না তার ঠিক নেই। অমন পোষাক এখানে কেউ পরেই না, নিদেন নস্করের ছেলেও নয়। চোখে কি বাহারী চশমা! পুলকে অভিভূত হয়ে গেল চাঁপা, কোথাকার মানুষ গো এটা?

চাঁপা এক পলক দেখে নিয়েছিল রাজতিলক ওর দিকে তাকিয়েই রইল। হুলির মা সাদা বুদ্ধির অতি সাধারণ জীবন-জর্জর মানুষ, যা চোখে পড়ে তার অর্ধেক দেখে না। যেটুকু দেখে তারও অনেকটাই বোঝে না। যতটুকু যা বোঝেও তা প্রকাশ করতে গেলে ঠিকমত হয় না। চাঁপার কথার উত্তরে বলল, দেখ তো মা পুকুরে গেল কি না। আমাকে কিছু বলে নি।

কৈশোর শেষ হতে যাচ্ছে বলে মন স্বপ্নের দেশ পার হয়নি। সে সব স্বপ্নের কোন ধারা নেই, যখন যেদিকে খুশি বইতে পারে। অনেক সময় চাঁপারা নিজেই জানতে পারে না কোনদিকে বইছে। কি এক অচেনা আকর্ষণে সে যেন বহু চলা মাটিতেই আটকে গেল, মন চাইছিল এখানেই মায়ার জন্য অপেক্ষা করে। তাই নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করল, এখন আসবে না?

কি জানি মা, আমাকে কিছুই তো বলেনি, আমি আন্দাজে বলছি।

চাঁপা অযথাই ছোট্ট জায়গাতে পায়চারী ক'রতে লাগল দেখে হুলির মা বলল, তুই নইলে একটু বোস, কোথায় আর যাবে, এসে পড়বে। বলেই হুলির মার মনে হল চাঁপাকেই খবরটা দেওয়া হয়নি, তাই একপ্রাণ আনন্দে বলল, হ্যাঁ রে চাঁপা হুলির খবর এসেছে। এই বাবু ছেলে এনেছে। হুলির মা-ও তিলককে তার চেহারা পোষাক পরিচ্ছদের জৌলুশ দেখে সমীহ ক'রে 'বাবু' এবং বয়সের জন্যে 'ছেলে' দুটোই জুড়ে নিয়ে বলল।

ওমা তাই বুঝি! বল কি কাকি? যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল চাঁপা। যে ছেলেটা অকস্মাৎ একদিন ঘর ও গ্রাম ছেড়ে উধাও হয়ে গিয়েছে কোনদিন যে সে নিজে অথবা তার খবর আসবে এটাও যেন ভাবতে ভুলে গিয়েছিল সবাই। চাঁপার প্রথম যে কথা মনে এল, মায়া জানে কাকি?

না রে। এই তো এল। তারও নাকি আসবার কথা ছিল, আসেনি। কি বলেছে গো বাবা? পরে আসবে?

তিলক ছবিতে দেখা নায়কদের কায়দা নকল ক'রে বলল, হ্যাঁ।

শ্যামানন্দপুরের বিস্ময়কর ঘটনার নায়ক ব'লেই হুলির সম্বন্ধে যতটুকু যা আগ্রহ সেটুকু নেহাৎই কৌতূহল, চাঁপা জানতে চাইল, কবে আসবে?

কথাটা কাকিকে জিজ্ঞেস ক'রলেও তিলক বলল, জলদি আসবে।

চাঁপার প্রশ্ন বিন্দুমাত্র নিরসন হ'ল না। 'জলদি' তার প্রথম শোনা অচেনা শব্দ বলে কিছু বুঝল না কিন্তু স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার জন্যে অচেনা যুবক যতই দৃষ্টি নন্দন হোক সে কথা বাড়াল না। না বুঝেই রইল। অথচ কেবলই মনে হ'তে লাগল ছেলেটি আরও কথা বলুক। ছেলেটির কথা যেন কেবল কথা নয় সুরধ্বনির মত শোনাচ্ছে, ওর গলার স্বরে সুধাবর্ষণ। জীবনে এমন উজ্জ্বল যুবক এই প্রথম দেখল চাঁপা। এই বয়সের ছেলে তো গ্রামে আরও

আছে, সব কেমন ম্যাটমেটে ম্যাড়মেড়ে হাভাতে চেহারা। নিদেন নস্করের ছেলে গোবিন্দ ভাল ভাল পোষাক পরলে কি হয় কেমন বোকা বোকা দেখায়। এমনটা মানায় না।

কলকাতায় তাদের এলাকায় মেয়ে তো কম নেই। শহর বাজারে সুন্দরীরও শেষ নেই। নানা রঙের সুন্দরীরা ভিড় ক'রে আছে সেখানে কিন্তু এ মেয়েটি যেন অন্যরকম। তিলক প্রথমটা ঠিক বুঝল না তারপর চমকটা কমে গেলে মনে পড়ল লালতা ওস্তাদ যাকে 'তাজা মাল' বলে এ তাই। কথাটা ক'বার শুনেছে বটে তবে জিনিষটা চোখে এই প্রথম দেখল। আর দেখেই চিনল। হ্যাঁ, যাদের নিত্য দেখে সেই শিউলি, বীণা, লালী, লায়লা, পরভীন, যমুনা, বেবি—সকলের থেকে আলাদা। ওদের অনেকের মত সুন্দরী না হলেও মেয়েটা 'তাজা' বটে। দেখে বোঝা যায় 'সিধা সাধা'ও আছে। গোলাপীকে দেখলে যেমন 'দিল ধড়কন' হয় একে দেখে তা হচ্ছে না তবে 'ডাকু' ছবির গানটা মনের মধ্যে উঠে আসছে—'মেরে দিল কি রানী হ্যায় তু—'। এখানে তো সিনেমা হল বলে কিছু নেই, বিজলীই নেই তার টি ভি কি থাকবে তাই 'ডাকু' পিকচার নিশ্চয় দেখেনি এই মেয়েটি, দেখে থাকলে তিলক দুলাইন গেয়ে দিলেই তিলুয়ার 'দিল কি বাত' বুঝতে পারত। না পারলে আর কি করা যাবে? কলকাতার মেয়েদের তো আর 'সাদী' করা যাবে না, তারা রাজিই হবে না, এখানে গামছার মত কাপড় পরা মেয়ের কাছে ইচ্ছা ক'রলে রাজি করা যাবে। ভেবে চিন্তে কাজ করবার ছেলে তিলক নয়, ভাবামাত্র কাজ করা তার অভ্যেস। সে হুলির মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বলল, এ মেয়েটার কি নাম মাসি? তোমার মেয়ে?

না বাছা, গাঁয়েরই মেয়ে। নাম চাঁপা।

ও।—এরপর যে কি বলতে হবে তিলক ভেবে পেল না। চট ক'রে স্থির ক'রে নিল রামুকে দিয়ে বলাতে হবে। ঠিক আছে, এখনই ফিরে যাবে, কলকাতা রামুকে নিজের পয়সা খরচ ক'রে নিয়ে আসবে, ওকে দিয়েই কাজটা করাতে হবে। কলকাতা গিয়ে কালই ধরবে, দোস্ত! 'আমার জন্যে' একটা কাজ ক'রতে হবে।

মনে মনে মহড়া দিয়ে নিল তিলক, বলবে, তোদের গাঁয়ের মধ্যে চাঁপা বলে যে মেয়ে আছে তাকে আমার ভারী পছন্দ। আমাকে বিয়ে করিয়ে দিতে হবে।

এ মাইরি আমি পারব না।

আমার জান কসম তোকে এটা ম্যানেজ ক'রে দিতেই হবে।

না মাইরি—

তুই একটু চেষ্টা ক'রলেই হয়ে যাবে। আমি কিছু খরচা ক'রে দিবো। এক আধশো টাক যা লাগবে খরচা ক'রব।

এক আধশোতে হবে না।

বেশ, দুশোই হবে। ব্যস্।

তুই কি ক'রবি বিয়ে ক'রে? রাখবি কোথায়?

আরে ঘর লিয়ে লিবো। লাখোটিয়ার বাড়ীতে কত ঘর খালি হয়েছে মালুম আছে দারোয়ান বিজয় দুবে তো আমার দোস্ত আছে।

ক'দিন বাদেই হুলিকে সঙ্গে ক'রে আবার ফিরে এল তিলক। গ্রাম সুদ্ধ সবাই তো অবাক। বয়স্কদের স্মরণে এল তাদের ছেলেবেলায় এ গাঁয়েরই সরোজ বারিক বলে একটি বাপ মা মরা ছেলে সেই যে গাঁ ছেড়েছিল তার আর কেউ খবরই পায় নি। অথচ হুলি বছর কাটতে না কাটতেই ফিরে এল। আর এল কি না একজন অন্য হুলি! যে হুলি গিয়েছিল শহরের জল হাওয়া তাকে পালটে দিয়েছে। সেখানে নাকি চাকরিও পেয়েছে।

চাকরী করা ছেলেকে পেয়ে হুলির মা আহলাদে আটখানা। বড়ভাই হাঁদুও মাঠ থেকে খেটে এসে ভাইকে সশরীরে হাজির দেখে এক মুখ হেসে বলল, হ্যাঁ রে তুই কেমন ধারা মানুষ? গেলি তো একটা খবর দিতে পারলি নি?

কি ক'রে খবর দেব? হুলি প্রতিপ্রশ্ন ক'রতেই হাঁদু বলল, কোন লোককে দে একখানা চিঠি দিলেই তো আমরা পড়িয়ে নিতে পারতাম। তা যাক কি কাজ ক'রছিস?

দোকানে কাজ করি।

বড় দোকান?

হ্যাঁ রে। পেল্লায় বড়। আমাদের মত তিনখানা গাঁয়ের লোক সেথা রোজ খেতে আসে। কচুরি, মেঠাই, দই রাবড়ি কত কি!

হাঁদু ওসব জিনিষ চেনেই না। মণ্ডা মেঠাই রসগোল্লা—এই কেবল জানে। দৈবাৎ একবার জুটেছিল সারা জীবনে। তাই সেই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলল, ভালই হয়েছে এবার ঘরটুকু ছেয়ে ফেলতে হবে আর মায়াটার বিয়েও তো দিতে হবে—

হুলি কথাগুলো কানে নিল না বলে দাদার কথার জবাব দিল না। হাঁদু ঘরে গিয়ে মাকে বলল, কাজ কর্ম তো ক'রছে টাকাপয়সা তোমাকে দিয়েছে কিছু?

মা তখন ছেলের ফিরে আসার আনন্দেই বিভোর, সে কি আনল না আনল দেখার অবকাশ নেই, সে ভাবনাও নয়। তাই বড় ছেলের সার কথারও গুরুত্ব খুঁজে পেল না। হারানো নিধি ফিরে পাবার আনন্দ কেমন ক'রে প্রকাশ ক'রবে, কি যে খেতে দেবে ওদের সেই চিরন্তন ভাবনার ভারে বিব্রত হয়ে উঠল। সংসারের অতি প্রয়োজনীয় কথায় মা ভাই কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না দেখে হাঁদু বিরক্ত বোধ ক'রে, মনে মনেই বলল, মরুক গে সব আমারই কিসের দায়?—মা যখন পরামর্শ চাইল, 'ছেলে দুটোকে দুপুরে ভাত দিতে হবে ঘরে তো চাল নেই—কি করি' হাঁদুও

কোন উত্তর ক'রল না। সে যে সত্যিই বিরক্ত সেই কথাটা বোঝাতে চাইল।

ঘরে এসে মাত্র হুলি যেন প্রচন্ড অস্বস্তিতে পড়ল। তার এই পরিবেশ ভালই লাগছে না। এ যে তার জন্মভূমি তার চিরদিনের লালনভূমি সবই যেন মুছে গেছে এই ক'দিনের প্রবাসে। নিজের জননী বা অগ্রজকেও তার আপন ঠেকছে না, অনুজাদের জন্যেও মনে হচ্ছে না তার আছে কোন কর্তব্য। এখানে সে বহিরাগত। তিলক যেমন সে-ও সেই রকমই। মায়ের ব্যাকুল আত্মা তাকে স্পর্শ ক'রছে না, যে হাতে তাক দীর্ঘকাল লালন ক'রেছে, প্রতিপালন ক'রেছে, যে মমতা তাকে সমস্ত দুর্যোগ থেকে ঘিরে রেখেছে জীবনটাকে পরিণত করবার ঐকান্তিকতায় সেই হাত তার মায়ের হাত তার শরীরে শান্তির প্রলেপ মাখাচ্ছে না। মায়ের করস্পর্শ তার মাথায় বুকে শান্তির বার্তা বহন না ক'রে অস্বস্তির কারণ ঘটাচ্ছে শীর্ণা মায়ের জীর্ণতার জন্যে। বিরক্তি প্রকাশ ক'রে সে বলে উঠল, মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ ক'রোনা তো। ঘরে দুবেলা ভাতও তো দিতে পার নি এখন বড় ন্যাকামী মারছ।

তার অবোধ মূর্খতা মায়ের ব্যথা বোঝবার ক্ষমতা দেয়নি বলে অর্বাচীন সন্তানের আঘাত জননীকে নীরবেই সইতে হ'ল। আপন সন্তানের মুখে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে না পারা যে কি বেদনা সে কথা হুলিরা কি বুঝবে? তার মা তবু সকরুণ কণ্ঠে আত্মপক্ষ সমর্থনের মত ক'রে বলল, কি ক'রব বল বাপ? তোর বাবা যতদিন ছিল—

মাকে কথা শেষ ক'রতে দিল না হুলি, ঝেড়ে ফেলে দেবার ভঙ্গীতে বলল, থাক আর বলতে হবে না বাবা থাকতেই বা কত খেয়েছি!

রামুর কথাবার্তায় তিলক বেশ অস্বস্তিতে পড়ছিল। যে কারণে সে ওকে অর্থব্যায় ক'রে এখানে এনেছে সেটাই বুঝি ভেস্তে যেতে বসেছে। তাই সে বন্ধুত্বের সুবাদে হুলিকে মৃদু ধমকে উঠল, কি ক্যাচাল লাগালি বে! চুপ যা।

হুলি নিমেষে থেমে গেল। বরং একেবারে অন্য সুরে নিজের বোনকে বলল, হ্যাঁ রে, চাঁপার বাপ আজকাল কি কাজ করে রে?

জমির কাজ। মায়া যতটুকু জানত বলল। তারপরই কোন সাহায্যের আশায় বলল, তবে কাজ নেই। এখন তো কারও কাজ নেই। এবছর চাষ তো হ'ল না।

তা ওর বাপ চাঁপার বে দেবে?

মায়া আচমকা একথার কারণ বুঝতে না পেরে বলল, সে ওই তুষ্ট খুড়াকেই জিজ্ঞাসা কর।

কথাটা মায়েরও কানে গেল বলে সে জানতে চাইল, বিয়ে দেবে বললেই আর হচ্ছে কোথায়? মেয়ের বিয়ে কে না দিতে চায়? বাপের তো সাধ হাল বলদ আছে এমন বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে দেবে। হা-ঘরে দেবে না।

আরে হালবলদ ছাড়। খাস কলকাতাতে যদি দিতে চায় তো বল। আমাদের

সঙ্গেই পাত্তর আছে। এই যে তিলুয়া দেখছ না—বলে বিরাটত্বের ইঙ্গিত ক'রল মুখভঙ্গীর মাধ্যমে। সে যা বোঝাতে চাইল তার প্রাক্ অনুমান ছিলই হুলির মার। তিলক কে বড়লোকের ছেলে এমন অনুমান সে কদিন আগেই ক'রেছিল ছেলেটা প্রথম আসতে। হুলি এবার খোলসা ক'রেই বলল, তিলুয়া চাঁপাকে বিয়ে ক'রতে চায়। ওর বাবাকে দরকার হ'লে কিছু টাকাও দেবে। তুমি একবার বলে দাও মা।

হুলির মার মনে এসে গেল, আমাদের দিবে না ?

কথাটা বলা শেষ হ'ল কি না হ'ল তিলক পাঁচটা দশটাকার নোট বের ক'রে এগিয়ে ধরল হুলির মার দিকে। পঞ্চাশ! এ যেন এক বিশাল কিছু এমনই ভাবে মহিলা ছোঁ মেরে টাকা ক'টি নিয়ে আঁচলের খুঁটে বেঁধেই হাঁটা দিল।

অবশেষে পরদিনই তুষ্টর হাতে আটশোটাকা গুঁজে দিয়ে চাঁপাকে নিয়ে তিলক আর হুলি কলকাতা চলে গেল। তিলক নাম না জেনেও যে আকর্ষণ তার ছিল তা ভেসে গেল অজানার পথে চিরচেনা আশ্রয় ছেড়ে যাবার বেদনায়। সব আশা, স্বপ্ন, অনুরাগ তখন গৌণ হয়ে গেল, এক নদী অশ্রুর স্রোতে ভাসতে ভাসতে চাঁপা ঘর ছেড়ে ঘর বাঁধতে চলল। গ্রামের স্বজনেরা সমবেত উলুধ্বনির মাধ্যমে হতদরিদ্র সংসারের কন্যার দায় মোচন ক'রল সকলে মিলে। এর বেশি আচার অনুষ্ঠান আর সম্ভব ছিল না, প্রয়োজনও নয়।

পেছনে পড়ে রইল জন্মভূমি শ্যামানন্দপুর তার নিরানন্দ অন্ধকারের মধ্যে। চাঁপা কলকাতা মহানগরীর মধ্যে এসে তার জৌলুস আর জেল্লা দেখে হকচকিয়ে গেল। এ কোন স্বপ্নপুরী রে বাবা! এখানে যে সবই আলাদা, সবই একেবারে অন্যরকম—বিপরীত। কেবলমাত্র বিস্ময়ে নয় ভয়েও সে সঙ্কুচিত হয়ে গেল যেমন একটা শামুক গুটিয়ে যায় তার খোলসের মধ্যে। কিন্তু কোথায় তেমন নির্মোক, এ যে একবারে খোলা, কোথাও কোন আবরণ নেই, লুকোবে কোথায়? যেন এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে একা এক বাবলা—তার সমস্ত ভাল মন্দ নিয়ে অসহায় উন্মোচিত।

অজ গ্রাম শ্যামানন্দপুরে বসে চাঁপা কোন গভীর রাতে এমন কোন জায়গার স্বপ্ন পর্যন্ত দেখেনি। কোনদিন কানেও শোনেনি কলকাতা বলে কোন একটা দেশ আছে। শ্যামানন্দপুরই ছিল তার সীমাবদ্ধ পৃথিবী। সেখানে যেদিন তিলক নামক যুবককে প্রথম দেখল, তার মুখের কথা শুনল সেদিনই বিস্ময়ের সুরু। তার পোষাকের চাকচিক্য, চোখমুখের উজ্জ্বলতা, বেশভূষার পারিপাট্য, সপ্রতিভতা সবই ওর কাছে বিস্ময়ের। সেই ঘোর লাগা অবস্থার মধ্যেই এল রেলগাড়ী, স্টেশন, শহর কলকাতা—তার এই জনাকীর্ণ বাসস্থান। এর মধ্যে রাত্রিটা হোটেল নামক এক সুখনীড়ে বাস; সহবাস। জীবনে প্রথম আনন্দ প্রথম বেদনার সুখ অথবা

সুখের বেদনা।

রাতটা হোটেলে কাটিয়ে সুখের সকাল যখন হ'ল অন্যদিনের মত হ'ল না। মনে হ'ল এ যেন স্বপ্নের মধ্যে এসে পড়েছে চাঁপা, রাত্রের অন্ধকারে যে স্বপ্ন ভাল বোঝা যায় নি দিনের আলোতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ সে কোথায়? তার মাটির ওপর ছেঁড়া চাটাই বিছিয়ে শোয়া, যেখানে সকাল হ'তে না হ'তে আলোর বন্যা বয়ে যায় আর এ এমন ঘর যেখানে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও সকাল হ'তেই চায় না। এমন নরম বিছানা মানুষের শোবার জন্যে পাওয়া যায় তাও চাঁপা এই প্রথম জানল। সে রাত্রের না ঘুমোনো ক্লান্তি অভ্যাস বশে মুছে ফেলে জানতে চাইল, এই কি তোমার বাড়ী? তিলক যেন কোন এক নেশার ঘোরে পাশ ফিরে শুল, জড়িত স্বরে বলল, বাড়ী যাব।

ঘরের দেয়ালে বেশ একটা বড়সড় আয়না। কালরাতে চোখে পড়েছিল ভয়ে ওদিকে যায়নি চাঁপা। আজ সকালে একা ঘরে সন্তর্পণে গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে। ইস্। কি অবস্থা হয়েছে তার! শানুকাকী সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল কেমন ঘটা ক'রে তারই বা কি অবস্থা! চুলগুলো সব এলোমেলো হয়ে মুখের ওপর এসে পড়েছে। গ্রামের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলে যেমন অবস্থা হয় তার শরীরেও তেমনি ধারা। বাবাঃ কি শক্তি ওর গায়ে। রমনীয় সুখে ইচ্ছে ক'রল ওর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়। রাতের বেলা যা কাণ্ড ক'রেছে—একটু ঘুমোতে দেয় নি। এখন কেমন ঘুমোচ্ছে! ঘুমোও। কিন্তু এখানকার সবই কেমন অদ্ভুত। অন্য রকম। কিছু মেলে না। কাল রাত্রে একটা ঘর দেখিয়ে বলে দিয়েছে পায়খানা কিংবা আর যা কাজ সেই ঘরে করতে। দূর। ঘরে আবার কেউ পায়খানা করে? মাঠে যেতে হয়। কিন্তু কোথায় যে মাঠ—! ঘরের দরজা খুলে যে দেখবে সাহস হ'ল না। অজানা অচেনা জায়গায় দরজা খুললেই হ'ল? ও আগে উঠুক।

সমস্ত মিলেই চাঁপার কেমন ভয় ভয় ক'রছে। তিলক যা খাতির যত্ন ক'রছে সে তো স্বপ্নের অতীত তবু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না সে। কিছুক্ষণ অতিকষ্টে কাটিয়ে অবশেষে আন্দাজে আন্দাজেই ঘর কলঘর ব্যবহার ক'রতে লাগল। প্রতি মুহূর্তের বিস্ময়ে সে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ ক'রতে থাকল। কাল থেকে যে সব খাবার খাচ্ছে কোনদিন চোখেই দেখেনি। তিলকের বলাতে দু একটা যদিও বা খাচ্ছে মুখে রুচছে না। কেবল রাতে সে ডাল ভাত খেয়েছিল মাছের ঝোলের সঙ্গে—সেগুলো খুবই ভাল লেগেছিল। তাদের বাড়ীতে ডাল তো এমন ডাল হয় না। মাছের ঝোল—তাতেই বা এমন স্বাদ থাকে কোথায়? আগে খাওয়া মানে কোনক্রমে পেট ভরা বলে জানত চাঁপা এই একটি দিনেই প্রথম জানল খাওয়া কেবল পেট ভরা শুধু তাদেরই কাছে খাবার যাদের সহজে জোটে না। যাদের পয়সা আছে তারা যে কত ভাল ভাল খাবার খায় তা এখন জানতে পারল চাঁপা।

দুপুর বেলা একটা গাড়ী ডেকে রাতের বাসস্থান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল তিলক, বলল, এবার বাড়ী যাব।

চাঁপা কৌতুহল বশে জানতে চাইল, এটা ?

এটা তো হোটেল।

হোটেল কথার কি অর্থ চাঁপা জানে না। জিজ্ঞাসা করবার সাহসও হল না। সে এখন ভরা স্রোতের নৌকা, ঘাট যতই আসুক থামা নামা যতবারই হোক জলের বেগেই চলবে। তিলকের সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে বসে সবটা পথ যেন স্বপ্নপুরীর মধ্যে দিয়ে চলল। চারদিকে কত রকম কত গাড়ী। হুসহাস করে কি জোরেই যে ছুটছে। পাস দিয়েই বিশাল বিশাল বাস ছুটে যাবার সময় গাড়ীর মধ্যে বসে চাঁপা মাঝে মাঝে আতংকিত হয়ে পড়ছিল এই বুঝি তার ঘাড়ে এসে পড়ে। তিলক লক্ষ করে মনে মনেই বলল, গাঁইয়া। প্রকৃত পক্ষে চাঁপা সম্বন্ধে ওর আগ্রহ কমেই গিয়েছিল এক রাত্রির সম্ভোগে। নারীকে শুধু সম্ভোগের বস্তু হিসেবেই জানে তিলক, সেইটুকুই ওর আকর্ষণ। তার চারপাশে যে জীবন সেখানে আছে কেবল ভোগ আর সম্ভোগ। জন্মানোর পর বেঁচে থাকা এবং 'মজামে' বেঁচে থাকা। নিম্ন-পর্যায়ের প্রাণীরা যেমন যখন যা বেগ হচ্ছে প্রাকৃতিক ভাবে ক'রছে—যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ, পাওয়ামাত্র খাওয়া, বিপরীত যোনিমাত্রেই রমন—তিলকদের জীবনও সেইরকম। কোন পরিশীলিত বোধের দ্বারা সে জীবন পরিচ্ছন্ন নয়। তাদের অঙ্গমার্জনা ছাড়া কোন পরিমার্জনা নেই। শরীর সর্বস্ব জীবন—গাছপালা, জন্তু জানোয়ারের মত। কাজেই চাঁপা ততক্ষণ আকর্ষণীয় যতক্ষণ সে স্পর্শের বাইরে থাকে। ব্যবহারের পর তার আকর্ষণ কমে যায়, সে তখন পোড়া বিড়ির শেষ টুকরো।

তাছাড়া তিলকের সংশয় ছিল চাঁপাকে নিয়ে রাখবে কোথায় ? তার নিজেরই তো সুনির্দিষ্ট নির্ভরতা নেই। মায়ের ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টাকে কাঁচকলা দেখিয়ে সে একদিন পালিয়ে এসেছে তার আবাসিক স্কুলের ঘেরাটোপ থেকে। তারপর থেকে প্রবল অনীহাযোগে মায়ের আশ্রয়েই রয়ে গেছে অন্নবস্ত্রের জোগানে ঘাটতি পড়ে নি বলে। অনেকদিন আগে তসবীর মঞ্জিলের বুধিয়া মহারাজ একটা ষাঁড় ছেড়েছিল। এলাকার মধ্যে একা বলে সে এলাকাতেই রয়ে গেছে, খায় দায় আর যে কোন বাড়ীর সামনে শুয়ে থাকে। পাড়ার অনেকেই তাকে বাসি ভাত রুটি যা থাকে ডেকে খাওয়ায়। তিলককে যে কেউ না খাওয়ায় তা নয়, জনতা হোটেলের পিণ্টুদা কোন কোনদিন এক আধকাপ চায়ের দাম নেহাৎ ইচ্ছে ক'রেই নেয় না। খাওয়ায়। আর মায়ের কাছে দুবেলা ভাতটা নিয়মিত। সময় মত গেলেই হ'ল। বরং খাবার সময় না গেলেই মা অনর্থ করে। পোষাক পরিচ্ছদ কিনে দিতেও মার কোনই কার্পণ্য নেই আপত্তি কেবল তার বাইরে টাকা পয়সা দেওয়ায়। হাত খরচা দিতেই মায়ের যত আপত্তি। বলবে, কামিয়ে নে। সবই যে আমাকে দিতে হবে তার কি মানে

আছে ? এতদিন যা হয়েছে তা কি চিরদিন চলে ? এখন বড় হয়েচিস যা কিছু একটা ধান্দা করবি তো !

তিলক ভেবে পায় না এই বাজারে কি ধান্দাই বা থাকতে পারে। এলাকাটা জুড়ে তো কেবল একটা ধান্দাই চোখে পড়ে তা সে তো মরদ মানুষের কাজ নয়। আর এখানে যা চলে তার কোন হদিস পায় না তিলক। তার জন্যে আছে লালতা মহারাজ, বঙ্কু পাঁড়ে, সিপাই সিং, বাচ্চেলাল ইদানীং তো আবার সোনাদার নাম খুব উঠেছে—সোনা সরকার। তা ছাড়া র‍্যালা দিলে তো চলবে না ফতে চাঁদকে দিয়ে তার মায়ের আমদানীও তো কম নয়। তাই মাঝে মাঝে মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বলে, কি হবে তোমার অত টাকা দিয়ে! মাল তুমি কিছু খসাও না!

টাকার কথা বললেই মা চট ক'রে রেগে যায়, টাকা কি গাচে ফলে রে হতভাগা ? বসে বসে খাচ্ছিস রোজ কত ট্যাকা খরচা তা জানিস না ? নিজের চোকে দেখিস না কত ট্যাকা লাগে !

তিলক জানে মা রাগলেও তাকে ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে হবে। হয়ত কিছুক্ষণ আপন মনে দুচার কথা বলবে তারপর নিজেই আলমারী খুলে বের ক'রে দেবে। কেবল রাগলে তার মুখে মুখে কথা বলা চলবে না, তাহ'লেই গেল। মা তখন কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে দেবে। খুব রেগে যাওয়াকে সবাই 'কুরুক্ষেত্তর' বাধিয়ে দেওয়া বলে বটে ব্যাপারটা যে কি তিলক জানে না। অত জেনে হবেই বা কি ? অযথা ওসব জানবার কোন মানেই হয় না। তাছাড়া কোনদিনই তিলকের বাজে ব্যাপারে কোন 'ইণ্টারেস' নেই। তার চাই ভাল খাওয়া, জেল্লাদার পোষাক আর সিনেমা দেখা। সিনেমা হলে অথবা যখন যেখানে ভিডিও শো হয় সেখানে। সেটা প্রায় রোজই হয়। অনেক সময় একই ছবি বার বার দেখা হয়ে যায়। তা সব ছবি তেমন ভাল লাগে না। গুলেশান কুমার বা মমতাজ হাকিম হিরো হলে সে সব দশবারও দেখতে আপত্তি থাকে না তিলকের। আর যদি একই সঙ্গে হিরোয়িন হয় জিনাত কিংবা শ্রী লেখা তবে তো কথাই নেই। 'মারকাটারি' সেই পিকচার দেখতে প্রথম শো-তেই হলে হাজির থাকবে তিলুয়া তা 'বেলাকে' টিকিটের দাম যতই হোক। 'ফাস' শো মারা তার চাই। প্রথম প্রদর্শনীর সময় হলে গিয়ে কোন ছবি দেখাকে বিশেষ গৌরবের মনে করে তিলক। সে কেবল একা তিলুয়া কেন তার দোস্ত রাকেশও তাই। আর কেউ যাক আর না যাক দুজন তো যাবেই। আর রাকেশ যদিও বা কোন কারণে কখনও ফেল করে তিলুয়া ক'রবে না। আগে তো তাদের পাড়ার 'পার্টি'রাই' টিকিট বেলাক ক'রত আজকাল সিনেমা হলের আশে-পাশের বস্তির লোকেরা ফুটপাথের লোকেরাই ও কাজটা ধরে নিয়েছে, তবে তারাও তো বাঁধা খদ্দের তিলুয়াকে চেনে। খাতিরও করে। ভাল সীট দেবে টিকিট তার জন্যে রেখে দেয়।

এর বাইরে তিলুয়ার জীবন নেই। সময় সময় কার্যকারণ যোগে হাতে কোন পয়সা হঠাৎ এসে পড়লে তরল পানীয়ে নেশা কিছুটা করে বটে তবে মাকে সেটা

বুঝতে দেয় না, আর যাই হোক ওর নেশা করাটা মা ভাল চোখে দেখে না। এমনিতেই একদিন সাবধান ক'রে দিয়েছিল, যেদিন দেখব তুই মাল খেয়ে ঢুকেচিস সেদিন থেকে এবাড়ীর দরজা বন্ধ। বিন্তি দাসীর কথার নড়চড় হয় না।

তা ঠিক। একথাটা বাড়ীর সব বাসিন্দাই জানে, বিনতি এক কথার মানুষ। জেদীও। তার প্রচণ্ড জেদকেই সবাই ভয় পায়। তাই তিলুয়াও পায়, ভয় পাওয়া তার অভ্যাস হয়ে গেছে। রামুদের গ্রামে বেড়াতে যাচ্ছে সে মাকে বলেই গেছে কিন্তু আচমকা একটা মেয়েকে বিয়ে ক'রে এনেছে—এই কথাটায় মার যে কি মূর্তি হবে ভাবতে তার আতংক জাগল কাছাকাছি পেঁাছে। এতক্ষণ তো বেশ ছিল, মজাতেই সব ঘটল। ট্যাক্সি যতই বাড়ীর কাছে যাচ্ছিল ব্যাপারটা সব বিপরীত লাগছি। কিন্তু উপায়টাই বা কি? এখন মেয়েটাকে ফেলবে কোথায়? তাতে আবার একবারে গেঁয়ো মেয়ে। কিছু জানেও না বোঝেও না। বোকার বেহদ্দ। পরক্ষণে মনে হ'ল বোকা বলেই তো সুবিধে — আবার কোন একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে চলে এলেও চলবে। নেবে নাকি ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে?

ততক্ষণে পাড়ার কাছে এসে পড়েছে। বিডন স্ট্রীট পার হয়ে জটাধারী পেট্রল পাম্পের সামনে গাড়ী। তিলুয়া পাম্পটো পার হবার পরই বলল, বাঁয়ে।

বড় গলি থেকে সরু গলিতে হেঁটে ঢুকতে হয়। অজ গ্রামের হতদরিদ্র সংসারের মেয়ে, তাতে আচমকা প্রস্তাবমাত্র বিয়ে। ফলে চেয়ে চিন্তে, দশজনের হাতে পায়ে ধরে যে কিছু জিনিষ জোগাড় ক'রে দেবে সে সময়ও তো ছিল না। আর সময় থাকলেই বা শ্যামানন্দপুর গ্রামে দেবার মত সামর্থ আছে কার? কারও তো রোজ হাঁড়ি চড়ে না এক নিদান নস্কর ছাড়া। কে কাকে কি বা দেবে? কেউ কাউকে একটা কানাকড়ি দেবার সামর্থ রাখে না। তাই খালি হাতেই এসেছে চাঁপা। বাড়ীতে যে শাড়ীটা পরে থাকত সেটা পর্যন্ত আনে নি লোক চক্ষুর গোচরে আনা সম্ভব ছিল না বলে। বিয়ে বলে দুখানা কাপড় আর সায়া ব্লাউজ তিলকই যা কিনে দিয়েছে। তারই একখানা পরে আর একখানা ভাঁজ ক'রে সঙ্গে নিয়ে আসা। কাজেই তিলুয়ার ব্যাগের মধ্যেই সব।

কি সরু পথ রে বাবা! চাঁপা অবাক হয়ে গেল। এত বাড়ী এ দেশে! এত সব বড় বড় ইটের বাড়ী! অজানা পথে প্রতি পদক্ষেপে আশংকা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সে এতক্ষণ এসেছে এবার হাঁটতে লাগল। এ কি অদ্ভুত জগৎ! এমন ধারা দেশ থাকে চাঁপার স্বপ্ন সীমার বাইরে বলে সে ভয়ে বিস্ময়ে ক্রমশ যেন মনের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছিল। এখন সকালের শেষ তবে দুপুর আরম্ভ হয়নি লোকের কাজে যাবার বেলা। পথের জনতা দেখেও চাঁপা হতবাক; এত মানুষ! কোথায় থাকে? এই যে চারপাশে অগুনতি বাড়ী, উঁচু উঁচু আকাশ ছোঁয়া বাড়ী এসব

ভর্তি হয়ে থাকে? এখন কি সবাই বেরিয়ে এসেছে, নেমে এসেছে? খুব দ্রুত যে সব গাড়ী উল্টোদিক থেকে আসছিল কতবার সভয়ে তখন চোখ বন্ধ ক'রে ফেলেছে চাঁপা। এখন যা হোক অমন জোরে ছুটে আসা গাড়ী নেই। এই যা রক্ষে। যা ভয় ক'রছিল! কয়েক পা হেঁটেই একটা বাড়ীর খোলা সদর দরজায় ঢুকে পড়ল তিলুয়া, চাঁপাও সঙ্গে।

ঢুকেই উঠোন। তিন পাশে বারান্দা। কাল রাতে যে বাড়িটাতে ছিল সেটা কেমন ঝকঝক ক'রছিল এটা তেমন নয়। কেমন ভিজে ভিজে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ছোট্ট উঠানটাও পানের পিক আর কাগজে শালপাতায় নোংরা। ও বাড়ীটা এরকম ছিলনা, চাঁপার মনে হ'ল। দরজা দিয়ে ঢুকেই বারান্দা, বাঁ পাশেই সিঁড়ি তবে সিঁড়িতে পা দেবার আগেই তার পাশের দরজা থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল যার পরণে শুধু সায়া আর বুকে একটা কাঁচুলি। পোষাক দিয়ে শরীর ঢাকার বৃথা চেষ্টা যে তার নেই সেটা ব্যবহারেই স্পষ্ট। চাঁপা যেন নিজের মনেই 'ওমা' বলে আঁতকে উঠল। মেয়েটি তাকে বেশ অবাক চোখে দেখল ততক্ষণে তিলকের পেছন ধরে সে সিঁড়িতে পা চড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক সিঁড়ি উঠেছে কি না উঠেছে হঠাৎ ওপর থেকে একটা নারী কণ্ঠের ঝঙ্কার কানে এল, আলা দুলালী, তুই একাই বসে থাকবি না আর সবাই যাবে? রাতের ঘুমটা ওখেনেই হবে না কি লা?--যে বলছে সে একাই চেঁচিয়ে বলছে আর কোথাও কোন শব্দ নেই। যাকে বলছে তার দিক থেকেও কোন উত্তর নেই। চাঁপা কথার কোন তাৎপর্য না জানার জন্যে শব্দগুলোই শুনল কেবল, অর্থ বুঝল না বলে কথাও অর্দ্ধেক বুঝল না। কেবল ভাবল, এ আবার তেমন ধারা কথা রে বাবা!

দোতলায় উঠে দেখল সামনের ডান দিকের কোনে দাঁড়িয়ে প্রায় উলঙ্গ একজন বয়স্কা মেয়ে কাকে যেন ঐসব বলছে। এতক্ষণ ভাষা বোঝেনি এখন ব্যাপার স্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল। মহিলা তাদের দিকে দেখেই বলে উঠল, এ আবার কে রে? কাকে আনলে?

তিলক গ্রাহ্য না ক'রে আরও ওপরে উঠছে দেখে চাঁপা তাকে যেমন নিঃশব্দে অনুসরণ ক'রছিল তেমনই সিঁড়ি ধরল। পেছনে থেকে সেই মহিলা তখন গলা তুলে বলছে, আর কাজ পেলি না এলি খানকি পাড়ায়?

তিলকের সঙ্গে একটা রাত্রি বিবাহিত জীবন কাটিয়েই অভিজ্ঞতায় বহু বছর বেড়ে গিয়েছিল বলে চাঁপা দুজন মহিলার শরীরেই অশ্লীলতার রেখা পাচ্ছিল। ওদের দেখেই ওর কেমন লজ্জা ক'রছিল। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। তেমনই সঙ্কুচিত ভাবেই ওপর তলাতে পৌঁছাল চাঁপা। তাদের গ্রামেও ক'টি বিয়ে দেখেছে চাঁপা গরীব ঘরের বিয়ে, তবু তো সেখানে বিয়ে বিয়ে ভাব ছিল। কিছু না কিছু আয়োজন ছিল। পাঁচজন বৌ ঝি মিলে উলুধ্বনি ছিল, আরও কিছু কিছু ছিল যাতে দিনটা অন্যরকম দেখায়। কিন্তু এত বড় বাড়ী, বড় লোকের

ছেলে, কিন্তু কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই, কোন আদর আপ্যায়ণ নেই, তার কোন বিয়ের সাজ নেই—এ কেমন ব্যাপার সে কিছুই অনুমান ক'রতে পারছে না। কেউ যেন কিছু জানে না! এরা কারা? বাড়ীতে কেবল মেয়েমানুষই এখন পর্যন্ত দেখা গেল কোন পুরুষ মানুষ কি এখনও ওঠে নি, নাকি কাজে গেছে তাদের গ্রামের লোকেরা যেমন সব ভোর ভোর কাজে যায়! এখানে কি কাজ সব? চাষবাস তো কোথাও নেই। মাঠ নেই, বাগান নেই, পুকুর নেই! কি কাজে যায় সবাই, আর কি কাজ থাকতে পারে পুরুষ মানুষদের? তার কেমন ভয় ভয় ক'রছে। কিসের ভয় সে নিজেই তা জানে না।

ভয় কাল রাত্রেও খুব লেগেছিল। তিলকের ব্যবহার দেখে প্রথম তো মনে হচ্ছিল এ কি ঝঞ্ঝাটে পড়লাম রে বাবা! কি বিপদ! কি কুক্ষণেই না বাবা এর হাতে তুলে দিয়েছিল তাকে। পরে অবশ্য সে ভয় কেটে গিয়ে বড়ই আপনার মনে হয়েছিল তিলককে; একান্তই আপনার জন। অচিরেই এটাও বুঝেছিল যে এমন আপন আর কেউ হতে পারে না। সেই বোঝাপড়া নিয়েই একটু আগে পর্যন্ত বেশ ছিল এই বাড়ীটায় পা দেবার পর থেকে আবার যেন একটু ভয় ভয় ক'রছে, দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। এক পা এক পা ক'রে ওপরে যত উঠছে ভয়ের মাত্রাও উঠছে ওপর দিকে। এ কোথায় এল সে! আজন্ম পরিচিত পরিবেশের সম্পূর্ণ বিপরীত তো বটেই মানুষগুলোও একবারে আলাদা। এসব মানুষ সে কোথাও কোনদিন দেখেনি। কেমন যেন। তার কেমন গা ছম ছম ক'রতে লাগল।

এই অবসরে তিলক কয়েক ধাপ এগিয়ে একদম ওপরে পৌঁছে গেছে। অমনি একটা তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠ আছড়ে পড়ে কিছুটা শব্দ ভেঙে নিচে চলে এল ছিটকে।—কোথায় ছিলি এতদিন?

তিলকের জবাব শোনা গেল, দুটো দিন তো।

দুটো দিন মানে! ক'দিন আগে শুনলাম বাপির হোটেলের কোন ছোকরার সঙ্গে তাদের বাড়ী চলে গেছিস।

সে তো তোমাকে বলেই গেলাম যে বেড়াতে যাচ্ছি।

কোথায় যাবি বলে যাবি তো! ওমা! ওটা আবার কে রে?

তিলক বলল, বউ।

বউ! কার বউরে?—এসো এসো দেখি—বলেই চাঁপাকে ডাকল মহিলা। চাঁপা এগিয়ে আসতেই তিলক বলল, আমার মা।

শোনা মাত্র চাঁপা সেই সিঁড়ির মুখেই গড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বসল। তিলকের মা তাতে যেন কিঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল, ওমা! এ কি গো! কোন গাঁ থেকে আনলি?

তিলক কোনই উত্তর দিল না। চংপা শাশুড়ীর এমন নিষ্প্রাণ ব্যবহারে অবাক হয়ে গেল! তার যা শোনা ছিল তাতে এমনটা তো স্বাভাবিক নয়। বরং ছেলের

নতুন বৌ এলে তাকে তো মানুষ অভ্যর্থনা করে, আপ্যায়ণ করে এ তো কিছু নয়। এ যে কেমন সব কথা বলে। মা শিখিয়ে দিয়েছে, শাশুড়ীকে শ্বশুরকে আর যারা বড় আছে সকলকে প্রণাম করবি। তা শাশুড়ীকে দেখে প্রণাম ক'রতেই যা অবস্থা—মনে মনে একটু দমে গেল চাঁপা। এরা তো বড়লোক এদের আদব কায়দাই আলাদা। সে ভাবতে লাগল কেমন ক'রে এদের সঙ্গে মিশবে বা কেমন ব্যবহার ক'রলে ঠিক হবে। সেই অজ গ্রামে বসে এত তো বোঝা সম্ভব নয়, এই রকম যে বাড়ী হয়, ওপর নিচে এত মানুষ থাকে কিছুই তো কেউ জানে না। এখানে কেমন ক'রে চলতে হয়, কেমন ক'রে কথা বলতে হয়ে তারও কিছু জানা নেই বলে চাঁপার ভয় ভয় ক'রছে, শাশুড়ীর প্রথম সাক্ষাতে সেই ভয় বেড়েই গেল।

মহিলা ছেলের কাছে নিজের কথার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই পেছন ফিরল। একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বেশ জোরেই বলল, এ আবার এক আপদ জুটিয়ে আনল। একে ঘর দোরের এত অভাব, যারা আছে তাদেরই রোজ ঘর দিতে পারছি না আবার নতুন একটা এনে জোটালে ঘর কোথায় পার ?—তারপরই কাকে যেন উদ্দেশ্য ক'রে বলে উঠল, ও মাসি! কি ব্যবস্থা ক'রবে করো। বলা নেই কওয়া নেই হুট হাট মেয়ে আনলে কি আর চলে ?—পরক্ষণেই নিজের ছেলেকে বলল, হুট ক'রে নিয়ে এলি সব বলে কয়ে এনেছিস না কি উটপটাং নিয়ে এলি ?

তিলক কি বলবে ভেবে পেল না, একবার চোরা চোখে চাঁপার দিকে দেখল।

বউ সে তো বুঝলাম। এখেনে তো বউ হয়ে সব আসে, আইবুড়ো থাকবার জন্যে এখেনে আসবে কেন, পৃথিবীতে কি আর থান নেই ?

বিয়ে ক'রে এনেছি—

তা বেশ ক'রেচিস। তোর যে কদিন খাবার খেয়ে নে তার মধ্যে বরং একট পাকা পোক্ত হোক। রাখ এখেনেই দেখি কি ব্যবস্থা ক'রতে পারি।

ইতিমধ্যে একজন শীর্ণকায়া প্রৌঢ়া বেরিয়ে আসতেই তাকে বলল, তোমার জিম্মায় রইল গো মাসি। ঘর নেই তো কি হবে ওরই মধ্যে ব্যবস্থা ক'রে রাখ।

রমণী বলল; সে এক রকম ক'রে হয়ে যাবে। একজন বৈ তো না! শীলাদের সঙ্গেই থাকবে 'খন। ঘরেরই যা আকাল! তোমায় ত্যাখন অত ক'রে বন্নু দত্ত বাবুর বাড়ীটে কিনে নাও শুনলে না তো আমার কতা!

তুমি তো তখন বললে আমার ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কি ক'রব ?

তুমি চাইলে চানু বাবু তোমাকে ট্যাকা ধার দিতোক না ?

চানু মাড়োয়ারী নিজেই বাড়ী কিনতে চায়। ওর বন্ধু সোনারাম পরী দাসীর বাড়ীটা কিনল না ? পরী দাসী বেচারী কি ক'রে টাকা জমিয়ে কিনেছিল বাড়ীখানা। আর মরতে না মরতে আবাগী মেয়েটা সোনারামকে বেচে দিলে!

অমনি কি আর বেচেচে ? সোনারাম তখন কি সোহাগটাই না দেখাতো।

সোহাগ দেখিয়ে মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে নিলে না !

রাঁঢ়ের মেয়ে অমন ছেঁদো সোহাগে ভুললে তো মরবেই। রাঁঢ়ের মেয়ের কখনও সোহাগে ভুললে চলে ! অমন কত সোহাগ রোজ দেকচে ! কতরকম যে সোহাগ তার আর শেষ নেই। ক'টায় ভুলবে ? হারামজাদাগুলো যখন আসে সবাই তো গলে পড়ে। শেষ কথাগুলো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে গেল তিলকের গর্ভধারিণী। ঘৃণা তার সোনারাম, চানুরামদের ওপরও কিছু কম নয়। লোকগুলো যে যার নিজের ব্যবসা বাণিজ্য করে করুক শুধুশুধু তাদের মধ্যে বাড়ী কিনে যে কেন মরতে আসে সে বোঝে না। ওরা ওদের মত কাজ কারবার যা খুশি করুক। স্ফুর্তি ক'রতে হয় চলে আসুক, খরচা করে স্ফুর্তি করুক ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাক। সব বাড়ীতে কি আর বউরা সুখ দিতে পারে ! না পারে তো আসুক। তাতে যদি মনে ধরে যায় কোন মেয়েমানুষকে দিক না গয়নাটা বাড়ীটা কিনে। নিজেরা ভাড়ার ব্যবসায় নামার কি দরকার ?

মাসিকে বলল বটে তবে রাণীবালার নিজের যে আফশোস হয় না এমন নয়। দত্তবাবুরা বড় লোক। কত বাড়ী এদিকে সেদিকে ছড়ানো। কর্তা মারা যাবার পরই ছেলে বলল বাড়ীটা বেচে দেব। দালাল এসে খবরটাও দিয়েছিল মিসির পান-ওয়ালাকে। রোজই যেমন সকাল হলেই মিসির পানওয়ালার দোকানে আসে তেমনই এসেছিল সখী দালাল। বলল, মিসিরজী আঠারো নম্বর বাড়ী বিক্রি হবে। হাতে পার্টি আছে নাকি ? নতুন মালিক সস্তায় ছেড়ে দেবে।

দোকানে পান কিনতে গিয়ে দুপুরেই খবর পেয়েছিল মাসি। নতুন পয়সা হচ্ছে যে আশাবাড়ীউলী তার চাকরকে পানওয়ালা বলছিল খবরটা, মাসি শুনে এসে বলল, সখী দালালকে আমি চিনি। তুমি নিলে বল আমি ডেকে আনি।

রাণীবালা সাহস করে নি। এই যে বাড়ীটা তার মা ক'রে গেছে এটা রাখতেই এক সময় তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়। কি সব সরকারী চিঠি রে বাবা ! ছাপা ছাপা কাগজ সব···নোটিশ না কি যেন নাম। কে সে সব পড়ে আর বোঝেই বা কে ? ভাগ্য ভাল ছিল যে ছায়া বাড়ীউলীর কাছে একজন উকিলবাবুর যাতায়াত ছিল আর অমনি কাগজ ছায়ারও এসেছিল। উকিল বাবুর শেখানো মতই ছায়া গিয়ে একদম দপ্তরের বড় সাহেবের ঘরে একমাথা ঘোমটা দিয়ে হাজির। কাগজখানা দেখিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, আমরা কি ট্যাসকো দেব বাবু ? কিসের টাকার কি ট্যাসকো দেব ?

সাহেব বলল, তা আয় করছ দেবে না ?

কত আয় করি বাবু। কে আর কি দেয় ?

তা আমরা কি জানি ? বাড়ী কিনছ গয়না কিনছ আর ট্যাক্স দেবে না ?

কি ক'রে যে কি হচ্ছে সে তো আপনি সবই জানেন।

আমরা কি ক'রে জানব ?

বাঃ আপনি আমাদের পাড়ায় প্রায়ই যাচ্ছেন আর জানবেন না? আপনিই বলুন রুবির ঘরে গিয়ে তাকে আপনি কত দিচ্ছেন?

কে রুবি?

আপনার মেয়েমানুষ। ওই তো লাল বাড়ীটায় যেখানে আপনি যান; পরশুও গেছিলেন।

অফিসের সাহেব কি বলবে আর কি ক'রবে ভেবে দিশা না পেয়ে ধমকে উঠল, কি যা তা বলছ ঠিক আছে? তোমাকে আমি কি ক'রতে পারি জান?

ও তো আমাদের সবাই করে। আমাদের হেনস্তা করাতে আর অসুবিধে কি? কিন্তু আমি তো রাগবার মত কিছু বলিনি। আমাদের এলাকায় যারা যায় কেউ স্বীকার ক'রতে চায় না। তা আমরা কার টাকার হিসেব দেখাব বলুন? এই তো আপনার টাকার হিসেব চাইতেই আপনি রেগে গেলেন, তাও তো আমি বাইরে গিয়ে জনসমক্ষে বলিনি! ঘরের মধ্যে বললাম।

সেই শেষ। আর কর বিভাগের কাগজ এলাকায় আসে নি। তাই বলে ঝামেলা কি আর শেষ আছে? ঝঞ্ঝাটকেই বড় ভয় করে রাণীবালা। সেইজন্যেই সস্তার বাড়ীটা নিতেও সাহস করে নি।

আজ পশ্চাত্তাপ হ'লেও উপায় নেই। তখন টাকারও এত জোগাড় ছিল না কথাটা ঠিক, তবে টাকা জোগাড়ের চেষ্টাও করে নি। গোপীরাম বাবু ইদানীং আর আসে না, আসবার দিনও নেই, রাণীবালা শুনেছে বার্দ্ধক্যে জরজর, জবুথবু হয়ে গেছে। এখন ব্যবসা বাড়ীঘর সবই ছেলেদের হাতে, তখনও বোধহয় এমন অবস্থা হয়নি ইচ্ছে ক'রলে কিছুটাকা দিতে পারত। গোপীরাম ক্ষেত্রী জানে ছেলে তারই, তাই ছেলের জন্যে বাড়ীটা কিনে দাও বললেও হয়ত পুরো না দিক অনেকটাই দিত। যাক ভুল যখন হয়েই গেছে এখন আর ভেবে কি লাভ? বাড়ীটাতে এখন আশিটা মেয়ে কাজ করে অথচ দত্ত বাবুরা যখন মালিক ছিল, মেয়েরা সব ঘর ঘর ভাড়া থাকত। যে যার ঘরে নিজের মত থাকত।

এখন অবশ্য মেয়ের চাপ বেড়েছে। চারিধার থেকে অনবরত মেয়েরা আসছে কাজ ক'রতে। কাজেই তেমন হালকা থাকবার উপায়ও নেই। এই তো ছোঁড়াটা কোত্থেকে একটা মেয়ে এনে হাজির ক'রল। তবে মেয়েটার গায়ের রঙটা বেশ ফর্সা আছে। হলে কি হবে একেবারে গেঁয়ো। কিছু জানে না। শহরের আদব কায়দা শেখাতেই অনেক সময় কেটে যাবে তার মধ্যে যদি আবার কেটে পড়ে তা'হলে এত-দিনের সব খরচ খরচাই মাটি।

মাসি বলল, তুমি আমাকে মাসি বলেই ডাকবে বুঝলে? সবাই তাই ডাকে।

চাঁপা ঘাড় নাড়তে মাসি আবার বলল, যা দরকার আমাকে বলবে। ঘর তো আর খালি নেই বাছা এখানেই তোমাকে থাকতে হবে। তা অসুবিধে হবে না মালকানীর ঘর। অন্য মেয়েরা তো এ ঘরে ঢুকতেই পারে না, পেটের ছেলে বলে

কতো সে এনেচে তোমার দামই আলাদা।

চাঁপা দেখল ঘরের মধ্যে একখানা বিরাট খাট, তাতে খুব উঁচু বিছানা। লম্বা আয়না দেওয়া একটা কাঠের আলমারী—তাতে তার পা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এর আগে গতকাল রাতে প্রথম নিজেকে অর্দ্ধেকটা দেখেছিল সে হোটেলের ঘরে, আজ নিজের পুরোটা দেখল। বেশ ভাল লাগল। আনন্দ হ'ল। এমন ক'রে গোটা একটা শরীর দেখতে পাবার বিশেষ আনন্দ আছে সে জানত না। সে শরীরটা নিজের। কি ভাবে দেখলে যে ঠিক হবে স্থির ক'রতে পারছিল না কিন্তু ভয়ে ভয়ে বেশি ক'রে দেখতেও পারল না, সরে গেল। আয়নার সামনে থেকে সরল বটে তবে তার আকর্ষণ তাকে টানতে লাগল। 'যদি কিছু মনে করে' এই ভয়েই সে নিবৃত্ত রইল। ইতিমধ্যেই শাশুড়ীর মেজাজ দেখে ভয় ধরে গিয়েছিল আর এটাও বুঝেছিল যে ছেলেটি তাকে বিয়ে ক'রে এনেছে এখানে অর্থাৎ মায়ের কাছে তার বিশেষ আধিপত্য নেই। এখানে ওঁর কথাই শেষ। কিন্তু এ বাড়ীর অনেক কথাই সে বুঝছে না, অনেক ভাবধারাই তার হিসেবের বাইরে থাকছে! সব যেন কেমন, তাদের মত কিছুই নয়। এটাই হয়ত শহরের ধারা। শহর বাজারের মানুষজন যেন কি রকম। তাদের আদব কায়দা যেমন কথাবার্তা তেমনই অদ্ভুত। কিন্তু ছেলেটি ভাল। বড় লোক হলে কি হবে বড় কাছের লোক।

দুপুরবেলা খাটের পাশে মাদুর পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, মাথার দিকে আর একটা সতরঞ্চি পেতে শুয়েছিল মাসি মাসের বুড়িটা। ঘুম ভাঙ্গতে দেখল ঘরে সে একা আর তারই একটু বাদে তিলক এসে ডাকল। চল সিনেমা দেখে আসি।

সিনেমা শোনা ছিল সে নাকি বড় মজার জিনিষ। গাঁয়ের অনেকে গঞ্জে গিয়ে দেখে আসে। নীলিমাও দেখে এসে একবার গল্প ক'রেছে। বড় আনন্দ হ'ল আজ সে নিজে দেখবে। নীলিমার কথাগুলো মনে আছে, অনেক কথাই মনে আছে 'তারপর সেই লোকটা না—সবাই বলছিল কমলকুমার—সেই কমলকুমার মাইরিবা কি সুন্দর দেখতে—এক লাফ দিয়ে গাড়ীটার সামনে পড়েই গুণ্ডাটাকে কি মার কি মার! এই মার, ওই মার, আবার মার, গুণ্ডাটাও সমানে মারছে কিন্তুক মারলে কি হবে কমলকুমারের সঙ্গে পারবে কেন। একা মেরে পাট করে ফেললে! আর চন্দ্রাকুমারী দৌড়ে এসেই ঠিক এমন ক'রে জাপটে ধরলে কমলকুমারকে।—বলেই চাঁপাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, আর তোকে কি বলব মাইরি চাঁপা অত লোকের মাঝখানে চটাস ক'রে চুমু খেয়ে ফেললে!

সে আবার কি রে! অবাক হয়ে চাঁপা বলেছিল, সে তো ছোটদের সবাই খায়।

তবে আর বলছি কি—আমি ভাই লজ্জায় মরে যাই। আর চারপাশ থেকে ছেলেদের কি শিস্। সে আর থামেই না—বলে নীলিমা স্মৃতির পুলকে যে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল সে হাসি পর্যন্ত মনে আছে চাঁপার। আজ সব নিজে দেখবে। কাল রাতে তিলক যা সব দেখিয়েছে তা আবার সিনেমাতে দেখাবে না কি

অত লোকের মাঝে! তিলকও যেন দু তিনবার চুমু খেয়ে নিয়েছিল তার গালে! ভালই লেগেছিল। তা বলে লোকের সামনে আবার তা হয় না কি? দূর। নীলিমাটা বানিয়ে বানিয়ে বলেছিল, আজ সে নিজে দেখবে। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ী, ঘর, গাড়ী, বাগান কি সুন্দর সব মেয়েমানুষগুলো—। কমলকুমার কি সুন্দর। চাঁপার ধারণায় সিনেমা মানেই সেই কমলকুমার আর চন্দ্রাকুমারী। সেই গুণ্ডাদের ধরে মারা গাড়ীর সামনে লাফিয়ে পড়া—। নীলিমা বর্ণিত সেই দৃশ্য-গুলোই দেখবার জন্যে মনে মনে তৈরী হয়ে নিল চাঁপা।

সিনেমা দেখে ফেরবার সময় বাড়ীর কাছাকাছি এসে চাঁপা অবাক হয়ে গেল। দিনের বেলা তো এমন ছিল না! রাস্তা ভর্তি মানুষ গিজ গিজ ক'রছে। মেয়ে-মানুষই বেশি। কত রকম সেজেছে সব! এক একজন এক একরকম পোষাক। মুখে কি রকম রঙমাখা মনে হচ্ছে। এত মেয়ে কোথা থেকে এল। আগে তো এমন দেখে নি! সারা রাস্তা মেয়ে মানুষে ভর্তি। কত রঙীন রঙীন পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে সব। কেন দাঁড়িয়ে আছে? এখানে আজ কি কোন মেলা আছে? চাঁপা ভাবল। তাদের দেশে সবাই যখন মেলা দেখতে যায় এই রকম ভাল ভাল পোষাক পরে। সে নিজে কোনদিন মেলায় যায় নি, কেউ নিয়ে যায় নি বলে। নিত্য যাদের ভাত জোটে না মেলায় গিয়ে কি কিনবে তারা? শুধু দেখতে গেলেও তো পরণের শাড়ীর দরকার হয় তাও তো ছিল না। যাবে কি পরে?

এত ভিড় দেখে ভয়ে চাঁপা তিলকের গা ঘেঁষে চলতে লাগল। পাশ থেকে একটা মেয়ে তাকেই যেন কি বলে উঠল সে বুঝতে পারল না। সে না বুঝলেও রাস্তায় দাঁড়ানো অন্য মেয়েরা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। ওর কেমন ভয় ভয় ক'রল। সে ভয় যেন সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল। সব বাড়ীগুলোরই দরজার গোড়ায় গোড়ায় গাদা গাদা মেয়ে জড় হয়ে আছে। একটা বাড়ীর দরজায় মেয়েদের ধাক্কা দিয়েই ঢুকতে হ'ল তাদের। ভেতরে ঢুকে চাঁপা বুঝল এটাই তাদের বাড়ী বটে। এত লোকই বা কি ক'রছে এখানে? ওদের মধ্যেকার একটি মেয়ে তাকেই কি যেন বলল, সে বুঝল না। অচেনা একজন মানুষ কি বা বলতে পারে? কিন্তু তার কথা শুনে অনেক মেয়েই এক সঙ্গে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

একটি মেয়ে বেশ জোরেই বলল, কিছু বলিস না রে, তিলুয়ার বউ হয়ে এসেছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে আবার কে একজন বলে উঠল, কদিনের বউ রে?

এসব কথা বুঝতে কোনই অসুবিধে হবার কথা নয়, হ'লও না। কিন্তু কেন যে এসব বলছে চাঁপা বুঝল না। বিচিত্র এই জায়গার সে তো কিছুই বুঝছে না। তিলক কাউকে কিছু না বলে তাকে ওপরে তুলে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই নেমে গেল। যাবার সময় চাঁপাকে একটা কথাও বলে গেল না। ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক লাগল ওর কাছে। এবং শুধু তিলকের ব্যবহারই নয়, এই ব্যবহারের সুবাদে এখান-কার সব কিছুর সঙ্গেই তার অপরিচয় দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। তার শাশুড়ীর

ঘর বলে যেটা জেনেছে সেখানে ঢুকতেই দেখল একজন লোক খাটের ওপর বসে কি যেন খাচ্ছে। ঘরের মধ্যে কি রকম গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। নানা রকম ফুলের গন্ধ, পাকা কুল বা বেলের গন্ধ এমন কি পচা ডোবার জলের গন্ধও তার চেনা কিন্তু তার কোনটাই এরকম নয়, এ ধরণেরই না। এ একধারে অন্যরকম। কি খাচ্ছে লোকটা? বড় একটা বোতল বসানো আছে, সামনে আছে গেলাস। একটা রেকাবিতে কি যেন খাবারও দেখতে পেল চাঁপা। কে বা লোকটি? শাশুড়ীর কোন আত্মীয় হবে কি? তাই হয়ত হবে নইলে শাশুড়ীর বিছানায় বসে অমন আরাম ক'রে খাচ্ছে—যেন নিজেরই ঘরবাড়ী। খুবই কাছের আত্মীয় না হ'লে কখনও এমন হয়! গ্রামে দেখেছিল শ্বশুর বাড়ীর মানুষের সামনে, বিশেষ ক'রে পুরুষ মানুষ দেখলে মাথায় ঘোমটা দিতে হয়, চাঁপা তাই তাড়াতাড়ি ঘোমটা দিয়ে ঘরের একপাশে সরে দাঁড়াল। খেতে খেতে লোকটি বলে উঠল, বাঃ এমন কচি মালটি কবে জোগাড় ক'রলে রাণীবালা? এমন ডাঁসা মালটি জোটালে আর আমাকে খপর দিলে না? ট্যাকা কি আমি কখনও কম দিইচি?

রাণীবালা চকিতে উত্তর দিল, এলই তো আজ। আমি খপর দেব কখোন?

আজই এল! বাঃ বাঃ। তাই বলি আমি যখন বলে রেকেচি টাটকা মাল এলেই বলবে তকন কি আর কথা রাকবেনা রাণীবালা? তা ভাল।

তবে পোষ মানানো নয় এ কতাও কিন্তু বলে দিলাম।

তা না হোক। খাঁচার মধ্যে আচে যখন পোষ মেনে যাবে।

দেখে শুনে খেয়ো, সামলিয়ে নেবে, পরে আমার দোষ দেবে না।

কি যে তুমি বল রাণী, তারক দত্ত কোনদিন কারও দোষ দেয় না।

বেশ তবে তোমরা থাক আমিও ওদিকটা দেখি—বলে রাণীবালা ঘরের দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। চাঁপা কেমন হতভম্ব হয়ে গেল, হঠাৎ দরজা বন্ধ ক'রে দিল কেন? আর এরা কেমন লোক, কি যে সব কথাবার্তা দুজনে বলল বেশ জোরে বললেও তার কিছু বুঝল না সে। সে যে কি ক'রবে কিছু ভেবে পাচ্ছিল না। এরই মধ্যে তারক বলে উঠল, কই একেনে এসো।

নিজের গায়ের জামাটা খুলে মেলে ধরল চাঁপার দিকে, এটা রেকে দাও তো!

চাঁপা এমনই বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল যে কি ক'রবে ভেবে না পেয়ে পাথরের মূর্তি'র মত স্থির হয়ে রইল। তারক দত্তের মধ্যে ততক্ষণে তরল শক্তি কিছুটা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। সে হুংকার দিয়ে উঠল, কি হ'ল কতা কানে লাগচে না?

জামা খোলাতে লোকটির পেশিবহুল চেহারা, বিশেষ ক'রে শক্তিশালী বাহুর আকৃতি আর গলার প্রচণ্ড স্বরে কেমন কেঁপে উঠল চাঁপা। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে এগিয়ে এসে জামাটা হাতে নিতেই তারক বলল, এই তো সুবুদ্ধি হয়েচে।

লোকটার ভাবগতিক দেখে ভয়ংকর ভয় পেয়ে গিয়েছিল চাঁপা এবার চোখের রঙ দেখে সে ভয় তাকে অবশ ক'রে দিতে চাইলেও, সে জামাটা সোফার ওপর ফেলে

প্রায় দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে ঘরের বাইরে পালাবার চেষ্টা ক'রল। কিন্তু দরজা টেনে দেখল খুলছে না। বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দিয়েছে তার শাশুড়ী, রাণীবালা। সে ছাড়া আর কে হবে!

তার হতাশাকে যেন উপভোগ ক'রল তারক। তারপর হঠাৎই নিজের উরুর কাপড় সরিয়ে বিশাল পেশী দেখিয়ে বলল, একেনে এসে বসো তো দেখি। গোপন জীবন সম্বন্ধে সদ্য বোধ হওয়া চাঁপা যেন কুঁকড়ে গেল ভয়ে, লজ্জাতেও। সে দরজার সঙ্গে এমনভাবে লেপ্টে রইল যেন অদৃশ্য কোন শক্তি বলে এখনই দরজাখুলে তার মুক্তি মিলে যাবে। লোকটার জামা খুলে যাওয়া, উরুর কাপড় সরে যাওয়া—যেন মুখোশ খুলে যাচ্ছে এক ভয়ঙ্কর কোন দৈত্যের। সে ভীতি বিহ্বল ব্যাকুলতায় কাকে যে শরণ ক'রবে ভেবেও পেল না। কেবল একমাত্র ত্রাতা বলে মনে হ'ল তিলককে, যাকে সে স্বামী বলে জেনে এবং বিশ্বাস ক'রে এখানে ঘর ক'রতে এসেছে। সে তার মায়ের ঘর করা, নীতিপিসির সংসার, আশাদের সংসার—এই সব আজন্ম দেখা গৃহস্থালীর স্বপ্ন মনে নিয়ে এসেছে এখানে, আগে না জেনে অজানা স্থানেই এসেছে যেমন সব মেয়েই স্বামীর হাত ধরে আসে। এ ক'দিন তো এক রকম ঠিকই চলেছে আজ অকস্মাৎ এ কী বিড়ম্বনা—কি সাঙ্ঘাতিক বিপাক এসে জুটল। বাইরে থেকে ঘরই বা বন্ধ ক'রল কেন শাশুড়ী? তাকে বা এখানে রেখে গেল কেন?

দারুণ বিপদের মধ্যে পড়ে তার মনে কেবল একটি চিন্তা—এই সমূহ সর্বনাশ থেকে কে তাকে উদ্ধার ক'রবে। স্বভাবতই কাতর স্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠল, আমার স্বামী এসে পড়বে, আমাকে যেতে দিন।

অকস্মাৎ ছিপি খুললে যেমন বোতলের সোডা চমকায় তেমনি ক'রেই তারক তার নেশার মধ্যে থেকে চমকে উঠল, য়্যাঁ! কি বললে? স্বামী? সে তো কেউ একজন হবেই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন হবে প্রথমটা না হয় আমিই হলাম। এসো খুকি আমি তোমায় স্বামী দেখাচ্ছি।

তারক এক লাফ দিয়ে নেমে চাঁপার হাত ধরে একটানে বিছানায় ফেলল। চাঁপার দারিদ্রপীড়িত শরীর উপলব্ধি ক'রল লোকটা দৈত্যের মত শক্তি সম্পন্ন। শরীরে শক্তি তিলকের চেয়ে বেশি, হয়ত অনেক বেশি। হত দরিদ্র দুর্বল পরিবারের সন্তান হিসেবে বিদ্রোহের ক্ষমতা তার মনে কোনদিনই জন্মায় নি বলে সে ভয়ঙ্কর হবার সাহস পেল না। ফলে শরীরে যত মনে তার অনেক বেশি বিধ্বস্ত হয়ে সে পড়ে রইল খাটের পাশে মেঝের ওপর, তার শাড়ীটা দূরে কোথায় ছিটকে ফেলেছে সে খুঁজতে পারল না। দরজা খুলে মাসি এসে ঘরে ঢুকে দেখল সে উপুড় হয়ে পড়ে অঝোরে কাঁদছে। খাটের ওপর তারক বেঁহুশ অথবা বিবশ। মাসি ঘরে ঢুকেই বলল, হ্যাঁ লা অমন কাঁদচিস কেন? কি হ'ল? ওঠ, কাপড় পরে নে।

শাড়ী খানা কুড়িয়ে এনে চাঁপার গায়ের ওপর ফেলে দিল মাসি। চাঁপা একই ভাবে কেঁদে চলল ভয়ে এবং যন্ত্রণায়। ইতিমধ্যে তার ধারণা হয়ে গেছে এখানে

তাকে সাহায্য করবার জন্যে কেউ নেই। সে সহায়হীন। মাসি তাড়া দিল, ওঠ ওঠ, ওঠ। এখনই রাণীবালা আসবে, অনর্থ ঘটাবে। কেন অযথা গালমন্দ খাবি—। তারচে উঠে মুখ হাত ধুয়ে, সাফসুতরো হয়ে খেয়ে নে এখনই ভাত এসে পড়বে। আমি বিনোদ-এর হোটেলে বলে এলুম, মাংস ভাত আসচে।

এবার চাঁপাকে ছেড়ে তারককে নিয়ে পড়ল মাসি, কি গো বাবু, ঘরবাড়ী ফিরবে না এখানেই রাতটা কাটাবে? উঠে পড়।

বিছানার ওপর শূন্য বোতলটা কাত হয়ে পড়েছিল, গেলাসটা গড়িয়ে পড়েছিল দেয়ালের দিকে সে সবগুলো নামিয়ে নিল মাসি তারপরও তারক নড়ছে না দেখে মাসি খিঁচিয়ে উঠল, কি গো, বেঁচে আছ, না মরে গেলে? মরলে তো আবার ভাগাড়ে ফেলতে হবে। বেঁচে থাকলে ওঠ, ঘর খালি কর।

তারকের নেশাটা বেশ ভালই জমেছিল। শরীরেরও আশ মিটেছিল বেশ ভাল রকমই। ক্লান্তি এবং আমেজ কাটবার জন্যে আরও কিছু সময় প্রয়োজন। সে সময়টুকু শুয়ে থাকা, ঝিমিয়ে আচ্ছন্নতার মধ্যে থাকতে বেশ লাগছে। কিন্তু ঝি মাগীটা এমন তাড়া মারছে যে সুখটুকু সম্পূর্ণ করবারও সময় দিচ্ছে না। বিরক্ত হয়েই সে উঠে বসল। ক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে বলল, এ ঘরে কি খদ্দের আসে যে অমন তাড়া ক'রছ? রাণীবালা নিজের ঘরে খদ্দের ঢোকায়?

মাসি কিছুটা হালকা সুরেই বলল, না গো বাবু। পীরিতের নাগর ছাড়া এ ঘরে আর কে আসবে? তা রাণীবালার শরীরে কি আর পীরিতের রস আছে? এখন তাকে ঘর ছাড়তেই হবে। কত মেয়ে রোজ ঘর ঘর ক'রে হন্যে হয়ে যাচ্ছে তুমি জান?

ওসব জানাজানি দিয়ে তারকের কি লাভ? তার নিজের কাজ হলেই হ'ল। অনেকটা বাধ্য হয়েই যেন সে শয্যা ছাড়ল। এ ঘরের কোথায় কি থাকে সব তার জানা। আয়নার সামনে গিয়ে তার তেতাল্লিশ বছরের হালকা চুলে চিরুনী চালাল; নিজের জামাটা গায়ে দিল অমনি এসে ঢুকল রাণীবালা। পকেট থেকে বেশ কয়েকটা নোট বের ক'রে তার হাতে গুঁজে দিতে রাণী তা গুণে নিয়ে বলল, উহুঁ। এতে হবে না। আরও পঞ্চাশ দাও।

কেন?

এ তোমার রীতা বাসবী নয় যে এতেই হবে। টাটকা মেয়ে, এর জন্যে খরচ বেশি লাগবে।

কেন? এ তো জোটানো মেয়ে বাবা!

সে তোমাকে ভাবতে হবে না। জোটাতে খরচা ক'রতে হয়। বাজারে যাও না? বরফের মাছ আর টাটকা মাছে দামে তফাৎ হয় না! ঠিক মত ট্যাকা ছাড় মনের মত মাল পাবে!

আরও কিছুক্ষণ দর কষাকষি ক'রে অবশেষে টাকা দিয়ে তারক বলল, তুমি

মাইরি কি। বাঁধা খদ্দেরকেও কষে নিতে ছাড় না! আমাদের বাঁধা খদ্দের—

তার কথা আটকে প্রসন্ন রাণীবালা বলল, বাঁধা খদ্দের না হ'লে কি তুমি এমন ডবকা মালটি পেতে? অন্য কেউ হ'লে ভেড়াতাম না কি! যাক এখন কেটে পড় তো দেখি! দারোয়ানকে দশটা ট্যাকা দিয়ে যেয়ো।

বাবা! মতিলাল আবার দশ টাকায় রাজি হবে না কি! সেও পঁচিশ টাকা বলে বসে আছে। আর তোমার বাড়ী আসা যাবে না, যা খাঁকতি হয়েচে!

রাণীবালা অনর্থক কথা বলা পছন্দ করে না, তারককে ছেড়ে সে ঝিকে ধমকে উঠল, এ কি গো! ঘর এখনও সাফসুতরো হ'ল না কি কথা!

মাসি বলল, কি করব দেকচো তো উটচে না।

আসলে ধমকটা রাণীবালা পরোক্ষে চাঁপাকেই দিয়েছিল, বাইরের লোক তখনও ঘরে ছিল বলে সরাসরি কিছু বলে নি। তারক বেরিয়ে যেতেই বলল, ও মা! এত কান্নার কি আছে? গতরে সুখ কম হয়েচে না কি? ওঠ ওঠ। এখানে কান্নাকাটি ক'রো না বাছা, অলুক্ষুণে কাজ ভাল না। তোমাকে কাঁদতে দেখলে আর দশজন বলবে কি?

ইতিমধ্যেই তার শিখিয়ে আনা মেয়ে শীলা এসে ঢুকে যেন গলে পড়ল, চাঁপার গায়ে হাত দিয়ে সোহাগের সুরে বলল, আ রে! তুমিই তো আমাদের নতুন বন্ধু গো!

চাঁপার তখন কোন কথাই ভাল লাগছে না। সে যেন শরীরে মনে ভেঙ্গে পড়েছে। তার আর মুখ তুলতে ইচ্ছে ক'রছে না, মনে হচ্ছে সে আর নেই, তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। স্বামীর কাছে সে মুখ দেখাবে কি ক'রে, এই ভাবনাটা তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। শাশুড়ী যখন সব জানে স্বামী কি আর জেনে যাবে না! কে একটা হুমদো বয়স্ক লোক তাকে এভাবে লুঠ করে নেবে নিজেদের ঘরের মধ্যে, সে কি তা ভেবেছিল। সে রাত্রে রাগে ভয়ে কিছু খেল না চাঁপা। শীলা অল্পক্ষণ থেকে চলে গেল তারও তো কাজ আছে! রাণীবালা নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে মাসিকে দিয়ে একবার বলালো তারপর কেউ কিছুই বলল না। একাই নিজের মত পড়ে রইল চাঁপা, তিলকও এল না।

প্রত্যুষে এ বাড়ীর মেয়েরা সবাই যখন ঘুমোয় শীলা উঠে পড়েছিল দৈবাৎ ই। ফাঁকা কল ঘরের সামনে চাঁপাকে পেয়েই সে ধরে বসল, একেবারে আপনজনের মত ক'রে একমুখ হেসে ঠাট্টা ক'রল, কি রে কচি খুকি, শরীরে কোথাও টসকেছে না কি? দেখি—বলেই একটানে চাঁপার শাড়ী খুলে তাকে জড়িয়ে ধরে কলঘরে ঢুকে পড়ল। একান্ত প্রিয় বান্ধবীর মত ঢুকেই বলল, এখানে আমরা সবাই সবার আপন রে। কি নাম তোর? আমার নাম শীলা। আমি তোর চেয়ে বড়। তবু তুই শীলা বলে ডাকবি।

শীলা এতই আচমকা সব ক'রল যে চাঁপা বাধা দেবার অবসর পেল না।

কেবল শাড়ী ছাড়া হলেও তার গায়ে জামা সায়া সবই ছিল তা সত্ত্বেও লজ্জিত হ'য়ে পড়ল দেখে শীলা নিজেকে বিবস্ত্র ক'রে বলল, এখানে আমরা ছাড়া কে আছে, তোর অত লজ্জা কিসের ? কাল অত কাঁদছিলি বা কেন ? কি হয়েছে তোর ? এখানে দু চারটে খারাপ লোক এসে ঝামেলা করে, তা ক'রলে খারাপ লাগে—ওই বাবুটা তো ভাল রে ! একটু কঞ্জুস, এ ছাড়া কোন দোষ নেই। আগে লালীর ঘরে রোজ আসত। লালী একজন ভালবাবু পেয়ে গেছে বলে পাত্তা দেয় না। এই বাবুটা লালীকে কত কি দিয়েছে। সোনার হার, টিভি, টাকা পয়সা তো খুব দেয়। সব ওর মা এসে নিয়ে যায়। এ লোকটা কিছু দেবার মধ্যে নেই তবে বাঁধা খদ্দের, এই যা লাভ।

শীলা এক নাগাড়ে সব বলে যেতে লাগল। ওর কথা চাঁপা খুব সামান্যই বুঝছিল। সে অস্পষ্ট কথার ভিড়ে ঢুকে যেন পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। তবে মেয়েটির আন্তরিকতা ভাল লাগল বলে বলল, ও কেন কাল এল না—

কার কথা বলছিস ?

আমার স্বামীটা।

দূর। কি যে তুই বলিস। তিলুয়া ! সে এখন কোথায় মাল খেয়ে পড়ে আছে দেখ গে যা। যার ঘর ফাঁকা পাবে ঢুকে যাবে, নইলে নিচে দারোয়ানের ঘরেও পড়ে থাকতে পারে। তুই বটে হাসালি। স্বামী ! এখানে স্বামীর অভাব আছে ! গতর যতক্ষণ থাকবে রোজ কত স্বামী পাবি। ওসবে লাভ নেই, আমাদের বাড়ীউলিকে দেখে শিখে নে ; সময় থাকতে ট্যাকা গুছিয়ে নিবি।

টাকা শুনে চাঁপা ভেবে পেল না টাকা কোথায় পাবে ? একটু আগে লালীর কথা শুনল অনেক টাকা—কোথায় পায় টাকা। শীলা নিজেই প্রশ্ন করল, কাল কত পেলি ?

পেলাম মানে ? প্রশ্নটা মনের মধ্যেই আটকে রইল, চোখে মুখে ফুটে উঠল।

শীলা বলল, লোকটা তোকে টাকা দেয় নি ?

চাঁপা উত্তর দিল না। সে বুঝতে পারছে না টাকা কেন দেবে ? সে একজন সহানুভূতিশীল সঙ্গী পেয়ে এতক্ষণে সাহস করে জানতে চাইল, লোকটা কে ?

আ মলো যা, কোন গাঁ থেকে এসেছিস রে আবাগীর বেটি ? কিছু জানিস না ? ওতো তো তোর কাল রাতের নাগর রে ! তোর গতর খানা যা তাতে রোজরাতে কত ভাতার পাবি তার শেষ নেই। লাইন লেগে যাবে দেখবি।

ভাতার সে জানে। সে তো একজনই হয়, তার যেমন ওই ছেলেটা। তিলক। এ মেয়েটা আবার কি বলে, রোজ রাতে কত ভাতার—

শীলা ওর নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে গেল, এমনও থাকে ! এমন সরলতা সে কখনও দেখেনি বলে সস্নেহে বলল, তুই দেখছি কিছু জানিস না। তোকে তিলে ছোঁড়াটা পেল কোথায় ? কি বলে আনল ?

আমাদের শ্যামানন্দপুরে গিয়েছিল। বিয়ে ক'রে এনেছে।

শ্যামানন্দপুর কোথায় ?

অনেকদূর।

দূর বোকা। অনেকদূর মানে কোন জেলা ?

চাঁপা চুপ ক'রে রইল। শ্যামানন্দপুর সে জানে, এর বেশি জানবার আছে তা জানে না।

শীলা অবস্থা বুঝে বলল, এই হারামজাদাটা সেখানে গেল কি ক'রে? আর একদিন গেল অমনি বিয়ে ক'রে নিলি ? যেমন বোকার কাজ করেছিস এখন মর।

একদিন নয় দুদিন গিয়েছিল, চাঁপা জানাল, তারপর বলল, বাপ মা বিয়ে দিল। আমরা খুব গরীব তো!

শীলা সব বুঝে নিল, বলল, কি আর ক'রবি এখন নিজেরটা বুঝে নে, যেমন সব নিচ্ছে। এসেছিস যখন খাওয়া পরার তো অভাব হবে না তবে সাবধানে থাকতে হবে, পেট না হয়ে যায়। কতবার পেট ক'রবি ? একবার হ'ল মানে একবছর কাজ বন্ধ। খাবি কি ? তখন কি আর কোন বাড়ীউলি তোকে থাকতে দেবে! কেউ দেবে না।

অন্তর্বত্নী হওয়া ব্যাপারটা বোঝে চাঁপা। অনেকটাই বোঝে, তবে তার কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বোঝে না। স্বামী হ'লে ছেলে পিলে হয় এবং বিয়ে হলে সেটা হ'তে হয় তার বোধ এইখানেই সীমাবদ্ধ। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না আর তার সঙ্গে শীলার কথামত ঘটনার যোগাযোগ খুঁজে পাচ্ছে না সে।

ইতিমধ্যেই দরজায় ধাক্কা পড়ল, কে যেন ঘুম জড়ানো স্বরে জানতে চাইল, কে ভেতরে ?

কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে শীলা জানাল, আমি রে!

তাড়াতাড়ি বেরো।

দরজা খুলে চাঁপা দেখল, কালো রঙ শীর্ণকায় একটি মেয়ে কেবল শায়াটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁপাকে দেখে অসন্তুষ্ট চোখে তাকাল মেয়েটি। শীলা পেছনেই ছিল বলল, বাড়ীউলির ছেলের বৌ রে সোহাগী।

সোহাগী সেকথা শুনে একটা অতি অশ্লীল শব্দ বলে ভেতরে ঢুকে গেল। সেই শব্দের সঙ্গে চাঁপার পরিচয় নেই, তাদের গ্রামে শব্দটা নেই বলে, বুঝল শীলা, জবাব দিল, ক'বার খেলি ?

সোহাগী ততক্ষণে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। শীলা বলল, ঘরে চলে যা।

এ বাড়ীতে রান্নার পাট নেই। রান্না ঘর নেই। রাণীবালার স্মৃতিতে আছে

তার মা যখন ছিল, সে ছোট ছিল রান্না হ'ত। তখন এ বাড়ীতে এত লোক সমাগম ছিল না, মা সারাদিন হাপিত্যেশ ক'রে তাকিয়ে থাকত শুয়ে বসে দিনটা কেটে যেত অলসভাবে সন্ধেবেলায় গোবিন্দ গোস্বামী আসত। তার আগে মায়ের সাজগোজ হয়েই যেত, এক একদিন এক একরকম সাজত—তখন, আর সারাদিনের আটপৌরে মা তার থাকত না; রাণীবালারও জগত সংকীর্ণ হয়ে যেত, সারাদিন যেমন সমস্ত বাড়ীটা ঘুরতে পারত সন্ধে হলে আর তা পারত না। কে একজন মাস্টারবাবু আসত বুড়ো মানুষ একতলার ভেতরের ঘরে বসে পড়া শেখাতো অজগর, আতাফল ইত্যাদি বানান আর মানে। পড়াটা বেশ ক'বছর চলেছিল বলেই বাংলাটা এখনও যথেষ্ট সড়গড়, ইংরিজি সামান্য যা হয়েছিল, ভুলে গেছে। দরকারও তো হয়নি।

রান্নাটা মা নিজেই ক'রত, রাণীবালার মনে আছে আর একজন ঝি ছিল বিন্দুদি তার মা বলত।

একদিন গোবিন্দ গোস্বামীর আসা বন্ধ হ'ল তার মা ঘর ঘর ভাড়া বসাল এখন যে মাসি কাজ করে সে-ও একটা ঘরের ভাড়াটেই ছিল। এ বাড়ীটা মাকে গোবিন্দ গোস্বামীই কিনে দিয়েছিল। মা-ও একদিন মারা গেল, মাসিরও যৌবন গেল, একে একে খসে গেল ভাড়াটেরা। সব বদলে গেল। এই মাসি অনেকদিন নিজের গয়নাগাটি বিক্রি করেও ঘরটা রেখেছিল কারণ কোন কুলে কেউ নেই তার, কোথায় যাবে? সব বেচতে বেচতে যখন একেবারে নিঃস্ব রাণীবালাই বলল, তুমি অযথা ঘরটা আটকে না রেখে আমার ঘরেই শোও না মাসি। একটা তো পেট ও জন্যে আর ভাবনা কি?

সেই থেকে এই ব্যবস্থা চলছে। তখন রাণীবালার ঘরে খদ্দের আসত, রাণী-বালার কাছেই আসত তবে সে বেশি লোককে আসতে দিত না, সব রকম লোকের জন্যে ইতিমধ্যেই তো ঘরে ঘরে মেয়েরা সব জুটে গেছে রাণীবালা কেবল বিশেষ খাতিরের লোকদেরই পাত্তা দিত তাদের মধ্যে প্রধান ছিল ক্ষেত্রীবাবু। ক্ষেত্রীবাবু এলে কারও কোন কথা চলবে না, যেদিন আসবে কারও আসা চলবে না। গোপীবাবুরই ছেলে এই তিলক, পদবীটা কিন্তু তার লাগানো যায়নি, সেটা নিজের মন মত একটা লাগিয়ে দিয়েছে--রায়। একদিন ক্ষেত্রীবাবুরও বয়েস হয়ে গেল আসা বন্ধ হয়ে গেল, তখন কিছুদিন রাজত্ব চলল এক সকলদেব সিং-এর। বয়সে লোকটা রাণীবালার সমান বা সামান্য ছোটও হতে পারে, লম্বা চওড়া ভীষণাকৃতি জোয়ান। আগেও লোকটা আসত তবে দুধেল গাই ক্ষেত্রীবাবুর সামনে কখনও নয়; ক্ষেত্রীর আসা বন্ধ হ'তে সিং-ই প্রধান হয়ে উঠল। রাণীবালা তার আসাটা একান্তভাবেই চাই তো জেনেই লোকটা সুযোগও নিয়েছে প্রচুর। মাসি সব জানে, কি দেয়নি রাণী লোকটাকে। মেয়ের বিয়েতে নিজের পঞ্চাশ গ্রাম সোনার হার দিয়েছে, ছেলের জন্যে বাড়ী নিয়ে গেছে দামী দামী পোষাকের কাপড়, ছেলের জন্মদিন পালনের নাম ক'রে কতবার দামী দামী উপহার আদায় ক'রে নেয়নি সকলদেব! ও যাতে

সন্তুষ্ট থাকে তাই জুগিয়েছে রাণীবালা। দিনের পর দিন জুগিয়ে একসময় নিজের শরীরে ক্লান্তি জমেছে, মনেও অবসাদ এসে গেছে। সকলদেব বাড়ীটা পাবার ইচ্ছেয় ছিল রাণীবালা তার আগেই শীতল হয়ে পড়েছে বলেই হয়ত বেঁচে গেছে বাড়ীটা নইলে কি হ'ত কে জানে।

খুব ঘনিষ্ঠজনকে গল্প ক'রতে গিয়ে পুরানো কথা বলে মাসি। বলে আরাম পায়। জীবন যখন শুকিয়ে যায়, পুরানো স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা, তখন রোমন্থনই একমাত্র তৃপ্তি। স্মৃতিই আনন্দ, বিষদের স্মৃতিও সুখ। পুরানো বাড়ীতে পুরানো মানুষেরা থাকলে কত কথা সেখানে ঘোরাফেরা করে; অতীতের কথা সব, যে সব মানুষ ছিল অথচ নেই সেই সব মানুষের কথা, তাদের নিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা। আসলে সেই ঘটনার মধ্যে যে বক্তারও একটা প্রতিনিধিত্ব মূলক অবস্থান ছিল সেটা প্রকাশ ক'রে আনন্দ পায় কথক। এখনকার অবসন্নতাই যে সব নয় এই কথাটা জানিয়েই পরিতৃপ্তি তার।

মাসিরও হয়। অতীতের দিনগুলোকে গৌরবের মনে করে বৃদ্ধা, সেই গৌরব প্রেরণা যোগায়। এখন যাদের যৌবন আছে তাদের কাছে জানান দেওয়া যায় যে এই দাসীত্বই সব কথা নয় একদিন তারও এই যৌবন ছিল, তার রঙ ছিল, এমনই তার জৌলুসও ছিল।

হয়ত কোন উচ্ছল স্বভাবের মেয়ে রঙ তামাসা জোরদার ক'রতে প্রশ্ন ক'রে বসে, হ্যাঁ মাসি বাড়ীউলি মাসির পীরিতের লোকের কথা তো শুনলুম সত্যি ক'রে বল তো তোমার কোন নাং ছিল কি না?

তোর নেই? পালটা প্রশ্ন ক'রে মস্করাটা জিইয়ে রাখে বৃদ্ধা। তারপর নিজেই সমাধান করে, কার না থাকে রে? মনের মানুষ থাকবে না তা হয়? মন থাকলেই মনের মানুষও থাকে।

সে কে গো? আবদার ধরে মেয়েটি।

অত কি আর মনে আছে?

ওসব কথা বললেই শুনব? মনের মানুষকে কেউ ভোলে?

মাসি চুপ ক'রে যায়। পুরোনো প্রসঙ্গ বড় আরামদায়ক, তবু সব কেমন ঝাপসা হয়ে যায় ধীরে ধীরে। মনের মানুষ—যাকে একদিন প্রাণের দ্বিতীয়ভাগ বলে মনে হ'ত তার কথাও আবছা। মনে হয় একটা পাতলা শাড়ী শুকোতে দেওয়া আছে তার ওপাশে যে জানালা সেখানে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে কেউ। তাতে আকার আছে মূর্তি নেই। রূপের আদল আছে পূর্ণ রূপ নেই। এসব অল্প বয়সীরা এখন একথা বুঝবে না, পরে সব আপনি বুঝবে। এখন যে সময় সেই সময় যা ভাবনা তার বাইরে যাবে কেমন ক'রে? সে নিজেই কি তখন গিয়েছিল! সব সম্বল বিক্রি ক'রে যখন খেতে লাগল তখনও মনে হয়েছিল দিন ফিরবে। কিসের দিন সেটা ভাবে নি। কি ক'রে ফিরবে তাও নয়। তার রূপে খামতি ছিল, যৌবন

রাণীবালার মত দীর্ঘায়ু হয়নি, শরীরের যে তেজ যৌবনে আসে তা তার স্বল্পায়ু ছিল বলেই হারানো দিন ফিরে আসে নি। তবু ছিল। আর এখন মাঝে মাঝে সেই ছিলগুলোই তার জীবন ভরে দেয় সাময়িক ভাবে।

একসময় কাতারে কাতারে মেয়ে এল 'লাইনে' কাজ ক'রবে বলে। এলাকার সব বাড়ী ভরে গেল। তখনই রাণীবালা তার রান্না ঘরটিকেও বাজে জিনিষের জমা সরিয়ে ভাড়া বসিয়ে দিল। রান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আরও আগে থেকেই, বাপি বলে ছোকরাটা হোটেল খুলে সুবিধে ক'রে দিল। এলাকায় জন্মানো ছোট ছোট কতগুলো অনাথ ছোকরাকে দিয়ে বাড়ী বাড়ী ভাত পাঠাতে লাগল। যার যেদিন দরকার, যখন দরকার। রাতের খাটনির পর কোন মেয়ের আর ভাত রাঁধতে ভাল লাগে। রাঁধবেই বা কোথায়? জায়গা কই? ব্যবস্থাই বা কই? তার চেয়ে মুখের সামনে তৈরী খাবার অনেক ভাল। তাই চলছে।

সকাল বেলার জলখাবারটা মাসিই নিয়ে আসে। দুর্গাচরণ মিত্রের রাস্তায় রাজু মেঠাইওয়ালার দোকানে সকাল হলেই গরম কচুরি ভাজে, জিলিপিও। অনেকে খায় অনেকে খায় না। কোন রাতে রোজগার বেশি হলে সখ করেও খায় অনেকে। ন'টার বেলায় ঘুম ভেঙ্গে আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হাঁক ছাড়ে, মাসি ও মাসি।

ডাক শুনে হাজির হলে বলে, যাওনা মাসি মেঠাইওয়ালার দোকান থেকে কচুরি নিয়ে এসো।

মুখে মদের গন্ধ ছাড়ছে দেখে মাসি বলে, বাসি মুখ ধুলি নে এখনই খাবি? মুখ ধো।

আলস্য ছাড়তে ছাড়তে বলে, মাইরি বড্ড খিদে পেয়েছে।

রাজু সাউ-এর দোকানে বড় খাতির বুড়ির, সে মনে করে। কারণ সময় অসময়ে দুচারটাকা বাকিতেও দিয়ে দেয়। জানে যে মাসি ঠিকই টাকা দিয়ে আসবে। যার জন্যেই জিনিষ আনুক টাকা চেয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে সময় মত। ঐ সাময়িক বাকিটুকুই বা দেয় কে, তাই খাতির বলেই মনে করে মাসি। সেটা বজায় রাখবার জন্যে ব্যাগ্র থাকে। যে মেয়ে পয়সা দিতে দেরি করে বা ঘোরায় তার জন্যে বাকি আনে না।

রাণীবালা এদিক থেকে ভাল। নিতেও যেমন দিতেও ঠিক তেমনই। টাকা আদায় ক'রতে সে কোন ঢিলেমি শুনবে না। আঁচল খুলে টাকা বের ক'রে দিয়ে বলল, যাও মাসি হালুয়া কচুরি নিয়ে এস, মেয়েটাকে খেতে দাও। গরম জিলিপি—পেলে এনো কয়েকটা।

মাসি জানে জিলিপিটা রাণীবালার প্রিয় খাদ্য। এছাড়াও রাণীবালার প্রিয় সব কিছুরই সন্ধান রাখে মাসি। মুখে যতই যা বলুক ছেলেটাও যে প্রিয় একথা জানে বলেই বলল, তিলকটা তো কাল এলই না। তোমাকে কিছু বলেছে?

মরতে দাও—সক্ষোভে বলল রাণীবালা, যেখানে যায় যাক। আমি আর পারি

না। কে ওর খোঁজ রাখবে বল?

মুখের কথা যে মনের ভাবের সঙ্গে আলাদা মাসি তা ভালভাবে জানে ব'লেই রাস্তায় নেমেই বুধোর কাছে খোঁজ ক'রল। বুধোর চায়ের দোকানে সকালটায় এসে বসে তিলক। যেখানেই থাকুক এই সময়টা বাঁধা। বাড়ীতে থাকলে আসবে। সকালবেলা চা ওমলেট সে খায় রাণীবালা জানে কারণ মাসকাবারে পয়সাটা তাকেই মেটাতে হয়। তাতে কোন দুঃখ নেই, ছেলে যা-ই খাক টাকা মেটাতে দ্বিধা করে না রাণীবালা তার আর আছেই বা কে? কার জন্যে কি? কেবল সে চায় ছেলেটা কিছু করুক। ভবিষ্যতে আয় রোজগারের ব্যবস্থা ক'রে নিক সময় থাকতে। তিলকের সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই ব'লেই যা দুঃখ রাণীবালার। মাঝে মাঝে সেই দুঃখ প্রকাশ হয়ে পড়ে, কপালে সব সুখ কি আর থাকে মানুষের?

মাসিও কথাটা মেনে নেয়। আজ না হয় কম বয়েস আছে, একদিন তো বড় হবে! পুরুষ মানুষ রাঁঢের রোজগারে বসে বসে খাবে তা কি মানায় না সব সময় ভাল লাগে? ওরই একসময় ভাল লাগবে না, তখন কি ক'রবে? এখন থেকে রোজগার না ক'রলে তখন কি হবে?

রাণীবালার ভয়টা অন্য জায়গায়, বলে, বাড়ীভাড়ার রোজগারের কোন ভরসা আছে? এখন হচ্ছে বলে চিরদিনই হবে এমন কি কথা? এখন যা দিন পড়েছে শুনতে তো পাই ঘরের বৌঝিরা সব পয়সার জন্যে রাঁঢ়গিরি ক'রছে। ক'জন আর ফুর্তি ক'রতে খানকি বাড়ী আসে? এর ওপর ভরসা ক'রে কি আর চলে? আমরা মেয়ে মানুষ কোথায় যাব?

রাজু মেঠাইয়লার দোকানে যাবার আগে বুধোর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে জিজ্ঞাসা ক'রল, কি দেব গো মাসি?

তিলক আজ এসেছে রে?

এ পাড়ারই ছেলে বুধো। কোন এক আধিয়ার ছেলে। মা-টার কি সব খারাপ রোগ হয়েছিল কম বয়সেই মারা গেছে, দশ দোরে খেয়ে আশ্রয় পেয়ে মানুষ হয়েছে বুধো, পরে পথের ধারে ছোট দোকান ক'রছে। জীবনের প্রতি তার মায়া আর উপেক্ষা সমান। সবই সে অবহেলার সঙ্গে ধরে। তেমনি হেলাফেলা ক'রেই জবাব দিল, কালরাতে তো কেষ্টার সঙ্গে দেখছিলাম, আজ এখনও আসে নি।

'কেষ্টার সঙ্গে' কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তাতেই সব স্পষ্ট হ'ল মাসির কাছে। কেষ্টা পাড়রে সেরা মাতাল। তার সঙ্গে থাকা মানে নিশ্চয় কাল নেশা ক'রে ঘুরেছে তিলক, কোথায় পড়ে আছে কে জানে। কোথায় খুঁজবে তাকে? এ এলাকায় কি মানুষ খোঁজা যায়? না খুঁজলে পাওয়া যায় কাউকে?

খাবার নিয়ে বাড়ী ফিরে বলল, আমি বলি কি ছাতে একটা ঘর ক'রে ছেলেটাকে আটকে দাও।

রাণীবালা বকে উঠল, তুমি বেশ বলছ মাসি। একটা বেড়ালকে আটকানো যায়

না মানুষকে ঘরে আটকে রাখা যায় ? ঘর ক'রলেই হ'ল ?

আমি বলছিলাম কি পছন্দ ক'রে মেয়েটাকে নিয়ে যখন এসেছে তখন থাকনা ওকে নিয়ে। ওপরে ঘরটা বানিয়ে দাও ওরা ঘর করুক।

মাসির কথায় রাণীবালা গম্ভীর হ'ল। বোঝা গেল কথাটা মনে ধরেছে বলে ভাবছে। তাকে ভাবতে ছেড়ে দিয়ে মাসি বলল, কচুরি জিলিপি এনেছি। কাকে কি দেবে তুমি নিজেই দাও। আমি নির্মলার চা-টা এনে দিই, ওর বোধহয় জ্বর হয়েছে।

পাঁচটা সাতটা নয় ঐ একটাই মাত্র ছেলে রাণীবালার। ওপাড়ার সুখদার ছেলে মেয়ে নাকি কোন ইংরিজি ইস্কুল থেকে পাশ ক'রে এখন বড়মাপের মানুষ হয়েছে। বাড়ীর তিনতলার দুখানা ঘরে আলাদা থাকে। সুখদা বাড়ীউলির পয়সার তো শেষ নেই গাড়ী কিনে দিয়েছে ছেলেমেয়েকে তাতেই তারা যাতায়াত করে, নিজের মত থাকে। ছেলেমেয়ে এমন থাকে যে অমন ভব্যিযুক্ত বাবু না কি কমই দেখা যায়। এলাকায় কারও সঙ্গে কথাটি বলে না তারা, কেবল রাতে এসে খায় শোয় মাত্র। ভাগ্য বটে রাণীবালার। ছেলেটা কি কিছুতেই একটু লেখাপড়া শিখল! তিনবার স্কুল বদলানো হ'ল তাও অর্দ্ধেক পড়া মাথায় ঢুকল না, স্কুলের অর্দ্ধেক-টাই শেষ হ'ল না তার। কখন যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ ক'রে পড়ার পর্ব চুকিয়ে বসে রইল রাণীবালা তা টেরও পায়নি, পাবার কথা অবশ্য নয়, সে থাকে তার জগতে যেখানে থেকে স্কুল কলেজ বা শিক্ষা জগতের দূরত্ব পরিমাপ করা অসম্ভব।

অন্য আর কিছু দুঃখ নেই রাণীবালার। দুঃখবোধ তার নেই। নিজের বাড়ীতে বসে জন খাটিয়ে যেটুকু রোজগার হয় সে তার যথেষ্ট, যথেষ্টই কেবল নয় নিয়মিত অর্থ উদ্বৃত্ত হয় তার, অর্থ গিয়ে জমা হয় কিছুটা ডাকঘরে কিছুটা ঘরে, আর গয়নাতে কিছুটা। গরাণহাটার তুষ্ট মালাকার যোগানদার, নিয়মিত গয়না যোগায়। আগে তো ডাক পাঠালেই বাড়ী আসত তুষ্ট মালাকার, আজকাল গয়না গড়ানো আর তেজারতি কারবার ক'রে অনেক ধনী হয়ে গেছে বলে আসবার সময় পায় না, যেতে হয় রাণীবালাকেই। তার অবশ্য অসুবিধে হয় না, সে যৌবনও আর নেই শরীর নিয়ে ব্যবসাও ক'রতে হয় না বলে পথে নামতে আপত্তি করবার কারণ নেই। দরকার মতই টানা রিক্সা ক'রে বেরিয়ে পড়ে খটখটে দুপুরে। তখন পথ ফাঁকা থাকে তুষ্ট স্যাকরার দোকানও ফাঁকা। ঘর জোড়া চাটাই-এর ওপর বসলেই পুরানো খদ্দেরকে সাদরে বসায়, অনেকদিন পর যে! খবর-টবর সব ভাল তো!

অনেকদিন পর দিলখুশ একশ নম্বর জর্দা দিয়ে পান কিনে মুখে ঢুকিয়েছিল রাণী রিক্সায় আসতে আসতে। পিক ফেলে বলল, এসে পেঁছোতে যখন পারলুম তখন ভাল বৈ কি! আপনি তো আর যাবেন না, কাজেই আসতেই হবে আমাকে।

তুষ্ট একটু রসিকতা ক'রল, এখন কি আর সে বয়েস আছে ?

বয়েস থাকতেই বা আর গেলেন কই ?—রাণীবালা পর্যায়ে পেয়ে রসালাপে

তুষ্ট স্যাকরাকে টেক্কা দিল, ট্যাঁকের জোরটাই তো শেষ কথা নয় কোমরের জোরটাই বড় জোর স্যাকরা মশাই।

তুষ্ট মালাকার এখানেই থামল। সে অর্থমনস্ক মানুষ, অর্থ রোজগারের জন্যে তার ব্যবসা, সেটাই সে মন দিয়ে করে। তার মন, সময়, শ্রম সব টাকার পেছনে নিয়োজিত। এর বাইরে বিশ্বকে সে চেনে না। তাই সে রঙ্গরসিকতা ছেড়ে বলল, কি মনে ক'রে এলে তাই বল ?

তুষ্ট স্যাকরার যৌবনকালেই রাণীবালাও যৌবনবতী হয়ে হয়ে ছিল। আলাপ কিছুদিন পরের, তুষ্ট তখন প্রৌঢ়ত্বের প্রথম প্রান্তে পেঁাছেছে, রাণীবালার যৌবন তখনও তার আঁচলের গেরোয় বাঁধা। তখন ঠাট্টাতামাসা রঙ রসিকতা হ'তে পারত, দুজনেরই সে সময় ছিল, মনও ছিল। তা হয় নি। খদ্দেরকে খদ্দের হিসেবেই দেখত তুষ্ট মালাকার। দেশের কুখ্যাত এলাকার সংলগ্ন তার দোকান, অমন অনেক রাণীবালাই তার খদ্দের, রাণীবালারা ছাড়া খদ্দের আর এ মহল্লায় জুটবে কে ? তাই তাদের সঙ্গে ব্যবসাই ক'রেছে তুষ্ট স্যাকরা, ফষ্টি নষ্টি করে নি, যারা ক'রেছে তারা উচ্ছন্নে গেছে সব ; তুষ্ট জানে। সে তাই ব্যবসা ক'রেছে, ভাল রকমই ক'রেছে। এমন সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে ? সে সুযোগ পুরো কাজে লাগিয়েছে তুষ্ট। প্রায় সবই তো নিরক্ষর মেয়ে, সাক্ষর যদি বা কিছু আছে শিক্ষা তো নেই, মালের ওজন হিসেব সবই যতটা বোঝে, বোঝে না তার অনেক বেশি। কাঁচা পয়সা হঠাৎ কিছু হাতে এসে গেলে পয়সার প্রয়োগ জানে না বলে স্যাকরার কাছে এসে বলে, একজোড়া বালার কত দাম হবে গো ? অথবা বলে, এই টাকাতে আমাকে একছড়া হার ক'রে দিতে পারবে ওই বিনোদবালাকে যেমন গড়িয়ে দিয়েছ ?

কে বিনোদবালা কেমন হার তৈরী ক'রে দিয়েছে মনে না থাকলেও অসুবিধে হয়না তুষ্টর, বলে, আরে ও তো পুরানো নকসার হার তোমাকে আরও ভাল গড়িয়ে দেবো'খন। কত রকম আছে দেখে পছন্দ কর না !

দু একটা তৈরী থাকলে সিন্দুক খুলে দেখায় তুষ্ট। গয়না! দেখলেই মন চকচক ক'রে ওঠে, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়। সবই তো পছন্দ, কোনটা বলবে! বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে ক্রেতা। সেই সুযোগে গয়নার নকসা বইটা এগিয়ে ধরে তুষ্ট মালাকার, এর মধ্যে অনেক ডিজাইন আছে যেটা পছন্দ বলে দিলেই ক'রে দেব।

ক্রেতার মনে তখন পছন্দ আর অর্থক্ষমতার দ্বন্দ পরস্পরকে ধরে টানছে! তারই মধ্যে সামঞ্জস্য করবার জন্যে তুষ্ট দোকানীকে ধরে বসে, এইটা ক'রতে পারলে ভাল হয়। জমানো টাকার থলিটা দোকানদারের হাতে তুলে দেয় পরম নির্ভরতায়, গুণে দেখ তো মহাজন এতে হবে কি না! এরই মধ্যে ক'রে দাও—।

তুষ্ট গুণে দেখে বলে, আর সাতশো টাকা লাগবে।

আরও—শব্দটা উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় ক্রেতা দমে যাচ্ছে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে তুষ্টই পরামর্শ দেয় তোমার বাড়ীউলিকে বলো না এই ক'টা টাকা

কি আর তোমাকে ধার দেবে না ? কার বাড়ীতে থাক তুমি ?

মানদী মাসির বাড়ী।

মানদা দাসী তো ? দিয়ে দেবে। আজই তো আর টাকা লাগছে না। এ টাকাটা বায়না হিসেবে জমা রইল আমার তৈরী ক'রতেও তো সময় লাগবে, তুমি ততদিনে টাকা জোগাড় ক'রে নিয়ে যেয়ো।

এই জন্যেই এই দোকানটা পছন্দ সবার। পাড়ার মেয়েরা সবাই চোখ বুঁজে চলে আসে। এমন সুযোগ কে দেয়। যার যখন সুবিধে হয় চলে আসে, অনেকে অনেক সময় ধীরে ধীরে টাকা জমা দিয়ে যায়, দিতে থাকে, মাস বছর পার হ'লে জেনে নেয়, আমার কত টাকা হ'ল মহাজন ?

খেরো খাতা খুলে তুষ্ট বলে দেয়, তিন হাজার ছশো টাকা। কাউকে বলে একহাজার দুশো পঞ্চাশ। বারে বারে যেমন যেমন টাকা জমা দিয়েছে তেমন ক'রেই বলে দেয় তুষ্ট মালাকার সবাই তাই সন্তুষ্ট। ধর্ম রাখে বটে মহাজন। যখনই যাও ঠিক তোমার হিসেব বুঝে পাবে। এই কথা দুপুরের গল্পে বিকালে অবসরে মুখে মুখে ফিরতে থাকে তাই একজন থেকে আর একজন আসে, এক মেয়েমানুষ থেকে আর এক মেয়েমানুষ।

অনেক মেয়েই গয়না গড়িয়ে রাখতে পারে না। অভাব হলেই টান পড়ে। হয়ত কোনদিন না পরা অনেক সখের চুড়ি চারগাছা হাতে ক'রে চলে আসে, মহাজন এক-হাজার টাকার বড় দরকার।—চুড়িগুলো এগিয়ে দেয় মেয়েটি।

তুষ্টর কোন বিকার হয় না তবু বাচনিক সহানুভূতি দেখিয়ে বলে, এই তো সেদিন করালে। এমন কি দরকার পড়ল ?

এই সহানুভূতির আন্তরিকতাটুকু ভাল লাগে বলেই মেয়েটি আপ্লুত হয়। এবং সকলেই জানে মালাকার জুয়েলারীর মহাজন কারও দুর্বলতার কথা অন্য কাউকে বলবে না। যার যার গোপন কথা সবই নিজের মধ্যে জমিয়ে রাখে, কেউ কারও কথা জানতে পারে না। তাই সবই স্বচ্ছন্দ এবং নিশ্চিন্তে লেন দেন করে এখানে। তুষ্ট সকলকেই সমান সহানুভূতি দেখিয়ে বলে, এত সখ ক'রে যখন করিয়েছ বিক্রি না ক'রে বরং এখানেই জমা রেখে যাও; টাকা হ'লে ফেরৎ নিয়ে যেয়ো। আর একজনের বায়নার টাকা বা জমানো টাকা একে ধার দিয়ে সুদটুকু লাভ করে তুষ্ট স্যাকরা। কারও ক্ষতি হয় না, তুষ্ট স্ফীত হয়।

আর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই আঠার নম্বর বাড়ীর মালিক মঞ্জুরাণী একদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখল তুষ্টর কাছে, এলাকার খানদানী বাড়ীর মালিক, বড়দরের মেয়ের ঘাঁটির ইজ্জতদার মহিলা নিজের ঝিকে দিয়ে খবর পাঠাতেই তুষ্ট মালাকার গিয়ে হাজির। এ বাড়ীর ডাক আসা মানেই কোন ধনী লোক দামী কোন গয়নার বায়না দেবে ভালবাসার মেয়েমানুষকে দিতে। সেই আশাতেই নিক্তিটা কাপড়ে মুড়ে নিয়ে আসা, কিন্তু সে মোড়ক আর খুলতে হ'ল না, নিষেধ ক'রল

মঞ্জু, থাক থাক আর ওজন যন্তর খুলতে হবে না।

মঞ্জুর কথা বলার সময় ওর গলার দিকে অপলক তাকিয়েছিল তুষ্ট। এমন নিটোল সুন্দর গলা, দেহ সৌষ্ঠব দ্বিতীয়টি দেখেনি সে। এখানে না দেখে অন্য কোথাও দেখলে সে নিশ্চিত হ'ত বুঝি বা কোনও পরীর সঙ্গে দেখা হ'ল। কি গায়ের রঙ! এমন রঙ ভগবান দ্বিতীয় কারও দেহে লাগাতে পেরেছেন বলে তার মনে হয় না। মাথার চুল যা সামান্য একটু কটা। নইলে মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্তই যেন অনুপম সৌন্দর্যের নমুনা হিসেবে গড়ে তোলা। যে শক্তি সাধারণ মানুষ নির্মাণ করে এ যেন তাঁর নয় অন্য কোন আরও সুদক্ষ বিশ্বকর্মার নির্মাণ-শৈলীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন। মঞ্জু নামের অর্থ তুষ্ট জানে না নইলে ভাবতে পারত নামটি যথার্থ হয়েছে। নামধারীই আবার বলল, আমার টাকার বড় দরকার।

এমন একটা কথা শুনতে হবে ভাবে নি তুষ্ট। সে থমকে গেল। এ বেশ কিছু সময় আগেকার কথা তুষ্ট মালাকার তখন এমন সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। সাধারণ ভাবে ব্যবসা করে মাত্র, সবে জমে উঠছে। গয়না গড়িয়ে দিতে বললে তা পারে, এই মঞ্জুকেও ক'রে দিয়েছে বেশ কয়েকবার, এ বাড়ীর আরও দুচারজন মেয়েরও ক'রে দিয়েছে। সে সব গয়না মনে ধরার মতও হয়েছে নইলে এত দোকান ছেড়ে তারই কাছে মেয়েদের নির্ভরতা কেন? তুষ্ট মনে করে তার প্রতি মা লক্ষ্মীর কৃপা, তাই যে খদ্দেরই যাক না কেন, যে পেশারই মানুষ হোক, সকলকেই মা লক্ষ্মীর পাঠানো মনে ক'রে খাতিরটা খুবই করে। ইতিমধ্যেই রেকাবিতে ক'রে সন্দেশ এনে তার সামনে রাখল মঞ্জুর নিজস্ব পরিচারিকা মানদা। তুষ্ট জানে এ বাড়ীতে এলে হয় সন্দেশ নয় সরবৎ অভ্যর্থনা হিসেবে কিছু আসবেই তবু মঞ্জুর কথা শোনার পর এ খাতির গ্রহণ ক'রতে তার বিশেষ সংকোচ হচ্ছিল কারণ মঞ্জুরাণীর কথা সে যে কেমন ক'রে রাখবে ভেবে পাচ্ছে না।

সন্দেশের রেকাবিতে তুষ্ট হাত দিচ্ছে না দেখে মঞ্জুই অনুরোধ করল, জলটুকু খেতে খেতে কথাবার্তা বলি। নিন, খান।—তার আপত্তি নাকচ ক'রে দিয়ে বলল, সামান্য ক'টা মাত্র সন্দেশ, খেয়ে ফেলুন তো। সামনে থাকলেই আপত্তি করবেন, না থাকলে তো আর করবার ইচ্ছে হবে না। খেয়ে নিন।

তুষ্টর তখন কাহিল অবস্থা। মাঝে মাঝে কারও কারও প্রয়োজনে দু চারশো টাকা ধার সে দেয় বটে সুদের নিশ্চয়তা পেলে; তবে সে তো খুবই গোপনে। সামান্য দু চার হাজার টাকা তার পুঁজি, সেটাই ছোট ছোট অংকে ভাগ ক'রে মেয়েদের দেয়; এ বাড়ীতে সে কথা এল কি ক'রে? তার ভাবনার মধ্যেই মঞ্জু বলে বসল, আপনি টাকা লেনদেন করেন আমি জানি। তাই ভাবলাম আমার কাছে তো টাকা অযথা বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকছে, আপনি যদি সে টাকা কাজে লাগান তাহ'লে আমারও কাজ হয় আপনিও কিছু রোজগার বাড়িয়ে নিতে পারেন।

বলার পরই আরও ব্যাখ্যা করল মঞ্জু, এই ধরুন যা আয় হ'ল আপনি কিছু নিলেন আর আমাকেও কিছু দিলেন—।

এতক্ষণের দুর্ভাবনা কেটে গিয়ে যেন আকস্মিক আলোর উদ্ভাস হ'ল তার মনে! হঠাৎ প্রবল উদ্দীপনা এমনভাবেই সঞ্চারিত হ'ল যে সে উদ্বেল হয়ে উঠল। তবে তুষ্টর চরিত্রের বিশেষ গুণ তার সংযম! কোন অবস্থাতেই সে উচ্ছ্বসিত হয় না। আপন মনোভাব অবদমন করে রাখবার ক্ষমতা তাকে অবিচল ক'রে রাখে বলে সে কেবল নিঃশব্দে সন্দেশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

সেই থেকেই মঞ্জুরাণীর টাকা তুষ্ট মালাকারের মাধ্যমে খাটছে। সে টাকা তার ভাগ্যকেও অনেকটা প্রভাবিত ক'রেছে। লগ্নী করা টাকার সুদ কিছুটা মঞ্জু পেয়েছে ঠিকই, সে নিজে পেয়েছে অনেকটা। তুষ্ট স্যাকরা অর্থশালী হয়ে যাবার পর অনেকের সঙ্গে অনেক ব্যবহারে কিছুটা তারতম্য ঘটে গেলেও প্রৌঢ়া মঞ্জুরাণীর সঙ্গে প্রায় সমবয়স্ক মালাকারের ব্যবসায়িক সম্পর্কে কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। কুড়ি বছর আগের গোপনীয়তাতেই তা আছে। সময়ের ব্যবধানে লগ্নীর পরিমানে বৃদ্ধি ঘটেছে মঞ্জুরাণীর শরীরে মেদবৃদ্ধির মত। তবে মঞ্জুরাণীর লগ্নীবৃদ্ধি তুষ্টর ধনবৃদ্ধির মত বিপুল নয়। তুষ্ট রোজগার কেবল দুহাতেই করেনি মনে-প্রাণেও ক'রেছে বলে তার পরিমাপে কোন গাণিতিক সূত্র কাজ করেনি।

এই সময়কালব্যাপী লেনদেন গোপন থাকলেও সঙ্গোপনে নেই। তার আনুমানিক সন্ধান যে দু চারজন পেরেছে রাণীবালা তাদের অন্যতমা। যদিও তার পরিমাণগত ধারণা ঈর্ষা মেশানো বলে মাপে বাস্তবের চেয়ে বড়। ঈর্ষা অনেক কিছু বড় করে অনেক কিছুকে ক্ষুদ্র। সময় ও অবস্থার তারতম্যে বড় ছোট যাই হোক ঈর্ষা যাকে আশ্রয় করে তার মানসিক গঠনকে এমনই সংকীর্ণ ক'রে দেয় যে তার মধ্যে কোন প্রকার গুণের আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ছোটখাট কিছু কোন সময় থেকেও থাকে তা সংকীর্ণতার নিষ্পেষণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে। রাক্ষস প্রকৃতির মানুষ যেমন অপর প্রাণীর মাংস ভক্ষণ ক'রে নিজের শরীরে মেদবৃদ্ধি ঘটায় ঈর্ষাও তেমনই সকল রকম গুণকে বিনাশ ক'রে, আত্মগত ক'রে আপনাকেই বিস্তার করে আধারের ভেতরে। ফলে যে ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে পড়ে সে তো হতেই থাকে, দিনে দিনে বেশি মাপে হতে থাকে।

এখানেও তাই সেই প্রাকৃতিক কারণেই অনেকেই অনেকের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষে খিন্ন। এ ঈর্ষা রাণীবালা করে আশা বাড়ীউলিকে, আশা করে পুতুলদাসীকে, পুতুল করে মঞ্জুকে; এমনটি ক'রেই চলছে। এর বেশির ভাগই পরশ্রীকাতরতা। মঞ্জুর সঙ্গে যোগ্যতার মাপকাঠিতে সকলেই দীন হলেও তার ঘরে যত বড় মানুষের, বড় দরের মানুষের ভীড় বলে তাকে ঈর্ষা করে সকলেই। মঞ্জু নিজে কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, কোনদিনই কাউকে গ্রাহ্য করেনি। এ নিয়ে গস্তানী মহলে বেশ কয়েকটা মনোরোচক গল্প চালু আছে। বিহারের কোন অঞ্চলের এক ধনশালী

যুবক জমিদার একসময় মঞ্জুর বাঁধা খদ্দের ছিল। শুধু মঞ্জুর জন্যই সে লোকটা কলকাতায় পড়ে থাকত। দিনের পর দিন মঞ্জুর কাছে এসে আত্মনিবেদন ক'রে তৃপ্তি পেত লোকটি, মঞ্জু আদর ক'রে বলত রাজা সাহেব। আর সেই 'রাজা সাহেব' নাম ধরে রাখবার জন্যে হীরের হার, মুক্তোর বালা, সবচেয়ে দামী বেনারসী শাড়ী —কি না দিয়েছে লোকটি। মঞ্জুর সন্তুষ্টির জন্যে তার মনের সাধ সাধ্যের সীমাকে সর্বদাই ছাড়িয়ে যেত। তাগড়াই চেহারার বিশাল মানুষটা যেন পোষা কুকুরের মত কুঁকড়ে যেত মঞ্জুর সামনে। জাঁদরেল মানুষটাকে নিয়ে মঞ্জু পোষা কুকুরবাচ্চার মত খেলা করত। হয়ত চুপচাপ শুয়েই রইল। যে লোক রঙ্গরসিকতার জন্যে এসেছে সে কি আর ঝিমিয়ে থাকা পছন্দ ক'রবে। কিন্তু রাগ করবার বদলে বিচলিত রাজা সাহেব ব্যাগ্র উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করল, কা হুয়া মেয়ে প্যারে ?

মেকি যন্ত্রণায় কাতর মঞ্জু বড় কষ্টে উচ্চারণ ক'রল, মাথার যন্ত্রণায় আর পারছি না।

মঞ্জুরাণীর মাথার যন্ত্রণা যেন 'রাজার' শিরপীড়া হয়ে দাঁড়াল, ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। মাথার কাছে বসে জানতে চাইল কোন ওষুধ আনাবে কি না ? মঞ্জুরাণীর খিদমতে সে দিনরাতের ঝি চাকর রেখে দিয়েছে, হাঁক ছাড়ল, এ বুধুয়া ?

না না থাক। আপনি বসুন। অত কষ্টের মধ্যেও কণ্ঠস্বরে সোহাগের ঘাটতি হ'ল না মঞ্জুরাণীর। অবশেষে আধঘণ্টা ধরে মাথা টিপে দিয়ে 'রাজা' সাহেব'ই সুস্থ ক'রে তুলল মঞ্জুকে। মঞ্জু যে সেবা গ্রহণ ক'রেছে এতেই 'রাজা' তৃপ্ত। এবং মাথার যন্ত্রণার দরুণ যে শারীরিক ক্ষয় তা পূরণের জন্যে তখনই এল বিশ্বসেরা আরক, যার প্রতি বিন্দুই মনের বলসঞ্চারে সহায়তা ক'রতে পারে। মূল্যবান সেই সুরাসার এনে বুধুয়া সরকারে পেশা ক'রল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকেই খুব মোলায়েম ক'রে সম্বোধন ক'রল, হুজৌর !

লা বে'লা। ইৎনা দেরি কিঁউ ভইল ? অসহিষ্ণু রাজা এমন গর্জন ক'রে উঠল যে বুধুয়ার আর বাক্য সরল না। সে বলতেই পারল না যে দোকানে যেতে আসতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকু বাদে একটা পলকও বাজে খরচ করে নি যাতে তার মনিবের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। বড়া আদমীর মর্জি ওরকম হয় বুধুয়া জানে বলেই আর উচ্চবাচ্য না ক'রে বোতল নামিয়ে দিয়ে নীরবে সরে গেল প্রচ্ছন্নভাবে দোষ নিজে মেনে নিয়ে। এবার তার আর কোন ভূমিকা নেই, এবার দাইয়া গ্লাস বের ক'রে দেবে, বরফ দেবে বড় জোর তাকে আবার হয়ত হুকুম হবে, খানা লাও। কি কি আনতে হবে শুনে নিয়ে ট্রাম রাস্তার ওপরকার এলেন হোটেল থেকে সদ্য তৈরী গরম খাবার গলদঘর্ম হয়ে নিয়ে আসবে। ঐ হোটেলটায় গেলে নানা রকম সুখাদ্যের খুশবু দৌড়ে এসে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে ঢুকে পড়ে মনকে উৎসুক ক'রে তোলে। রসনা অযথাই উজ্জীবিত হয়। চিংড়ি মাছের কাটলেট বা মুরগীর আফগানী কাটলেট অথবা অন্য কিছু সুখাদ্য হাতে ক'রে আনতে আনতে সারাটা

পথ সুঘ্রাণ পেতে পেতে বিবশ হয়ে যায়; অবশেষে মনকে সংযত করে ওসব বড় লোকদের খাবার, তাদের মত গরীবদের খেতে নেই। কিন্তু গন্ধ মনের মধ্যেও ম ম ক'রতে থাকে, বুধুয়া তা থেকে মুক্তি পায় না।

পানীয়ের হুকুম রাজা সাহেব দিলেও খাবার আনবার বরাত মঞ্জুই দেয় তার পছন্দ মত। আর পেয়ারা দিলের পছন্দই তো পছন্দ রাজা সাহেব যোগীন্দর সিং-এরও। যদিও মানুষ আপন রুচি অনুসারে খাদ্য নির্বাচন করে, যোগীন্দর করে তা নিজের বাড়ী ফিরে গেলে। সেখানে তার স্বদেশী গ্রাম্যস্ত্রী পুত্র পরিজনদের মধ্যে আপন রুচির প্রকাশ ঘটায় যোগীন্দর। এখানে মঞ্জুরাণীর ইচ্ছাই তার ইচ্ছা ; ওর পছন্দেই এরও সন্তুষ্টি।

আপন অহংকার, সংসার সব বিসর্জন দিয়ে যোগীন্দরের এখানে থাকতেই ভাল লাগে। কলকাতা এলে আর যেতেই চায় না। মঞ্জু মাঝে মাঝে সোহাগ দেখিয়ে যোগীন্দরের ভাষাতেই বলে, কি বাড়ী যাবে না ? বউ ছেলে ফেলে কতদিন থাকবে এই কলকাতায় ?

নেশায় জড়িত স্বরে যোগীন্দর জানায় সে যাবে না। এখানেই ঘর ক'রবে সে।

মঞ্জু তখন পূর্ণ যৌবনা। শরীরে ও মনে পূর্ণা। পরিপূর্ণা। মাঝে মাঝে সে তার প্রার্থী তালিকা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যায়। সন্দেহ হয় মায়া নয় তো ? যারা আসে তারা কেউ বরানগরের দোকানী বা রাধাবাজারের কেরানী নয়। কে তা জানে না তবে যখন যে আসে পকেট ভর্তি নোট থাকে। বড় অঙ্কের নোট সব এখানেই জমা রেখে শূন্য পকেটে বেরিয়ে যায়। কোথা থেকে ভরে আনে মঞ্জু দেখতে চায় না, যখন আসে জানে ভরা পকেটে আসছে। তাই কাউকেই বঞ্চিত ক'রতে চায় না মঞ্জু, কিছু কৃপা সকলেই পাক, সকলেই তুষ্ট হোক এই তার ইচ্ছা। এ যেন তার জয় বলে মনে হয়। বড় বড় মাপের লোকগুলো তার কাছে এসে কেমন ছোট্ট হয়ে যায় দেখতে খুব মজা লাগে। কি অদ্ভুত ব্যবহারই না এক একজন করে। এক একজন এমনও আসে যে ছোট শিশুর মত কেঁদেই ভাসিয়ে দেয়। সে একবার করেছিল এক জাঁদরেল অফিসারবাবু—মঞ্জুর মনে আছে। মঞ্জুর এক নিয়মিত খদ্দের লোকটাকে এনেছিল, বাঁধা খদ্দেরটি অরুণাচলের ব্যবসায়ী, বয়সে যুবক। শরীরে তার যেন আসুরিক বল। লম্বা সুঠাম চেহারা। মঞ্জুর বড় পছন্দসই খদ্দের। টাকা সে-ও দিত বটে তবে কত দিত মঞ্জু দেখত না, সে আসুক এটাই কেবল চাইত। সে একবার এসে বলল, আমার সঙ্গে এক বড় অফিসারকে এনেছি মঞ্জু। তোমাকে সামলে দিতে হবে। একে সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে আমার কাজ নষ্ট।

ওর জন্যে সব ক'রতে পারে মঞ্জু একজন লোককে সন্তুষ্ট ক'রতে পারা সে জায়গায় কিছু না, সে তো রোজই ক'রছে।

হ্যাঁ লোকটি জাঁদরেল বটে। চোখে মুখে উদ্ধত অহংকার তাকে আলাদা

ক'রেই রাখতে চায়। মঞ্জু অনুমান ক'রে নিল বয়েস চল্লিশের চৌকাঠ মাড়িয়ে বেশিদূর যায় নি। তবে পদমর্যাদা জাহির করবার জন্যে সজাগ সব সময়। মঞ্জুর খদ্দের সমীর সঙ্গেই ছিল বলল, কি খাবেন স্যার? যা বলবেন সবই আছে। নতুন বেরিয়েছে 'সালাম বাদশা'—টেষ্ট ক'রে দেখুন না একবার।

সংকেত বুঝতে সময় লাগল না মঞ্জুর। সে চট ক'রে হাতে হালকা তালি দিতেই দক্ষ পরিচারিকা 'সালাম বাদশা'-এনে হাজির ক'রল সঙ্গে যা প্রয়োজন সবই। সমীরও সঙ্গ দিতে বসে গেল। এলেন হোটেল থেকে বিখ্যাত চিংড়ি কাটলেট মঞ্জু নিজেই আনাল। পান ভোজন জমে ওঠবার কিছুক্ষণ পরেই সমীর নিজের পাত্র মাত্র এক চুমুকে শেষ ক'রে বলল, আপনি স্যার বসুন আমি এবার উঠি।

'স্যাবটি' ততক্ষণে বাদশা-র স্নেহরসে ও মঞ্জুর সরস ব্যবহার পেয়ে পরম তৃপ্তির পথে হাঁটতে সুরু ক'রেছে। সময়টাকে তার উৎসব মনে হচ্ছে। তার সামনে আরও অনেক তীব্র জীবন্ত মদিরা। সেই সুধা পানের জন্যে সে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সমীর উঠে পাশের ঘরে রোজির কাছে চলে গেল মঞ্জু বুঝল। মঞ্জু দরজাটা ঠেলে দিয়েই নিজেকে অনেকটা উন্মোচন ক'রল। তার পাত্রে সামান্য একটু সুরা অবশিষ্ট ছিল সেটি হাতে তুলে নিল তার অতিথির দেহ সংলগ্ন হয়ে বসে। এতক্ষণ ঘরে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির জন্যে যে দূরত্ব বজায় রেখেছিল তা দূর ক'রে দিতেই অতিথির শরীর জুড়ে আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনে সে প্রতিটি মুহূর্তে পলে দগ্ধ হতে লাগল। অচিরে তার অহংকারের মুখোশ খসে পড়ল। এতদিন যে আচরণটাকে সে ব্যক্তিত্ব বলে জড়িয়ে রেখেছিল নিজের শরীরের ওপরে, মনের মধ্যে যে মিথ্যেটাকে অনেকদিন ধরে সে বসিয়ে রেখেছিল বাদশার তরল শক্তি তাকে অল্প সময়ের মধ্যেই গলিয়ে ধুয়ে সাফ ক'রে দিল।

মঞ্জু সামান্য পরিমাণে পান ক'রেছিল। নিজে সে সর্বদা তাই করে। কিন্তু বাদশার ঐ সামান্য ছোঁয়াতেই সে তার ভেতরে অন্য শক্তির সঞ্চার অনুভব ক'রতে লাগল। কে যেন তাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ক'রছে, উজ্জীবিত ক'রতে চাইছে। শরীর পরী হতে চাইছে। মনে হচ্ছে অদৃশ্য ডানা তাকে উড়িয়ে নিয়ে আকাশে চলে যাবে। সে উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে আকাশে উঠে তারা হয়ে ফুটে থাকবে। অন্তরে কোন এক সঙ্গীতের ধ্বনি আপাততঃ তাকে নাচবার প্রেরণা দিচ্ছে। কিন্তু নাচবার তেমন সঙ্গী কই? এই লোকটাকে রোজির ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সমীরকে এখানে আনলে নাচটা জমত বটে। সমীর কি আরাম পেত না তার কাছে? খাসিয়া পাহাড়ের মেয়ে রোজির কাছে কি বেশি সুখ পায় সমীর? পাহাড়ে জঙ্গলে বাস ক'রে সমীরটাও পাহাড়ী হয়ে গেছে। নইলে কি আরাম পায় রোজি মেরীর ঘরে? যতই যেখানে যাক আসতে ওকে হবেই। কি এক ফালতু লোককে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল এখানে।

তবু সমীর যখন দিয়েছে—বলেছে স্যার—তখন সন্তুষ্ট একে ক'রতেই হবে।

নিমেষে মঞ্জু তার দুবাহু দিয়ে 'স্যারের' গলা জড়িয়ে ধরতেই স্যার আপ্লুত হয়ে গেল। আহলাদে গলে গিয়ে ঢলে পড়ল।

পদমর্যাদার জোরে সুখভোগ অনেকই জীবনে জোটে, সম্ভোগও সুযোগ সন্ধানীর কখন কখন জুটে যায়, তা বলে এমনটি এই প্রথম পাওয়া গেল 'স্যারটির' মনে হ'ল। বাসনা কোন কোন সময় প্রাপ্তিতে বেড়ে যায়, এক্ষেত্রেও গেল। সাধ্যের সীমাবদ্ধতা যখন সাধের অসীমতাকে অতিক্রম করবার ব্যর্থ প্রয়াসে কেবলই বিধ্বস্ত হতে থাকে তখন বাড়ে শুধু আকুতি আর আকাঙ্খা; সেই আকাঙ্খা বিক্ষোভে নয়ত আত্মগ্লানিতে পর্যবসিত হয়, ভোগ কখনই বাসনার নিবৃত্তি করে না, দুর্ভোগ বাড়ায়। অন্তত সমীরের অতিথির ক্ষেত্রে বাড়াল, মঞ্জুর রূপ তার প্রণয় পদ্ধতি তাকে এমন পাগল ক'রে তুলল যে রূপসীর ত্যাক্তবস্ত্র দুই উরুর মধ্যে মুখ গুঁজে সে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত সে কান্না যে অদৃশ্যপূর্ব এই ঘটনার অভিঘাতে মঞ্জুর বহুদর্শী অভিজ্ঞতাও হতচকিত হয়ে গেল। অচিরেই নিজেকে সামলে নিয়ে মঞ্জু পরম ঘৃণা প্রকাশ ক'রে ধমকের মত বলল, কি করছেন কি? উঠুন।

সাবালক মানুষের নাবালক ভাব মঞ্জু চিরদিনই অপছন্দ করে। তাছাড়া সে জানে কারও সঙ্গে তার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক থাকতে পারে, তা সকলের সঙ্গে তো হ'তে পারে না। নিত্য যত মানুষ আসে তারা বিকিকিনির বাজারে আসে, ক্রেতা। যার যেমন ক্ষমতা কিনতে ততটুকুই পারে, এস, বসো, ট্যাঁকের জোর যতটা তেমনই সওদা কর, সরে পড়। হ্যাংলামী তার দুচোখের বিষ। অসহ্য।

এই লোকটাকে এই মুহূর্তে তার খুবই জঘন্য লাগল। এই ক'ঘণ্টা সে ভাল মন্দ কিছুই বিচার করে নি, এখন ক'রতে লাগল। ক্ষমতার চেয়ে বেশি মদ খেয়েছে লোকটা। যে লোক পরের পেলে শরীর নষ্ট ক'রে খায় তার চেয়ে জঘন্য প্রাণী পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। ওকে কিছুটা বল প্রয়োগ করেই সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মঞ্জু। নেশার ঘোরে পাশ বালিশের মত সে গড়িয়ে পড়ে গেল। মঞ্জু নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল সমীর দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে। মঞ্জু অনুচ্চস্বরে বলল, কি একটা মাল এনে জুড়িয়েছ মাইরি!

সমীর নিজের ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে ওকথা বলতে নিষেধের ইঙ্গিত ক'রল। মঞ্জু সরস আবেগে সমীরের নিটোল শরীরের স্পর্শ পেতে পেটে একটা ঘুষি মারল আলতো ক'রে। সমীর গ্রাহ্য ক'রল না, ইশারায় প্রশ্ন ক'রল অতিথি কি করছে?

মঞ্জু হাতের মুদ্রায় সুন্দর ভঙ্গীতে দেখাল, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।

সমীর নিজের পিঠ দেহ দুলিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। তার অতিথির প্রায় বেঁহুশ অবস্থা দেখে বলল, স্যার, চলুন যাই।

প্রথমবার বলায় অতিথি কোন জবাব দিল না, দ্বিতীয়বারে বলল, যাব না।

সমীর কোন অবস্থাতেই হিসেবে ভুল করে না। ইতিমধ্যেই মঞ্জুর যা বিল

হয়েছে সে বেশ কয়েক হাজার টাকা। এখন ঘর খালি ক'রে না দিলে অযথাই দেয় অর্থ বেড়ে যাবে। সমীর ভালভাবেই জানে মঞ্জু একরাতে তার ঘরে দুবার লোক ঢুকতে দেয় না। কি প্রয়োজনে দেবে? তার প্রতি কামরা তাকে মোটা মোটা টাকা এনে দেয় প্রতিরাতে। রোজি মেরী দুই বোন প্রত্যেকে প্রতি অতিথির কাছে নেয় হাজার টাকা তারা প্রতি রাতে ঘর পিছু ভাড়া পরিসেবা খরচ দেয় আড়াই শো টাকা। ওরা যতদিন থাকে নানা দেশের খদ্দের আসে বাড়ীতে স্থান দেওয়া যায় না। খদ্দেরদের চাহিদা মেটাতে ওদের দুজনকে কোন কোন রাতে তিনবারও লোক নিতে হয়। তাতে মঞ্জুর লাভ না হ'লেও এলাকার আগলদার ওস্তাগর সিং, বাড়ীর দারোয়ান আনোয়ার, ঝি চাকরেরা সবাই খুশি থাকে; প্রভূত আমদানী হয় তাদের। ঝর্ণা নামের যে বউটি আসে তার খদ্দের বাঁধা। ভাড়া দুশো টাকা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না তার কাছে। এবাড়ীতে কোন আধিয়া নেই, বখরা পাওয়া যায় না। না যাক, যা দৈনিক আমদানী হয় তাই যথেষ্ট। কিন্তু অনেকটাই তার বেরিয়ে যায় বলে মঞ্জুর কিছুটা দুঃখ। রোজগার তারা করে অন্যেরা অযথাই সিংহভাগ তুলে নিয়ে যায়। অবশ্য ওস্তাগর যেমন সব বাড়ী থেকে টাকা নেয় তেমনই সামালও সে দেয়। পুলিশের কোন ঝামেলা কদাচই ঘটে-এ দিকটাতে। ওস্তাগর কি ক'রে সামলায় সে-ই জানে। কোনদিন পুলিশের অভিযান হবার থাকলে সে আগেই খবর পেয়ে কোথা থেকে কতগুলো মেয়েকে জোগাড় ক'রে যে পুলিশে জমা ক'রে দেয় পাড়ার কেউ তা টেরও পায় না। আবার ওই তাদের আদালত থেকে খালাস ক'রে আনে। মামলা মেটায়।

আরক্ষী বাহিনীও সন্তুষ্ট থাকে। দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বোধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্যে কার প্রতি মানবিক সহানুভূতি দেখাতে যে বিশ্বের আদিম ব্যবসা নাম দিয়ে মেয়েদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তা তারাও জানে না, তবে তাদের কলমের চিৎকারে আরক্ষীকুলকে মাঝে মাঝে উচ্ছেদে নামতে হয়, দরিদ্র সহায়হীন মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে সমাজকে নিষ্কলুষ রাখবার অভিনয় করে তারা। এবং এই এলাকার স্বেচ্ছাসেবী ওস্তাগর সিং শংকর পাঠকরা তাদের কাজ সহজ-ক'রে দেয় কুশলী সহযোগিতায়। এলাকাটা তো ছোট নয় ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ করা। এক একটা অঞ্চলের অলিখিত কর্তা এক একজন মাতব্বর। কাজ সকলেরই এক, পদ্ধতি সামান্য আলাদা। শংকর পাঠক, ওপাশে ভোলা, বিন্দু সিং এরা সব নতুন, অল্পদিন রাজত্ব পেয়েছে। ওস্তাগর সিং বয়সে প্রৌঢ়। যৌবন অনেকদিন পার ক'রেছে। এলাকার প্রাক্তন বিধান সভাসদস্য দলের সঙ্গে তার গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। এলাকার পুলিশ চৌকির সঙ্গে তার পুরানো দিনের সহযোগিতার সুবাদে নতুন যে সব আরক্ষী পুরানোর পরিবর্তে আসে তাদের কাছে ওস্তাগরের পরিচিতিও বদল হয়ে আসে। নতুন যারা থানায় আসে তাদের তো সব জেনে বুঝে নিতেই হয়, এ এলাকার কাজে কাদের সহযোগী

হিসেবে পাওয়া যাবে তারও অলিখিত তালিকা তাদের জানা হয়ে যায় প্রাক্তনদের কাছে। অতি বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবে ওস্তাগরের নাম প্রথমেই থাকে।

ওস্তাগর কুশলী। পুরনো রাজনীতির সঙ্গে তার বোঝাপড়া থাকলেও কালের দেবতার সঙ্গে সে বিরোধ করে না। বাম রাজনীতির কর্তারা প্রবল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে এদের সঙ্গেও সহযোগিতা প্রসারিত ক'রে দেয়। সে নিজে মিটিং-এ মিছিলে যায় না কিন্তু লোক জুটিয়ে চাঁদাও তুলে দেয়। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র সভাপতি সিংকে দিয়ে ভালরকম চাঁদা পাঠিয়ে দেয় রাজদলেদের প্রবল ব্যক্তির প্রয়োজনে। বামদলের রাজত্ব যখন নতুন কায়েম হয় এলাকারই এক 'রেণ্ডিকা আওলাদ' শিবু চেষ্টা করেছিল ওস্তাগরের প্রভাব খর্ব ক'রতে। দিনকতক খুব লাফালাফি করেছিল। দেয়ালে দেয়ালে কাগজ লিখে আটকেছিল 'কংগ্রেসী গুণ্ডাদের খতম কর' 'কালোহাত ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও'—ইত্যাদি কত কি। ওস্তাগর কদিন সব লক্ষ ক'রল। দেখে নিল কে কে শিবুর সঙ্গে জুটে এসব ক'রছে। তারপর একদিন শিবুর খুঁটি অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীটের দুর্গাবাবুর কাছে ভাইপো সভাপতিকে লাগাল। সে লক্ষ রেখে রেখে একদিন দুর্গাবাবুকে একা পেয়ে নমস্কার ক'রে বসল, আমাদের দিকে ভি একটা নজর দিন। আপনি ছাড়া কে নজর দিবে ?

সভাপতিকে দুর্গাবাবু কোনদিন দেখেনি, পার্টির কোন মিটিং মিছিলে বা অফিসেও নয়। কিন্তু তাকে অবাক হবার বা ভাববার অবকাশ না দিয়েই সভাপতি প্রস্তাব ক'রল, আমাদের ইলাকাতে একটা সভা তো করুন।

কোন এলাকা ?

সভাপতি বুঝিয়ে দিতেই দুর্গাবাবু বলল, ওখানে তো কমরেড শিবু আছে তাকে বলুন।

ওখানে স্যার শিবু উবুর কাম নয়। আপনি একটা মিটিং করুন দেখবেন কি কত লোক চলে আসে। বহুৎ লোক পার্টিকা কাম করবার জন্যে তৈরী আছে।

কিন্তু ওটা তো কংগ্রেসী এলাকা। তখন প্রথম বিজয় হয়েছে, দুর্গাবাবুদের সংশয় তাই ব্যক্ত হ'ল। সেটা সভাপতি যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দিল, কংগ্রেস উংগ্রেস কুছু থাকবে না স্যার। দেখুন না কি হয়। আমরা সব ইন্তেজাম করিয়ে দিবো, আপনি দু চারজন লীডর খালি ভাষণ লাগাবেন।

ব্যাপারটা ব্র্যাঞ্চের মিটিং-এ তুলতে উৎসাহে সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। শিবুর অতি সাধারণ বুদ্ধি এর তাৎপর্য বুঝল না। লোকাল কমিটিও সোৎসাহে প্রস্তাবটা গ্রহণ ক'রে পথসভা ঘোষণা করল। শিবুরা খুব পোস্টার লিখল, এলাকার দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দিল যতীন্দ্রমোহন এভেনু পার করে দর্জিপাড়া পার্কের চারধার পর্যন্ত ঘিরে। সন্ধ্যায় সভার আয়োজন দেখে দুর্গাবাবুদের চক্ষু স্থির। শয়ে শয়ে লাল পতাকায় ছেয়ে গেছে চারিদিক। ঝকঝকে সোনালী রঙে লেখা বিশাল লাল ব্যানার টাঙ্গানো হয়েছে মার্কসবাদ জিন্দাবাদ। লাল রঙে মোড়া মঞ্চ—

এলাকাটাই যেন লাল হয়ে গেছে উৎসাহে। রাতারাতি মার্কসবাদী হয়ে গিয়ে কাজে নেমেছে ওস্তাগর ছাড়া তার সমস্ত লোকজন। সভাপতি তাদের চালনা করছে। 'কমরেড শিবু' নয় এলাকার মূল ক্ষমতার সন্ধান পেয়ে গিয়ে দুর্গাবাবুরা অতি সন্তুষ্ট হল, আর পেছনে দাঁড়িয়ে থেকে ওস্তাগর সিং আপন কব্জা বজায় রাখল মহল্লার ওপরে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন মনে মনে সন্তোষ প্রকাশ ক'রল।

যে কোন প্রয়োজনে পার্টির চাঁদা এলাকায় সবচেয়ে যে বেশি সংগ্রহ ক'রে দেয় সে হল সভাপতি সিং, কলকাতায় ব্রিগেড ময়দান জুড়ে জনসমাবেশ করতে হবে সভাপতিরা তার জন্যে রাত জেগে রুটি তরকারীর প্যাকেট বানায়, হাজার প্যাকেট, দু হাজার প্যাকেট খাবার করে দেয় একা সভাপতি তথা ওস্তাগর সিং। তা বলে ওস্তাগর কখনও বাহবা নিতে সামনে আসে না, থাকে নেপথ্যে। সে তার কংগ্রেসী পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখলেও বজায় রাখে। কিন্তু স্থানীয় বামদলের যা কিছু কাজকর্ম তার লোকেরাই ক'রে দেয়। এমন কি কোনদিন চোখ খুলে না দেখলেও গদীনসীন দলের মুখপত্র যে দৈনিক বাংলা পত্রিকা তাও সে নিয়মিত কেনে। কেবল যে নিজে কেনে তাই নয়, শিবু যে কাগজ বিক্রি করে তার কাজেও সাহায্য করা তার নিঃশব্দ কাজের অন্তর্গত। এলাকার মেয়েদের প্রায় প্রত্যেককেই তার নির্দেশ দেওয়া আছে দৈনিক একটি ক'রে কাগজ নিতে হবে। যে সব মেয়েরা নিরক্ষর, মেনে নেয় তারাও প্রত্যেকে। এ কাগজ সর্বশক্তিমান, তার কোন বিকল্প নেই। এমন একটি অক্ষরজ্ঞান নিরপেক্ষ কাগজ না নেবার কোন যুক্তি থাকতে পারে ?

যারাই এলাকাতে কোন না কোনভাবে খেটে খায় সকলেই ওস্তাগরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে। দিনের মধ্যে কোন না কোন সময় একটিবার অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা ক'রে কুশল বিনিময় করে যায়। কোন খবর থাকলে দিয়ে যায়, কোন নির্দেশ থাকলে সংগ্রহও করে যায়। নিয়মিত খদ্দেরদের যারা তাকে চেনে অনেকেই তাকে দেখলে একবার সম্বোধন করে। সমীর তো বিশেষ ক'রে, সে পাড়ায় এলেই একবার ওস্তাগরের এজলাশে এসে বলে, রাম রাম ওস্তাদজী।

ওস্তাগর প্রত্যাভিবাদনে কখনও দেরি করে না, রামরাম বাবু। সব ঠিক হ্যায় তো ? মজেমে হ্যায় না ?

সমীর নিজের মাতৃভাষা ছাড়া কিছুটা যা বলতে পারে তা হল যে এলাকায় তার কাজের ঘাটি সেই আপংদের ভাষা। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের ছোট্ট একটি পাহাড়ী এলাকার সামান্য সংখ্যক মানুষের কথ্যভাষা, যার পরিচয় সেই একদা অরণ্যময় পার্বত্য এলাকার বাইরে আর কোথাও নেই। হিন্দি সে বোঝে, বলবার চেষ্টা করে না কখনই—বোকামী করতে চায় না বলে। ওস্তাগরকে যতই খাতির করুক জবাবটা সে নিজের ভাষাতেই দেয়, ভালই আছি ওস্তাদ।

সমীর যে কলকাতার মানুষ নয় সে খবর ওস্তাগর রাখে, জানতে চায়, কবে কলকাতা এলেন ?

পরশু এসেছি।

কাজকর্মের খবর সব ভাল ?—কুশল জিজ্ঞাসা করে ওস্তাগর।

হ্যাঁ, মোটামুটি ঠিকই আছে।

ওস্তাগর সিং আর বেশি কথা বলে না। সমীর এখানে এলেই ওস্তাগরের সঙ্গে দেখা ক'রে নেয় কারণ কখন কি ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হয় সাবধান থাকাই ভাল। সে এসেছে জানা থাকলে ওস্তাগর ঠিক তার নজর রাখে। সমীর যতক্ষণ আঠার নম্বর বাড়ী থেকে বেরিয়ে না যায় ঠিক লক্ষ্য থাকে বলে সমীর মনে ক'রে। তাই দুখানা একশো টাকার নোট বের ক'রে প্রণামী দিয়ে যায় ওস্তাগরকে। এসব ছাড়া এই এলাকার সাতাশটা বাড়ীর বাড়ীউলি নিয়মিত মাসোহারা দেয় তাকে। তার নিজস্ব কিছু মেয়েমানুষও আছে যাদের ওস্তাগরই পুষেছে বিভিন্ন ভাবে সংগ্রহ ক'রে। তাদের দৈনিক আয়েরও অর্দ্ধেক অংশ পায়। এই সাতাশটা বাড়ীতে যত মদ লাগে তাতে বোতল পিছু একটা ক'রে টাকার তার প্রাপ্য। সব মিলিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য তার, বিপুল তার রোজগার। সে আয়ের কিছুটা ভাগ দিতে হয় থানাতে, বেশ কিছুটা পার্টির সেবায় লাগে, আর ছোকরাদের আনুগত্য ধরে রাখতে সামান্য কিছু তাদের পেছনে খরচ ক'রতে হয় তাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়লে। নিজের বাহিনীকে সে নিয়ন্ত্রণেই রাখে তবু কিছু কিছু উল্টো পাল্টা কাজ তাদের কেউ কেউ কখন ক'রে ফেললে ওস্তাগরকেই তা সামলাতে হয়।

মঞ্জুর ঘরে সমীরের অতিথির প্রায় বেহুঁস অবস্থা। অথচ তাকে অসন্তুষ্ট না ক'রে বের ক'রতে হবে। চট ক'রে সমীরের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, প্রায় কানে কানে বলল, স্যার এলাকায় পুলিশ এসেছে শুনে আমি আপনাকে বের ক'রে নিতে এলাম। পুলিশ এসে আপনার পরিচয় পেলে অসম্মান তো হবে! তারা তো সব বাড়ীতে ঢুকছে।

কথাটা শুনেই সম্বিৎ ফিরল লোকটির। সে যে একজন বড় মাপের সরকারী অফিসার, অরুণাচল সরকারের একজন কর্তাব্যক্তি এ কথাটায় ফিরে এল। যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে, পোষাক পরে নিজের মুখোশটা লাগিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রল কিন্তু সেটা তখন ঢিলে হয়ে গেছে, ঠিক লাগছে না।

নিজের ব্যাগ প্রায় ফাঁকা ক'রে মঞ্জুকে এক গোছা একশো টাকার নোট দিল সমীর। মঞ্জু গুণে দেখল না। হাতের মুঠোয় ধরছিল না তবু সেভাবেই মুড়ে নিল। টাকা নেবার সময় অতিথিকে এড়িয়ে সমীরের হাত চেপে ধরল নিজের মুঠোয়, বলল, ওকে তুলে দিয়ে এসো। চ'লে যেয়ো না। কতদিন পরে এলে গল্প করা হ'ল না।

মঞ্জুর আবেগের জবাবে সমীর কোনরকম ভাব প্রবণতা প্রকাশ ক'রল না। ওসব তার চরিত্রে নেই। তা বলে সে যে রুক্ষ স্বভাব তাও নয়। সে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে চলাচল করে। সময় ও অবস্থা

অনুসারে তার সিদ্ধান্ত বদলায়। তার স্বার্থপূরণে যেটা সহায়ক সেটাই সে আগে করে। মঞ্জুর প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা থাকলেও সে তাকে কোন কথা না বলে নিজের অতিথিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে আবার আসবে কি আসবে না কিছু না বললেও মঞ্জু তার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বাস ক'রল হয়ত আসবে। আজ এলে কখন যে আসবে তার কোনই ঠিক নেই তবে যখনই আসুক মঞ্জুর দরজা ওর জন্যে খোলাই থাকবে। ঘরের দরজা তো বড় কথা নয় মনের দরজা খোলা থাকলে বন্ধ ঘরও আগলমুক্ত থাকে।

শীলা চাঁপার সঙ্গে মেলামেশা করুক কথাবার্তা বলুক এটা রাণীবালা চায়। ওর একটা বিশেষ গুণ যেখানে থাকে সেখানকার কোন ক্ষতি করে না। আগে যখন আশা বাড়ীউলির বাড়ীতে থাকত তখনও এই রকমই ছিল। এতদিন এসেছে একটা দিনের তরেও আশার কোন বদনাম করেনি! অথচ রাণীবালা লোক মুখে খবর পেয়েছে আশা নাকি ওর অনেক টাকা দেয়নি। এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন ক'রলে বলে আমাকে কাজে নামিয়েছে তো আশা মাসি, কাজেই কম দিক বেশি দিক যতটুকু যা রোজগার ক'রতে শিখেছি সে তো ওর জন্যেই শিখেছি।

শীলার মা লোকের বাড়ী বাসন মেজে খেতো। স্বামীটা গাড়ী চালাত, যা টাকা পয়সা আয় ক'রত সবই চলে যেত শুঁড়িখানায়। এদিকে দুই ছেলে তিন মেয়ের সংসার কি আর ঝি গিরি ক'রে চালানো যায়? ছেলে দুটোর একজনও মানুষের চরিত্র পেল না। বস্তির ছোট্ট খুপরিটা আর রাস্তায় তফাৎ কেবল একটা ভাঙ্গা দরজার, সে দরজাও বন্ধ ক'রতে গেলে আর্তনাদ ক'রতে থাকে বলে মাঝ রাত্তিরে একবার বন্ধ হয়; খুলে যায় অন্ধকার একদম কেটে যাবার কিছুটা আগে। কাজেই যে যত পথে থাকে ততই ভাল, অন্যথাও নেই। সংসারের সব ক'জন সদস্যকে একসঙ্গে ঘরে আঁটে না, শোবার সময়ও নয়। কাজেই পথে ঘুরেই ছেলে দুজনের যৌবনে পদার্পণ ঘটেছে, বলে পথের সঙ্গেই সম্পর্ক তাদের নিবিড়। বাড়ীতে নিত্য অন্নাভাব দেখে দুজনই খাবার পাট মাঝে মাঝেই বাইরে চুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। নইলে যেদিন বাড়ী ঢোকে সামান্য যা ভাত তাদের মা রান্না ক'রতে পারে আগে ভাগে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তাতে। মা এবং মেয়েদের জন্যে অপেক্ষা করে নিরম্বু উপবাস।

এই অবস্থাতে একদিন গঙ্গার ঘাটে আশা বাড়ীউলির সঙ্গে আলাপ শীলার মায়ের। সেখানেই দুঃখের কথা শুনে আশা সদ্য কিশোরী শীলাকে চেয়ে নিয়েছিল দয়া বশত। শীলার মা-ই দিয়ে গিয়েছিল, কিছুদিন পর থেকে সামান্য সামান্য অর্থ সাহায্য নিয়ে যেত পরে শীলা নিয়মিত টাকা জুগিয়ে বোন দুটোর বিয়ে পর্যন্ত দিয়েছে। শীলার মা মেয়েকে কোথায় দিচ্ছে না বুঝে দেয় নি। কিন্তু

নিত্য উপবাসে শ্বকিয়ে মরার চেয়ে যেখানেই থাক দ্বটো খেতে পাক এই ইচ্ছাতেই সজ্ঞানে সমর্পণ ক'রে গেছে সে। না খেয়ে কোন প্রাণীই বাঁচে না, তাছাড়া খেতে না পেয়ে শ্বধ্ব শ্বকিয়ে মরা হলেও না হয় কথা ছিল মরত, প্রতিদিন যে কি যন্ত্রণা সে তো মা হয়ে চোখে দেখা যায় না। এতে তো বরং মেয়েটা বাঁচবে, বেঁচে যাবে আরও কতগ্বলো প্রাণী। সে নিজে যে কাজ পারে তাতে তো সবাই বাঁচে না! ভয় তো কেবল লোকের! লোকে কি বলবে? বেশ্যা হয়ে গেছে, এই তো! যারা বলবে তারা কি এই হওয়া থেকে কাউকে বাঁচাতে পারছে? বাঁচানো কারও পক্ষে সম্ভব? তা যদি সম্ভব তাহলে ক'রত ব্যবস্থা, বাঁচাত সকলের বেশ্যা হওয়া।

শীলা নিজেও এখন আর কিছ্ব অগৌরবের মনে করে না। বোনেদের বিয়ে তো একজনের এখান থেকেই খ্বঁজে দিয়েছে। একটা কম বয়সী ছেলে রাজার হাটের দিকে কোন গ্রামে বাড়ী এখানে মাঝে মাঝে আসত। ছেলেটাকে দেখতে নিরীহ, আনাজ তরকারী কেনাবেচার কাজ করে। এর তার ঘরে দ্ব একদিন এসে শীলার কাছে জমে গেল। কি হ'ল কে জানে শীলা একদিন বলে বসল, তুমি এখানে কেন আস? বিয়ে থা ক'রে সংসার ক'রতে পার না? তুমি তো ছেলেমান্বষ এখনও জীবন অনেকটাই পড়ে আছে।

ছেলেটাকে দেখে কেন যে মায়া হ'ত কেন যে আশা ওকথা বলল শীলা নিজেও জানে না। অমন অনেক কম বয়সী ছেলেই তো এপাড়ায় আসে রোজ রাত্তিরেই আসে। আর কাউকে তো বলতে যায় না। কজনকেই বা বলবে! এসব বলছে শ্বনলে পাড়ার মেয়েরা রাগ ক'রবে। আর খদ্দের না এলে তাদেরই বা চলবে কি ক'রে? তব্ব শীলা বলেছিল; আরও বলেছিল, বাড়ীতে কে আছে?

আন্তরিকতায় এমন ম্বগ্ধ হয়ে গেল ছেলেটি বলল, মা বাবা একভাই এক বোন।

শীলার নিজের বাবার কথা মনে পড়ল। বাবার জন্যে তাদের দ্বর্গতির কথা মনে পড়ল। জানতে চাইল, তোমার বাবা কি করে?

চাষের কাজ করে।

এখান থেকে কতদ্বরে তোমাদের বাড়ী?

গ্রামের নাম তেচারা। বাসে দেড় ঘণ্টা লাগে।—

শীলার যেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল; কেবলমাত্র কেনাবেচার জগতে এসে এমন সহান্বভূতি পেয়ে নেহাৎ জৈবিক তাড়নায় ছ্বটে আসা ছোকরাটিরও ভাল লেগে-গেল শীলাকে।

অবশেষে একদিন রাজি হ'ল ছেলেটি, বলল, তোমাকে হ'লে আমি বিয়ে ক'রতে পারি। তুমি যদি কর তো ক'রব।

বিয়ে হলে আর এখানে আসবে না তো?

অবেগপ্রবণ হয়ে ছেলেটি বলে বসল, এই তোমার গা ছ্বঁয়ে দিব্যি ক'রছি। মাইরি বা আসব না।

শীলার মনের মধ্যে তখন আলোড়ন সুরু হয়ে গেছে। ছেলেটি তার উরু ছুঁয়ে শপথ করেছে বলে নয়, জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে। ওর হাতখানা সরিয়ে না দিয়ে নিজের মনের উত্তেজনা দমন ক'রে রেখে শীলা বলল, দেখ আমাকে ছুঁয়ে বললে। কথা যদি না থাকে তো আমি মরে যাব।

নিশ্চয় রাখব।

ভুল হবে না তো!

কখনই না।

অনেকক্ষণ থেমে থাকল শীলা। যে কথা বলবার তা বলতে আটকে গেল মনের মধ্যে মুখের কাছে। অতঃপর নিজেকে শক্ত ক'রে নিয়ে বলল, আমার কথা বাদ দাও। আমার তো আর উপায় নেই, আমার চেয়ে দেখতে ভাল আমার এক বোন আছে। তুমি তাকেই বিয়ে কর। আমার কথা রাখ।

ছেলেটি তাতে রাজি নয়, তার শীলাকেই চাই।

বহু কষ্টে তাকে রাজি করিয়ে, তার কাছে পথের নিশানা বুঝে নিয়ে মাকে পাঠিয়ে মেজো বোনের বিয়েটা দিয়েছিল শীলা। এখান থেকেই সব খরচ পত্তর জুগিয়েছিল আশা বাড়ীউলির কাছে কিছু টাকা ধার ক'রে। অথচ ঠিকমত টাকা পেলে তার নিজের টাকাই সে অতটা পেতে পারত। আশার কাছে ধার নেওয়া টাকা গায়ে খেটে শোধ ক'রে দিয়ে সে এখানে, রাণীবালার অর্ধেক মজুরীর চুক্তিতে চলে এসেছে। সে এখানে আধিয়া।

দুপুরের নির্জন সময়ে বসে শীলা জীবনের গল্প শোনাচ্ছিল চাঁপাকে। নিজের জীবনের গল্প। সে গল্পে আরও অনেক কথা অনেক অমানুষের কথা। নাম মনে না রাখা সেই সব অমানুষদের জব্দ করার কাহিনী—শুনিয়ে রাখে সাদাসিধে মেয়েটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে চালাক চতুর করবার জন্যে। তারপর উপদেশ দেয়, আমরা অনেক ঠকেছি চাঁপা। কত রকম ঠকেছি, লোককে বিশ্বাস করেছিস কি ঠকেছিস। কাউকে বিশ্বাস ক'রবি না।

এ কথা ইতিমধ্যেই কিছুটা বুঝতে পারছে চাঁপা। তিলক সেই যে বিয়ের নাম ক'রে এখানে এনে ফেলেছে তারপর থেকে কোনই পাত্তা নেই, একমাত্র এই শীলা ছাড়া কেউ তার কান্নায় আমল দেয় নি। প্রথম প্রথম যখন খুব কাঁদত শীলা বলেছিল, কি হবে বল কেঁদে? কে তোর কান্না শুনবে? এখানে তো তবু কাছাকাছি আছিস, নিজের লোকের মধ্যেই আছিস, বেশি ঝামেলা ক'রলে কোথায় কার কাছে বেচে দেবে বেপাত্তা হয়ে যাবি। কোন দেশে চলে যাবি না, কথা বুঝবি না বুঝবি তাদের চালচলন। এই কলকেতা শহরে কত মেয়ে বিক্কিরি হয়ে কোথায় চলে যায় জানিস! কেউ তার কোনও হদিস পায় না।

শীলা আরও বলেছিল, ঘাবড়াস নি। একটু থিতু হয়ে বোস মা বাপকে আবার দেখতে পাবি। সব দেখবি খুঁজে খুঁজে পয়সা নিতে আসছে, আর যদি

বিক্কিরি হয়ে যাস তো কেউ টেরও পাবে না কোথায় গেলি।

চাঁপা শীলার কথা সব না বুঝলেও এটা বুঝল যে বিক্রি হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা খুব খারাপ। এখানটা তাহ'লে সে তুলনায় ভাল।

সে চুপ করে আছে দেখে শীলা তাকে জাপটে ধরল ; খুবই অন্তরঙ্গভাবে বলল, এখানে কোনই কষ্ট নেই। এমন সুখ কোথায় পাবি ? জানিস কত বাড়ীর বউ এখানে কেবল নানা পুরুষের সুখ খাবার জন্যে আসে! পুতুল মাসির বাড়ীতে কত বউ, কলেজের মেয়ের আনাগোনা জানিস ? এর মধ্যে কেউ মজা পেতে আসে, কেউ পয়সার জন্যে। যারা কেবল মজা পেতে আসে পয়সা নেয় না, সে সব টাকা পুতুল মাসি নিজে নেয়। তাদের নাম ক'রেই খদ্দেরদের কাছে নেয়।

শীলার কথা বলেই মন দিয়ে শোনে চাঁপা। এমন দরদী মানুষ ক'টা আছে ? দেশেও কেউ ছিল না, এখানে তো কথাই ওঠে না। তারা বড় খারাপ খারাপ কথা বলে, এমন সব কথা যা কখনই শোনে নি চাঁপা, অনেক কথার মানেই জানে না, আন্দাজে বোঝে। যতই যা বলুক শীলা, যতই বোঝাক মন মাঝে মাঝে হু হু ক'রে ওঠে। রাতে এ পাড়া, পাড়ার সব বাড়ী জমজমাট হয়ে ওঠে, ভাঙ্গা গানের শব্দ, কথার শব্দ, মাতালের চিৎকার, ফুল ফেরিওয়ালার হাঁক সব মিলে যা হয় দিনের পটভূমির সঙ্গে তা মেলে না। সেই লোকটার পর আর কোন লোকের সঙ্গে তাকে সঙ্গ দিতে হয়নি ঠিকই কিন্তু সে এতদিনে ভালই বুঝে গেছে এটা বেবুশ্যোদের বাড়ী, শীলার মুখে গল্প শুনে জেনে গেছে এই এলাকাটাই বেবুশ্যেদের পাড়া। এই একটা মাত্র বাড়ীই কেবল নয় আশপাশের সব বাড়ীই এক।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন তিলক এসে হাজির। তখন রাত। এলাকা সরগরম। বাড়ীর ছাদে উঠে চাঁপাকে পেল। এতদিন বাদে স্বামীকে দেখে চাঁপা অভিমান প্রকাশ ক'রবে কি তার আগেই তিলক যে কৈফিয়ত চাইল, কি রে তুই ছাতে ?

আগে যে কদিন কথাবার্তা হয়েছে তিলক কখনও এ রকম বলে নি। আগেও মদ খেয়ে এসেছে, তবে তখন যা ব্যবহার ক'রেছে তাতে প্রাথমিক ভাবে বিস্মিত হ'লেও, মনে প্রথম ধাক্কা লাগলেও শারীরিক সুখে পুষিয়ে দিয়েছে। তবে ভাষা কখনই এরকম ছিল না। তবু স্বামী বলে কথা, এখানে তার জোর আছে। সেই অধিকার বোধ থেকে সে সক্ষোভে বলল, এতদিন কোথা গেছিলে ?

এ কথার জবাবে যে সোহাগ তার প্রাপ্য ছিল তিলক তার বিপরীত কথা বলল, ছাতে কোন সতীগিরি মারাচ্ছিস রে খানকি বাড়ীর মাগী ? জানিস না এখানে খেটে খেতে হয় ?

চাঁপাও উত্তেজিত হয়ে বলল, তুমি আমাকে বাড়ীতে দিয়ে এস, এখানে থাকব না।

থাকবি না। বাড়ী যাবি! চল শালী, বলেই তার হাত ধরে টানতে টানতে নিচে

একটা ঘরের মধ্যে ফেলতেই দুজন ষণ্ডামার্কা লোক এসে ঢুকল। তিলক অমনি বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা টেনে দিল। একজন লোক আর নিমেষ মাত্র দেরি না ক'রে আচমকাই এক হ্যাঁচকা টানে ওর পরণের শাড়ীখানা খুলে নিল। অন্যজন দুহাতে তার ব্লাউজটাকে এমনভাবেই ছিঁড়ল যে সেটি ন্যাকড়া হয়ে গেল। অতি কম সময়ে যেন চোখের পলকে সব ঘটে গেল সামান্য বাধা দেবার সুযোগও সে পেল না। চিৎকার ক'রতে চেষ্টা ক'রতে ওদের একজন জাপটে ধরে বাঁ হাতের চেটোয় ওর মুখ চোখ ধরল অপর জন সেই অবসরে ওর সায়ার দড়ি একটানে ছিঁড়ে ওকে একেবারে উলঙ্গ ক'রে দিল। দলা পাকানো সায়াটা এক লাথি মেরে ঘরের কোণে ফেলে দিল। ঊর্ধ্বাঙ্গে যে অন্তর্বাস ছিল সেটাও খুলে বেহদিশ ক'রে দিল। মুখ বন্ধ চাঁপা শারীরিক ভাবে বল প্রয়োগের মিথ্যা চেষ্টা ক'রে নিজের অসহায়তার রূপ দেখল কেবল। অতঃপর দৈত্যবলশালী লোক দুজন একে একে বলাৎকার যখন পূর্ণ ক'রল চাঁপার চেতনা তখন প্রায় লুপ্ত। তার শরীরে আর কিছুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই যে সে উঠে বসবে। কাজেই সে হতচেতন হয়ে উলঙ্গ অবস্থাতেই পড়ে রইল। লোকদুটো যাবায় সময় নেহাৎ অনুগ্রহ ক'রে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে ইরাণী রাস্তা থেকে খদ্দের পেয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজা ঠেলে দেখে ঐ অবস্থা। তখন ওর আচ্ছন্নভাব কাটলেও শরীরের শক্তি ফিরে আসেনি। চোখ বন্ধ করে শরীর খুলে সে পড়ে আছে যেমন ক'রে তাকে ফেলে যাওয়া হয়েছিল। ওকে ঐ অবস্থায় দেখে ইরাণী অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, গতরখানা তুলতেও কি আর ইচ্ছে ক'রছে না। বলি ঘরটা এমনভাবে আগলে রাখলে চলবে? একার চললেই হবে?

ইরাণীর রোগা পটকা চেহারা একেবারেই মাংস শূন্য, শুধু হাড়ের কাঠামোটা চামড়া দিয়ে মোড়া গায়ের রঙ ফর্সা বলে যা খদ্দের জুটে যায় তবে কোন খদ্দেরকেই পাকাপাকি ধরে রাখতে পারে না। শরীরের সুধা খুঁজতে যে সব মক্ষিকারা আসে পরিপাটি পোষাকের ঘেরাটোপের আড়ালে তেমন কোন স্বাদ না পেয়ে তারা আর দ্বিতীয়বার আসে না। ওকে চোখে পড়লে এড়িয়ে যায়। নিজের এ দুর্বলতার কথা ইরাণী জানে বলে সে তার খদ্দের-এর চোখে যাতে চাঁপার অমন নিটোল সজীব দেহ না পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি সরে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল, কই গো মাসি এ ঘরে তো লোক। কি বলে দিলে বাবা।

আসলে ওর তখন ধৈর্য সইছে না। তাকে কম পয়সার কম দামী খদ্দের জোগাড় ক'রতে হয় বলে এক খদ্দেরে চলে না। ঘর ভাড়া দিয়ে এলাকার মস্তান-খাজনা দিয়ে দুজন খদ্দের পেলেও কিছু বাঁচে না, তার বেশি হলে তবেই তার নিজের কিছু হয়। তৃতীয় খদ্দের না পেলে তার হোটেলের পয়সা, জলখাবার সব বন্ধ। কাজেই অল্প এই সন্ধ্যাটুকুর মধ্যে তাকে যে করেই হোক একাধিক খদ্দের

খ'ুজে নিতে হয়। তবে যদি কোনদিন নতুন আসা হাঁদাবোকা লোক পাওয়া যায় যার পকেটে তেমন টাকা আছে তাহলে রোজগারটা কিছু ভাল হয়। প্রতিদিনের টাকা যদি খরচই হয়ে যায় তবে ভবিষ্যৎটা কি? তাই দুচার টাকা হাতেও তো রাখতে হয়। যদিও ভবিষ্যৎ ভাবনাটা পাঁচজনের শুনে শেখা মাত্র, প্রকৃতপক্ষে বোঝে না বলে সামান্য টাকাকেই ভবিষ্যনিধি মনে ক'রে তুষ্ট থাকে তবু তাকে সন্ধেটা ব্যস্ত থাকতে হয়, দেরি ক'রলে চলে না। সময় বয়ে যায়, খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকবে না। তার তাড়াহুড়োতে মাসি এসে দেখল চাঁপার ঐ অবস্থা। সে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি শাড়ীখানা কুড়িয়ে ওকে টেনে বসিয়ে কোনক্রমে জড়িয়ে দিয়ে চাঁপাকে তুলে রাণীবালার ঘরে নিয়ে গেল।

রাণীবালা দেখে বুঝে জানতে চাইল, কোন আবাগীর ব্যাটা ছিল?

মাসি বলল, তিলুয়ার খদ্দের।

রাণীবালা আর কথা বলল না। বুঝে নিল ছেলে আসলে টাকা নিয়েছে। এক্ষেত্রে তো বলবার কিছু থাকতে পারে না। ঘর ভাড়া নিয়ে অনেকেই তো নিজের মেয়েছেলে রাখে, তাদের দিয়ে রোজগার করায়। কিশোরী পাণ্ডে যেমন প্রেমা সুনিতাকে এনে রেখেছে, রোমিলাকে রেখেছে। কিশোরী ঘর ভাড়া দিচ্ছে, ওরা আছে। কিশোরী পাণ্ডে নাকি আরও কটা বাড়ীতে নেপালী মেয়েদের এনে এনে রেখেছে। ওর চায়ের দোকানে খদ্দের আসে সেখান থেকেই সব বাড়ী বাড়ী পাঠায় নিজের রাখা মেয়েদের কাছে। খিদির পুরের ডকে ওর জানাশোনা লোক আছে খদ্দের আসে তাদের মাধ্যমেও। ধর্মতলায় পানের দোকান ক'রে বসে আছে যে ভাই, খদ্দের সে-ও পাঠায়। রাণীবালা লক্ষ ক'রে দেখেছে অন্য মেয়েদের ঘর ফাঁকা গেলেও প্রেমা রোমিলার ফাঁকা যায় না। ওদেরও নাকি আধিয়া চুক্তি। খদ্দের এর টাকা অর্দ্ধেক কিশোরী পাণ্ডে রাখে অর্দ্ধেক ওদের মজুরী।

অর্দ্ধেকটা বুঝছ কি ক'রে?

সহবাসিনীদের প্রশ্নের উত্তরে ভাঙ্গা হিন্দিতে দুজনেই জবাব দেয় বুঝে নিতে হয়। অবশ্য কোন কোন সময় স্বীকারও করে ঠিক কি আর বোঝা যায়, কিছু এদিক ওদিক তো হবেই। তবে ওরা এভাবে হিসেব করে যে কিশোরীর ব্যবস্থাপনায় খদ্দের তো আর ফাঁকা যায় না। তার জন্যে কোন দুশ্চিন্তাও নেই। নিশ্চিন্ত আয়। প্রতি রাতে একশো টাকা ক'রে আয় তো অন্তত নিশ্চিত। এর বেশি আর ভাবতে পারে না প্রেমা বা রোমিলারা। এ তাদের কাছে স্বপ্নেরও বেশি। দেশে থাকতে নিত্য অভাব আর অনাহার, অর্দ্ধাহার তো একান্তভাবেই নিজের ব্যাপার ছিল। এত টাকা সেখানে তো স্বপ্নেরও সীমার বাইরে। সেই জন্যেই কিশোরী কি নিল সে নিয়ে তাদের মাথা বাথা নেই, খদ্দের পিছু পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দ আছে সে-ই তাদের যথেষ্ট মনে হয়।

ওরা দুজন অপরের ব্যাপার নিয়ে ভাবেও না। এক সঙ্গে পাশাপাশি ঘরে

অনেকের সঙ্গেই বসবাস কিন্তু কারও আয় রোজগার বা সুখ প্রতিপত্তি নিয়ে প্রেমা বা রোমিলাদের কোনই ভাবনা নেই। শীলাটার গায়ে পড়া স্বভাব আছে, সে সকলের খোঁজ খবর নেয়, সবার ভালমন্দতে থাকে, সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতাও করে। তার সঙ্গেও প্রেমা বা রোমিলার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। ওরা যে কাকে পছন্দ করে আর অপছন্দ কাকে করে এ কেউ বুঝবে না। যার সঙ্গেই দেখা হোক, অথবা মুখোমুখি হলেই হেসে কথা বলে সকলের সঙ্গে। তবে নিজে থেকে কারও সঙ্গেই মেশে না। সেটা ওদের আসে না।

কিন্তু শীলার কাছে ছাড়া পায় না। শীলা নিজেই গিয়ে কড়া নাড়ে। বন্ধ দরজার ওপার থেকেই রোমিলার কণ্ঠ আসে, কৌন ?

আমি রে হতভাগী—আপন ভাষাতেই জানান দেয় শীলা। আর সেই স্বর শুনেই একমুখ হাসির অভ্যর্থনা সমেত দরজা খুলে ধরে রোমিলা। ওর শরীরে তখন সামান্য বাস, অত্যন্তই সংক্ষিপ্ত। প্রেমা ঘরের মেঝেতে শুধু একটা নাইটির ঘেরাটোপের মধ্যে শুয়ে আছে, সেটাও অত্যন্ত পাতলা কাপড়ের। শীলাকে দেখে শুয়েই অভ্যর্থনা ক'রল প্রেমা, কেয়া বাত রে ?

এ সময় বন্ধ দরজায় ডেকে ঢোকা সত্যিই অস্বাভাবিক বটে, কারণ এটা তো শীলারও বিশ্রামের সময়। শীলা ঘরে ঢুকেই প্রেমার পাশে বসে পড়ল, কোন ভূমিকা খাড়া না ক'রেই বলল, একতলার বিন্দু বলে মেয়েটাকে চিনিস তো ?—প্রেমা রোমিলা ভেবে পেল না দেখে নিজেই বলল, তোরা চিনিস না, যা হোক, ওর আজ দশদিন ধরে বড় অসুখ। দুর্গাবাবু ডাক্তার দেখছিল। কাল বলেছে রক্ত পরীক্ষা আরও কি কি সব ক'রতে হবে। ওর কিছু টাকা দরকার। সবাই মিলে দু দশটাকা দিলে হয়ে যায়। কি বলব বল ওর পাশের ঘরের তপতী না কিছুতেই দিল না। বলল, দিতে পারব না।

রোমিলার মুখে চিন্তার ছায়া পড়ে গেল, বলল, কি হয়েছে জানিস ?

বুঝতে তো পারছি না। দুর্গা ডাক্তার নিজেও বুঝতে পারছে না।

বিন্দুকে প্রেমা বা রোমিলা কেউ চেনে না তবু তাকে ওদেরই একজন মনে হ'ল। সহানুভূতি হ'ল বলেই বলল, ওর কোন জমা টাকা নেই ? চিকিৎসা কি ক'বে হবে ?

সেই জন্যেই তো সকলকে বলছি।

এ ভাবে কত হবে ? আমরা পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি।

শীলা খুব খুশি হ'ল। অনেকে পাঁচটা টাকা দিতেই কত রকম ক'রছে আর এরা এক কথাতে দিল পঞ্চাশ। সে যে কি বলবে ভেবে পেল না। কেবল বলল, যাক কাল দুর্গা ডাক্তারের কাছে রক্ত পরীক্ষার টাকাটা দিয়ে দিতে পারব।

প্রেমা বুকের নিচে বালিশ টেনে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বলল, মেয়েটা কেমন থাকে জানিয়ো।

নিশ্চয় জানাব।

এলাকার মেয়েদের পরিত্রাতা দুর্গা ডাক্তারকে রক্ত দেবার দুদিন পরেই পুলিশ দল বেঁধে বিন্দুবাসিনীকে নিতে এল। বাড়ীর অনেক মেয়েই হকচকিয়ে গেল, শীলা রাণীবালাকে বলল, মাসি আটকাও। ও তো কোন দোষ করেনি, ওকে কেন নিয়ে যাবে? ও কার কি ক'রেছে?

একতলার অপর এক বাসিন্দা রানু বলল, ও কোনদিন কারও সাতে পাঁচে থাকে না তার ওপর ও তো কতদিন ধরে কেবল ওষুধ খেয়েই আছে। ওকে খামোখা ধরা কেন রে বাপু?

অচিরে খবর পেয়েই ঝর্ণা এসে হাজির, সে এখানকার মহিলা সমিতির নেত্রী। বাড়ীর মেয়েরা যতক্ষণ পুলিশকে কোনভাবে আটকে রেখেছিল তারই মধ্যে সে এসে পড়ল, শাসক দলের পাণ্ডা সে সামান্য পুলিশকে তার কিসের ভয়? কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমত কৈফিয়ত চাইল, ওকে নিয়ে যাচ্ছেন তার মানে?

পুলিশ অফিসার বলল, ওর রক্তে এমনই দূষিত সংক্রামক রোগ ধরা পড়েছে যা ভয়াবহ। ছড়িয়ে যাবে। তাই ওকে বিশেষ হাসপাতালে পাঠানো হবে। কোন লোক এই সংক্রামক রোগ এনেছে।

ঝর্ণা স্কুল শেষ ক'রে কলেজেও দুবছর গিয়েছিল তারপর নানা কারণে শিক্ষা-লাভের বাসনায় ইস্তফা দিয়েছে। সে তাই পল্লবগ্রাহী। তাছাড়া এই রাজত্ব আসবার পর থেকে সমস্ত দিকে দলকে ছিটিয়ে দেবার পরিকল্পনা মত যে প্রচেষ্টা সুরু হয় সেই সময় আরও জন কয়েক স্থানীয় মহিলার সঙ্গে তাকেও জালে আটকে নেওয়া হয়েছিল। বেশির ভাগই ছিটকে গেছে যে দুচারজন মহিলা রয়ে গেছে নামে এবং প্রয়োজনীয় 'সংগ্রামে'ও ঝর্ণা তার প্রধান কারণ সে-ই একমাত্র শিক্ষিত মহিলা। তা ছাড়া তার কতগুলো বিশেষ যোগ্যতা আছে—সে মেজাজে রুক্ষ, কোন রকম ভয়ই তার কম, তার মধ্যে লোকভয় তো নেই বললেই চলে, ফলে রাজনীতি করবার পক্ষে আদর্শ। তার আর একটি বিশেষ গুণ বাক্‌ভঙ্গী, কোনই সংযম নেই। এটাই তাকে জনপ্রিয় ক'রেছে অন্তত যে জনগণকে নিয়ে তার চলাচল তাদের মধ্যে।

সেই ঝর্ণা কোমর বেঁধে এসেও থমকে গেল। পুলিশ অফিসারের কথা সে বুঝল। আতঙ্কিত বিন্দু তখন কাঁদছে, সে বুঝতে পারছে না তাকে কোন বিপন্নতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঝর্ণাই তাকে বুঝিয়ে বলল, তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমার যে অসুখ হয়েছে সেটার চিকিৎসার জন্যেই তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চিকিৎসা করা হ'লে তুমি ভাল হয়ে যাবে।

চিকিৎসার জন্যে পুলিশে নিয়ে যায় না এই বাস্তব জ্ঞান বিন্দুর অস্থিরতা কমতে দিল না। বিন্দু শীলাকে ধরে বসল, আমাকে ওরা ছেড়ে দেবে তো? আমি তো কোনই দোষ করিনি।

এ কথার জবাব পুলিশ অফিসারটি দিল, আমরা তো তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি

না। আমরা এসেছি তোমাকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে। আমাদের দায়িত্ব পড়েছে এই যা।

আমি আবার ফিরতে পারব তো?—শীলার কাছেই আকুতি জানাল বিন্দু। কথাটা পুলিশ অফিসারটির কানে পৌঁছাতে সে বেশ বিস্মিত হ'ল, এই নরকে ফেরবার জন্যেও কি আগ্রহ থাকে মানুষের!

পুলিশে কাজের সুবাদে অনেক দেখা যায় ঠিকই কিন্তু অধিকাংশই কেবল চোখের দেখা, মনে কিছু কিছু দাগ কাটলেও মনের অবস্থা হিসেবে সে দেখায় তারতম্য তো ঘটবেই। যে যেখানে থেকে অভ্যস্ত সেটাই তার আশ্রয়। যার যেখানে আশ্রয় সেটাই তার স্বর্গ। কীটের স্বর্গ তাই আবর্জনা স্তূপ যেখানে তার বসবাস। তার বাইরে নিয়ে গিয়ে কোন গোলাপের মধ্যে রাখলেও সে বাঁচবার পথ পাবে না। আশ্রয় তো কেবল বসবাস নয় বেঁচে থাকার রসদও জোগায়।

এখানে না এসে বিন্দুর আর জায়গা কোথায়? অন্য কোন স্বর্গলোক আছে যেখানে সে বেঁচে থাকবার মত অর্থ সংগ্রহ ক'রতে পারবে, কে তা জোগাবে? কাজেই এই নরকই তার সব তার জীবন তার স্বর্গলোক যা ছেড়ে সে কোথাও যাবার কথা ভাবতে পারে না।

তবু যেতে হয়। বিন্দুকেও যেতে হ'ল। গোটা এলাকাকে হতবাক্ ক'রে দিয়ে পুলিশের গাড়ীতে বসে বিনা অপরাধে, কেবল বেঁচে থাকবার সংগ্রামে বিধ্বস্ত মেয়েটি অজানা বিপন্নতার মধ্যে কোন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলল সে নিজেই জানে না। এতদিনের সঙ্গী পরিচিত জনেরা কেউ নেই, নতুন সঙ্গী আতঙ্ক কেবল অন্তবর্তী একাত্মতায় চলতে লাগল তার সঙ্গে। একতলার বাসিন্দারা এমনিতেই দীন, অসহায় সকলেই, কেউ কাউকে সাহায্য করবার সামর্থ রাখে না সত্য তবে এগিয়ে এসে দাঁড়ায় যে কোন বিপদে। তারা সব পেছনে পড়ে রইল, বিপদ তাকে একা বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে এল নিজের কবজায়। দোতলার শীলা, যাকে এতদিন বাইরে থেকে চিনত কেবল, ইদানীং যে সমানে টাকা জুগিয়ে যাচ্ছিল চিকিৎসার, সাহস জোগাচ্ছিল বেঁচে থাকবার, তারই জন্যে মনটা ব্যথায় বিদুর হয়ে উঠল। একদিন বাংলাদেশের গ্রামে সব আত্মজনকে হারিয়ে এসে একা যে মেয়ে নিঃসঙ্গ থাকত তার কেবলই মনে হতে লাগল একান্ত আপন একজনকে সে ফেলে যাচ্ছে, ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

একদিন জীবনের আকর্ষণে বিন্দু তার পূববাংলার গ্রাম তার মায়া মমতা, তার অসহায় বিধবা মা, স্বজন বলে জানা সমস্ত মানুষকে ছেড়ে এসেছিল, কোন জীবনের জন্যে সে জানত না; কি জীবন পেতে পারে বা জীবন কি সে সম্পর্কেও সম্যক ধারণা ছিল না। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে জানল জীবন মানে বেঁচে থাকা, জীবনের অর্থ জীবন কাটানো। একথাটা না জেনেই যেমন সে একদিন জীবনের আকর্ষণে এসেছিল আজও তেমনই কিছু না জেনেই রওনা হ'ল। জীবনের জন্যে

তার বহুবার বহুরকম ভয় হয়েছিল এবার এক বৃহত্তর ভয়ের মধ্যে যেন অনন্যোপায় সে ঢুকে গেল যেমন ক'রে বধ্য প্রাণী যূপকাষ্ঠে মাথা ঢুকিয়ে দিতে বাধ্য হয় অথবা ঘাতকের হাতের মধ্যে উঠে আসে অসহায় মোরগটা মৃত্যুর আগের মুহূর্তে।

পূর্ববাংলায় তার স্বভূমিতে সে কি হারাতে পারত তা জানে না, এখানে এসে কি পেয়েছে তাও বোঝেনি কিন্তু এখন তার সমস্ত মন জুড়ে বসেছে সব হারানোর আশংকা। এই সব যে কি তা সে জানে না, হারানো প্রাপ্তির ব্যবধানও কোনদিন বোঝে নি, তবু—। একটা দিনের পরই সবাই ভুলে গেল। যে শীলা বিন্দুর জন্যে খুবই চিন্তিত ছিল সেও ভুলল সকলের সঙ্গেই। বিন্দুর ঘরে লতিকা নামের যে মেয়েটি কদিন ধরে ঘুরছিল তার জায়গা হ'ল। সে অনেকদিন মনিরুদ্দিন লেন-এর একটা বাড়ীতে বেগার খেটেছে মিশির পানওয়ালার কাছে। মিশির তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল বলে সম্পূর্ণ ভাবেই তার জান মানের মালিক হয়ে গিয়েছিল। বহু কষ্টে পাড়ার ছেলেদের ধরে বুঝিয়ে সে ছাড়া পেয়েছে বলেই এখানে আসতে পেরেছে। প্রথমে হরিদাকে সে ধরেছিল, হরিদা পাড়ার নতুন লীডার, এখন তারই রোয়াব বেশি। অমন মিশির পানওয়ালা পর্যন্ত তাকে ভয় করে, মান্য ক'রে বলে হরিদা। অথচ কি ছিল এই হরিদা! ওর মামার কাপড় কাচার দোকান ছিল গলির মুখটায় লোকে বলত, দিলু বাবুর লন্ড্রী। নাম নিশ্চয় একটা ছিল কিন্তু কি যে লেখা ছিল একখানা রঙ চটে লেখা মুছে যাওয়া ভাঙ্গা সাইন বোর্ডে তা আর এখনকার কেউ জানে না। বেশির ভাগ মেয়ে পড়তে জানে না বলে, বাকি লোকে পড়তে পারে না সেই সাইন বোর্ড; পড়বার দরকারও হয় না। দিলুদার লন্ড্রী বলেই চলে যায়। যারা দিলুবাবুকে দেখেনি তারা বলে দিলুবাবুর লন্ড্রী। এই দিলুবাবু কে, কি তার পরিচয় কেউ জানে না; দিলুবাবু লোকটা লম্বা ছিল কি বেঁটে, রোগা কি মোটা সে কথাও কারও জানা নেই, সে এক বিস্মৃত ইতিহাস যেমন ইতিহাস প্রতি গঞ্জে, শহরে, জনপদে, প্রতি পাড়ায়, অলিতে-গলিতে বাড়ীতেও অনেক থাকে। এসব মামুলি কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কারও মাথাব্যথা হবার কারণও নেই বলে কত যশস্বী মানুষের ইতিহাসও জানে না তার উত্তরসূরীরা। আর এ তো কোন যশস্বী মানুষের বা তেমন কোন কাজের ইতিহাস নয় এ নেহাৎই একজন অখ্যাত লোকের কথা যে মাত্র বাইশ বছর বয়সে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার নায়লেখোলা নামের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে কোনকিছু না জেনেই কলকাতা মহানগরীতে এসে জুটেছিল তাদেরই গ্রামের নবজীবন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যার সন্ধানে। সে-ও এক পুরাতন ইতিহাস। সেই গ্রামে এক ঘর ছিল নিরাপদ মিত্রের পরিবার। বেশ বড় মাপের পরিবার চাষে চাকরীতে জীবন কাটাত। নিরাপদ নিজে জোপুরের বিশ্বাসদের সেরেস্তায় গোমস্তার চাকরী ক'রত, দূরের আত্মীয়দের বলত সে নায়েব। সেই নিরাপদর চতুর্থ পুত্র তথা সপ্তম সন্তান দিলীপ যে নাকি দিলু নামেই পরিচিত সতের বছর বয়সেই তার সমবয়স্ক সরমাকে এমনই পছন্দ

ক'রে বসল যে সরমা ছাড়া তার পৃথিবী অন্ধকার। তখনকার গ্রামে বিশেষ ক'রে খুলনা জেলার অভিমানী মানুষদের গ্রামে মুখ দিয়ে সেকথা বলাতে মুস্কিল ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও ভাবনার বাইরে, দেশভাগ তো নয়ই। কাজেই বাংলার মানুষের কিছু মূল্যবোধ তখন সজাগ। বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্বের সৌজন্যে বাংলায় তখন মানুষ জন্মাচ্ছে, রীতিমত সব মানুষ—যারা দেশে সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাচ্ছে। সেই ধাক্কাতে যাদের মধ্যে বিকাশিত হবার মশলা নেই তারাও সংস্কৃত আচরণের অভ্যেস ক'রে নিচ্ছে।

ফলে দিলুকে দুঃখের কূপে ফেলে নবজীবন ঘোষ পাশেই যশোরের খুলনা সংলগ্ন নেলাপোতা গ্রামের জয়শংকর বসুর পুত্র শ্রীমান করুণাশংকর বসুর সঙ্গে তার পঞ্চম কন্যা সরমার বিবাহ দিলেন। সরমার কোন অভিব্যক্তির পরিচয় কেউ পেল না, দিলীপ নয়। তার মনোভাব কি ছিল তাও জানা গেল না। সে, আর দশটা মেয়ে যেমন আপন সংসারের মায়া কাটাতে কাঁদে তেমনি কেঁদে সংসার ক'রতে গেল। করুণাশংকর নামক যুবকটির শরীরের মধ্যে যে একটি কঠিন ব্যাধির গোপন বাসা ছিল তা সে নিজেও কোনদিন টের পায় নি; বিয়ের পর পেল, যে কোন কারণের সূত্র ধরে শরীর গণ্ডগোল ক'রতে লাগল। ছুতোয় নাতায় অসুস্থ-তায় সেই অজ গাঁয়ের শাশুড়ী অর্থাৎ জয় শংকর বসুর ঘরনী ধরে নিলেন এবং প্রচারে নামলেন বউ অকল্যাণ বয়ে এনেছে। দেখতে শুনতে স্বাভাবিক হলে কি হবে নেলাপোতা থেকে উৎসারিত কথাটা পল্লবিত হয়ে গ্রাম ছেড়ে, জেলা ছেড়ে, খুলনার নায়েলখোলা পর্যন্ত এসে পেঁছাল, এ ভূমির সন্তান সরমা 'অলক্ষুণে'। অথচ তেমন কোন দুর্লক্ষণ এখানেও তো দশঘর বয়স্কা আছে তারা কেউ দেখেনি বলে বিস্মিত হ'ল। কিন্তু কারও কিছু করবার তো ছিল না তাই মেয়েদের ভাগ্যের ওপরে দোষারোপ ক'রে সবাই যে যার ঘর সংসার ক'রতে লাগল, সরমার মা-ও।

ক্লিষ্ট দুটো বছর কোনক্রমে কাটিয়ে করুণাশংকর যখন পৃথিবীর মায়া কাটাল তখনও সরমার বিয়ে তিনবছর পূর্ণ হয় নি। কোনদিন সুস্থ না থাকলেও স্বামী যে ছিল এবং অনেক কিছু ছিল এই রূঢ় সত্য সরমা যখন বুঝল তখন সে একান্তই সহায়হীন। জয়শংকর বসুর নামের সঙ্গে সঙ্গতির সামঞ্জস্য ছিল না বলে পুত্রবধূর অপযশ প্রচারের প্রয়োজন ছিল। পুত্রের মৃত্যুর পর সেটার বেগ এমনই তীব্র হ'ল যে সরমাকে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন ক'রতে হ'ল। এখানে এসে দেখল যে সেই অপযশ তার পিছু ছাড়ছে না, এতদূর তাড়া ক'রে এসেছে। শুধু অপযশে তার তেমন অসুবিধের কারণ ছিল না, এখানে সেই অলীক অপযশ ধরে যখন তখন নাড়ানাড়ি ক'রে তার আশ্রয়কেই নড়িয়ে দিতে লাগল। একটু ক্রোধের কারণ ঘটলেই পরিবারের অনেকে, নিজের ভাইরা এবং মা পর্যন্ত সেই নির্বোধ নিন্দার কথা স্মরণ করিয়ে ছোট ক'রতে চায়। অপমানে, অসম্মানে জর্জরিত সরমা গঞ্জনার মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে নিত্য মৃত্যুর কামনা করে নিস্ফল বেদনায়। মাত্র একুশের জীবনে

যৌবন যখন পূর্ণতায় বিকশিত তখনই সরমার সকল বাসনা অস্তমিত।

মেয়ের মনের দিকে চেয়ে নয়, সংসারের অশান্তি ঘোচানোর জন্যেই নবজীবন ঘোষ স্থির ক'রল সরমার আবার বিয়ে দেবে। তখনও তার গলায় আরও একটি অনূঢ়া কন্যা ঝুলছে, সে মেয়েটি সরমার দুবছর পরে পৃথিবীতে পা রেখেছিল। স্বাভাবিকভাবে তারই বিয়ে হবার কথা। বাংলাদেশের সে সময় বিবাহযোগ্য পাত্র সংখ্যায় সামান্য অথচ প্রাকৃতিক জন্মসূত্রে কন্যা সন্তান সংখ্যাধিক বলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছাপূরণ সরমার বেলাতে হ'ল না। নেহাৎই নিরুপায় সে অতিক্লেশে দুটো বছর পার ক'রে একদিন হতাশ হয়েই ঘরের আগল ভাঙ্গল। 'যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়ব' কথাটা সে এতদিন ধরে কেবল শুনত মা, ঠাকুমা, দিদিমার মুখে—সেটাই প্রয়োগে লাগাল।

নিজের গ্রামের সামান্য অংশের পরই তার পরিচয়ের গণ্ডী পার হয়ে গেল। তা বলে পথ যে ছিল না এমন তো নয়। পথ তাকে নিয়ে চলল। সরমার বুকের মধ্যে বিশ্বাস ভরা ছিল কোথাও তো পথ যাবে! কিন্তু অসংখ্য পথ যে এই পৃথিবীকে বেষ্টন ক'রে আছে এবং নির্দ্ধারিত স্থান না থাকলে পথ কোথাও যে নিয়ে যেতে পারে না এ বোধ তখন তার নেই। নেহাৎ আবেগ তার চলার বেগ সঞ্চার ক'রেছে বলেই সে চলছে, কোথায় নিয়ে যে থামবে না জেনেই চলছে। চলতি পথে দুচারজন বিপরীতগামী মানুষ তাকে দেখলেও নিজের মত চলে যাচ্ছে, সে চলেছে মনস্তাপ জনিত আত্মমগ্নতায় ফলে তাকে কে দেখছে না দেখছে বা পথে কে যাচ্ছে তার নজরে আসছে না। কিন্তু অজানা পথ কাউকে জিজ্ঞাসা না ক'রলে হারাতে হয়; সেটাই হারাল এবং এক জায়গায় সে দিশা হারাল। সেটা স্থানীয় লোকেরা বুঝল তার ভাব ভঙ্গী দেখে। তাই একজন বয়স্ক মানুষ পরণে চেক লুঙ্গি চুল পড়ে যাওয়া চকচকে মাথার ঘাটতি পূরণের জন্যেই যেন রাখা একমুখ সাদা দাড়ি, এগিয়ে এসে প্রশ্ন ক'রলেন, কোতার থে আসতিছো গো মাইয়ে?

মানুষটির কণ্ঠে মমতা। তবু সরমা জবাব দিল না। কি বলবে সে? কয়েক মিনিট জবাব না পেয়ে বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন ক'রলেন, কোয়াত যাবা?

কোনখানে যাবে? সে রকম কিছু একটা বোধ হয় বলা যায়। ধীর স্বরে বলল, নেলাপোতা।

শ্রোতা একটু থমকে গেলেন। নেলাপোতা স্থানটির নাম তাঁর স্মৃতিতে এল না। বাধ্য হয়ে পেছনে এসে দাঁড়ানো কৌতূহলীদের একজনের সাহায্য চাইলেন, হ্যাঁ রে ছিদ্দিক নেলাপোতা কোয়ানে রে? সি টি আব কোন গেরাম?

সিদ্দিক নামের যুবকের স্মৃতি যে কিছুটা স্পষ্ট তার প্রমাণ দিল সে, কুদ্দুস চাচার শ্বশুর বাড়ী গো বাজান, সেই যশোরি।

সে তো অনেক দূর গো মায়ে, ক্যামনে যাবা?

রাস্তাটা এট্টু বলে দেন, তালি চলে যাবো।

তোমারে তো নৌকোতি যাতি হবে। নদী তো এ হেনের থে আধক্রোশ দূরে। দুশ্চিন্তা ভদ্রমানুষটার কপালে কুঞ্চন হয়ে ফুটে উঠেছিল। অবশেষে দুটো কিশোরকে ডাকলেন, সোলেমান, মকসুদ বাপজীরা এট্টা কাজ কর তো দেহি। এই মায়েডারে নদীর ঘাটে পৌঁছে দে আয় তো বাপ—

চোদ্দ পনের বছরের সোলেমান আর মকসুদ দায়িত্ব পাওয়া মাত্র সরমাকে নিয়ে নদীর পথ ধরল। সামান্যই পথ, তারা যেমন ক'রে জমির আল ভেঙ্গে, চষা জমির মধ্যে দিয়ে যাতায়াত ক'রে থাকে তেমন ক'রে গেলে তো কিছুই না, ভদ্রঘরের মেয়েমানুষ সে ভাবে তো পারবে না—।

নদীর ঘাটে একজন লোক তার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে নৌকায় ওঠবার উদ্যোগ ক'রছিল। মাঝি ডাঙ্গা থেকে মালপত্র তুলে নিচ্ছিল। সরমা একমাথা ঘোমটা দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতে মাঝি হেঁকে উঠল, এই নৌকোতি যাতি পারবা না নে! টাবুরে নৌকো ভাড়া কইরে নিতি হয়, যাবো বললিই কি যাওয়া যায়?

সরমা কিছুই জানে না, সে লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে গিন্নি কাছে এসে জানতে চাইলেন, স্টেশনে যাবা?

নিঃশব্দে কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সরমা। মহিলা স্বামীকে কি বলে সরমাকে বললেন, উঠে পড়। আমরাও স্টেশনে জাচ্ছি।

নৌকায় উঠে এক পাশে সংকুচিত হয়ে বসল সরমা। মহিলা বললেন, অমন চাইপে বসতিছো কেন, ভাল ক'য়রে বসো।

সরমা খুব নিচু স্বরে বলল, ঠিক আছে।

ক'নে যাবা? মহিলা আবার জানতে চাইলেন।

সরমা সংকটে পড়ল; কোথায় যাবে? কিছুই তো জানে, কি বলবে? ঘর ছাড়বার সময় ভেবেছিল যেদিকে দুচোখ যায়, যাবে। বাইরে এসে দেখছে দুচোখ তো চারিদিকে অনেক দূর পর্যন্তই যায়, বোধহয় ভূমির ভিতরে ছাড়া ন'টা দিকেই যায়। এর কোন দিকটা তার যাবার মত? সে নিজেই পথের দিশা পাচ্ছে না মহিলাকে কি জবাব দেবে।

হঠাৎ তার সৌভাগ্য উদয় হল, পরিবারের কর্তাটি পত্নীকে বলে উঠল, ঐ যে গাঁ দেখতিছো ঐডে হলো গে জিলেটি।

স্বামীর কথায় স্ত্রী মন দিচ্ছে না দেখে কর্তাটি আবার বলল, ঐ আমাগে নেত্যর পিসে অশ্বিনী বিশ্বেসইর বাড়ী, চেনো না?

এবার গৃহিণী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন, ক্যানো চেনবো না? নেত্যো ঠাউরপোর পিসের বাড়ী এহেনে হতি যাবে ক্যান, সে তো শিরোলি। এডা হলো হলো গে মাইউর শ্বশুর কুঞ্জ বিশ্বেসির বাড়ী।

দ্যা হো তো আমার আজকাল কেমোন ভুল হয়ে যায়—গৃহকর্তা একবাক্যে মেনে নিয়ে একমুখ হেসে ফেলল।

সাংসারিক কথাবার্তা বলতে বলতে বাকি পথ টুকু পার হয়ে এল বলে সরমা কোন জবাবদিহি থেকে বেঁচে গেল। ঘাটে নৌকো ভিড়তে আবার সেই নামার তাড়াহুড়ো। সরমার সামনে সবই যেন অন্ধকার, কোথায় যাবে? সামনে পাড় দেখতে পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু পাড়ে পা দিয়ে কি ক'রবে সে? কোথায় যাবে?

তবু তো নামতেই হ'ল, নামা মাত্রই প্রশ্ন এল, ফুলতলির থে কনে যাবে?

ফুলতলা রেলস্টেশনের নাম সরমার শোনা ছিল। সেখান থেকে ট্রেনে উঠে গ্রামের সবাই যাদের প্রয়োজন, তারা কলকাতা যায়, নয়তো যায় দৌলতপুর, খুলনা। এটাই কি তাহলে ফুলতলা! কই রেল স্টেশনই বা কোথায়? এবার তার ভয় বেড়ে গেল। এতক্ষণ যেন বিকারে পথ চলছিল, কতবার মনে হয়েছিল নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়ে ভৈরবের জলে। পরক্ষণেই মনে হয়েছে সে তো সাঁতার জানে, ভালই জানে। কাজেই ভৈরব তাকে মুক্তি দেবে না মাঝখান থেকে হেনস্থা হবে। লোকজন তাকে নৌকাতে তুলে ফিরিয়ে দেবে নিজেদের বাড়ী, সে হবে অপমানের একশেষ। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেই ভৈরবে ঝাঁপ দেয় নি যে সরমা সে এখন প্রকৃতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কি করবে? কোথায় যাবে? একটা জীবন যে এমন বোঝা এ যেন দিনে দিনে সে বেশি ক'রে বুঝছে। শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক স্বামীর মৃত্যুতেই মুছে গেছে অথচ তা হবার ছিল না। তাদের গ্রামেই তো আছেন নিভাপিসিমা বিধবা হয়েছেন সেই কোন আদ্যিকালে, শ্বশুরের ভিটেতেই তো আছেন, দাপটেই আছেন, নারাণ জ্যাঠা ভাই-এর স্ত্রীকে না বলে তো কোন কাজই করেন না। পিসি আবার বলেন, আমি কি জানি? উনি যা ক'রবেন আমি তার চেয়ে ভাল বুঝবো?—বেশ তো আছেন পিসিমা। তারই জায়গা হ'ল না কোথাও না শ্বশুর বাড়ীতে, না তার নিজের ঘরে। এখন যে কোথায় যাবে সে কিছুই জানে না, কিন্তু উত্তর যেহেতু একটা দিতে হয় তাই বলল, কলকাতা।

পথ চলতে গিয়ে প্রশ্নোত্তর বন্ধ হয়ে গেল। ওদের জন্যে গোগাড়ীর ব্যবস্থা ছিল। সকলে সেই গাড়ীতে উঠে পড়ছে দেখে সরমা ভাবল কোন পথে সে যাবে? পথ অবশ্য একটাই দেখা যাচ্ছে ঘাট থেকে উঠে কোনদিকে যে চলেছে সে জানে না, তবু মনে হ'ল পথ যখন একটাই তখন এটা ধরেই চলতে হবে। গাড়ীর চাকার দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে সকলকেই এই পথে যেতে হবে। এরাও নিশ্চয় যাবে। কিন্তু স্টেশন যে কতদূরের পথ তাই তো জানা নেই, জিজ্ঞাসা ক'রতেও সাহস হচ্ছে না। তাই ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। যতদূরই হোক যেতে তো হবে! এই ঘাটের ধারে তো আর জীবন ভোর বসে থাকা যাবে না! কিছুটা এগোতেই গোগাড়ীটা পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে তার পিছু নিল সরমা। এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত, স্টেশন পর্যন্ত তো পেঁছিানো যাবেই।

ছোটবেলা গ্রামের পাঠশালা যতটা শেখাতে পারে সবটুকু পড়া শিখেছিল বলে সহজেই পড়তে পারল ফুলতলা। এবার তার প্রচণ্ড ভয় হ'ল। কোথায় যাচ্ছে? গ্রামের বাইরে যে কিছু চেনে না সে রেলস্টেশন থেকে কোথায় যাবে? এইটুকু আসতেই তো কি অবস্থা। নাঃ সে ভাবতে পারছে না। তার ভয় লাগছে। প্রচণ্ড পশ্চাত্তাপ হ'ল তার। যত গঞ্জনাই সহ্য ক'রতে হোক দুবেলা দুমুঠো ভাত কি আর বাড়ীতে জুটতো না! তাকে না দিয়ে কি মা বাবা ভাইরা খেতে পারত! নাঃ সে বরং বাড়ীতেই ফিরে যাক্। অজানা পথের অপরিচয়ের চেয়ে পরিচিত সংসার অনেক ভাল। নিশ্চিন্ত। নিরাপদ। আপন সংসারের বাইরে বিশ্ব যতই বিপুল হোক কোথাও মানুষের আশ্রয় নেই। ছোট ঘরের গণ্ডীর মধ্যেই মানুষ বাঁধা পড়ে তার অভ্যাসে ও নির্ভরতায়। সেখানে তার সুখ যে নিরবচ্ছিন্ন হবে এমন কোন কথা নেই, সুখে হোক আর দুঃখের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ভাগ ক'রে নিতেই হোক নিশ্চয়তা ছাড়া জীবন হয় না। সরমার ভুলই হয়েছে ঘর ছেড়ে আসা। এখন ফিরবেই বা কোন মুখে?

ভাগ্যে যা আছে হোক, ফেরা যাবে না। একথা ভেবেই সরমা হঠাৎ আসা রেলগাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ী কোথায় যাচ্ছে কি বৃত্তান্ত কিছুই সে জানে না, জানবার প্রয়োজনও নেই। যেখানে যাচ্ছে যাক্ কোনও খানে তো যাচ্ছে! যার কাছে কোনই লক্ষ স্থল নেই তার আর দিশা জানবার কি দরকার? ওর কাছে উত্তরও যা দক্ষিণও তাই। যে কোন জায়গায় যেতে হবে, সরে যেতে হবে। বাঁচতে যাবে কি মরতে যাবে তাও তো অজানা। এখন আর কিছু ভাবছেও না, যা হবার হোক। ব্যস্ত চলাচলের হৈ চৈ চ্যাঁচামেচির মধ্যে কিছু ভাবতেও পারছে না সরমা। ট্রেনটা এসে পেঁছানো মাত্রই স্টেশন জুড়ে যে সোরগোল পড়ে গেল, ট্রেনের কামরায় উঠে বসে সে যেন সেই হট্টগোলের মধ্যেই ঢুকে পড়ল, তার শরীরের চারপাশে বাতাসের মত জড়িয়ে গেল সেই গোল-যোগ—হট্টগোল, যেন সকলেই চেঁচাচ্ছে কে যে কি বলে চেঁচাচ্ছে সে আর আলাদা ক'রে বোঝা যাচ্ছে না। একমাত্র সরমা ছাড়া প্রত্যেক প্রাণীই যেন গোলমালে মগ্ন। সরমা তার মধ্যে একটা বেঞ্চে কিছুটা জায়গা ফাঁকা পেয়ে চুপচাপ বসে পড়ল। যেখানে বসল তার দুপাশে অনেকটাই ফাঁকা। লোকজন উঠছে নামছে, হৈ চৈ হট্টগোল চলছে তার মধ্যে সরমা কেবল নিঃশব্দ, নীরব। অতিরিক্ত শব্দ অদ্ভুৎ এক নৈঃশব্দতার সৃষ্টি ক'রল সে যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

হঠাৎ এক সময় এমন প্রবল এক ঝাঁকানি দিয়ে ট্রেন ছাড়ল যে সরমাকে আমূল দুলিয়ে দিল যেমন ক'রে ঝড়ের ঝাঁকানি বৃক্ষকে মূল থেকে উৎপাটিত ক'রে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলে তেমনি ক'রেই এই ট্রেন যেন তাকেও মূল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে অন্য কোথাও নিয়ে চলল যেখানে তার স্বভূমির কোন স্পর্শ মাত্র নেই। উৎস থেকে উৎসছিন্নতায়, সূত্র থেকে সূত্রহীনতায়, অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব হীনতায়

পার্থিব বস্তু ও প্রাণমাত্রেরই যে চিরায়ত যাত্রা সেই যাত্রাপথেই তো অপ্রত্যক্ষ চলা—সরমা প্রত্যক্ষভাবে চলতে লাগল।

যারা সপরিবারে যাচ্ছে তারা তো সবাই যে যার স্ত্রীপুত্রে মগ্ন, যারা অন্যান্য সঙ্গীসহ তারা মগ্ন সঙ্গীর সঙ্গে, সরমার নিঃসঙ্গতা সীমাহীন বলে সে-ই কেবল নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মূক। স্টেশনে স্টেশনে ট্রেন থামলেই আপেক্ষিক চঞ্চলতা বাড়ছে। কেউ উঠছে কেউ নামছে, হট্টগোল হচ্ছে। হট্টগোল বাড়লেও সরমার তাতে কোন ভাবান্তর হচ্ছে না। সেই সব হট্টগোল তার কানে আঘাত ক'রলেও মনে প্রভাব ফেলতে পারছে না। কখন থামছে কখন চলছে—কিছুই বুঝছে না সে, এ তো বরং একটা আশ্রয়, থাকবার স্থান পেয়েছে, ট্রেনটা একদম থেমে গেলে কোথায় যাবে তার ঠিকানা নেই বলে মনোভারাক্রান্ত সরমা যেন পরম নির্ভরতায় বসে আছে। হঠাৎ চমকে উঠল একটা হাত জানালা দিয়ে এগিয়ে আসতে। ভয়ে শিউরে দেখল সেই হাতে এক ঠোঙা খাবার ; শুনল, খায়ে নাও।

ভয়টা প্রবলই বটে তবে স্বরে ভয় দূর করবার আন্তরিকতা। কিন্তু হাতখানা এবং কণ্ঠস্বর পুরুষ মানুষের বলে সেই বরাভয় কোন কাজে লাগল না। সে যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। এবার জানালার কাছে বাইরে দাঁড়ানো মানুষটার মুখটাও কাছে এসে গেল, খা'য়ে নাও। না খায়ে কতক্ষণ থাকপে?

সচকিত হ'ল সরমা, এ কার স্বর? কার এত মমতা? এই কঠিন পৃথিবীতে কে এমন সহানুভূতি এনেছে তার জন্যে? এই মুহূর্তে তার মনে হ'ল ক্ষিধে পেয়েছে। সভয়ে সন্তর্পণে জানালার বাইরে চেয়ে চমকে উঠল, দিলু! তার শৈশবের খেলার সাথী! এখানে ও কেমন ক'রে এল? মিত্তিরদের বাড়ীর দিলু গাঁ ছেড়ে এখানে কি ক'রে? বিস্ময় তার দীর্ঘকালের নিঃশব্দতার পাহাড় ফাটিয়ে দিল, তুমি!

খাও। আগে খায়ে নাও তারপর ক'চ্ছি।

আর কোন দ্বিধা ভয় তো নয়ই বরং এই চরম অসহায়তার মধ্যে আত্মজন পাবার তৃপ্তিতে তার সমস্ত দুশ্চিন্তা কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত থমকে গেল। স্বস্তি তাকে সাহায্য ক'রল, এতক্ষণ যে হাত কোলের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছিল তারই একটা বাড়িয়ে দিল। খাবারের ঠোঙা নিয়ে বলল, জল খাবো।

অপেক্ষা করো, বলেই দিলু গিয়ে জল আনল কার একটা গ্লাসে ক'রে। তৃষ্ণায় বুকের ভেতরটা যেন শুকিয়ে ছিল, পরপর দুগ্লাস জল পান ক'রে তবে শান্তি। এরকম সময়ে দিলুর মত একজন সুহৃদের দেখা পাওয়া যাবে তেমনটা ভাবতে পারার সুযোগই ছিল না। সেই ছেলেবেলাতে একসঙ্গে খেলাধুলা ক'রেছে, তারপর মাঝে মাঝে দৈবাৎ দেখা হয়েছে 'কেমন আছিস' এর বেশি কথা কোনদিনই হয়নি তাও গত পাঁচ ছ বছর তো নয়। তার বিয়ে হবার পর থেকে দেখা কথা কোনটাই হয়নি, তবু যে দিলু এই বিপদের দিনে দেবদূতের মত এসে দেখা দিল তার দিকে সাহায্য

বাড়িয়ে দিল সেটা কি কম ?

ট্রেন ছাড়বার আগেই দিল্‌ উঠে এল। সাহস ক'রে যে পাশে বসবে পারল না। সামনে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, কনে যাচ্ছো ?

সরমা পাশটিতে দেখিয়ে দিল, বলল, বসো।

দিল্‌ জীবনে পরমার্থ লাভের স্বাদ পেল সরমার পাশটিতে বসতে পেরে। অকারণেই তার শরীরে শিহরণ জাগল। কত বছর ধরে সে যেন কেবল এইটুকুই চেয়েছিল আজ তা কেমন আকস্মিক ভাবেই না জুটে গেল। যে সরমা মনের মধ্যে অতি সঙ্গোপনে কেবল একটি ইচ্ছা হয়ে বসেছিল সেই সরমা বসে আছে তার পাশে, একেবারে গায়ের সঙ্গে মিশে! গাড়ীর ঝাঁকানিতে তার কাপড় ঠেকছে শরীরে! এ কি কম রোমাঞ্চের কথা! দিল্‌র যেন সহ্য হচ্ছে না। মনের ভেতরে কি এক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে তাকে অস্থির ক'রে তুলতে চাইছে। সে কি ক'রবে ভেবে পাচ্ছে না। এই সৌভাগ্য সে সইবে কেমন ক'রে তাও বুঝতে পারছে না।

সৌভাগ্য আত্মস্থ ক'রতে যতটুকু সময় লাগল সেটুকু কাটিয়ে সরমা প্রশ্ন ক'রল, তুমি এ গাড়ীতে কেমন ক'রে আসলে ? যাবাই বা কনে ?

আমি দোলতপুরি গিছিলাম আমার সাইজে মাসীর বাড়ী। ফিরতিছেলাম। ফুলতলি স্টেশনে নায়মে দেখি তুমি যেন গাড়ীতে উঠতিছো। ভাল কোয়রে বুঝতি পারলাম না সঙ্গে কেডা আছে। পেছনের কামরাডায় উঠে তোমারে লক্ষ ক'রতি লাগলাম প্রতি স্টেশনে। জহন বোজলাম তুমি একাই আছো, তোমার কেমন যেন বেহাল অবস্থা তহনই সাহস কোয়রে খাতি বললাম। এহন কও দি কোয়ানে জাস্‌সো ?

সরমা চুপ ক'রে থাকল; কি বলবে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাবল, তারপর অতি নিচু স্বরে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যাতে অপর কেউ শুনতে না পায়; বলল, কোয়ানে জাব তা জানি না।

সে কি!

সে অনেক কথা। তুমি অত কথা বোজবে না।

তোমার স্বামী যে মারা গেছে সে তো শুনিছিলাম। দেখতাম তুমি গেরামে ফিরে আলে, তোমারে রোজই তো দেখতাম, দিল্‌ একথা বলতে পারল না সে সরমাকে দেখবার জন্যে সে প্রতিদিনই ওদের বাড়ীর সামনে দিয়েই ঘুরপথ হলেও যাতায়াতের পথ ক'রে নিয়েছিল।

সরমা সে কথা তেমন গায়ে মাখল না। এমনিতে ছেলেবেলার খেলার সাথী ছেলেটি তার চেয়ে বছর খানেকের ছোট। মেয়েদের জীবন কিছুটা আগে সুরু হয় বলে স্বাভাবিক ভাবেই তার দিল্‌কে অপরিণত মনে হ'ত। এ নেহাৎ উপায় নেই তাই খড়কুটো ধরা, নইলে দিল্‌ তো ছেলেমানুষ।

সরমার কথাটা দিল্‌র মনে আঘাত ক'রল। কি এমন কথা সে বুঝবে না? কি

মনে করে সরমা ? সে কি এমনই অবুঝ, শিশু ? কি এমন বেশি বোঝে সরমা ? সে আঘাত পেল বটে সরমাকে প্রত্যাঘাত ক'রতে মন চাইল না। অভিমান মাখানো স্বরে বলল, বেশ তোমার কথা তোমারই থাক কোথায় জাচ্ছ বল ?

কোথাও না—সরাসরি জানাল সরমা। অতঃপর বলল, ক'নে জাব জানি না।

এরপর সবই মোটামুটি ভাবে জানাল সরমা। আত্মহত্যার কথা ভেবেছে তাও জানাল। দিলু বুঝল যেভাবে সরমা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে তাতে তার ফিরে যাবার আর পথ নেই। না ফেরবার সংকল্পের কথাও জানাল সরমা, কোন না কোনভাবে আত্মহত্যাই সে ক'রবে, বাড়ী আর ফিরবে না।

সরমার আত্মহত্যার কথা দিলুর ভাল লাগল না। সরমার মত মেয়ে মারা যাবে, আশ্রয় পাবে না এ যেন ভাবাই যায় না। তার পৌরুষে আঘাত লাগল। সে চট ক'রে সিদ্ধান্ত নিল, কলকাতাতে তার বড় পিসিমার ছেলে হারাণ সরকার আছে। হিসেবে পাঁচ বছরের বড়। কলকাতার নিমতলা বলে কোন জায়গা আছে সেখানে পিসে মশাইদের গ্রামের জমিদার গোপাল মিত্রের বিরাট কাঠ গোলায় কাজ করে, থাকে, তাকেই গিয়ে ধরবে দিলু, সব বলে তার কাছেই একটা আশ্রয় চাইবে সরমার জন্যে। সে শুনেছে আত্মীয় স্বজন তো ছার কথা, দেশের যে কোন লোকই সেখানে গেলে জায়গা পায়, বহুলোকই আছে। অনেকদিন আগে তারা দাদা হারাণ একবার মামার বাড়ী এসে গল্প ক'রেছিল গ্রামের অনেক ছাত্রও সেই কাঠগোলায় থেকে পড়াশোনা করে। হারাণদা এতদিন কলকাতা আছে একটা আশ্রয় বা নিদেন-পক্ষে একটা কাজ কি জুটিয়ে দিতে পারবে না সরমার জন্যে!

চলো কলকাতা—সরমাকে পরামর্শ দিল দিলু মিত্র। সেখানে গেলে কিছু ব্যবস্থা যে একটা হবেই সে নির্ভরতার কথা জানিয়ে আশ্বস্ত ক'রতে চাইল। তাতে সরমা প্রভাবিত হ'য়ে বলল, তুমি যে বাড়ী না গিয়ে চলে জাচ্ছো ?

তুমি যে জাচ্ছো। দিলু প্রতিপ্রশ্ন ক'রল।

আমার ঘরও নেই বাড়ীও নেই। আমার কোথায় কে আছে যে কারও কোন ক্ষতি হবে ? আমি থাকলিই বা কি গেলিই বা কি ?

সরমার স্বরে অভিমান স্পষ্ট, প্রকট। এতক্ষণ কাজে যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল কথায় তার এক ভগ্নাংশও নয় তবু সরমা ভাবল সে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে পেরেছে। দিলু এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাইল, কারও যদি কিছু না-ই হবে তবে আমি তোমার জন্য ঘর ছেড়ে ভেসে পড়লাম কেন ? এ প্রশ্নটা সে ক'রতে পারল না। থাক। বলে কি হবে ? তার ভব্যতায় বাধল। অনেক কথা না বললেই সুন্দর থাকে। মানুষের শরীরের মত, যতক্ষণ উন্মুক্ত না হচ্ছে, আচ্ছাদিত, ততক্ষণই সুন্দর।

অল্পস্বল্প কথার মধ্যে দিয়ে এক সময় শিয়ালদহ স্টেশনে এসে যাত্রী তাড়াহুড়ো দেখেই কেবল বুঝল তারা অন্তিমে পেঁীছেছে। এবার দিলু পড়ল সংকটে।

ট্রেন তো ছাড়তেই হ'ল। যাত্রীদের দলের পাল্লায় পড়ে যেন স্রোতের মতই ভেসে চলল কোনদিকে যেতে হবে না জেনেও। সবাই যাচ্ছে বলেই যাওয়া। কিন্তু যাওয়া যে এত সহজ নয় জানতে পারল একটা দরজার মুখে এসো ছাতার রঙের কালো কোট গায়ে দেওয়া একজন ব্যক্তি সকলকে আটকাচ্ছে, টিকিট ?

এরকম যে একটা ব্যাপার আছে সে কথাটা মাথাতেই ছিল না ; অবশ্য দিলুর পকেটে একখানা আছে ফুলতলাতেই যার মেয়াদ গেছে ফুরিয়ে। সে দিয়ে আর এখানে কি হবে ? শিয়ালদহ স্টেশনে ফুলতলার টিকিট কোন কাজেই লাগবে না এ বোধ দিলুর খুবই ছিল তাই পকেটে হাত না দিয়ে সে সোজা টিকিট পরীক্ষককে বলল, আমার এই দিদিটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। স্বামী মারা যাতিই ঘরের থে তিন দিন হলো বাইরোয়ে পড়িছে। আমি দোলতপুরি মাসীর বাড়ী খুজতি গেছিলাম। ফুলতলাতি ফিরে দেখি ট্রেনে বসা। অমনি উঠে পড়লাম। এখন ফিরতি পারতিছিনা বলে কলকাতা আমার কাকার বাড়ীতি নিয়ে যাচ্ছি।—পকেট থেকে নিজের দৌলতপুর ফুলতলার টিকিটখানা বের ক'রে দেখিয়ে আপন কথা প্রমাণ ক'রতে চাইল দিলীপ মিত্র। ওরই মধ্যে ঘোমটার ঘেবাটোপে জড়ানো আচরণে কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত সরমাকে দেখে নিয়েছেন টিকিট পরীক্ষক ভদ্রলোক। দিলুকে কিছু না বলে অন্য যাত্রীদের নিয়ে পড়লেন দিলু চট ক'রে সরমার হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজার বাইরে চলে এল।

এই হাত ধরাতে অন্য সময় হলে যা হ'ত দিলুর সে অনুভূতির সুযোগ ছিল না। অন্তরে সে নিজেও কম উত্তেজিত ছিল না। এই তার প্রথম কলকাতা প্রবেশ বহু শোনা ক'লকাতা। তার ওপর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভরসায় সঙ্গে এনেছে এক অস্বাভাবিক সঙ্গীকে। ছেলেবেলার খেলার মধ্যে কখন অনুত্তাপ মনে হাতে হাত পড়েছিল কারওই সে খেয়াল থাকবার কথা নয় ; দিলুরও নেই, তবে যে হাত ধরা জীবনের জন্যে অভিপ্রেত সে হাতও ধরল এই প্রথম, আবেগহীন উদ্বেগে। তবু এটা তার কাছে একটা প্রার্থিত ঘটনার মত মনে হ'ল। এত বড় স্টেশন, তার ছাউনি পেরিয়ে চাতাল। জীবনে যা দেখেনি সেই সব দৃশ্য দিলুকে অবাক আর সরমাকে ভীত এবং সংকুচিত ক'রল। সামনে বিরাট চাতাল জুড়ে কত ঘোড়ার গাড়ী যেন তার শেষ নেই, আর জীবনে না দেখা এক অদ্ভুত গাড়ী—ছোট্ট, দেখল সামনে একজন মানুষ দুজন মানুষকে বসিয়ে টেনে চলেছে। মানুষ থাকলেই সঙ্গে জিনিষ থাকবে, জিনিষও বোঝাই থাকছে সমান তালে। সরমা এমন অদ্ভুত গাড়ী দেখে অবাক হ'ল কিন্তু এই অবাক করা বস্তুটা যে ভাল ক'রে দেখবে সে অবকাশ কোথায় ? সে তো দিশেহারা সেই বাড়ী থেকে বেরিয়েই হয়েছে এবার বুঝল যাকে দেখে কিছু আশ্বস্ত হয়েছিল সে-ও তার চেয়ে কিছু বেশি অভিজ্ঞ নয়। এবার যে কোনদিকে যেতে হবে দিলু তা নিজেও বুঝতে পারছে না। সামনে একজন লোককে

পেয়ে জানতে চাইল, ও দাদা, ক' তি পাবেন গোপাল মিত্তির মশায়ের কাঠগোলা জাবো কোন পথে ?

লোকটা কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল। দিলু তাতে দমলো না, সে সেই পাত্রই নয়; আবার একজনকে সেই একই কথা জিজ্ঞাসা ক'রল। সে ব্যক্তিও নিরুত্তর চলে যেতে তৃতীয়জনকে প্রশ্নটা করতেই সে থমকে দাঁড়াল।

বেশ মনযোগ দিয়ে শোনবার চেষ্টা ক'রল অতঃপর জানতে চাইল, ঠিকানা কি ?

ঠিকানা ব্যাপারটাই জানে না দিলু, কেবল জানে কলকাতাতে গোপাল মিত্তিরের কাঠগোলাতে কাজ করে তার পিসতুতো দাদা, হারাণ সরকার।

তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে লোকটা বলল, এখানে ঠিকানা লাগে—রাস্তার নাম, পাড়ার নাম তবে সব বলা যায়। বলেই সে হন হন ক'রে হেঁটে গেল। শুধু সেই লোকটি নয় সবাই কেমন দ্রুত হাঁটছে, কেউ দু দণ্ড দাঁড়াচ্ছে না। অথচ তাদের গ্রামে যারই সঙ্গে যে কথা বলুক বেশ কিছুক্ষণ কুশলাদি প্রশ্ন করে, দশকথা বলে শোনে, কথা ফুরিয়ে গেলেও বসে থাকে বা দাঁড়ায় অবশেষে যখন আর কোন কথাই থাকে না তখন বলে, এখন তবে যাই। আবার পরে আসব খন।—এখানে সে সব কিছুই নেই; এ কেমন দেশ রে বাবা !

কিন্তু মানুষটা পেছন ফেরা মাত্র তার মনে পড়ল নিমতলা বলে একটা নাম তো কাঠগোলার সঙ্গে জানা ছিল, সেটাই কি তবে পাড়া হবে ? বলবে বলে ভাবতে গিয়েই দেখল মানুষটা আরও অনেক মানুষের মধ্যে মিশে কোথায় চলে গেছে। এ লোকটা তবু ভাল ছিল, অন্য লোকে তো জবাবই দিল না, এ তো তবু দাঁড়াল, শুনল, কিছু একটা বলল। মানুষের গতিময়তা দেখে সে আর কাউকে কিছু না বলে পায়ে পায়ে এগিয়ে সেই অদ্ভুত দেখতে মানুষ টানা গাড়ীগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুচারজন ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান ডাকাডাকি ক'রলেও কানে নিল না অনেক ভাড়া লাগবে বলে। তার মন বলল, এগুলো ছোট গাড়ী কম ভাড়া লাগা উচিত। পকেটে দুটি টাকা, এ দিয়ে তাকে পেঁছোতে হবে দাদার কাছে।

রিকসাওয়ালা নিমতলা কাঠগোলা এলাকাতে এককথাতেই পেঁছে দিল আট আনা পয়সা ভাড়ার বিনিময়ে। একটা জায়গাতে যে এত কাঠগোলা থাকতে পারে এটাও দিলুর কল্পনার এলাকা থেকে অনেক দূরত্বে ছিল। যাই হোক অল্প ক্লেশেই সে গোপাল মিত্র মশায়ের কাঠগোলা এবং তার দাদা হারাণ সরকারকেও পেয়ে গেল। দিলুকে দেখেই হারাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে জানতে চাইল, কখন এস, কে কে এসেছে ইত্যাদি। একই সঙ্গে একঝাঁক প্রশ্ন ক'রে ফেলল কয়েক মিনিটেই। দিলু আসাতে যে হারাণ খুব আনন্দ পেয়েছে তা তার ব্যবহারেই প্রকাশ হ'ল। সরমাকে সামান্য একটু দূরে দাঁড় করিয়ে এসেছিল দিলু তার আসা একটু স্থিতি হ'তেই বলল, সাইজেদা আমাগের গেয়ামের নবজীবন ঘোষ মশায়ের মায়েরে একটা কাজ জোটায়ে দিতি পার ?

এবার যেন হারাণ চমকে উঠল, মায়ে মানষিরি কি কাজ দেবো ? তোগে গেরামের নব ঘোষ তো আমাগে যতীনির শ্বশুর।

যতীন কি ডা ?

যতীনরে তুই চিনবি নে। আমাগে গেরামের শাস্ত দত্ত ছেল তার বড় পুত্তুর। সে হারাম জাদাও বাপের মত বদমাস ছেল। শক্তি গে পাড়ার নমোরা তারে কুপোয়ে মারিছে না!

দিলু দেখল সে বড় দূরের ইতিহাস। অত দূরত্ব দিয়ে যাতায়াত ক'রে কোন লাভ নেই, তাই বলল, মায়েডার বড় কষ্ট সাদেজা। —এর পর খুবই সংক্ষেপে সে সরমার জীবনের ঘটনা তিন চার বাক্যে বুঝিয়ে তার এখানে চলে আসার ইতিহাস অকপটে বলল ; কেবল সামান্য মিথ্যে বলল যে মেয়েটাই স্টেশনে দেখা হ'তে তাকে ডেকে এনেছে। একরকম জোর ক'রেই এনেছে।

দিলুর কথা শুনে হারাণ যেন হতবাক্ হয়ে গেল, কয়েক মিনিট থেমে থেকে বলল, তুই কি কাজটা করিছিস তা জানিস ?

কি কাজ ?

ঐ মায়েডারে এহেনে আনলি কি হবে বল দেখি ? এ্যাহোন পুলিশি তাড়া করবে, কি বিপদের কাজ ক'রলি বল দেহি ?

পুলিশের নাম শুনে দিলু বিপদে পড়ে গেল। কিন্তু পুলিশে ধরবার মত কি অন্যায় ক'রেছে সে বুঝল না। তেমন কোন অন্যায় তো সে করেনি! চুরি ডাকাতি, নরহত্যা এই সব ক'রলে না পুলিশে ধরে, অনর্থক ধরবে কেন?

সরল এ প্রশ্নটা সেজদার কাছে ক'রতে সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, তুই নেহাৎই ছেলে মানুষ। কিছু বুঝবি না। তা এহেনে মায়েডারে কনে রাকবো বল দেহি? কাজই বা কি দেব ? সেয়ান মায়ে ছোটও না—

হারাণ যেন সমস্যায় পড়ে গেল। তার মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল তারপর ভাইকে ভৎর্সনা ক'রে বলল, তুই ক্যান ওর কথা শুনতি গেলি? হলোই বা নিজেগে গেরামের মায়ে এ্যাহোন কি সম্যা বল দি ?

যা হোক এট্টা ব্যবস্থা করো। নাহলি মায়েডা অপঘাতে মরতো।

মরতো তা তোর কি ? ভৎর্সনার সুর ফুটে রইল হারাণের গলায়।

দিলু চুপ ক'রে রইল ওর যে কি সে কথা ও নিজেও জানে না তবে কিছু যে একটা বটে একথা ওর মন বলে। এখন এই মনের কথাটা তো আর ব্যাখ্যা ক'রে বলা যায় না, দাদাকে তো নয়ই। হারাণ হঠাৎ বলে উঠল, কত বয়েস হবে ?

দিলু বুদ্ধি ক'রে বলল, আমাগে থে কিছু বড়।

তোর থে বড় ? তালি তো বেশ বড় রে! কোয়ানে রাখি বল দি ? আচ্ছা তুই এক কাজ কর ওর নিয়ে ঐ রাস্তার ধারে মিস্টির দোকানটায় বয় আমি দেখতিছি কি ক'রতি পারি। লক্ষীবাসার ছিদেম বোসেগে এহেনে ঘর সংসার

আছে, দেহি তাগে কয়ে বলে রাখতি পারি কি!

প্রবল সংকটের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে হারাণের তখন মনে পড়েছে শ্রীদাম বসুর ছেলে সুনীল তার বন্ধু। সুনীলকে বলে যদি তাদের বাড়ীতে স্থান ক'রে দেওয়া যায়। ওদের কাঠগোলা তো এই পাশেই চারপাঁচটা গোলার পরে, সুনীলকে এখন পাওয়াও যাবে। শ্রীদাম বসু গদীতে বসলেও বড় ছেলে সুনীলই কাজকর্ম দেখে। দিলু একলা হ'লে তো কোন অসুবিধেই ছিল না, হারাণ নিজেদের কাঠগোলার মেস-এ নিয়ে তুলতে পারত, যেমন সকলেরই আত্মীয় স্বজন আসে, দেশগ্রামের লোকেরা অনাত্মীয় হলেও আসে থাকে, তেমনই থাকতে পারত গোপাল মিত্রের আশ্রয়েতেই। কিন্তু কোথা থেকে একজন মেয়েমানুষকে নিয়ে সঙ্গে এনেই তে বিপত্তিটা বাধাল ছোকরা। ওদেরকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতে খুবই খারাপ লাগলেও কিছু করবার নেই বলে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা ক'রতে চাইল।

সুনীল সতরঞ্চির ওপর বসে হিসেব দেখছিল। শ্রীদাম বসুর ম্যানেজার খুদু মুখার্জী সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রছিল, হারাণকে দেখেই বলল, কি মনে ক'রে ভায়া? তোমাদের বি টি এম ব্যামপীশ এল নাকি!

হারাণ খবর দিল, কাল আসবে। জাহাজে মাল খালাস হচ্ছে, আজ বিকালেও হতি পারে। আপনারা নিলি আজই কথা কবেন।

ইতিমধ্যে হাতের কাগজ দেখা হয়ে গেলে খুদু মুখার্জীর হাতে দিতে দিতে সুনীল হারাণকে জিজ্ঞাসা ক'রল, কি গো বড় কোম্পানীর লোক কি মনে কইরে? সন্দেবেলা বসতিছো তো?

সন্দির কথা ছাড়ে এ্যাহোন সকালের কথা শোন তো!

বল?

আমার মামাতো ভাই তাগে গ্রামের এট্টা বিধরা মায়েরে নিয়ে আইছে। তারে কোন এট্টা চাকরি দিতি হবে।

হারাণ সুনীলের বন্ধু স্থানীয় এবং প্রায় সমবয়স্ক। দুজনের মধ্যে সম্পর্কও বেশ গভীর। সন্ধেবেলা সুনীলদের পানের আসর বসে বিডন স্ট্রীটের নরেশ চৌধুরীর 'কুমার কুঠিতে'। হারাণ মাঝে মাঝে সেখানেও সঙ্গী হয়। নিজে হারাণ সামান্যই পান করে, সুনীলের উৎসাহের কারণ হিসেবে সঙ্গ দেয়।

এত জানা সত্ত্বেও হারাণ তার কাছে এল কারণ তাদের বিরাট পরিবার। আহিরীটোলায় একটা গোটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে শ্রীদাম বসুর সংসার। সেখানে দুবেলাতে আটত্রিশজন লোকের পাত পড়ে। ফলে কাজের লোকও লাগে এবং যে কোন সময় একজন লাগানো যায়। সুনীল বন্ধু বলে তারই কাছে সাহায্য চাওয়া সম্ভব। সে নিয়ে গিয়ে তার মায়ের হেফাজতে জমা দিতে পারে, হয়ত দেখা যাবে নায়েলেখোলার নবজীবন ঘোষের সঙ্গে কোন ক্ষীণসূত্রই বেরিয়ে গেল আত্মীয়তার। সে সব সুনীলের মা ই জানবে।

সুনীল জিজ্ঞাসা ক'রল মায়েডার বয়স কত ?

হারাণ জবাব দিল, আমি জানবো কেমন কোয়েরে ? হবে তেইশ চব্বিশ।

ওরে বাপরে! ওরে রাখতি দেবে না বাড়ীতি। সোমথ মায়ে ঢোকবে না।

কেন ?

আমার মা-রে তুই জানিস না ? তেনার ঘরে সাত সাতটা ছাওয়াল আছে না ? ভয় আমাগে সাইজে বাবুরি। বাবু বিয়ে করবে বলে নাচতিছে।

তা তো ভালই। বয়েস কত হলো ? চব্বিশ-পঁচিশ তো হবেই ?

সেই জন্যিই তো মার ভয়। ন' বাবুও তো পিঠোপিঠি।

তা'লি! কি করবো ? ব্যবস্থা তো এট্টা করতি হয়, হারাণের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সুনীল অবিচলিত ভাবে বলল, থামো। হরেন রে ডাকো। নরেশের তো ফাঁকা বাড়ী। লোকজন কেউ নেই। হরেন কে কয়ে বলে নরেশ চৌধুরীর বাড়ীতি আপাততঃ রাখা যাক। হরেন দাশগুপ্ত বললি নরেশ না করবে না নে।

হরেন দাশগুপ্ত পাশে থাকে, নিমতলা স্ট্রীটের পাঁচনম্বর বাড়ীতে তার বাবার কবিরাজখানার সে একাই কর্মী। বাবা বৃদ্ধ বলে তাঁকে সাহায্য করে। সুনীলের সর্বকর্মের সহযোগী এবং অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। নরেশ চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম সংযোগ তারই। তাকে দিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সব কাজ হয়ে গেল, নরেশ চৌধুরীর অফিসে ফোন ক'রে তিন চারদিন থাকবার অনুমতি হ'ল। সেখানে তিনখানা ঘরে একার সংসার নরেশ চৌধুরীর। খাওয়া হোটেল থেকে হয়, রাতে তাসের আর মদের আসর রোজ বসে বলে হোটেল থেকে খাবার রোজই আসে, কাজ চলে যায়। টেলিফোনে নরেশ বলল, আমার তো রান্নার ব্যবস্থা নেই, মেয়েটা খাবে কোথায় ?

সে তোমারে ভাবতি হবে না, সুনীল জানাল, সেসব ব্যবস্থা ক'রে দেবানে।

বেশ। তা হ'লে পাঠিয়ে দাও। আমার ঘরের চাবি হরেনের কাছেই আছে।

সরমার গতি হ'ল। আপাততঃ দিলুও থাক, বিকাল বেলা, মানে আর দুঘণ্টার মধ্যেই তো নরেশ আসছে, দিলু তখন হারাণদের মেস-এ চলে যাবে।

বিডন স্ট্রীট সদর রাস্তার থেকে সরু গলি ঢুকেছে, ঢুকেই ছোট দোতলা বাড়ী দরজা খুলে ঘরদোর দেখিয়ে হরেন বলল, সাবধানে থাকবে। আমরা বেরোলেই সদর দরজা বন্ধ ক'রে দেবে। কেউ ডাকলে খুলবে না।

হারাণ বুঝিয়ে বলল, এডা কলকাতা—মনে রাখবি। এ হেনে নানারকম মানুষ। সাবধানে না থাকলি বিপদে পড়ে জাবি। বিকাল বেলা আসে তোরে নিয়ে জাবো। এটটু বাদে হোটেলের থে ভাত দিয়ে যাবে খায়ে নিবি।

ওরা চলে যেতেই সদর বন্ধ ক'রে সরমা বলল, আমার বড়ো ভয় করতিছে।

কিসির ভয় ? দিলু যেন অনেক সাহস সঞ্চয় ক'রে ফেলেছে এমনি ভাবে অভয় দিল। কিসের যে ভয় সরমা জানে না। ভয়ে ভয়েই তো সে আছে অথচ কিসের ভয় বলতে পারছে না, জানেও না। এখানে আশ্রয় পেয়েও ভয় কেন যে কাটছে না তাও

তার বোধের বাইরে বলে সে বোঝাতে পারছে না। মাত্র তিন ঘরের বাড়ী, নিচে একখানা, দোতলায় দুখানা। একতলাতে রান্নাঘর, কল পায়খানা আর একটি ঘর তাকে উদ্দেশ্য ক'রে দিলুকে বুঝিয়ে গেছে ওটি নাকি স্নান ঘর। সদর বন্ধ ক'রলে কুকুর পর্যন্ত ঢুকতে পারে না অথচ ভয়ের কারণ সরমা নিজেই খুঁজে পেল না।

স্নান করাটা খুবই দরকার। ভয় ভয় কর'লেও ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকে টিনের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতেই বেশ লাগল। একা। এমন একান্ত একা জীবনে থাকে নি সরমা। সুযোগ পায়নি। দেশে স্নান মানে একেবারে খোলা জায়গায় উন্মুক্ত আকাশের নিচে একরাশ মানুষের মধ্যে, সকলের জোড়া জোড়া চোখের সামনে সর্বাঙ্গ আবরিত অবগাহন। আর এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত, একা কেবল নিজেকে দেখা, আপনাকে অনুভবের চেষ্টা করা। এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসেছে সে বাড়ী থেকে। একটা অতিরিক্ত কাপড় আনবে সে সুযোগ পায়নি। গামছা আনবার কথাই ওঠে না। প্রাণত্যাগ ক'রতে কি কেউ কাপড় জামা নিয়ে বেরোয়! আত্মহত্যা ক'রতে বেরিয়ে আত্মরক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে গেল সরমা। ভগবান যা হোক এমন একটা আশ্রয় জুটিয়ে দিয়েছিলেন বলে তবু স্নান করা গেল। কিন্তু সমস্যা হ'ল বাসি জামা কাপড়ে থাকবে কি ক'রে? পরে যা হয় তা হোক সামনেই এক চৌবাচ্চা ভর্তি জল, মগ। বন্ধ ঘর এমন সুযোগ হারাতে আছে? কাল কি হবে তা যখন জানা নেই তখন আজ তো মন ভরে যাক! অভ্যাস বশে কাপড় চোপড় পড়েই গায়ে মাথায় জল ঢালতে লাগল সরমা, সমানে ঢালতে লাগল। আঃ কি মধুর শীতলতা! শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। শাড়ী নিংড়ে মাথা গা মুছে নিয়ে পেটিকোট ও সেমিজটা নিংড়ে শাড়ীটা শরীরে ভাল ক'রে জড়িয়ে নিল। পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে দেখল শরীর যেন সমস্ত আবরণ ভেদ ক'রে প্রকট হতে চাইছে। দুঃখের শরীরে যে এত উচ্ছ্বলতা থাকে আজই যেন প্রথম উপলব্ধি ক'রল সরমা একা নিজেকে পেয়ে। এভাবে সে দিলুর সামনে যাবে কি ক'রে? হোক না দিলু শৈশবের খেলার সাথী, বয়সে ছোট তা বলে শৈশব কি আর আছে? এই উচ্ছৃঙ্খল শরীর ঠিকমত ঢাকা না দিয়ে কি ওর সামনে যাওয়া যায়? আজ শরীরটাকে নিজের মনের মত ক'রে দেখবার পর আর তো কোনমতেই সম্ভব নয়।

হঠাৎ দিলুর স্বর শোনা গেল। নেপথ্যে দাঁড়িয়ে সে বলল, আমার কাছে একখান শুকনো ধুতি আছে, রায়খে গেলাম ঐডেই পরে তোমার কাপড় ছাদে শুকোতি দাও।

আঃ বাঁচা গেল। শুকনো কাপড় গায়ে লেপটে থাকে না, আলগা থাকে বলে ঢাকা পড়ে।

সরমা ওপরে যেতেই দিলু নিচে চলে গেল স্নান ক'রতে। হোক না বিকেল, সারাদিন অনেক কালিঝুলি ধুলো ময়লা লেগেছে শরীরে, না ধুলে ভাল লাগছে না। সরমা দেখতে পেল একটা শালপাতার ঠোঙায় খাবার। কে কখন দিল? দিলু তো খায় নি বলেই মনে হচ্ছে। হাতই দেয় নি।

সরমা ছাদে কাপড় মেলে দিয়ে নেমেই দেখল দিলু এসেছে। কে যেন নিচে সদরে কড়া নাড়ল। দোতলা থেকে সদরে লোক দেখা যায় না। কড়া নাড়ার শব্দে বেশ উত্তেজনা বোঝা যাচ্ছে বলে দিলু নিচে নেমে জিজ্ঞাসা ক'রল, কি ডা ?

নরেশ চৌধুরী কড়া নেড়ে নেড়ে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। নিজের বাড়ীতে সে চিরদিন এসে তালা খুলে ঢুকে পড়ে আজই প্রথম এই অভিজ্ঞতা। তার ওপর ভেতর থেকে আশ্রিত লোক জানতে চাইছে সে কে এর চেয়ে রাগের বিষয় আর কি হতে পারে ? মনের রাগ অস্ফুট স্বরে প্রকাশ ক'রল, আহাম্মক।

আহাম্মক কথাটা সে স্বগতোক্তির মত অস্ফুট স্বরে এমন ভাবে উচ্চারণ ক'রল যে দিলুর কান পর্যন্ত তা পৌঁছোতে পারে না। ফলে দিলু তার দাদার পরামর্শ মত যে কেউ ডাকুক দরজা খুলবে না বলে নিশ্চিন্ত রইল। নরেশ চৌধুরী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে এমনই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হ'ল যে খুব জোরে কড়া নেড়ে উঠল। ওপরে নেপথ্যে থেকে আবার সেই স্বর, কিডা ? কিডা ডাকে ?

নরেশ স্বভাবে ভদ্র, স্মিতভাষী মানুষ। চূড়ান্ত রকম বিরক্ত হলেও সে তারই বাড়ীতে বসে তাকে পরিচয় জানতে চাওয়া নির্বোধকে কিছু বলতে পারল না। সক্ষোভে সে স্থান ত্যাগ ক'রল হরেন দাসের উদ্দেশ্যে, স্থির ক'রল কিসব বাজে লোক এনে তার বাড়ীতে ভর্তি যে ক'রেছে তাকেই একবার দেখে নেবে।

হরেন সব শুনে হেসেই অস্থির, তোর বাড়ীতে তোকেই ঢুকতে দিচ্ছে না !

নরেশ তখন সক্ষোভে ফাটছে, হরেনের হাসি তাতে আহুতির কাজ ক'রল, হাসতে তোর লজ্জা ক'রছে না ? অফিস থেকে এসে বাড়ীতে ঢুকব তা কে এক উল্লুক জিজ্ঞাসা করে, কেডা ?

হরেন তাকে শান্ত করবার বাসনায় বলল, খামোখা তুই চটছিস। ও তোকে চিনবে কি ক'রে বল ? তোর যে বাড়ী ও কেমন ক'রে জানবে ? ওদের বলা আছে যেন কেউ ডাকলে ওরা দরজা না খোলে। তাই খোলেনি ! সেফটি চাই তো !

থাক তোর সেফটি। আমার বাড়ী থেকে এসব জংলী হটা।

সে তো হটানো হবেই। তুই তো তিনচার দিন থাকতে দিতে রাজি হয়েছিস।

এই ঘটনার পর আর তিন চার মিনিটও নয়, নরেশ গর্জন ক'রল। রাগের বেগ সামলাতে না পেরে বলে উঠল, যত গোঁয়ো বাঙাল এনে জুটিয়েছিস।

হরেন হেসে হালকা ভাবে বলল, নাঃ তুই দেখছি খুবই ক্ষেপেছিস। এমন তো কোনদিন হয় না। কি হ'ল তোর ?

কি আবার হবে ? তুই ঐ সুনীলটার কথায় আমার বাড়ীতে কোথাকার মেয়ে এনে ঢোকালি ! আমার বাড়ীতে কখনও কোন মেয়েমানুষ দেখেছিস ?

মেয়েদের ব্যাপারে নরেশের যে প্রবল অপছন্দ এবং অনীহা একথা হরেন জানে তা বলে সে যে একবারে ছুৎমার্গতার মত তা জানত না। তাই সমস্ত বিষয়টাকে হালকা করবার জন্যে বলল; ঠিক আছে চল আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি। আর হারাণকে

বলব কালই ওকে অন্য কোথাও রাখবার ব্যবস্থা ক'রবে। আসলে মেয়েটি বড় অসহায় বলেই হারাণের মাথা ব্যথা নইলে এই ঝামেলা সেও চায় না।

কে কি চায় না চায় আমার দেখবার দরকার নেই, আমি চাই না এটাই শেষকথা।

ঠিক আছে চল। যা বলছিস তাই হবে। সন্ধেবেলা তো হারাণ যাবে তখনই মীমাংসা করা যাবে।

হরেন পৌঁছে দিলুর নাম ধরে ডাকতে দরজা খুলে গেল তাকে দেখেই দিলু বলল, কিছুক্ষণ আগে কে যেন খুব কড়া নাড়া দেল। আমি খুলিনি।

নরেশ আপন মনেই উচ্চারণ ক'রল, স্টুপিড। তারপর রাগে গরগর ক'রতে ক'রতে ওপরে উঠে গেল। উঠে ধুতি জড়ানো যুবতীকে দেখা মাত্রই তার বিরক্তি চরম সীমায় পৌঁছাল। এ কী! অসহায় মানে এমন অবস্থা কে জানত? পরবার একটি শাড়ী পর্যন্ত নেই! নীচে নেমেই হরেনকে বলল, মেয়েটার কাপড় পর্যন্ত নেই তোমরা জান না? এখনই যাও নতুন বাজারে গিয়ে ওর জন্যে শাড়ী ব্লাউজ যা লাগে কিনে এনে এখান থেকে বিদায় কর। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের ক'রে টাকা দিয়ে বলল, এখনই যাও।

হরেন হুঁশিয়ার লোক। নরেশ চৌধুরীকে সে ভালোই চেনে। মুখে যতই যা বলুক কাউকে ঘাড় ধরে বের ক'রে দেবার মানুষ সে নয়। শুধু তাই নয় নরেশ আরও অনেক মানুষের তুলনায় উদার ও দয়ালু। তারই মাধ্যমে হারাণ সরকারের সঙ্গে আলাপ নরেশের অথচ হারাণ দুর্বল বলে যে কোন প্রয়োজনে নরেশ সাহায্য সহযোগিতা ক'রে থাকে। নরেশের ভদ্রতার সুযোগ সবাই কমবেশি নিয়ে থাকে। তাই সে বলল, তোর কি দরকার অনর্থক টাকা খরচ করবার?

নরেশ এমনিতে কর্কশভাষী। সে রুক্ষভাবে বলল, আমার বাড়ীতে আছে, আমার তো একটা মান সম্মান আছে!

হরেন খুশিই হ'ল। অকৃতদার আত্মীয় স্বজনহীন নরেশ ইচ্ছা ক'রলে এমন দু চার টাকা খরচ ক'রতেই পারে, তা যদি করে তাহলে কার কি ক্ষতি; বরং এই মেয়েটার উপকার হোক।

দিলু সরমা নরেশের উত্তেজিত স্বর শুনে যেন চুপসে গেল। ফাঁকা বাড়ীর বন্ধ দরজা খুলে যখন তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল ভাবেই নি যে এমন প্রকার বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে যাবে। একা বাড়ীতে অনভ্যাসের আতঙ্ক এক রকম আর এ ভয় অন্য। পাশের ঘরেই চেঁচামেচি, রীতিমত জোরে ধমক দিচ্ছে একজন অজানা মানুষ—। সরমা মনে মনে কুঁকড়ে যচ্ছে; দিলু বোঝবার চেষ্টা ক'রছে ব্যাপারটা কি? দুজনের কেউ একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে না।

অল্পক্ষণ বাদেই হারাণ এসে পড়ায় দুজনে যেন বাঁচল। পাশের ঘরে হারাণের গলার স্বর শোনা যেতে দিলু সাহস ক'রে বেরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল তার দাদা একজন সুন্দর মত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। ভদ্রলোক আলমারী খুলে কি

যেন ক'রছে। এক লহমায় দেখেই ফিরে এসে দিলু বলল, সরমা ঐ লোকটারই বাসা এইডে।—তার বোধের কথা জানাল, আমাগে বোধহয় থাকতি দেবে না নে।

ক্যামনে জানলে ?

লোকটার মুখ দেখে মনে হচ্চে।

তা' লি কি করবো ?

দে হি। দাদা তো আইছে !

যেই আসুক সরমার ভয় যেন কাটছে না। কি যে হবে! দিলুর আশাতে জল ঢেলে নিভিয়ে দেবার মত কোন কথা বলবে না বলেই সে চুপ ক'রে রইল।

হারাণ এ ঘরে এল না দিলুকেই ডাকল। জানিয়ে দিল মেয়েটা এখানেই যেমন আছে থাক, দিলুকে হারাণ নিজেদের কাঠগোলায় নিয়ে যাবে। ক'দিনের মধ্যে কোন একটা বাড়ীতে সরমার থাকবার ব্যবস্থা সুনীলই ক'রে দেবে বলেছে। দিলুর কোন চিন্তা ক'রতে হবে না।

কথাগুলো শুনে দিলু আশ্বস্ত হলেও সরমা যখন শুনল আঁতকে উঠল। দিলু এখন অন্ধের যষ্টি ; সেটি হারিয়ে গেলে চলবে কি করে ? ভীত স্বরে বলল, তুমি থাকবা না তো আমি একা কেমন ক'রে থাকবো ?

কেন, কিসির ভয় ? ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ ক'য়রে থাকবে !

আমার কেমন ভয় ক'রতিছে।

ভয়ের কিছু থাকলি তোমারে সাইজে দা এহেনে রাকতো ?

দিলু যতই অভয় দিক ভয় মানুষের নিজস্ব ব্যাপার। কেউ ভয় পেলে কারও কিছু করবার থাকে না। একটা ভয়ের কারণ দূর ক'রে সে ভয় কাটানো গেলেও যে ভয় পায় সে আর একটা কারণে ভয় পেতে পারে। আবার যদি কারও জীবনে ভয় পাবার কারণ ঘটে তো সে কারণ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত ভয় দূর হয় না কিছুতেই। সন্ধেবেলা পাশের ঘরের জমায়েত আর কাজ কর্ম দেখে ভয়টা সরমার বেড়েই গেল। দিলু থাকায় হারাণ সেদিন আসরে থাকবে না বলে দিলুকে নিয়ে চলে যেতেই একা সরমা বেশি শংকিত হয়ে পড়ল। তার ওপর ধীরে ধীরে যখন পাশের ঘরে মদ্যপান আর তাসখেলা শুরু হ'ল এ ঘরে বসে তার শব্দে অসম্পূর্ণ বোধ সত্ত্বেও আতঙ্ক তার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলল। দিলুর নির্দেশমত দরজায় খিল এ'টে বসে থাকলেও আতঙ্ক তো বুকের মধ্যে, কোন দরজা বন্ধ ক'রে তাকে বাইরে রাখবে সরমা ?

অদ্ভুৎ সময় এক জীবনের বিচিত্র সংযোগ। রাত হলেও পাশের ঘরের হৈ চৈ থামল না। কোথা থেকে সব মানুষ এল, কোথা থেকে কে যেন তাদের কি সব এনে দিল সরমা কিছু বুঝছে না, তার প্রতি মুহূর্তে জুড়ে আশংকা প্রকাণ্ড হচ্ছে। এমনটা সে স্বপ্নেও কোনদিন দেখেনি। এমন যে ঘটে তাও তার জ্ঞানের বাইরেই থেকে যেত ঘটনাচক্রে এখানে এসে না পড়লে। গ্রামের পুকুরে শামুক দেখত সরমা,

ছেলেবেলায় খেলার ছলে কতদিন তুলেও নিয়েছে হাতে। তোলামাত্রই প্রাণীগুলো কেমন গুটিয়ে যায়, নিজের খোলের মধ্যেই লুকিয়ে পড়ে, তাকে আর দেখা যায় না। এখন তার মনে হচ্ছে সে যদি এখন অমনি ভাবে লুকিয়ে যেতে পারত—

হঠাৎ তার বন্ধ দরজায় ছোট ছোট করাঘাত পড়ল। অমনই তার আতঙ্ক যেন লাফিয়ে দশগুণ হয়ে গেল। অতঃপর একটি কোমল কণ্ঠস্বর জানাল, এই যে আপনার ভাত এনেছি। দরজা খুলুন।

সরমা কোন সাড়া দিল না। এখানে কাউকে সে চেনে না। একমাত্র দিলু সেও তো কোথায় চলে গেল তার দাদার সঙ্গে, বলেই গেল, কিন্তু বলে গেলেই কি সব হ'ল? তাকে তো এই বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে গেল! সবাই পুরুষ মানুষ তাছাড়া কেমন হৈ হল্লা ক'রছে—কি যে ওখানে হচ্ছে! নাঃ দরজা সে কিছুতেই খুলবে না। বলছে ভাত এনেছে, বলুক। দিলু এলে তবে খাবে না এলে খাবে না।

রাত্রে কখন যে হৈ চৈ থেমে সব শান্ত হ'ল, কখন যে চারপাশের বাড়ীগুলোর আলো নিভে গেল, কখন যে জমজমাট শহর ঘুমিয়ে পড়ল সরমা কিছুই জানল না। সে দুর্ভাবনার ভারে ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন মনে কখন ঘুমোল জানতেই পারল না। চারপাশের শব্দ আর চিরদিনের অভ্যাসে যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন প্রত্যূষ। রাস্তায় গাড়ী চলার শব্দ, কোথাও থেকে জলের শব্দ আর কিছু পাখির চেঁচামেচি ছাড়া আশেপাশের বাড়ীগুলো সব নিঝুম। ঘুমন্ত। অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে কোনক্রমে চোখ বাড়িয়ে দেখল পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। ধীর পায়ে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। ইচ্ছে হ'ল সদর খুলে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। পরক্ষণেই মনে হ'ল কোথায় বা যাবে? কালকের দিনের অবশিষ্ট সময়টুকুতে ছোট্ট বাড়ীর ভেতরটা যা চিনেছে এর বাইরে পা দেওয়া মানেই তো সেই অন্ধকার। সবই তার অজানা। তাছাড়া তার সঙ্গে তো কেউ কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। বরং ভদ্রলোক নতুন শাড়ী কাপড় আনিয়ে দিয়েছে, জামাও তার সঙ্গে। সকলে নিজেদের মত থেকেছে ওর সঙ্গে শব্দ করে নি কেউ। চলে যাবার কথা কেন ভাবছে সে?

কোনদিন যা হয় না তাই ঘটতে দেখে হরেন যেন আকাশ থেকে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিতও—তাহ'লে নিশ্চয় গুরুতর কোন অঘটন ঘটেছে। কিন্তু ঘটল কখন? কি ঘটল যে সাত সকালে নরেশ একবারে দোকানে এসে হাজির! খলের মধ্যে নুড়ি দিয়ে জরুরী একটা ওষুধ মাড়ছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। নরেশের মুখে চরম বিরক্তির প্রকাশ পড়ল হরেন, এত সকালে কি মনে করে? অফিস যাবি না?

নরেশ রাগে কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে নরেশ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চূড়ান্ত প্রশ্ন যেন ছুঁড়ে মারল, এসব ঝামেলা আমার ওখান থেকে কখন হটাচ্ছিস বল?

কেন, কি হ'ল? হরেন যেন কিছুই জানে না এমন ভাবে প্রতিপ্রশ্ন ক'রল।

কাল রাতে মেয়েটা কিছু খায় নি তা জানিস?

কি ক'রে জানব ? আমরা তো যখন উঠলাম প্রায় দশটা।

হোটেলের ছোঁড়াটা ভাত নিয়ে গিয়েছিল সে দরজা খোলে নি। আমি কোন ঝামেলায় পড়তে চাই না। কে কোত্থেকে কাকে জুটিয়ে এনে আমার ঘাড়ে তুলে দিল আর আমি মরি—।

মরবি কেন ?

কেন তা জানি না, আমি চাই না যে বিকালে অফিস থেকে ফিরে মেয়েটাকে দেখতে হয়। দুপুরের মধ্যেই হটাবি, বলে গেলাম।

হরেন বিত্তের দুর্বলতার জন্যে অপেক্ষাকৃত সবল নরেশকে বন্ধু হলেও সমীহ করে। সে সমীহ অর্থকে। তাই সে ওর মুখের ওপর কিছু বলতে না পেরে চুপ করে থাকে। অতঃপর খেয়াল হয় মেয়েটিকে আনা এবং আশ্রয় দেওয়া কোনটাতেই তার নিজস্ব কোন অভিপ্রায় নেই, তার সীমাবদ্ধতা কেবল বান্ধবজন হারাণের অসহায়তা দূরীকরণে। এখনও তার ভূমিকা নগন্য, তার ইচ্ছায় অচেনা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণরূপে অদেখা এই মেয়েটি কোথাও যাবেও না। তার ক্ষমতাও নেই কোথাও একে আশ্রয় দেয়। নরেশের বাড়ীর আশ্রয় নির্বাচনও সে নিজে করেনি, করেছে সুনীল বোস। সে কেবল নরেশের সঙ্গে সংযোগ ক'রেছে মাত্র। কথাগুলো সংক্ষেপে নরেশকে জানিয়ে বলল, তুই যদি একবার সুনীলকে বলিস তো সবই মিটে যায়।

নরেশ সাফ জবাব দিল, তুই বলবি। তোকে বলে এনেছে, তুই সরাবি।

কাল বিলম্ব না ক'রে নরেশ প্রস্থান ক'রল। জোড়াবাগান থানার পাশেই কাশী দত্তের গলিতে সুনীলরা ভাড়া বাড়ীতে থাকে। হরেন ভাবল হাতের কাজ শেষ করে সেখানেই যায়। আটটার পর স্নানটান ক'রেই কাঠগোলাতে এসে পড়বে বলে ইচ্ছা বদলালো। আগে হারাণকেই বলবে, তাকে দিয়েই সুনীলকে বলাবে। নরেশের বাড়ীতে সন্ধেটা তাসটাস খেলে কেটে যায় এই ঝামেলাতে সেটাই না বন্ধ হয়ে যায়।

সুনীল নিজেই ফোন ক'রল নরেশের অফিসে। হারাণ নরেশের কথা শুনে পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে দিলুকে গিয়ে রেখে এসেছে, মেয়েটা তাকে বলেছে রাত্রে তার ভয় ক'রছিল। এখন এর বিহিত একমাত্র সুনীলই ক'রতে পারে, যেখানে হোক একটা কাজে লাগিয়ে দিক মেয়েটাকে। এখানে ওদের অনেকদিনের বাস, পারিবারিক সূত্রে জানা শোনাও অনেক। সব কথা শুনে সুনীলের কোনই ভাবান্তর হ'ল না, বলল, তোরা থাম। যা করবার আমিই ক'রছি। তাই এই টেলিফোন।

নরেশের সাড়া পেয়ে সুনীল বলল, আরে সকাল বেলা তুমি আমাগে পাড়ায় আলে আর আমাগে বাড়ীতে গেলে না এ ক্যামন হলো ?

সুনীলের কথার জবাবে নরেশ বলল, এটা একটা কথা হ'ল। অফিসে

আসার তাড়াতে সকালে কোথাও যেতে পারি? কাল সারারাত ঘরের অতিথি না খেয়ে ছিল, সকালে হারাণকে বলতে গেলাম।

সে আমি দেখতিছি। সুনীল জানাল, অতঃপর বলল, আজ হরেনরে মাংস নিতি কলাম। সইন্দে বেলায় তোমার ওহেনে মাংস ভাত হবে নে। দু সেরি হবে তো, না আরও বেশি কিনতি বলবো?

নরেশ জানে সব আয়োজন সুনীলই ক'রবে, তার কেবলই সম্মতি, তাই বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ যথেষ্ট হবে। বেশিই হয়ে যাবে।

সুনীল তার স্বভাব মতই বলল, আমি তাহ'লি দুপোরেই সব ব্যবস্থা ক'ইরে রাখতিছি।—বলেই টেলিফোন নামিয়ে রাখল। হরেনের দিকে চেয়ে হেসে আত্মপ্রসাদের সুরে বলল, তুই যে কেন মিথ্যে লাফাস আমি বুজিনে।

হারাণ বন্ধুত্বের মধ্যেও সমীহ করে, বলল, তুমি জে পারবা তাতে কি কারো সন্দ থাকতি পারে! তুমি না হলি ঝামেলাডা মিটোবে কেডা? তাই তোমারে কলাম।

আজ মিত্তির মশায় রে বোয়লে দুঘণ্টা ছুটি নিতি পারবি? হরেনডারে দে তো কিছু হবে না নে। ওরে আনতি দেব খাসির মাংস ও রামছাগলের মাংস আনে থোবে নে।

আজ তো নৌকো লাগবে না নে, কোন অসুবিধে হবে না।

বেশ তবে তিনডে বাজলি আসবি। তোরে টাকা দিয়ে দেব দুসের মাংস, আমাদের সাতজনের খাবার মত চাল আর যা লাগে নিয়ে তুই মাংসটা চড়ায়ে দিবি।

আমি রানদে ফ্যালাবো।

ছাওয়ালডারে কোয়ানে রাখিছিস?

ঐ বাড়ীতি।

তিনটের একটু পরেই হারাণ এলে সুনীল তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে বলল, তুই ও বাড়ী গিয়ে ছাওয়ালভারে নিয়ে বাজার যা। আমি কিছুডা পর গিয়ে সব দেখবা নে।

হারাণ রওনা হবার আধঘণ্টার মধ্যেই সুনীল নরেশের বাড়ী গিয়ে হাজির। সরমা তাকে গতকালই পরিত্রাতা হিসেবে চিনেছিল, দিলুই বলেছিল, ওনাগে বাড়িতি তোমারে রাখবে। তাই জানা মানুষ বলে সহজই দরজা খুলে দিল সরমা। সুনীল ওকে দেখেই খুব শান্ত স্বরে জানতে চাইল, কাল রাতে ভাত খালে না কেন?

সরমা নিরুত্তর। অধোবদন রইল। তা সত্ত্বেও তার মুখখানা ভাল ক'রে দেখে নিল সুনীল। খুবই কমনীয়, সজীব। সুন্দরী না হলেও সরমা সুদর্শনা। ভরা যৌবনে যেন উচ্ছ্বসিত। ভরা নদী যেমন আকাশ চৌয়ানো জলে টলমল, তেমনই ঢলঢলে। সামান্য অনুজ্জ্বল পোষাকে এবং কৃচ্ছতায় ম্লান বটে সে কেবলই বর্হিভাগে—। সুনীল তার সাধ্যমত মমতা মেশানো স্বরে জানতে চাইল, তোমার কি আর কাপড় নেই?

উত্তর ক'রল না সরমা। সুনীল নিজের সিদ্ধান্ত প্রকাশ ক'রল, ঠিক আছে কালই তোমারে আমি শাড়ী কিনে দেবানে।

খুব আস্তে নিচু স্বরে সরমা বলল, শাড়ী আছে। কাল কিনে দেছে।

তাহলি পর না কেন?

শাড়ী তো আমি পরিনে।

কেন পর না? এই বয়সি শাড়ী না পরলি মানায়? জে বয়িসি জা।

সরমা প্রত্যুত্তর ক'রল না। মানুষকে চালায় তার বিশ্বাস, বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে সংস্কার। নইলে কিসের কি? সংস্কার বশেই সরমা জেনেছে বিধবা নারীকে শাড়ী পরতে নেই ইত্যাদি।

সুনীল সুযোগ বুঝে বলল, তালি কি করবা? একজন মানুষ তোমারে দেল তুমি তারে নেবা না? তাছাড়া দেশের চালচলন এহেনে চলবে না নে। কলকাতা শহরের মানুষগুলোনরে দেকতিছো না কেমন?

সরমার মনে হ'ল সে যতটুকু দেখেছে সত্যিই এখানকার মানুষের সঙ্গে তাদের দেশের গ্রামের মানুষের মেলে না, কেমন যেন অন্যরকম। সেই মানুষই একদম আলাদা। যেমন অন্যরকম মনে হচ্ছে এই মানুষটিকে, মুখের ভাষা না শুনলে বোঝবারই উপায় ছিল না যে তাদের দেশের মানুষ। কেবল কথা শুনে আপন বলে মনে হয়। তা যত আপনই হোক ওর কথামত শাড়ী কি আর পরা যায়? লোকে কি বলবে?

দিলুর কাছেও সুনীল সেই একই প্রস্তাব ক'রল, ওরে শাড়ী পরতি বলো। এহেনে শাড়ী না পরলি কাজ চলবে না নে।

কাল বাড়ীওয়ালাবাবু শাড়ীখান আ'নে দিলি উনি ক'লো লোকে কি কবে?

কথাশুনে হেসে উঠল সুনীল, কোন লোক? কলকাতার লোক না পরলিই কবে। বোঝলে ভাইডি যেহেনে য্যামোন সেহেনে ত্যামোন।

কথাগুলো দিলুকে বললেও আসলে সবই সরমাকে শুনিয়ে বলা। সরমারও মনে লাগল কথাটা। সত্যিই তো কোন লোক? দেশের সেই স্বজনেরা তো এখানে কেউ নেই। সত্যিই এখানে সবই অন্যরকম। এখানকার মানুষেরা যা পছন্দ করে এখানে থাকতে হ'লে তো সেইভাবেই থাকতে হবে। কাল শাড়ী ব্লাউজ এনে দিতে তো সেটাই বোঝা যাচ্ছে। যাদের ওপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকতে হবে তারা যা চাইবে সেটা করাই বোধহয় ঠিক কাজ। আপনজনেদের কাছে পাওয়া নির্মম রুক্ষতা এখানকার সহানুভূতিতে যেন ইতিমধ্যেই মুছে যেতে বসেছে। ওখান থেকে বস্ত্র আনে নি, কি বা আনতে পারত? স্বামী মরবার সঙ্গে সঙ্গেই ছলে ও কৌশলে তার শাড়ীগুলো একে একে নিয়ে নিল ননদরা। ছজন ননদের সংসারে জমির অন্নে টানাটানি না থাকলেও বস্ত্রে সঙ্কুলান যথার্থভাবে হয় না, তাই শাড়ী ধরে টানাটানি হতেই থাকে। সরমার জুটল একখানা থান, বাপের

বাড়ী থেকেও একজোড়া থানই জুটল সঙ্গে একটা সাদা সেমিজ। তার অঙ্গের সম্বল বলতে তো কেবল এইমাত্র। তার মধ্যে একটি থান ধুতি আর সেমিজ তো সে পরেই এসেছে, কাপড় আছে তা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর, সে তুলনায় বরং কাল সন্ধেবেলা যে পোষাক জুটেছে তা অনেক মর্যাদাকর।

আগের দিন মাংস রান্নায় সরমার সাহায্য এক রকম জোর ক'রেই আদায় ক'রল সবাই, গায়ের জোরে নয় প্রীতিসম্পন্ন ব্যবহারের জোরে। সম্পর্কটা সুনীলই সহজ করিয়ে নিল। তবে মাংস খাওয়াতে পারল না তাকে কিছুতেই। তেমন জোর অবশ্য কেউ ক'রল না। কারণ সহযোগে মাংস পরিমাণে সবাই এতই খেল যে আরও কেউ ত্যাগ ক'রলে বরং একটু ভালই হ'ত। তবে এই পান ভোজনের আসরে সাহায্য করল বলে সরমার সম্পর্ক কিছুটা সহজ হ'ল।

এই সেই সহজ হবার সুবাদে পরদিন দুপুরে আবার এল সুনীল। একটা সুদৃশ্য বাকস সামনে ধরে বলল, দ্যাহ, তোমার জন্যি একখান শাড়ী আনলাম। এক কাপড়ে কি থাহা জায় ?

সঙ্কুচিত ব্রীড়ানম্র সরমা হাত বাড়িয়ে যে বাক্সটা ধরবে তাও পারছিল না।

সুনীল বলল, নাও ধর।

তার স্বরে কিছুটা যেন নির্দেশ, অনেকটা আদেশের মত; সরমা সম্মোহিতের মত হাত বাড়িয়ে নিল। সুনীল তার পান খাওয়া দোক্তা দিয়ে মাজা দাঁত বের ক'রে হেসে বলল, এইডে ঠিক কাজ হলো। শাড়ীখান পরে দেকবা ক্যাম দ্যোহায়।—শাড়ীর বাক্স দেবার ফাঁকে বাঁ হাত দিয়ে সরমার হাত ধরে ফেলে বলল, দ্যাহো তো ক্যামন সুন্দর হাত দুখোন ফাঁকা ক'রে থুইছো। চুড়ি ডুড়ি না পরলি কি মানায় ?

সুনীল-এর স্পর্শে যেন চমকে উঠল সরমা। ঝাড়া দিয়ে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। সুনীল নির্লজ্জ স্বাভাবিকতায় বলল, আহা এ তো মুখে ক'লি হতো। আমি কি আর তোমারে ধরে রাকতিছি ? অমন সুন্দর হাত দুখোন দেখে খারাপ লাগল, তাই বললাম। তোমাগে মায়ে মানুষ গে বাপু এই এক দোষ, ভালর জন্যি কিছু বললিও সহ্য করো না।

সিঁড়ি বেয়ে তরতর ক'রে ওপরে উঠে গেল সরমা। সুনীল নিচে থেকেই বলল, আমি উঠলি আবার রাগ করবেন্নানে। তার থে জাই, তুমি দরজাডা বন্দো কোরে দে যাও। এ্যাহন আমার পরে রাগ করতিছো দরোজা খোলা পালি অন্য কেউ আসে কাম সারে দে যাবে নে।

কথাগুলো শেষ সিঁড়ি পর্যন্ত পেঁছোতে পেঁছোতে কানে ঢুকে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে নিচে নেমে এল সরমা ততক্ষণে সুনীল দরজার ওপারে চলে গেছে।

চারদিনের দিন হারাণ বলল, তুই না বলে আইছিস এবার বাড়ী চলে যা। মামা মামী ভাববে নে। মায়েডার ব্যবস্থা যা হোক একটা তো হবে। ধর হয়েই গেল।

দিলুরও বাড়ীর জন্যে চিন্তা হচ্ছে, প্রস্তাবটা সে দিক থেকে ভালই। তবে সরমা এখানে থাকতেই চাইছে না, একদিন তো খুব বলল, এগে মদ্দি কি আমি একা মায়ে মানুষ থাকতি পারি?

কেন? নরেশবাবু মানুষ কি খারাপ?

তা কবো ক্যান। নরেশবাবু খুবই ভাল মানুষ।

তবে তোমার কিসির অসুবিধে হচ্ছে?

সরমা উত্তর দিল না। অসুবিধে তো কিছুই না সে কি বলবে? তবে সুনীলের অমন হাত চেপে ধরাটা তার আদৌ ভাল লাগে নি—সে কথাটা দিলুকে প্রকাশ করবার ইচ্ছাও হ'ল না তাই চুপ ক'রে রইল। তবে সত্যি বলতে কি একদিনের একটা সামান্য ঘটনার তুলনায় সুবিধে তো এখানে অনেক বেশি। জীবনে এত সুবিধে থাকে গ্রামে থাকতে তে সেকথা জানাই ছিল না। এমন সুন্দর সব ব্যবস্থা বাড়ীর মধ্যেই পায়খানা, কল খুললেই জল, কোন কষ্ট নেই। শরীরে কত আরাম! অসুবিধে এখানে একটাই যে এই সুখের কোন ভিত্তি নেই। এখানে পাকাপাকি থাকতে পারবে এমনটা মনে হচ্ছে না। এই ক'দিনে যা বুঝেছে তাতে তার কোন কাজ এখানে নেই। বাড়ীর যে মালিক সে কোনই কথা বলে না, তার রাতের খাবার হোটেল থেকে আসে, এখন সরমারও আসে। কোন হোটেল সরমা জানে না, একটা অল্পবয়সী ছেলে এসে দিয়ে যায়। তাকে যদি রান্না করবার কাজটাও দিত তবু স্থিরতা ছিল থাকবার। হোটেলের মাছের ঝোল ভাত যা আসে তার চেয়ে খারাপ সে রাঁধত না। বাড়ীতে কোন ব্যবস্থা যে নেই তা নয়, ক'দিন আগে সন্ধেবেলায় তো দিব্যি মাংস ভাত রান্না হ'ল। সবাই খেল। সে মাংস খেল না বলে সকলের অলক্ষ্যে পাতি লেবুর রস আর নুন দিয়ে ভাত খেয়ে রাত কাটিয়েছে। তা হোক তবু গ্রামের বাড়ীর নিত্য গঞ্জনার ভাত তো নয়। নুন ভাতেও শান্তি আছে।

দিলু তাড়া দিল, তোমার অসুবিধেডা কি কচ্ছো না তো! বাড়ী ফিরে যাবে?

ভীত চকিত সরমা বলল, না।

তা'লি কি করবে? আমারে তো এ্যাহোন বাড়ী ফিরতি হবে।

আমি ক'নে থাকবো?

তোমার ব্যবস্থা তো এনারাই করবেন।

এবার আবার ভয় ক'রতে লাগল সরমার। দিলুই এখন তার একমাত্র ভরসা। সে-ই সম্বল। অন্ধ যেমন তার যষ্ঠিকে ছাড়তে পারে না সরমাও দিলুকে পারছে না। দিলু সঙ্গে না থাকলে তার স্বস্তি নেই। কথাটা দিলুকে বলাতে সে বিপাকে পড়ল। সরমাকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছা তারও ক'রছে না। কিন্তু কি উপায়? কলকাতায় কোন একটা কাজ জুটে গেলে সরমাকে সঙ্গে ক'রে থাকবার বাসনা তার মনে যে উঁকি দেয় না এমন নয়। তা কাজই হোক বা আশ্রয়ই হোক জোগানোর মালিক তো এক ঐ সেজদা, তাকে কি আর মনের কথা বলা যাবে? অসম্ভব।

সেজদা যা হোক কোন একটা ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। এ কদিন রেখেছে। সেই লোকই দুদিন ধরে বাড়ী ফিরে যেতে বলছে এখন না ফিরে আর কি উপায় ?

তাই সরমার ভয় পাবার কথা হারাণকেই জানাল। হারাণ পরদিন প্রত্যুষে এসে সরমাকে বুঝিয়ে বলল সব অবস্থা। আশ্বাস দিল কাজ শীঘ্রি হয়ে যাবে। কাজ যেখানে হবে তার একারই হবে, দিলুর তো নয়। দিলু বাড়ী না ফিরলে তার অসুবিধে হবে একথাও বলল। সুনীল কাজ ক'রে দিতে না পারুক অন্যেরা ক'রে দেবে একথাও জানিয়ে সরমাকে নিঃশঙ্ক করবার চেষ্টা ক'রল।

ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে নরেশ ডাকল, হারাণ মনে হচ্ছে !

এত সকালে নরেশের ঘুম কোনদিনই ভাঙ্গে না। বেলা আটটার আগে তার সকাল হয় না তাই বিস্মিত হারাণ তার কাছে গিয়ে হাজির হতেই শুনল, তোমরা আমাকে কবে মুক্তি দিচ্ছ ?

সুনীল সিদিন কি কলো ?

আমি ওসব সুনীল ফুনীল জানি না। তোমাদের জানি। ওসব বাজে লোকের কথায় আমি কখনই রাজি হতাম না, তোমাদের অনুরোধে রাজি হয়েছি।

হারাণের নিজেকে খুব অসহায় মনে হ'ল। তার হয়েছে সবদিকে সংকট। মামাতো ভাইটা হঠাৎ এসে হাজির হ'ল তার একটা আবদার না রাখে কি ক'রে ? মেয়েটাও সত্যি অসহায় তাই আশ্রয়ের ব্যবস্থা সাধ্যের বাইরে হলেও ক'রতে হ'ল। পুরুষ মানুষ হলে তো কোনই কথা ছিল না, মেয়েদের কাজ তো আর কাঠগোলাতে হয় না। তাই এত ঝঞ্ঝাট। মিস্তিরদের এখানে কত ছেলেরই তো আশ্রয় জোটে, দরকার হলে আরও দু একজনের জুটতে পারত মেয়ে লোক বলেই না ঝামেলা ! সপরিবারে বাস করে এমন ধনীলোক তো কলকাতায় অনেকেই আছে কারও সঙ্গে হারাণের তেমন খাতির তো নেই। তাই একমাত্র সুনীলই যা ভরসা। নরেশ চৌধুরী সুনীলকে নস্যাৎ ক'রে দিতে চাইলেও তার তো তা করবার উপায় নেই। সুনীলকে ধরে ক'রে মেয়েটার কিছু একটা গতি ক'রতেই হবে। তাই আপাতত নরেশকে শান্ত করবার জন্যে সে প্রশ্নের মত বলল, আশ্রয় যখন দিয়েছ আর ক'টা দিন দিতে কি খুব অসুবিধে হবে ? ও বেচারী তো এক কোণে পড়ে থাকে বোঝাও যায় না যে একজন মানুষ আছে।

যারা বোঝবার তারা বোঝে। আশেপাশের বাড়ীর লোক কি ভাবছে সেটা দেখতে হবে না ?

এবার হারাণের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। নরেশের ঘরে সন্ধেবেলা বন্ধুবান্ধব আসে, ঘরের মধ্যে বসে সুরাপান, টাকা লেনদেন-এ তাস খেলা হয় সে তো আর বাইরে থেকে কেউ দেখতে আসছে না ! সত্যিই একজন জ্যান্ত মেয়েমানুষ থাকলে কি মনে করবে লোকে ? সমস্যাটা হারাণের মনে ধরল। সে জানাল, ঠিক আছে আজই সুনীলরে দে এর একটা বিহিত করবো।

নরেশ সুনীলের ওপর আস্থা রাখতে পারে না, তবু মেয়েটির অসহায়তার কথা ভেবেই হারাণের কথার উত্তর দিল না। সুনীলের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে ক'রতে তার সম্ভ্রমবোধে বাধে বলেও তার চুপ করে থাকবার বিকল্প থাকে না। নরেশ জানে সুনীল নিজের কথার মূল্য রাখবার কথা কোনদিনই ভাবে না, তাই প্রায় সময়েই দেখা যায় তার কথা ও কাজে কোন সঙ্গতি নেই।

হারাণও এ সম্পর্কে কিছুটা সজাগ তাই সে কিছুটা হতভম্ব হয়েই অমর মিত্রকে ধরে বসে, ভাই-ডি তুমি এট্টা উপকার ক'রতি পারো? এট্টা মায়েরে কোন কাজে ঢুকোয়ে দিতি পারো?

অমর কাঠের বাজারের কুখ্যাত ব্যক্তি হলেও ওদের বয়স্য এবং প্রায় সমবয়স্ক। এর মধ্যে বয়সে নরেশ সামান্য বড় তারও চেয়ে একটু বড় কৃষ্ণপদ। কিন্তু আসরে সে ব্যবধান মুছে যায়, ঘুচে যায়। তবু কৃষ্ণপদকে হারাণ আত্মীয়তার গন্ধ ধরে কেষ্টদা-ই বলে থাকে। মদ্যপান জুয়াখেলা একসঙ্গে চলায় সে সম্পর্ক কোনই বাধা সৃষ্টি করে না। তবু কৃষ্ণপদকে সরমার কথাটা বলল না হারাণ।

দুপুরে কাঠগোলা ঠিক বারটার সময় খাবার জন্যে ছুটি হয়। সবাই গোলা বন্ধ করে যে যার খেতে চলে যায় দুঘণ্টার জন্যে। দুটো বাজলে আবার এক এক করে সব খুলতে থাকে। নরেশের সঙ্গে কথাবার্তা যেদিন হল হারাণ বারটা বাজা মাত্র সুনীলের কাছে হাজির হ'ল, নরেশবাবু আজ পরিষ্কার বলে দেছে সরমারে আর থাকতি দেবে না।

সুনীল সে কথা কানে তুলল বলে মনে হ'ল না, বলল, চল দি ওরে একবার দেহে কথাবার্তা কয়ে আসি।

চল। ওর জান্যি যা হোক এট্টা ব্যবস্থা করো।

করবো। সেই জন্যিই তো জাস্‌সি।

সারাটা দিন একা থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছে সরমার। জেলখানা বলে একটা জায়গার নাম শুনেছে সরমা সেখানকার বন্দীত্ব নিশ্চয় এত খারাপ নয়। কিংবা এই রকমই—কে জানে? হারাণকে দেখে কিছু স্বস্তি পেল সরমা। দিলু যে ক'দিন ছিল তবু সে দুপুরটা এসে থাকত। কথাবার্তা বলবার একজন সঙ্গী ছিল। এ কি বীভৎস একাকীত্ব! সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি নিচে এসে দরজা খুলে দিয়ে বলল, আমারে বরং রান্নার এট্টা ব্যবস্থা ক'রে দেন, তবু সময় কাটে।

সুনীল সদরে খিল এঁটে দিয়ে বলল, কথাডা মন্দ বলো নি।

হারাণ নরেশের মনোভাবের কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

দোতলায় উঠে ঘরের মধ্যে বসে পড়ল সুনীল, জানতে চাইল, খাইছো?

এ্যাহোনই হোটেলের থে আসবে। কিন্তু আমার এভাবে ভাল লাগতিছে না।

রান্নার কাজডা থাকলি তো অন্তত সময় কাটতো।

সুনীল পান চিবোতে চিবোতে বলল, দেহি। তোমার কাজের ব্যবস্থা করতিছি। —কিছু সময় থেমে সামান্য হেসে হালকাভাবে বলল, আমি বলি কি এট্‌টা পাত্তর জুটোয়ে সরমার বিয়ে দেওয়া যাক।

কথাটা তার যাকে শুনিয়ে বলা সেই সরমা শুনল কিন্তু তার ভাল লাগল না। মনে মনে বলল, কি এসব অনাসৃষ্টি কথা! এখানে এলে কি দেশের লোকেদেরও বুদ্ধিভ্রম হয়ে যায়? না কি সায়েব মেমসায়েবদের দেশ বলে সবাই সেই রকমই চলে। মেমসায়েবদের নাকি সধবা বিধবা কিছুরই কোন তফাৎ নেই সবাই বলে, এরাও কি সেই রকমই চলে? তাই বা কি ক'রে হবে জানালা দিয়ে ওপাশের বাড়ীতে যে একজন বুড়ি মানুষকে দেখা যায় থান কাপড় পরে থাকে! ওর সঙ্গে মস্করা ক'রছে মানুষটা, তারও তো একটা ধারা থাকবে!

এবার সুনীল তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা ক'রল, কি, কথা কচ্চো না জে?

কথা হারাণ বলল, তুমি ছাড়ো তো দেহি! এট্‌টা কাজ দেহে দ্যাও।

কাজ তো এহেনেই ছেলো! নরেশবাবু মানুষটা জে পাগলা, না'লি এহেনেই তো রান্না-বান্না কোয়রে সংসার ক'রতি পারতো। কি সরমা, পায়রতে না?

সরমা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

হারাণ সে কথা ঝেড়ে ফেলার মত ক'রে বলল, বাদ দাও তো ও কথা! জা নয় তা বললি লাভ কি হবে? কি হতো সে কথা বাদ দে কি হতি পারে দ্যাহো। নরেশ বাবু আমারে খায়ে ফালাচ্চে।

সুনীলের মনের রসাগারে অকস্মাৎ উচ্ছ্বাস দেখা দেওয়ায় সে বলল, থাক না। কত আর খাবে এটুটু তো থাকপে।

হারাণ অসহায় স্বরে বলল, তুমি বুঝতিছো না—

তার কথা আটকে সুনীল বলে উঠল, খুব বুঝতিছি। মোল্লার দোড় মসজিদ ছায়ড়ে তো জাবে না—!

এবার সরমাও নিজেকে প্রকাশ ক'রল, ধীর স্বরে কাঁপা কণ্ঠস্বরে জানাল, আমারো বড় ভয় করে।

সুনীল হর্ষ প্রকাশ ক'রল, এই তো বোল ফুটিছে। কথাবার্তা না বললি মানুষের সঙ্গে কাজ ক্যামোন ভাবে করবে? একদম চুপ কোয়রে থাকলি চলবে?

একা একা কার সাথে কথা কবো? সরসতার ছোঁয়া লাগিয়ে সরমা বলল।

এডা এট্‌টা কথার মতো কথা বটে—সুনীল নির্দ্বিধায় স্বীকার ক'রল। অতঃপর হারাণকে বলল, সন্ধেবেলা তো আমাগে খেলার সোময়, তহন হবে না; তা'লি দুপোর ব্যালা আমাগে মাজে মাজে আসা উচিৎ, না'লি ও ব্যাচারীই বা বাচবে ক্যামোন কোয়রে?

এবং সেই সাধু প্রস্তাব অনুসারে দিন কতক দশ পনের মিনিটের জন্যে হারাণকে

সঙ্গে ক'রেই সুনীল এল কিন্তু হারাণ-এর মেস-এ খাওয়া অত পরে ফিরে গিয়ে আর সম্ভব হয় না বলে সে একদিন না আসাতে সুনীল একাই আসতে লাগল। নিজেদের গোলা কাজের লোকজন তো আছেই, ভায়েরাও আছে বলে বারটা বাজবার কিছু আগে বেরিয়ে এলেই বা কার কি ? এখানে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে বাড়ী গিয়ে ভাত খেয়ে আবার কাজে যাওয়া—হাতে অনেক সময় থেকে যায়। রোজ আসার ফলে সরমার সঙ্গে সম্পর্কও এমনই স্বাভাবিক হয়ে গেল যে ঐ সময়টাতে আসা যেমন সুনীলের অভ্যাসে পরিণত হ'ল সরমারও ব্যাকুলতা হ'তে লাগল সুনীলের আসবার প্রতীক্ষায়। প্রতিটা সেকেণ্ড মিনিটে আর মিনিট যেন ঘণ্টায় পর্যবসিত হতে লাগল সরমার প্রতিদিন।

এই সময়েই একদিন অনেকটা দেরীতে এসে পৌঁছাল সুনীল, এত দেরী যে সরমা অত্যন্তই উতলা হয়ে পড়েছিল। সারাটি দিন রাত্রির মধ্যে এই তার সামান্য মুক্তি বাকি প্রায় তেইশটা ঘণ্টা তার দুর্বিসহ বন্দিত্ব। নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলা। সুনীলকে দেখা মাত্র কি যে আনন্দ হ'ল যা সে জীবনে কখনও পেয়েছে বলে মনে করতে পারবে না। আসলে আজ ইচ্ছে ক'রেই খাওয়াদাওয়া সেরে এসেছে সুনীল। সংযোগ বশে বাড়ীতে বড় সংসারে খাবার পরিবেশনের দায়িত্ব আজ তার স্ত্রীর ওপর বর্তেছিল বলে সকালেই স্ত্রী পরামর্শ দিয়েছিল আগে ভাগে খেতে যাতে মাছের ভাল অংশ মাংসেরও চমৎকার টুকরো আপন স্বামীর পাতে দিতে পারে। তাদের ধরা বাঁধা সংসারে সকলের মাপা খাবার, তবু স্ত্রীর হাতে ভার পড়ছে বলে সুনীল আবেদন করেছিল, এট্টু বেশি দেবা তো ?

ইসারায় সম্মতি জানিয়েছিল তার সহমর্মিনী। সেই পরিকল্পনা অনুসারে দেরি। এখানে এসে উৎকণ্ঠিত সরমাকে বলল, আজ আসতিই পারতাম না। মাথাডা যা ধরিছে—ফায়টে জাচ্ছে যেন। বলেই গিয়ে সরমার রাতে শোবার মাদুরটা টেনে শুয়ে পড়ল। তাতে সরমার উদ্বেগ আরও বাড়ল সে কাছে এসে বলল, খুব ব্যথা ক'রতিছে ?

কি করবো ? কাতর স্বরে সুনীল বলল, তুমি যদি এট্টু টিপে দিতে—

এই ক'দিনের ঘনিষ্ঠতায় সহানুভূতি সঞ্চার হওয়াও খুবই স্বাভাবিক, আর তারই বশে সমস্ত কুণ্ঠা ত্যাগ ক'রে মাথার কাছে মাটিতে বসে সুনীলের কপালে হাত রাখতেই তার সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। এক লহমার মধ্যেই সেটা সামলে নিয়ে সে হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল কোনক্রমে ঠেকিয়ে ততোধিক স্পর্শ বাঁচানোর চেষ্টা ক'রে কপালে চাপ দিতে লাগল। সুনীল চোখ বন্ধ ক'রেই ছিল অকস্মাৎ বলে উঠল, তোমার গায়ে কি এট্টুও জোর নেই, খাওয়া দাওয়া ঠিকমত না হ'লি জোর থাকবে কনের থে ?—বলেই খপ ক'রে সরমার হাত চেপে ধরে বলল, চাইপে ধর দি।

সংকোচে সরমা কুঁকড়ে যাচ্ছিল বলে হাত গুটিয়ে নিতেই সুনীল লাফ দিয়ে

পড়ে ঝাপটে ধরল গোটা সরমাকেই, বলল, খালি খালি লজ্জা ক্যান করো বুজিনে। কিসির এত লজ্জা ? শরীল ডারে শুকোয়ে রাখলি কি লাভ হবে ?

সরমা অনুভব ক'রল আসুরিক বলে সুনীল আখ মাড়াই কলের মত ক'রে তাকে যেন নিংড়ে নিচ্ছে। দুই বাহুর মধ্যে বুকের সঙ্গে এমন ভাবেই ধরে যে তার মনে হচ্ছে আর একটু বাদেই হাড়গুলো মটমট শব্দ ক'রে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে শরীরে তার অন্য এক অনুভূতি—আরামই লাগছে। এমনটা যে স্বাদ শরীরে থাকে তা তার জানাই ছিল না, ক'বছর স্বামীর সান্নিধ্যেও নয়। দুর্বলতা ছিল স্বামীর শরীরের বৈশিষ্ট্য। তার সাধ ছিল না এমন নয় সাধ্য ছিল না। তারও বাহু বেষ্টন প্রথম দিকে ছিল তাতে বলিষ্ঠতা ছিল না। তার আবেদনে এমন পৌরুষ ছিল না। মনের দিক থেকে আপত্তি প্রবল হয়ে উঠলেও শরীর সে আপত্তিকে দুর্বল ক'রে দিল। তাই সুনীল সেসব সহজেই উপেক্ষা ক'রে তার শারীরিক পটুতা বলে সরমাকে সহজেই নির্বল ক'রে ফেলল। অতঃপর সরমার দীর্ঘদিন উপবাসী শরীরকে এমন ভাবেই ব্যবহার ক'রল যে সরমার নিজস্ব সত্তাই যেন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। মানসিক ভাবে সরমার কোন প্রস্তুতি না থাকলেও তার মনশ্চেতনার অগোচরে শরীর এমন এক সার্থকতা খুঁজছিল যা হয়ত যৌবনের ধর্ম। তাই শরীর সেই সঙ্গমকে ধর্ষণ বা বলাৎকার হিসেবে না ধরে সমর্থন ক'রল এবং সম্ভোগও ক'রল। কিছুক্ষণ বাদে শরীরটা আর সরমার রইল না সুনীলের ইচ্ছার প্রয়োজন মত সেটি পুতুল গড়ার কাদামাটিতে পরিণত হয়ে নতুন মুক্তিতে উদ্ভাসিত হ'ল।

সেই ক্ষণটুকুতে সরমা স্থান, কাল, এমনকি নিজের অবস্থান পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল। স্বপ্নের সময়টুকু অল্পে পার হয়ে গেলেও তার রেশ রইল অনেকটা সময় ঘিরে আর তারপরই বিকটদর্শন পশ্চাত্তাপ তাকে যেন আকাশের মত মুখ-ব্যাদান ক'রে গ্রাস ক'রতে এল। সাময়িক সুখ বিস্তৃত হতে পারে না বলে বিশাল কাল সীমা জুড়ে কেবল প্রতিক্রিয়াই আপনাকে বিস্তার ক'রে রাখতে পারে ; ক্রমাগত বিস্তৃত হতে লাগল। সুখ অপহৃত হয়ে এল অনুশোচনা। সুনীল তার সময়মত চলে গেলে সরমা গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে এল। এর আগে সে সুনীলের কাছ থেকে আড়ালে ছিল। ঘোর ক টবার পর উঠে পালিয়ে লুকিয়েই ছিল। প্রবল লজ্জা তার কেবল মন নয় সর্বাঙ্গ গ্রাস করে পঙ্গু ক'রে দিয়েছিল তাকে। যে একাকীত্ব দুঃসহ হয় সেই নির্জনতাই এখন আশ্রয় দিল তাকে। সুনীলের কৃতকর্ম যেন সরমাকেই অপরাধী ক'রে তুলল। তার মনের মধ্যে টানাপোড়েন চলতে লাগল—কি সে করতে পারত ? কি ভাবে প্রতিরোধ করতে পারত সুনীলের আসুরিক শক্তিকে ? যা ক'রেছে তা ও জোর ক'রেই করেছে। সরমা চেঁচাতে পারত—তাতে কি লাভ হ'ত ? বাড়ীর সদর বন্ধ কোন লোক তাকে সাহায্য ক'রতে ঢুকতেই পারত না উপরন্তু চারপাশের মানুষের সামনে তার কলঙ্ক হ'ত। আর এই আশ্রয়

থেকে তাকে তাড়িয়ে দিত সকলে। তখন কোথায় যেত সে? দাঁড়াতো কোথায়? তার জন্মভূমির গ্রামেই সে একটা আশ্রয় পায় নি আর এই একবারে অচেনা শহরে কে তাকে থাকবার মত নিশ্চিন্ত নির্ভরতা দিতে পারত? কোথায় পেতে পারবে? যেখানে পথঘাট কিছু চেনা নয়, জানাশোনা একজন মানুষ নেই তেমন জায়গায় এই নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে কোথায় যাওয়া যায়?

নানা প্রকার দ্বন্দের মধ্যে দিয়ে সময় বয়ে যেতে লাগল। নিত্যবহ নদীর স্রোতের মত অবিরাম ভাবনা বয়ে চলল তার মনের মধ্যে দিয়ে। ব্যাপারটা যদি জানাজানি হয়ে যায় নরেশবাবু তা'হলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় ক'রে দেবে বাড়ী থেকে; ঘাড় ধরে নামিয়ে দেবে রাস্তায়। যা রাগী লোক কোন কথা শুনবে না। হারাণদা শুনতে পেলেই কি আর রক্ষা রাখবে! চারিদিকে যেন সমূহ সর্বনাশ সরমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। কি করে সে এখন? কাউকে জানাবে না? না জানালে যদি সুনীল বাবু রোজ এরকম ক'রতে থাকে। তা কি আর ক'রবে? একদিন দৈবাৎ ক'রে ফেলেছে বলে কি আর প্রত্যেক দিন হবে? না না। মানুষটা তো খারাপ নয়! বেশ ভাল মানুষ; সকলের চেয়ে ভাল। কি চমৎকার শাড়ী খানা না দিয়েছে! কেমন সুন্দর রঙ! দেশে হ'লে এই শাড়ী পরতে দিত? পরতে নাকি নেই; কি হয় পরলে? এই তো ও নিজে পরছে কি হচ্ছে? কার কি লোকসান হচ্ছে? আসলে ওখানে অন্যের লাভের ব্যাপার ছিল। শাড়ীগুলো ননদরা ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়ে নিতে পারত। তার সব কিছুই তো নিয়ে নিয়েছে, হাতে চারগাছা চুড়ি ছিল সেও খুলে ফেলতে হয়েছে বিধবাকে পরতে নেই বলে। গলার হার হাতের চুড়ি কানে এক জোড়া কান পাশা ছিল বাপের বাড়ী থেকে দেওয়া বলে সে সব সঙ্গেই ছিল, মার কাছে রেখে এসেছে সরমা, রেখেছিল আসবার সময় চেয়ে নেবার কারণ ঘটে নি, কারণ সে যে জীবন রাখতে বেরিয়েছিল এমনই তো নয়, ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল জীবন থাকবে কি থাকবে না তার কোনই ঠিক ছিল না, বরং জীবন বিসর্জন দেবে এমনই একটা ভাবনা তাকে আশ্রয় ক'রেছিল বলে কোন কিছুর প্রয়োজন সে অনুভব করেনি! দিলুর সঙ্গে দেখা না হ'লে কি যে তার হ'ত কে জানে? সাঁতারটা জানা না থাকলে তার শব এতদিন সাঁতারে বেড়াতো কোন নদীর ঘাটে ঘাটে।

দিলুর কথা মনে পড়ছে সরমার। দিলুর চোখে সে করুণাশঙ্করের স্মৃতি বেশ কয়েকবারই ঝলকে উঠতে দেখেছে, করুণাশঙ্করের ইচ্ছার মূর্তি রূপ পরিগ্রহ ক'রলেও সরমা তা উপেক্ষা করেছে। প্রশ্রয় দেবার কথা বারেক ভাবেনি। দিলুর প্রতি তার প্রীতির অভাব ছিল এমন নয়, যে করুণা দিলুর ইচ্ছাপূরণ ক'রতে পারত সেই করুণা সে করেনি দিলুকে। করবার উপায় ছিল কিনা ভেবে দেখে নি। তার ভয় ছিল, ভয় এখনও আছে; ভয় ক'রছে। কিন্তু সুনীল তার অসহায়তাকে হয়ত মুছে দিতে পারে, ওর ক্ষমতা আছে দিলুর তা ছিল না। দিলুকে প্রশ্রয় দিলে

আরও এক নতুন বিপন্নতাকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হ'ত যা দিল্ম সামলাতে পারত না। স্মনীল তাকে রক্ষা ক'রতে পারবে।

তবে কি স্মনীলকে প্রশ্রয় দিয়েছে? হঠাৎ যেন নিজেকেই প্রশ্ন ক'রে বসল সরমা। স্মনীলের কাজে কি সে সহযোগিতা ক'রেছে? না। মোটেই নয়। সে আদৌ সমর্থন করে নি স্মনীলের কাজ, স্মনীল যা ক'রেছে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে ক'রেছে। তার দায়িত্ব স্মনীলেরই। আবার যদি স্মনীল আসে সে প্রতিরোধ ক'রবে, প্রতিবাদ ক'রবে; প্রয়োজন হলে চিৎকার ক'রে প্রতিবেশীদের জানাবে—তাতে যা হয় হবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত ক'রল।

পরদিন দ্মপ্মরে স্মনীল আসার সময় না হতেই নিজের অজান্তে সরমার মন উন্মুখ হ'ল আসবার সময় ব্মঝি হ'ল। সে সজাগ হ'ল আজ দরজা খ্মলবে না। কিছ্মতেই নয়। যতই ডাকাডাকি কর্মক দরজা খ্মলবে না সে। কি আর হবে, ডেকে ডেকে ফিরে যাবে, এই তো! তা যাক। স্মনীল ফিরে গেলে কার কি? তারই বা কি? কারও কিছ্ম আসে যায় না।

হারাণদা একদিন বলেছিল সরমার এখানে থাকার খরচ সব স্মনীল জোগাচ্ছে। নরেশ বাব্ম কেবল ঘরখানাতে থাকতে দিয়েছে তাও প্রতিদিন নাকি তাড়াতে চাইছে। তাহ'লে? স্মনীল ফিরে গেলে কি গতি হবে তার? কে তার দিন যাপনের ব্যবস্থা ক'রবে? হারাণদা আরও বলেছিল স্মনীল না কি তার কোন একটা ব্যবস্থা শীঘ্র ক'রে দেবে, যে কদিন না হচ্ছে এখানে থাকতে দিয়েছে নরেশ। নরেশবাব্ম যে তাকে অপছন্দ করে তার এখানে থাকা চায় না একথা সরমা নিজেও বোঝে। এতদিনের মধ্যে একটা দিন ভদ্রলোক ভুল ক'রেও একটা শব্দ করল না তার সঙ্গে। পাশাপাশি ঘরে রাত্রিবাস, ঝি চাকর মনে করেও তো একটা হ্মকুম করে মান্মষ, তাও না। কোনদিন সামনা সামনি হ'ল না পর্যন্ত। একজনের অস্তিত্বকে অপছন্দ করা আর কিভাবে বোঝানো যায়? কাজেই স্মনীল ছাড়া তার গতি নেই। স্মনীলকে পছন্দ না কর্মক মেনে নিতে বাধ্য। তবে কি স্মনীল রোজ এরকম ক'রবে? তাতে যদি কোন বিপদ হয়? অনেক কথাই মনের মনের মধ্যে ঘ্মরতে লাগল। নানা অন্মক্মল প্রতিক্মল ভাবনার ধারাস্রোত ঘ্মর্ণিপাকের মত চঞ্চল ক'রে রাখল তার মন। তবে কি সে স্মনীলকে তার কাজ কর্মকে ভয় পাচ্ছে না, পাচ্ছে না বিপদের সম্ভাবনাকে?

বিপদকে তো ভয় পেতেই হয়। মেয়েদের বিপদ একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব। সেখানে কেউ অংশীদার থাকে না। কেউ তার অপযশ ম্মছে দিতে পারে না। ভয় কি শ্মধ্ম এক রকম? দায় বহন তো আছেই নিন্দাবাদই কম? নিন্দা যে কি বিষম বস্তু সে এক ঐ নির্হেতু নিন্দাতেই যথেষ্ট ব্মঝেছে সরমা তাই এমন কোন ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়াকে তার দার্মণ ভয় যার ভিত্তি আছে। ভিত্তিহীন

অপযশকে অগ্রাহ্য করা তবু যদি সম্ভব সত্য নিন্দা অস্বীকার করবার কোনই উপায় থাকে না।

সরমার সমস্ত ভাবনা তছনছ ক'রে দিয়ে সুনীল পরদিন আবার হাজির হ'ল মত্ত হাতির উপস্থিতি নিয়ে। কি কারণে যেন সদর দরজা অর্গল মুক্ত ছিল, সরমা নিচেই কলঘরে বসে অবসর বিনোদন ক'রছিল নিজের কাপড় কেচে। সুনীল বিনা বাধায় প্রবেশ ক'রে সরমার শব্দ পেয়ে জানতে চাইল, সদর খুলে রাখিচো যে বড় ?

ও কোন সদুত্তর দিতে পারল না কেন খুলে রেখেছে। পরন্তু সে অনুভব ক'রল ওর মনের মধ্যে কেমন এক আনন্দের ফল্গু স্রোত যেন অকস্মাৎ বইতে সুরু ক'রল। যেখানে তার ভয় হওয়া উচিত ছিল সেক্ষেত্রে আনন্দ যে কেন হচ্ছে সে নিজেই তার কারণ খুঁজে পেল না। সুনীল একবার খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে সদর বন্ধ ক'রে ওপরে উঠে গেল যাবার সময় বলল, তোমার জন্যি এট্টা পান আনে ছিলাম। খায়ে দেখতি পারো, মিঠে মশলার পান।

সরমা আপন মনেই বলল, কাজ নেই তোমার পান খায়ে।

একখানা কাপড় অনেকক্ষণ ধরেই কাচছে, আর কত কাচবে ? কাজেই ধুয়ে নিয়ে ওপরে উঠল সরমা। সুনীল ওকে দেখেই জিজ্ঞাসা ক'রল, ভাত খাইছো ?

এট্টু আগে।

তয় তো ভালই হলো, পানডা খায়ে ফ্যালো।

বার বার বলছে মানুষটা—কাজেই দ্বিধা থাকলেও হাতে নিল। পান সে বহু আগে দু একবার মাত্র খেয়েছিল বিয়ের পর। শ্বশুরে বাড়ীতে একজন কটু দিদিমা ছিলেন তিনিই হাতে ক'রে দিয়েছিলেন, সে তেমন ভাল লাগে নি। সেই রসিকা দিদিমা বিয়ে উপলক্ষেই এসেছিলেন, বলেছিলেন, খা নাত বৌ খা। পানের রসে মজা পাবি। রস মানেই মজা, রসই তো দেবে নে।—আপন কথার রহস্যে আপনি হেসেছিলেন উদার আনন্দে। সরমা তাঁর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রতে পারে নি, তবে মনে আছে বলে আজ পান হাতে নিয়েই মনে এল। প্রৌঢ়া সেই সুরসিকা আরও যেসব কথা বলেছিলেন শুনলে লজ্জা পাবার মত। পেয়েও ছিল সরমা, আনন্দও পেয়েছিল সঙ্গিনীরা, সহাস্য কলতানে সায় দিয়েছিল তাঁর কথায়।

সুনীল তাড়া দিল, খায়ে ফ্যালো দেখতিছো কি ? খা'লি না বোঝবে ?

কি আর করে সরমা, লোকটা এত ক'রে বলছে পানটা মুখে পুরে দিল। সামান্য কয়েকবার চিবিয়েই বুঝল, এ পান সে পান নয়। এ আলাদা। এর স্বাদ আছে। অতি সুস্বাদু বটে। সত্যি বোঝবার মত। সপ্রশংস দৃষ্টি একবার মাত্র আপনি চলে গেল সুনীলের দিকে। সুনীল তার ভাষা পড়ে নিয়ে বলে উঠল, কি, কলাম না! এ পান কনে পাবা ? মতিলাল এর দোকানের পান, বানায়ে আনতি হয়।

বানিয়ে যে আনতে হয় সে কথা আর একটু বাদে টের পেল সরমা। মিস্টি

রস তার পুরোপুরি গলাধঃকরণ হয়ে যাবার পর মনে হ'ল শরীরটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে সে কেমন যেন উত্তেজনা অনুভব ক'রছে। কাল সুনীলের সঙ্গে ধস্তাধস্তির মধ্যে একসময় যেমন হয়েছিল অনেকটা সেই রকম ভাব আসছে শরীরে। তার ভাব দেখে সুনীল বলল, পান খাওয়া ওব্যেশ নেই তো তাই অমন হচ্চে। তুমি এট্টু জল খাও।

জল খেয়েও উত্তেজনা কমল না বরং উত্তরোত্তর বাড়ছে বলেই মনে হ'ল। হাত-পাখা খানা টেনে নিয়ে নিজেকেই বাতাস ক'রতে লাগল সরমা। তাতেও গরম তার কমছে না। কিছুমাত্র নয়, বরং আরও কিসের আকাঙ্খা যেন ভেতর থেকে উঠে আসছে তার শরীরের কোন অচেনা অংশ ভেদ ক'রে।

সুনীল সরমাকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এসে ওর মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দেবার চেষ্টা করতে সরমার শরীর জুড়ে যেন ঢেউ উথাল পাথাল হতে লাগল। তার কেবলই মনে হ'তে লাগল মাথায় নয় তার যা কিছু কষ্ট বুকের ভেতরটায়। অভিজ্ঞ শরীরবিদ্-এর মত দক্ষতায় সুনীল সরমার বুকে এবং শরীরের সর্বত্র ধীরে ধীরে হাত দিতে লাগল তাকে আরোগ্য হতে সাহায্য করবার অভিপ্রায়ে। সরমা বাধা দিল না, দিতে পারল না, এবং অবশেষে নিজেই সবেগে জাপটে ধরল সুনীলকে, ধরতে বাধ্য হ'ল—কে যেন ধরালো তাকে।

সাফল্য যে সুনীলের আয়ত্তের বাইরে থাকে না সেই কথাটা আরও একবার প্রমাণ হ'ল ভিন্নতর ক্ষেত্রে এবং এদিন থেকে তাকে সরমা করুণাশঙ্করের চেয়ে কাছের মানুষ ধরতে লাগল কারণ সেই রোগবল্মীক ব্যক্তিটির কাছে প্রাপ্য যা কিছু ছিল ঘাটতি সমেত সবটুকু মিটিয়ে দেবার নীরব প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই এই ধূর্ত লোকটি জয় ক'রল তার যৌবন। প্রাণী জীবনে উদরপূর্তি আর আশ্রয়স্থলের পরেও যে চাহিদা কালধর্মে তীব্র হয়ে ওঠে সেই চাহিদারও পূরণ ক'রতে পারা যার পক্ষে সম্ভব সেই তো জীবমাত্রেরই নিকট সঙ্গী; সেই সূত্রেই সুনীল হ'ল ঘনিষ্ঠতম, অন্তরঙ্গ। অনন্যোপায় ছিল বলে যে নির্ভরতা সুনীলের ওপর ছিল তাতে পূর্ণতা ছিল না, এখন সরমা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ক'রতে লাগল, যে নির্ভরতা একজন নারী এক পুরুষের ওপর ক'রতে পারলে আরাম পায়, তৃপ্তি লাভ করে, ঠিক সেই রকম।

জীবনে যে সুখ সরমার জোটেনি সেই সুখ তার আঁচলে বাঁধা চাবির গোছার মত পিঠের ওপর ঝুলতে লাগল। কিন্তু সামান্য ক'দিনের মধ্যেই তাতে ব্যাঘাত ঘটল। অকস্মাৎ একদিন দুপুরে যে অফিস ছুটি হয়ে যাবে সরমার তা জানবার কথা নয় কারণ নরেশ নিজেই তা আগের দিনও জানতে পারে নি। টেবিলে বসে কাজ ক'রতে ক'রতে অফিসের সর্বজ্যেষ্ঠ এবং মালিকদের অতিপ্রিয় কর্মী বারিদবাবু অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সকলে মিলে তাঁকে যাতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে সেই জন্যেই সেদিনকার মত অফিস বন্ধ হয়ে গেল। ছোট্ট অফিস, ন'জন কর্মচারী তবু সকলের প্রয়োজন হ'ল না বলে নরেশ—নিরীহ প্রকৃতির মানুষ

হিসেবে নীলমণি বেয়ারার সঙ্গে ছাঁটাই হ'ল হাসপাতাল দৌড়ানোর কাজ থেকে অক্ষম বিধায়। ভারাক্রান্ত মনেই নরেশ বাড়ী ফিরল। কাছাকাছি এসে দেখল সুনীল তার বাড়ী থেকে বেরোচ্ছে। ব্যবহারিক দিক থেকে নরেশ অতিভদ্র মানুষ বলে থমকে গেল; সুনীল চলে যেতেই নিজের বাড়ীর কড়া নাড়ল। সরমা সদ্য দরজা বন্ধ ক'রে সিঁড়ি ধরেছে, ভাবল সুনীল বুঝি কিছু ফেলে গেছে বলে ফিরে এসেছে নিমেষে তার মন পুলকিত হয়ে উঠল, সে পুলকের প্রকাশ তার মুখমণ্ডলে নিশ্চয় লেগেছিল দরজা খুলে নরেশকে দেখেই আতঙ্কে তার মুখের চেহারা বদলাতে পলক পড়বার সময়টুকুও লাগল না। শব্দমাত্র না ক'রে নরেশ চৌধুরী ওপরে উঠে গেল।

সেদিনই সন্ধেবেলা বান্ধববৃন্দ অন্য এক নরেশ চৌধুরীকে দেখতে পেল যাকে তারা জীবনে কোনদিন দেখেনি। হরেন প্রথমে এলে তাকে খুব রুক্ষভাবেই নরেশ বলল, আজ থেকে এখানে খেলা বন্ধ। তোমরা অন্য জায়গা খুঁজে নাও।

বিস্মিত হরেন বিমূঢ় হয়ে বন্ধুর অন্যমুখের দিকে নির্বাক চোখে চেয়ে রইল। নরেশ আর একটিও শব্দ ক'রল না। ইতিমধ্যে একে একে সবাই এসে অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল কিন্তু নরেশ কারও সঙ্গেই কোন শব্দ ক'রল না। সুনীল আশা-মাত্র নরেশ যেন অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হ'ল, আপনি এই মুহূর্তে ঐ মহিলাকে এ বাড়ী থেকে নিয়ে যান।

সুনীল অবাক্ হবার চেষ্টা ক'রলে নরেশ তার স্বভাববিরুদ্ধ স্বরে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলল, আমি আমার বাড়ীতে এক সেকেণ্ড কোন বাইরের এলিমেণ্ট রাখব না। অনেক বলেছি, আর নয়।

সকলে একই সঙ্গে হতচকিত হলেও নরেশের কোন ভাবান্তর হ'ল না। সুনীলের মত ধনী মানুষকে নরেশ মুখের ওপর এমন অপমান ক'রল তার যে কি ফল হবে সকলেই তা সভয়ে ভাবতে লাগল। তবে সকলে আরও অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে সুনীল যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। মনে হ'ল সে বলবার মত কথা ভুলেই গেছে। যে সুনীল কখনও কারও কাছে কথায় অন্তত হারে না সেই সুনীল যে কেন অমন হতবাক্ হয়ে গেল কেউ বুঝল না। অনেক চেষ্টায় সুনীল বলতে গেল, আচ্ছা খেলাড়া তো হোক—নরেশ তার কথা শেষ হ'তে না দিয়ে বলল, না। আর কিছু হবে না। আপনারা আর এ বাড়ীতে আসবেন না।

তা'লি আর কি করা জাবে, চলো ওঠা জাক—বলে সুনীল উঠে দাঁড়াল, হারাণকে বলল, হারাণ মায়েডারে নিয়ে চলো। আমাগেই দোষ সত্যি কথা, এতদিন এহেনে থাকপে একথা তো বলা হই নি। ওরে গুছোয়ে নিতি বলো।

সুনীলের ইচ্ছে ছিল সরমাকে কোথাও ঘর ভাড়া ক'রে রাখবে, ঠিকমত সুযোগ হচ্ছিল না। চুনি দালাল যে ক'টি ঘরের কথা বলেছে মনঃপূত হয়নি একটাও। সোনামণির বাড়ীতে খালি ঘর আছে কিন্তু সেখানটায় ওকে রাখতে চাইছিল না, সেখানে থাকলে কখন বেহাত হয়ে যায় তার ঠিক কি? সুনীলের ইচ্ছা ছিল সরমা

তার নিজের জন্যেই থাক। কিছুদিন তো যাক তারপর যা হয় হবে। তার ইচ্ছে পূরণটা হ'ল না। কেন যে নরেশ অমন ক্ষেপে গেল কে জানে। সরমা কিছু জানে কি? এমনও তো হ'তে পারে সরমা নরেশের কোন প্রস্তাবে মানতে অস্বীকার করেছে। তা হয়ে থাকলে গত রাতে হয়েছে কিন্তু দুপুরে তো তাহ'লে ও বলত। কিছু তো বলল না! কে জানে পাগলা লোকটার মাথায় কোন ভূত চাপল! অমর মিত্তির আসেনি তাই রক্ষা নইলে সে আজ নরেশের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে বসত। আর ওর ঝগড়া মানেই তো অশ্লীল গালাগালির ফোয়ারা ছুটে যাওয়া।

নরেশের বাড়ী থেকে বেরিয়ে বিডন স্ট্রীট ধরে কয়েকপা পশ্চিমে এলেই গরাণ-হাটার গলি। সেই গলিতে ঢুকে ফকির চক্রবর্তী লেন দিয়ে একটুখানি পার হলেই নীলমনি মিত্র স্ট্রীট। সে পথ যেখানে দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে ঠেকেছে সেই মিলন স্থলেই সোনামণির বাড়ী। বাড়ীটা তার নয় মালিক কে এক বংশীধর জালান সেই জালানের খাস সেবিকা সোনামণি দাসী। আগে নাকি কোন রামজীবন বসাকের বাড়ী ছিল এটা বংশীধর কিনে সোনামণিকে রেখেছে, সোনা আবার দশঘর মেয়ে বসিয়ে ভাড়া তুলছে। সোনার বাসের অধিকার আছে ভাড়াটাও সে নিজেই তোলে বংশীধরের হাতে তুলে দেয়। তবে লোক বসানো ভাড়া তোলা সবই সে নিজে করে তার বাবু কিছু দেখে না, দেখার দরকারও মনে করে না কারণ সোনামণি তার বাবুটিকে স্বামী জ্ঞান ক'রেই কাজ করে, বাবু স্ত্রী জ্ঞান না ক'রলেও জানে তার নিজের মেয়ে-মানুষ। তাই মহর্ষিদেবেন্দ্র রোডের ধনে মশলার গুদোম থেকে সন্ধেবেলায় প্রথম এখানে এসেই ওঠে, স্নান ক'রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে জলযোগ ইত্যাদি এখানেই সারে, রাত দশটার কাছাকাছি সময় নিজের বাসস্থানে যেখানে স্ত্রী আছে, ফিরে যায়। এই সন্ধেবেলাটায় সোনামণি বংশীধরের অঙ্গসেবা করে। যে সেবা স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয় বা স্ত্রীরা সাধারণত করবার কথা ভাবে না সোনামণিই তা করে এবং নিপুণা বলেই বংশীধর মনে করে। স্নানের আগে তার সর্বাঙ্গে তেল মালিশ, স্নানে সাহায্য এবং স্নানান্তে অঙ্গরাগ—সব কিছুতেই অসীম দক্ষতা সোনামণির।

অথচ সোনামণি একদিন বংশীধরের ধনের গুদোমে আরও বিশজন গরীব ঘরের মেয়ের মতই ধনে ঝাড়ার কাজে এসেছিল, এখনও যেমন অনেক মহিলাই রোজ মজুরীর বিনিময়ে সারাশরীর ধুলো মেখে গামছা জড়িয়ে ধনের ধুলো ঝেড়ে চালনি দিয়ে চেলে পরিষ্কার করে। ঐ যে কথায় আছে না 'যার সঙ্গে মজে মন'—কেমন ক'রে কোন শুভ সময়ে সোনার ওপর চোখ পড়ে গিয়েছিল বংশীধরের এবং নিশ্চয় বিশেষত্ব ও ব্যতিক্রম কিছু ছিল নইলে সোনাকে চোখে লাগল কেন আর নিত্য কাজে আশা নিম্নবিত্ত, অতি দরিদ্র ঘরের অত মেয়ের মধ্যে সোনাই বা ধনে ঝাড়ানী থেকে মালকানি হ'ল কেন! ভাগ্য মানলে ভাগ্য, সংযোগ বললে সংযোগ। এ দুরত্ব তো সীমার মধ্যে পাবার নয়, হিসেবেরও নয় দৈবাৎই কারও জীবনে এ দুরত্ব অতিক্রমণের ঘটনা ঘটে।

পাড়ার লোকে সোনামণির ধনের গুদোমে মশলা ঝাড়াই-এর ইতিহাস জানে না। তারা জানে এ এলাকার আর মহিলাদের মত সোনামণিও একজন, এই পাড়া জুড়ে যে ক'জন ইজ্জৎদার থাকে তেমনই একজন, বাড়ীওয়ালি—। সুনীলও সেই ভাবেই চেনে। তার চেনা তো এই বাড়ীতে যাতায়াতের সুবাদে, মায়ার ঘরে মাঝে মাঝে আসে বলেই আলাপ—। সোনামণি খাতির করে পয়সাওয়ালা পার্টি বলে। সোনামণি নিজের ঘরে লোক তোলে না, সে নিজে তোলা থাকে বংশীধর জালানের জন্যে তবে বাড়ীর দায়িত্ব তার বলে বাড়ীতে নিয়মিত আসা লোকেদের চোখে রাখে। এটা যখন ব্যবসা খদ্দেরদের চিনে রাখতে হবে বৈকি! ভাল খদ্দেরের সঙ্গে ভাল ব্যবহারও তো ক'রতে হবে, তাদের ভালমন্দও তো দেখতে হবে। সেই সুবাদে আলাপ। তাছাড়া যে খদ্দের খরচাপত্তর করে তার প্রতি একটু বিশেষ আপ্যায়ণ তো আপনি এসে পড়ে। এটা সব ব্যবসাতেই হয়ে থাকে।

ক'দিন আগে তাই কথায় কথায় সোনা সুনীলকে বলেছিল, টগরীকে জানতেন তো? হ্যাঁ দোতলার কোনের ঘরটায় থাকত—টগরী একটা লোকের সঙ্গে ভেগে পড়ল। লোকটা নাকি ওকে বিয়ে ক'রবে। তা এখেনে কি রোজ বিয়ে হচ্ছে না? কত বিয়ে আর ক'রবি? দেখুক ক'দিন। আমার মুস্কিল হ'ল ঘরটা খালি হয়ে গেল। যাকে তাকে তো আর ঢোকাতে পারি না! না দেখে দিলে তো ভাড়া এখনই হয়ে যায়। তা দেব না।

কথার পিঠে কথা বেরিয়ে যায়। সুনীলও যা শুনেছিল পরখ ক'রে নিতে চাইল, ফুলমতিয়া নাকি চলে গেছে?

ওকে আমিই তাড়িয়ে দিয়েছি, বলেছি যা এখেন থেকে। কি হারামজাদা মেয়েমানুষ বলুন আমাদের বাবুর দিকে তার নজর। আশা যাওয়া ঠায় দাঁড়িয়ে দেখবে, গায়ে পড়ে বাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে। দেখে শুনে বাবুই আমাকে বললে, ওকে ভাগিয়ে দাও। অমন ভাড়াটে দরকার নেই। বাবু যখন বলেছে আর কি কথা। ফুলমতিয়া তো ভাড়াটে ছিল না, আধিয়া ছিল। তা যাই থাক ঘরটা তো খালিই রইল।

সেই কথার ভিত্তিতেই সোজা রিক্সা ক'রে এসে সোনামণির দরজায়। ভরা সন্ধে, যে সব মেয়েকে খদ্দের ধরতে হয় বাঁধা খদ্দের নেই তারা সব সেজে গুজে নেমে পড়েছে পথে, সারি সারি মেয়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ী মানুষ সবই চলছে। লোকারণ্য ভেদ ক'রে রিক্সাটা ঠুন ঠুন ঘণ্টি বাজিয়ে এসে যখন দাঁড়াল সদরের মেয়েরা কৌতূহলে উপচে পড়ল—এ কী বাবা! খদ্দের আবার মাল নিয়ে আসছে বেচতে! নিয়মিত বলে অনেক মেয়েই চেনে সুনীলকে, অনেকেই চিনে রেখেছে যদি ধরা যায় বলে। দু একজনের ঘরে এক আধ রাত শুয়েওছে সুনীল, তাদেরই কেউ রসিকতা ক'রে বলে উঠল, বউ নাকি গো? অপর একটি মেয়ে যোগ ক'রল, বিয়ে করে আনলে নাকি নাগর?

এসব কথার জবাব দিতে নেই, পথের হাটে তো নয়ই। সুনীল তাই সরমার হাত ধরে সোজা উঠে এল দোতলায় সোনামণির ঘরে। মেয়েগুলো বজ্জাতি ক'রে পাছে সরমাকে আটকে দেয় তাই একরকম টেনেই নিয়ে চলে এল। ভাগ্য ভাল ছিল জালান বাবু আজ আসেনি ঘর খোলা সোনা কাপড় গোছাচ্ছিল; সুনীল বলল, কই গো বাড়ীউলি আমারে দোতলার এট্টা ঘর দ্যাও।

সোনামণি পেছন ফিরে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। এ তো লাইনের মেয়ে নয়। একটু অবাক হয়ে বলল, একে আবার কোথায় পেলে গো বাবু?

সরমা নতুন জগত দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এসব কারা? কোথায়? এরা কে? এখানে কেন? এমনি সব অসংখ্য প্রশ্ন এক সঙ্গে জট পাকিয়ে তাকে বিভ্রান্ত ক'রে দিচ্ছে। এরই মধ্যে সদরের ভিড়ে কে একটা মেয়ে তাকে চিমটি কেটে দিয়েছে জ্বালা ক'রছে। এ কোন দেশ, কিসের ভিড়, কেনই বা এত মেয়ে এসে জমেছে কিছুই তার বোধগম্য নয়। ভয়ে বিস্ময়ে সে গুটিয়ে চোরের মত দাঁড়িয়ে রইল সুনীলের পেছনে।

মায়া বলে যে মেয়েটির ঘরে সুনীলের প্রায়শ যাতায়াত সেই মেয়েটি দরজার মধ্যে থেকে সুনীলকে সরমা সহ দেখে বিমর্ষ হয়ে গেল। দুঃখ ভারাক্রান্ত চোখে সে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ ক'রতে লাগল। যে লোকটাকে সে এত খাতির ক'রত, যার মনোরঞ্জন আর শারীর সুখের জন্যে সে কত কিছু ক'রেছে সেই লোকটা তলায় তলায় ঠিক ক'রে আবার একটা মেয়েকে এনে হাজির ক'রল! মানুষ এত বেইমান হয়! মায়া ভাবল। চব্বিশ বছরের জীবনটুকুতে এর আগেও সে বহু কৃতঘ্নতা দেখেছে তবু এই মুহূর্তে তার সব ভুল হয়ে গেল, নিয়মিত খদ্দের সুনীলের আজকের কাজটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। তার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। না, কোন মোহ নয়, মায়াও নয়; অর্থচিন্তা। লোকটা প্রতি মাসে পাঁচ ছবার নিশ্চয়ই আসতো। পয়সাও নেহাৎ খারাপ দিত না। সেই বাঁধা আয়টা তো এবার নিশ্চিত বন্ধ হয়ে যাবে সেই দুর্ভাবনা তাকে পীড়িত ক'রতে লাগল। লোকটা যে কঞ্জুষ তাতে সন্দেহ নেই, উদারতা যে নেই সেও সত্যি, তবে হিসেব ক'রে খরচ ক'রলেও ক'রতে তো বাধ্য হয়। যে বেশি হিসেব করে সে আত্মতুষ্টির জন্যে হিসেবটাই না হয় ক'রতে পারে খরচ তো যেটুকু হবার তারও হয়। প্রকাশ সিং-এর খাজনা তো দিতেই হবে, খাবার পানীয়ের দামও দিতে হবে, কমটা সে দেবে কোথায়? টানাটানি ক'রবে শরীরের দাম নিয়ে, এই তো! সেজন্যেই এসব লোকের কাছে বেশি ক'রে দর হাঁকতে হয়। কিন্তু পয়সা বাঁচাবার জন্যেই যদি বউটাকে কারও বাড়ী থেকে ভাগিয়ে এনে থাকে, এখানে রাখে তাহ'লেই কি খরচা বাঁচবে? একা একটা মাগ পুষতে খরচা লাগবে না? কার ঘরের বউ ফুসলে আনল কে জানে? যত রাগ গিয়ে পড়ল আগন্তুক সরমার ওপর—বলিহারি যাই মাগীগুলোকে। ঘরের বউ হয়ে ঘর ছেড়ে কেউ শরীর বেচতে নামে! রাগের চোটে মায়া অনেক গালাগালি দিল মনে মনে।

শকুনের শাপে কোনদিন যেমন কোন গরুকে মরতে দেখা যায় নি তেমনই মায়ার ক্রোধাগ্নিতে সরমা বা সুনীলের সামান্য ফোস্কাটুকু পর্যন্ত পড়ল না শরীরের কোন অংশে। সানন্দে খালি ঘরটি খুলে দিল সোনামণির দাসী। ঘরে ঢুকে একান্তে পেয়ে সরমা প্রথম কথা বলল, এহেনের থে আমারে নিয়ে চলেন। এই হানে থাকতি পারবো না নে।

সুনীল অবাক হবার মত ক'রে বলল, ক্যান্ কি হলো ?

কি হ'ল জানানোর বদলে সরমা আবেদন ক'রল, আমারে নিয়ে চলেন।

কোয়ানে নিয়ে জাবো ? এ হেনে তোমার নিজির ঘর হলো, তোমার মতো তুমি থাকপে অসুবিধেডা কিসির ? আমরা সবাই তো রোজ এহেনে আসপো। হারাণ আসপে, তাস আমরা এহেনেই খ্যালবো।

ঘণ্টা খানেক ধরে বোঝালো এবং সরমার যা সদ্য প্রয়োজন মোটামুটি তার ব্যবস্থা করে দিল সুনীল। সোনামণিও নিজে এসে আপন দাসীকে দিয়ে সব সাহায্য ক'রল। সুনীলকেই বলল, নন্দলালকে বললে সে কালই খাট দিয়ে যাবে। এখন ভাড়ার খাটই থাক না পরে আপনি দেখে শুনে কিনে দেবেন খন। ভাড়ার জিনিষ যা যা বলবেন সব নন্দলাল দিয়ে যাবে, খাট, গদি, বালিশ—।

গদি বালিশ বিছানা কাল আমি কিনে দেবা নে।

আপনি ওসব ঝামেলা কেন ক'রবেন লাল মিঞাকে এখনই ডেকে পাঠিয়ে বলে দিন সে সব ঠিক ঠিক দিয়ে যাবে আপনি খালি ট্যাকাটা ফেলে দেবেন। আর যদি বলেন তো আপনার ট্যাকা দিতেও হবে না ও যদি খাটতে চায় তো ওর টাকা থেকেই কিস্তিতে সব শোধ ক'রে দিতে পারবে ও নিজেই।

সুনীল তাড়াতাড়ি বলল, না না টাহা আমি দেবো। দেশের থে আইছে ওর আর কাজটাজ ক'রে লাভ নেই।

বেশ তাই হবে। মাসি দারোয়ানজীকে বল তো লাল মিঞাকে ডেকে আনবে।

লাল মিঞা এল যেন আলদীনের দৈত্যের মত। নিমেষেই এসে হাজির। সুনীলকে চেনে না, জানেও না কিন্তু দেখা মাত্রই বলল, সালাম আলেকুম জনাব। ফরমাইয়ে।

সুনীলের নিজের ভাষাতে সে বলল, এট্টা গদি বালিশ বিছানা দিতি পারো ? নতুন চাই।

হাঁ জনাব। গদি তো মজুদা হ্যায়। বালিশ-ভি।

সুনীল অবাক হয়ে বলল, বলে কি! অ্যাহনই দেবে ?

হাঁ জী! হমলোক বানাকে রাখে। ইস মহল্লামে কব ক্যা দরকার হোতা—

সোনামণির দিকে তাকিয়ে সুনীল পরামর্শ চাওয়ার মত বলল, কি বলবো— ট্যাহা তো য়্যাহোন দিতি পারবো না—কাল দেবানে। দুপোরেই পাবা।

সোনামণিই জবাব দেবার দায়িত্ব তুলে নিল, তাতে কি আছে। কি মিঞা

সায়েব—ট্যাকা কাল দুপুরে দিলে হবে না ?

উসমে কি, ওহি দিবেন। আপসে আকে লে লেঙ্গে!

হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমার খুব জানাশোনা বাবু।

আধঘণ্টার মধ্যেই মেঝেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে নতুন গদি তোষক চাদর বালিশ পেতে এমন বিছানা হয়ে গেল যে সরমা অবাক। সোনামণি ঘরে না ঢুকেই সব তদারকি ক'রছিল, বিছানা হয়ে গেলে বলল, মাসিকে বলবেন রাতের খাবার হোটেল থেকে এনে দেবে।

সুনীল সরমাকে বলল, বসো। দাঁড়ায়ে র'লে কেন ?···বলে তার হাত ধরে টেনে নিজের পাশে বসিয়ে দিতে সরমা বিছানার স্পর্শ পেয়ে আর একবার নতুন ক'রে অবাক হ'ল—এমন নরম বিছানা হয়! কি আশ্চর্য! সুনীল তাকে বাহু বেষ্টনে জড়িয়ে ধরে বলল, এই বিছানাতি ঘুমোবে।

সরমা ভাবল, ঘুম আসবে তো ?

প্রথম প্রথম বেশ ভয় ভয় ক'রলেও সকালবেলা সরমা বুঝল ঘুম বেশ আরামেই হয়েছিল! সে বিছানা ছেড়ে ঘরের দরজা একটু ফাঁক ক'রে সভয়ে দেখল বাড়ী নিঃসাড়। রাতের অত মানুষজন, জমজমাট ভাব সে সবের কিছু নেই। নিঃসীম নীরবতায় ঝিম ধরে আছে যেন বাড়ীখানা। রাতের অত মেয়েরাই বা কোথায় ? কারও কোন চিহ্নমাত্র নেই। কয়েকটা কাকের ডাক শোনা না গেলে নিষ্প্রাণ পুরী বলে মনে ক'রতে হ'ত। কাকগুলোকেও দেখা যাচ্ছে না। আবার ভয় পেল সরমা। রাতের ভয়টা নয়, এ অন্যরকম ভয়। মনে হচ্ছে একজন ভয় এসে তাকে ভর ক'রল। এই ভয়টিরও পরিচয় সে জানে না। প্রাতঃকৃত্যের প্রয়োজনে দরজা খুলে বাইরে যাবার সাহস তার হচ্ছিল না ইতিমধ্যে নজরে এল রাতের বুড়ি, যে সব কাজ কর্ম ক'রে দিচ্ছিল, খাবার এনে দিয়েছে বারান্দা দিয়ে আসছে। তখনই সাহস হ'ল দরজা খোলবার। বুড়িটার চেহারায় তাদের গ্রামের দিদিমা পিসিমাদের আদল আছে। একেই তো কাল মাসি বলে ডাকা হচ্ছিল। সরমাকে দেখে মাসিই স্মিত ভাবে বলল, উঠে পড়লে ? ভালই হয়েছে, পায়খানা খালি পাবে। এখন সব ঘুমোচ্ছে।

সরমা কিছু একটা বলতে চাইল, কথা খুঁজে পেল না। কথা বলতেও ওর বাধল, এখানকার মানুষের মুখের ভাষা ওদের থেকে আলাদা, ওর কথা শুনে এরা হাসবে না তো! বললে বুঝবে তো ? এই সব চিন্তা ক'রে সে চুপ ক'রে রইল মাসি নিজেই বলল, আমার সঙ্গে এসো।

একটু পরেই সোনামণির সঙ্গে দেখা। সরমা নিজের ঘরে ফিরছে সোনামণি ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, জানতে চাইল, রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো ?

সরমা ইতিবাচক ঘাড় নাড়ল। মহিলার আন্তরিক ব্যবহারে ইচ্ছে হ'ল তার সঙ্গে বাক্যালাপ করে, বলে, যা বিছানা ঘুম না হবার উপায় আছে!—বলতে সাহস

হ'ল না। সোনামণি নিজেই বলল, মুখ হাত ধুয়ে আমার ঘরে চলে এসো. চা খাবে। তোমার তো এখনও কোন ব্যবস্থাই হয়নি।

চা খাওয়া জিনিষটা এখানে এসেই জানল সরমা, দেশে এসব অনেক কিছুই ছিল না, জানাও ছিল না। চা জিনিষটা যে কি সরমা জানত না, অধিকাংশেই এখনও জানে না। এখানে মানুষ সকাল সন্ধে চা খায়। কিন্তু সুনীল তো কোথাও যেতে বলে নি, লোকের ঘরে ঘরে ঘোরা কি ঠিক হবে? সে যদি কিছু বলে? যদি রাগ করে, কেন গিয়েছিলে?

অল্পক্ষণ বাদে দাসী এসে বলল, তোমাকে বাড়িউলী ডাকছে গো। চল।

বাধ্য হয়েই আসতে হ'ল, দেখল চায়ের গ্লাস সামনে ক'রে সোনা বসে আছে, আর একটা বাটিতে কিছুটা মুড়ি। সোনা বলল, এ বেলার মত এদিয়ে চালাও দেখি তোমার বাবু কখন আসে তারপর ব্যবস্থা যা হবার হবে। তবে আমি বলি কি একার জন্যে আবার না রেঁধে নীলুর হোটেলে ব্যবস্থা ক'রে নিলেই চলে যাবে। নীলু আমাদের ঘরের মানুষের মত, পরীবালাদের বাড়ীতেই তো বৌ নিয়ে থাকে। ডাল ভাত, তরকারী, ছেঁচকি, মাছের ঝোল—যা চাও পাবে।

চায়ের গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে সোনামণি সরমাকে গাঁয়ের মেয়ে বলেই একটু ঠাট্টা ক'রে বলল, আর যদি বাদশাহী খাবার চাও তাও পাবে এলেন হোটেলে। চিৎপুরের ওপরে এলেন হোটেলে মাংসের কারী, চিংড়ি মাছের কাটলেট, খাসির কোপ্তা, দোপেঁয়াজী কি চাও বল না? হ্যাঁ তেমন রহিস খদ্দের এলে দেখবে তারাই অর্ডার দেবে। খাও খাও এখন চা মুড়িই খাও। ওসব খাবার কেউ নিজের পয়সায় খায় না, এ বাড়ীর মেয়েরা তো নয়ই।

সরমা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গেল। এসব কি বলে যাচ্ছে বাড়িউলি! এসব খাবার-এর নামই শোনে নি সে। কি যেন বলল সব? কিছুই মনে নেই, শুনল এই মাত্র। ওরা বোধহয় প্রায় খায় নইলে অমন গড়গড় ক'রে বলে গেল কি ক'রে? তবে আর একটা কি যেন বলল—কি খদ্দের এলে কি হবে যেন বলল—কি যে বলল! খদ্দের এলে মানেই যে কি? কোন কথাই সরমা বুঝতে পারছে না। তাই বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল সোনার মুখের দিকে।

চা যে খেতে খুব একটা ভাল এমন নয়। তবু যে কেন লোকে খায়, কি খায় সরমা বার কয়েক চুমুক দিয়েও বুঝল না। নেহাৎ দুজনে খাচ্ছে বলে খাওয়া নইলে একা সে ঢেলে দিত কোন নর্দমাতে। কিছুটা মিষ্টি লাগছে এই যা স্বাদ।

মাসির বয়েস হলে কি হবে নজর তীক্ষ্ণ আছে, সরমার চা পানের ধারা দেখেই জানতে চাইল, হ্যাঁ গা মেয়ে বলি অমন ক'রে খাচ্ছ কেন? চা খাও নি? খেতে ভাল লাগছে নি?

হ্যাঁ, মিষ্টি মিষ্টি—এই প্রথম শব্দ ক'রল সরমা।

সোনামণি রসিকা রমণী, সরমাকে আবার ঠাট্টা ক'রল, প্রথম প্রথম সবই অমন

লাগে, পরে নেশা ধরে যায়।

তার কথার অর্থ ক'রতে না পেরে সরমা কিছুটা ভয়ে ভয়েই মুড়ি সহয়োগে বাকি চা টুকু পান ক'রে নিল। সোনামণি সরমাকে উপদেশ দেবার মত করে বলল, তোমার লোকটি রেখে গেল তোমাকে ট্যাকা পয়সা ঠিক মত দিয়ে গেছে তো? দেখো বাপু এ হল গে কোলকাতা, এখানে অমন অনেক নাগর পাবে গতরের সুখটুকু বেশ ক'রে চেটে পুঁছে খেয়ে নেবে ট্যাকার বেলায় বুড়ো আঙ্গুলটি দেখিয়ে দেবে। তা যেন ছেড়ো না। এখেনে প্রতিটি মিনিটে দেখবে ট্যাকার দরকার। সকাল থেকে রাত্তির অনবরত কেবল ট্যাকা। তার ওপরে পাড়ার নাম সোনাগাছি খাতির করেছ কি মরেছ; খাতির বিক্রি করবে, খবরদার খাতির করবে না।

সরমা চুপচাপ শুনছিল। যত কথা কানে আসছে তার অধিকাংশই বুঝছে না তবু মানুষটার কথা শুনতে ভাল লাগছে। কোথাও যেন একটা বিশেষ সুর আছে, এসুরে কথা আপনজনকেই বলা যায়। এক রাতের চেনাতেই যে ভাবে কথা বলছে তাতে মানুষটাকে ভাল না বলে পারা যায় না।

সোনা পুনরায় বলল, এ শহরে ট্যাকা ছাড়া কিছুর কোন দাম নেই। এই যে দেখছ আমি তোমাকে ডেকে মুড়ি খাওয়ালাম মাসের ভাড়ার ট্যাকাটি কিন্তু আমি বুঝে নেব। সে সময় ট্যাকা দিতে দেরি করলে দারোয়ান যখন ঘাড় ধাক্কা দেবে তখন এই সোনা বাড়িউলিকে খুঁজলেও পাবে না। এখানে ট্যাকাই বাপ-মা ট্যাকাই নাগর—বুঝে চলবে।

সরমা এখনই কিছু বুঝতে পারছে না বুঝে চলবে কি! এ যে কোথায় এসেছে কেন তাকে এনেছে সুনীল, সে এর কিছুই জানে না। কাল রাতে যখন অমন গদি বিছানা বালিশ এনেছে তখনও অবাক কম হয়নি। ওকে তো কোথাও কাজে লাগানোর কথা, যতটা অনুমান করতে পারছে তাতে এ আবার কেমন কাজ যে এমন গদি বালিশ বিছানার ব্যবস্থা! রাতটা তো ভয়ে ভয়েই কেটেছে জানা বোঝার কোন উপায়ই ছিল না, এখন বাড়িউলি যখন নিজেই ডেকে কথা বলছে তখন একটু সাহস করে জেনে নেওয়াই ভাল নয় কি? অনেক বুদ্ধি বিবেচনা করে সে জানতে চাইল, আমারে কি করতি হবে?

সোনা যেন আকাশ থেকে পড়ল, এখনও করনি বুঝি? ব্যাপার কি বলতো? ঘর থেকে বের করে সোজাই এখেনে এনেছে? আমাকে তো কিছু বলেও গেল না মিনসে! তা তুমি কচি খুকিটি তো নও, কি করতে হয় কিছু জান না? পুরুষ মানুষ কেউ করে নি?—শেষ কথাগুলো বলল বিদ্রূপের মত করে। আ মলো যা; এ খুকি বলে কি গো! সোনাগাছি এসে জিজ্ঞেস করছে কি করতে হবে!

আবার সব গুলিয়ে গেল। একটু একটু করে যদি বা এতক্ষণ সব সহজ হচ্ছিল এখন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ একজন বাড়িউলি ছিল হঠাৎ যেন বদলে অন্য একজন হয়ে গেল। বেশ সোজা সরল কথা বলছিল নিমেষে একবারে

অন্য কথা। এবার তার ভয় করতে লাগল। হঠাৎ দেখল একজন যুবতী এসে দরজার সামনে দাঁড়াল, মাসি চা খাওয়াবে না? আমি সেই কখন থেকে তোমায় খুঁজছি, পাচ্ছি না। বলেই সদ্য ঘুম ভাঙ্গা শরীর টান করে আড়ামোড়া ভাঙ্গল। মেয়েটিকে দেখে সরমা অবাক হয়ে গেল, কোনরকমে কোমরে একটা শাড়ীর অর্দ্ধেক জড়ানো শরীরের ওপর অংশে আবরণ মাত্র নেই। শাড়ীর যে অর্দ্ধেকটা ওপরে জড়ানোর কথা তা মাটিতে লুটোচ্ছে ওর কোন খেয়ালই নেই। কোমরের নিচে শাড়ীখানা এমন ভাবে জড়ানো যে তাতেও শরীরের সবটুকু বেশ ভাল ভাবেই দেখা যাচ্ছে। পাতলা ফিনফিনে শাড়ীটা কেবল কাপড় আছে দেখানোর জন্যেই পরা, পরণে না থাকলেও বিশেষ তারতম্য হত না। সরমা অবাক হল, মেয়েটার কি একদম লজ্জা নেই!

মাসি তার কথার উত্তরে বলল, আমি তো দেখে এলাম তোমার ঘর বন্ধ। তুমি আমায় খুঁজলে কখন?

সে কেমন জড়ানো স্বরে জানাল, বড় তেষ্টা পেয়েছে মাসি। একটু চা এনে দাও।

আগে একটু লেবুর সরবৎ খেয়ে নাও, পরে চা খেয়ো।

তুমি মনে ক'রছ আমার নেশা এখনও আছে? মোটেই নয়—কথাগুলো যেন ঘুমন্ত মানুষের স্বরে বলল।

সোনামণি কোন শব্দ করছে না, সরমা লক্ষ ক'রল। মাসিই বলল, সে তো বুঝতে পারছি কিন্তু বাছা আমি যা বলি শোন। ঘরে লোক এখনও আছে?

লোক! আমার বন্ধু আশিস আছে। জান মাসি, ও কাল দুবোতল 'ম্যাড হর্স' এনেছিল। এখন বেহুঁস হয়ে আছে।

তোমারও তো বাছা হুঁস বিশেষ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না!

আছে আছে মাসি, ঠিক আছে। এই তো তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি! এটা আবার কে? নতুন মাল আমদানী হ'ল? কোন বাড়ী থেকে এলে সই?

সরমা বুঝল তাকেই বলছে। কিন্তু কথাগুলো অমন পাগলের মত বলছে কেন? মাসি বলল, তুমি ঘরে যাও আমি যাচ্ছি, চা এনে দিচ্ছি।

মেয়েটি চলে যেতে দাসী বল, যে ছোকরার পাল্লায় পড়েছে তাতে সে ছোকরাও মরবে ও নিজেও এই মদ খেয়ে খেয়েই মরবে।

এতক্ষণে সোনামণি প্রশ্ন ক'রল, ছোকরাটা কে গো মাসি?

কোন সেনেদের বাড়ীর ছেলে। ভবানীপুরে না কালীঘাটে বাড়ী। দিনরাত প্রায় এখানেই প'ড়ে থাকে।

ট্যাকা পয়সা? চলে কি ক'রে?

মাঝে মাঝে গিয়ে নিয়ে আসে। সেদিন ছভরি সোনার বালা এনেছিল এক জোড়া। সেই পুরোনো দিনের মকরমুখ বালা জোড়া শেষ পর্যন্ত নিতাই স্যাকরার দোকানে অর্দ্ধেকেরও কম দামে বিক্রি ক'রে দিলে!

সোনামণি কোন কথা বলল না। এভাবে কত লোক যে ভিখারী হয়ে যায় তার ঠিক নেই। সে নিজেও কতজনকে দেখেছে, এই ছোকরাও হবে এ আর নতুন কি? এসবে সোনামণির মনে দাগ কাটে না। এখানকার কারওই নয়। সব গা সওয়া হয়ে যায়। ভিখারী হয়ে যায় যাবে তাতে কার কি? যার গয়না যাবে সে বুঝবে, যার সম্পত্তি যাবে বুঝবে সে-ও। সোনামণি, আরতিদের কিছু নয়, কিছু যায় আসে না। বরং এরকম বেপরোয়া উদ্‌ভ্রান্ত খদ্দের না হলে লাভও হয় না। যাদের জীবনে এ রকম খদ্দের না জুটেছে তাদের আর উন্নতি বলতে কিছু হয়নি। সারাজীবন শরীর বেচে জীবন বাঁচানোই হয়েছে। অবশেষে কেউ অসুস্থ, কেউ ভিখারী। বুড়ো বয়সে দাসীবৃত্তি। যে বাড়ীতে একসময় রাণী ছিল সেই বাড়ীতেই নতুন রাণীদের খরমাস খাটা—এই তো অন্তিম পরিণতি। আরতি যদি আশিস সেন বা আশু দত্ত যাকেই হোক না কেন বধ ক'রে বেঁচে যেতে পারে তো দোষ কি? তবে মাসির ভয় অমূলক নয়। শ্যামলী বলে মেয়েটার কথা এখনও মনে পড়ে সোনামণির, অত্যধিক নেশা ক'রে হাসপাতালে ভর্তি হ'তে বাধ্য হ'ল কিন্তু বাঁচল না। বাড়ীতে যতদিন ছিল কি যন্ত্রণাতেই না ভুগতো। তার আর্তচিৎকারে আর সকলের ব্যবসা নষ্ট হচ্ছিল বলে এক রকম জোর ক'রেই হাসপাতালে পাঠানো হ'ল তাকে; ফিরে আসুক এ কেউ চাইছিল না, ফিরলও না। শেষ পর্যন্ত সাহেব ডাক্তারও দেখেছিল, ভাল হ'ল না। শ্যামলীর গয়নাগাটি সব চিকিৎসাতে শেষ হয়ে গিয়েছিল তবে এমনি যা কিছু ছিল, শাড়ী জামা শখের জিনিষপত্র—সব পড়ে রইল শেষে কে কে যেন নিয়ে গেল। বেশির ভাগ নিয়েছিল জাভেদ বলে ছোকরা, যার সঙ্গে শ্যামলীর বড় পীরিত ছিল। জাভেদ অবশ্য আগেও নিয়েছে অনেক, শ্যামলী প্রায়ই তাকে এটা সেটা দিত। টাকা পয়সাও কম দেয়নি শ্যামলী সুস্থ থাকার সময়ে। সোনাগাজীর মসজিদের মৌলবীর ছেলে জাভেদ, কেমন ক'রে যে শ্যামলীর সঙ্গে জুটে গিয়েছিল কে জানে।

বেহিসেবী কাজ সুনীল কখনই করে না। সব কাজ হিসেব ক'রেই করে। কত কয়ের বিনিময়ে কতটা পেল এ হিসেব তার মাথাতে সব সময়ই থাকে। হারাণ মাঝে কেবল একদিনই জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, মায়েডারে কোথায় দিলে? ভাল জায়গায় দেছো তো?

মুখে পানের পিক ভর্তি বলে সামান্য সময় নিয়ে থুতু গিলে বলল, চিন্তের কোন কারণ নেই। যেহেনে দিসি খায়ে পরে বেশ ভালই থাকপে। বাড়ীডা মায়ড়োর হলি কি হবে বউডে বাঙ্গালী।

ঠিক আছে। খায়ে পোয়রে থাকতি পারবে তাহলি হলো।—

সেই শেষ। জানাশোনার মধ্যে থেকে সরমা হারিয়েই গেল। সংযোগ রইল কেবল একা সুনীলের, তাই তার শিরঃপীড়ার কারণ ঘটল। কেবল নিজের প্রয়োজনে

একটা মেয়ে মানুষের খরচ চালানো কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু মেয়েটাকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্যে সোনামণির হাতে পুরোপুরি তুলে দিলে তার সত্বস্বামীত্ব একেবারেই যাবে। তাকেও তখন আর দশজন খদ্দের-এর মত টাকা দিয়েই ঢুকতে হবে। সেটা তো চলতে পারে না। তার চেয়ে বরং মেয়েটাকে লাইনে নামিয়ে দেওয়াই ভাল, তবে তা সোনামণিকে দিয়ে নয় নিজেই নামাবে। সে জন্যে তাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা ক'রতে হবে, কিছু টাকা খরচও করতে হবে, তা হোক।

ক'দিন বাদেই সরমা ভয় পেল। কার্য কারণ সম্পর্কযোগের যে ধারণা ছিল তা থেকেই মনে হল তার কৃতকর্ম ফল দিচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে সুনীলকে জানাতেই সে যেন পথ পেল বলল, তুমি কিছু চিন্তা কইরো না।

আরও কিছুদিন বাদে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হরেনকে এনে হাজির করল। তার আগে দিন কয়েক ধরে তার পেছনে পড়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি করালো একটাই সর্তে যে বৌ এর ভরণ পোষণের জন্যে তার কোন দায় থাকবে না এবং হরেন প্রকাশ না করলে বিয়ের কথা গোপন থাকবে।

হরেনের যথেষ্ট বয়েস হয়েছে প্রায় বত্রিশ। স্কুলে সুনীলের সহপাঠী ছিল অথচ সুনীলকে এখন তিনটি সন্তান বাবা বলে ডাকে আর হরেন অবিবাহিত। তারও তো জীবন সম্পর্কে আগ্রহ আছে, আর দশজন সাধারণ মানুষের মত জীবন বলতে সেও স্ত্রী সন্তান সমন্বিত একটি বাসস্থানের কথা ভাবে যেমন তার পিতার জন্যে তারা মা ও ছয় ভাই বোন আছে। ওর বাবা মেয়েদের বিয়ে দেবার ব্যাপারে সমধিক আগ্রহী, ছেলেদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত। তাই হরেন সুনীলের প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

সরমাকে তো আগেই দেখা ছিল, তার সামনেই সুনীল হরেনকে বলল, তুই আমাগে বন্ধু, আর ও হলো সে আমাগে নিজির মানুষ। তুই ওরে বিয়ে করলি ও ভাল থাকপে আর আমরাও শান্তিতে থাকতি পারবো। তারপরই হেসে বলল, আমার ঘাড়ে বাবা আটবছর আগে এট্টারে চাপায়ে দেছে নালি আমিই করতাম। কি সরমা তুমি রাজি তো? হরেনরা হলো গে বদ্দি। আমাগে কায়েতের থে কম না।

সরমার মনে ওসব ব্রাহ্মণ বৈদ্য বিশ্লেষণ ছিল না। সুনীলের সঙ্গে তার মানসিক সম্পর্ক কিছুটা গড়ে উঠেছে, দৈহিক তো পুরোমাত্রায়, এরই মধ্যে হঠাৎ তাকে এমন ভাবে হাত বদল হয়ে যেতে হবে মনের দিক থেকে এ ঘটনার সমর্থন খুঁজে পাচ্ছিল না। বিয়ে মানেই স্বামী আর স্বামী মানেই শারীরিক সম্পর্ক—এ জ্ঞান তার স্পষ্ট। নতুন করে একজনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা তার মনের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এও সত্যি যে তার অন্য উপায় নেই। যে কার্য কারণ সম্পর্কবোধ সাধারণ প্রাণীদের থাকে না তা মানুষ হিসেবে তার আছে। সেই জন্যে সে জানে তার শরীরে যদি কোন গোলমাল হয়ে গিয়ে

থাকে যা মনে হচ্ছে, তাহলে তার একজন স্বামী দরকার যে হবে তার সন্তানের পিতা। প্রচলিত জীবনধারা যে সন্তানের পিতৃত্ব-পরিচয় প্রয়োজন।

তাই সে বাধ্য হয়ে সুনীলের ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি হ'ল।

পরদিনই কোথা থেকে একজন পুরোহিত নামের মূর্খ ডেকে মন্ত্রের নামে কিছু ভুলভাল শব্দ বলিয়ে ফুলের মালা বদল করিয়ে ঘরের মধ্যেই হরেনের সঙ্গে সরমার বিয়েটা সমাধা করিয়ে দিল সুনীল। তার যত অপকর্মের বোঝা ধূর্ত সুনীল বন্ধু হরেনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল যা হরেন জানল না আর জানলেও তার তাতে অমত করবার কোন হেতু ছিল না, কারণ সে জেনেই এসেছিল বোঝা যা বইবার অন্যে বইবে, সে হয়ত পারে সুনীল অথবা সরমা নিজে। তার কোনই লোকসান সেই বরং লাভ আছে অনেক দেরিতে হলেও সম্ভোগের স্বাদ সে পাবে, পেতে থাকবে। এটার জন্যে সে 'বন্ধু' সুনীলের কাছে নিশ্চয় কৃতজ্ঞ।

সরমা দ্বিচারিণী হ'ল না কিন্তু একই সঙ্গে দু'জন পুরুষ তাকে সম্ভোগ ক'রতে লাগল একজন স্বামীত্বের অধিকারে অপরজন তার অর্থ সামর্থ্যের বলবত্তায়।

সোনামণি ভেতরের ব্যাপারটা না জানলেও সব লক্ষ ক'রছিল। তার অভিজ্ঞতা একথা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছিল যে আগন্তুক মেয়েটা শালপাতায় পরিণত হয়েছে। খাওয়া শেষ হলে এঁটো পাতা যেমন ভোজবাড়ির লোকেরা দূরে ফেলে দেয় একদিন তেমনি উড়ে যেতে হবে সরমাকে। সেদিন ধুলোয় গড়িয়ে গড়িয়ে বাতাসে উড়ে বেড়াতে হবে—নিঃস্ব রিক্ত নিঃশেষিত জীবনের মূল্যহীনতায়। প্রথম মাসের ভাড়াটা সুনীলের হাত থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই নিল সোনামণি। পরদিন দুপুরে বাড়ী যখন মধ্য রাত্রির ঘুমে নিঃসাড়, সরমা ভাতঘুমে কাতর সেই সময় দাসী এসে ডাকল, বাড়িউলি তোমাকে ডাকছে।

এই একটা মাসে পাশাপাশি থাকবার জন্যে সম্পর্ক কিছুটা কাছের হয়ে গেছে। সে ডাকতেই পারে। সোনামণির ঘরে গিয়ে সরমা দেখল সে জানালার ধারে পা ছড়িয়ে বসে পান চিবোচ্ছে। সামনে পানের ডাবর চূণ খয়ের জর্দা। সরমাকে দেখে সুপুরীকাটা বন্ধ ক'রে হাতের জাঁতিটা নামিয়ে রাখল। জিজ্ঞাসা ক'রল, একটা পান খাবে?

না থাক।

সোনামণি বলল, না খাওয়াই ভাল। দেখ না আমি কেমন অভ্যেস ক'রে ফেলেছি। বেশি পান খাই বলে বাবু মাঝে মাঝে বকে কিন্তু ছাড়তে পারি না। সে যাক্। কি ক'রছিলে?

কি আর ক'রি কিছু তো কাজ নেই—।

আমারও আজ তাই। ভাবলাম তোমাকে ডেকে গল্প করি। নিচের লতাকে চেনো?

সরমা নেতিবাচক মাথা নাড়ল। এ উত্তর হবে সোনা জানত তবু কথা বলার

জন্যেই যেন বলল, ও হার গড়াবে তাই নিতাই স্যাকরা এসেছিল গরাণহাটা থেকে। আমাকে নক্সা দেখে দিতে বলল, দিলাম। তখনই তোমার কথা মনে হ'ল। তোমার হাতে চারগাছা চুড়ি পর্যন্ত নেই মেয়েমানুষকে এমন শূন্য শরীরে কি থাকতে হয়?

সরমা সোনামণির সহানুভূতির উত্তরে বলল, আমার মত মানুষ সোনা কোথায় পাবে? দুটো ভাত জুটে যাচ্ছে এই না কত?

সোনামণি সরমার কথার প্রত্যুত্তরে তার ভুল ধরাবার চেষ্টা ক'রল, তুমি ইচ্ছে ক'রলে সোনা তো কোন ছার হীরের গয়নায় গা ঢাকতে পার।

সরমা বুঝল বাড়িউলি—তার সঙ্গে ঠাট্টা ক'রছে। তা করুক। একটু ঠাট্টা তামাসাই ক'রছে, খারাপ তো কিছু ক'রছে না! কেউ ভালবেসে যদি হাসি মস্করা করে তো ক্ষতি কি!

সোনামণি ওর অবিশ্বাস বুঝতে পারল। স্মিত মুখে যথেষ্ট গাম্ভীর্য মিশিয়ে বলল, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বিশ্বাস ক'রলে তোমার লাভই হবে। কথা শুনে চললে ছ'টা মাস লাগবে না কপাল খুলে যাবে। তোমার মত অমন শরীর থাকলে রাজ সিংহাসনে শুয়ে থাকা যায়।

বাড়িউলির কথার কোন অর্থ খুঁজে পেল না সরমা। কি যে সব বলছে—। তার গায়ের রঙ ফর্সা নয়, লোকে চিরদিন বলেছে একটু চাপা। কালো নয় শ্যামলী যাকে বলে তাও নয়। দেশে গ্রামে দেখেছে ফর্সা মেয়েরই কদর। সুন্দরী মানেই ফর্সা। সেখানে শরীর বলে কোন কথা নেই। এখানে আবার শরীর বলে আলাদা কথা আছে দেখছি—সরমা ভাবল।

সরমা যখন সাত সতের ভাবছে সেই সময়ে সোনা বলল, শরীরই তো সব। শরীর ঠিক থাকলে কিসের অভাব? আমার অমন শরীর থাকলে আমি কি কখনও একজন বাবুর সেবা করি? তখন বিশজন বাবু আমারই শরীর সেবা ক'রত। এমন চেহারা কি চিরদিন থাকবে? যতদিন আছে ততদিনই যা রাজত্ব করা। তা তুমি বাছা সেই সু-সময়টুকুই যদি হাড়কেপ্পনের হাতে পড়ে খোয়ালে তাহ'লে অসময়ে তোমার গতি কি হবে? তখন তো ছেঁড়া কানির মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এ লাইনে যতক্ষণ শরীর ততক্ষণ সব।

এই 'লাইন' ব্যাপারটা সরমা কিছু বোঝে না, এ বাড়ীতে বিকেল হ'লেই যে যেমন পারে মেয়েরা সব সাজতে বসে, সন্ধে হ'লেই সব মানুষ আসতে থাকে; কে কোথা থেকে আসে সরমা বোঝে না। বাড়িউলির ঘরেও ওনার স্বামী আসে, সরমা একদিন দেখেছে—বেঁটে খাটো একটু মোটা সোটা মানুষ কি পাতলা কাপড়ের সুন্দর পাঞ্জাবী গায়ে, এমন পাতলা ধুতি পরণে যে হাঁটলে পা-টা দেখা যায়। মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। গম্ভীর হয়ে এসে গড়গড় ক'রে ঘরে ঢুকে যায়, তখন আর বাড়িউলিকে কেউ দেখতে পায় না, মাসিও ব্যস্ত হয়ে কাজ ক'রতে থাকে। এটা আনছে সেটা আনছে বায়রনের সোডার জল আনছে—ছুটছেই। সুনীলও সন্ধের

পরই আসে। নরেশবাবুর আড্ডা আর জোড়া লাগেনি বলেই মনে হয় কারণ প্রায় রোজই আসে, সঙ্গে কোন কোনদিন হরেন থাকে, এখানেই বসে মদ্যপানের কাজটা চলে। হরেনকে দিয়েই খাবারটা আনিয়ে নেয়, বাড়ীতে ঢুকে আর খাবার আনতে যাবার নিয়ম নেই, এখানে থেকে আনাতে হ'লে বাড়ীর দাসীদের বা দারোয়ানের লোকেদের দিয়ে আনাতে হবে তাতে টাকার জিনিষে দু আনা বেশি লাগবেই, মেনে নিতে হবে। সুনীলের তাই ব্যবস্থা করা আছে হরেন যেদিন সঙ্গে আসে এলেন হোটেলের চিংড়ি কাটলেট বা লাটুবাবুর দোকানের মোগলাই আনতে টাকা দিয়ে দেয় তাকে। আজকাল সরমা বুঝতে পারে লোকটা এতই নীচ যে ভাল খাবার যাই আনাক না, কেবল নিজের জন্যেই আনে। সরমাকে বাদ দেয় বিধবা সাজিয়ে, যে হরেন হাতে ক'রে খাবার আনে তার জন্যে পর্যন্ত আনতে বলা না। রাক্ষসের তৃপ্তিতে সুনীল যখন মুত চিংড়ি মাছের ঝলসানো ঠ্যাং চিবোতে থাকে হরেন সামনে বসে মদের গেলাস হাতে নিয়ে বাদাম ভাজাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সরমা কখনই সামনে বসে না, নারী মানসিকতায় মানুষকে সামনে বসিয়ে খাওয়াতে তার ভাল লাগবার কথা কিন্তু সুনীলের খাওয়ার সামনে থাকতে তার লজ্জা করে। কলকাতার প্রথম দিন গুলোতে আশ্রয়দাতাদের মধ্যে ভরসাস্থল সুনীলকে বিশ্লেষণ করা তার সম্ভব হয় নি, এখন ক'রতে পারবার আর একটা প্রধান কারণ প্রতিদিনের ব্যবহারে সুনীল এখন প্রায় সম্পূর্ণই উদ্ভাসিত। তার যে অন্তরঙ্গ ব্যবহার সে আর কোন আবরণের আড়ালে নয়। তাই সোনা বাড়িউলি যখন বলে, 'যাদের হাতে পড়েছ তোমার জীবনটাই শেষ হয়ে যবে' ওর মিথ্যে মনে হয় না, ভুলও নয়। কিন্তু উপায় কি? বিধবা মেয়েকে অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সুনীল যা ক'রল তা তো ক'রলই, ভাল হোক মন্দ হোক একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে যখন দিয়েই দিয়েছে আর তো কিছু করবার নেই।

একথাতেও সোনামণির আপত্তি। তাই সে প্রতিবাদ করে, দেখ বাপু আমার এই চার কম দু কুড়ি বয়েসে অমন বিয়ে আমি অনেক দেখেছি, রোজ দেখছি। ও কথা আর আমাকে বলো না। বিয়ে! বিয়ে আবার কি? বিয়ে মানে তো জোর ক'রে ভোগ করা। যখন ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে ভোগ ক'রবে। এই তো? তার চেয়ে আমাদের পাড়ার রোজ রাতের নিকে অনেক ভাল, পয়সা ফেল বিয়ে কর। এখানে মেয়েদের স্বাধীনতা আছে।

সোনা বাড়িউলির কথাটা যে ফেলবার নয় তা সে বুঝল ক'দিন বাদে। হরেন ক'দিন এলই না। সুনীলকে সরমা জিজ্ঞাসা ক'রল, কি আপনার বন্ধুর তো দেখা নেই?

সুনীল মনে ক'রল সরমা হরেনকে তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই সে নিমেষে ক্ষেপে গেল, আমি তোমারে খাওয়াবো পরাবো আর ঐ হরেন, জার টিকে

ধরাবার জামিন নেই, সে হলো গে তোমার আপনজন! মা'য়ে মানুষের জাতটাই দেকতিছি বেইমান।

সরমা বুঝতে পারল না বেইমানীর কোন কাজটা হয়েছে। যাই হোক বাদ প্রতিবাদে যাওয়া তার অনভ্যাস বলে সুনীলের সম্পূর্ণ ক্রোধ সে নীরবে সহ্য ক'রল। হাজার হোক সুনীল ওর অন্নদাতা তো বটে। বলতে গেলে ওর জীবন দেবতা। সরমা তাই আর ওকে কিছু বলতে চায় না। বলবার উপায়ও তো নেই। ও তো পরাধীন, সুনীলের দয়াতেই এখানে টিকে আছে। সুনীল যদি বলে যাও, তবে আর যাবার জায়গা নেই। বাড়ীউলি বলে, এখানে না কি মেয়েরা স্বাধীন। কিসের স্বাধীন? ও স্থির ক'রল সকালেই কথাটা বাড়িউলিকে জিজ্ঞাসা ক'রবে।

ক'রতেই সোনা উত্তর দিল, তুই যদি ওরকম থাকতে ভালবাসিস তো কে তোর কি ক'রবে? তোর ভাল করা তো শিবেরও অসাধ্য!

সরমাকে হঠাৎই তুই তোকারি ক'রতে লাগল সোনামনি। এমন ভাবে কথা বলতে লাগল যেন একান্ত আপনজন। তারপরই বলল, তুই তো এ রকম পরাধীন থাকতে চাইছিস। গ্রাম থেকে যত বাজে ভাবনা সঙ্গে ক'রে এনেছিস সে গুলোকেই মাথার মধ্যে পুরে রেখেছিস্। তুই যদি চাস তো তোর এমন গতি ক'রে দিতে পারি যে পরে মনে ক'রবি হ্যাঁ একদিন সোনাদি ক'রেছিল। সারাজীবন আমার নাম ক'রতে হবে।

সরমা কি বলবে ভেবে পেল না।

সেদিন সন্ধের পর হরেনকে দরজায় দারোয়ান আটকে দিল, বলল, এখন যাবার হুকুম নেই।

হরেন এমনিতে ব্যবহারিক দিক থেকে দুর্বল লোক। আর্থিক দুর্বলতার জন্যে মানসিক শক্তিও তার অনেকটাই কম। প্রথমটা থমকে গিয়ে আমতা আমতা ক'রে বলল, আমার বউ আছে।

এ এলাকার বাড়ীর দারোয়ান বিশেষ মানসিকতার মানুষ, রুক্ষ, রূঢ়, কঠোর এবং কর্কশ ভাষী। সে বলল, যো আছে সো আছে। কাল দুপহরমে আসবে।

আমি রোজ তো আসি।

ও হামি জানে না। ঝামেলা না করিয়ে চলিয়ে যাও। ভিতর যাবার হুকুম নেই। কাল দু পহরমে এসে মালকানির সঙ্গে বাত ক'রবে।

হরেন ফ্যাসাদে পড়ল। সুনীল আজ আসবে না বলে পাঠিয়েছে ঢুকতে না পারলে সে খবরটা বলবে কি ক'রে? রোজই দেখছে লোকটা অথচ আজ বলছে হুকুম নেই। কার হুকুম? এখানে আবার কে হুকুম দিতে যাবে? এ তো বারোয়ারী বাড়ী, তার সামনেই ক'জন লোক ঢুকে গেল। এই কথাটা 'নিবেদন' করা মাত্র দারোয়ানের গলার স্বর পুরোপুরি বদলে গেল, প্রচণ্ড এক ধমক খেল হরেন। তার মর্যাদায় লাগল, অর্থে যতই দীন হোক সে ভদ্র পরিবারের সন্তান তো!

তার তো একটা সামাজিক মর্যাদা আছে। তার বাবা একজন 'বৈদ্য, ভিষগাচার্য'। আর এই দারোয়ানটা যার হয়ত পিতৃপুরুষের ঠিকানা নেই, কে জানে হয়ত জন্মের কোন রীতিসম্মত সূত্রও নেই, সে কিনা এমন ধমক দেয় তাকে! কিন্তু করবার তো কিছু নেই! কি প্রতিকার আছে? সুনীলের যত বাজে কাজ; এখানে কখনও রাখে মেয়েটাকে? কলকাতা শহরে এত বাড়ী আর ও একটা ঘর পেল না ভাড়া নেবার মত? নাঃ কালই একটা ঘর ভাড়া ক'রে এখান থেকে সে নিয়ে যাবে সরমাকে। আর যাই হোক সরমা তার বউ তো! সে নিজে তো বিয়ে ক'রেছে বলে মেনে নিয়েছে!

সন্ধে থেকেই কারও না কারও জন্যে অপেক্ষা ক'রছিল সরমা, সুনীলই হয়ত আসবে, কাল খবর যখন দিয়েছে হরেনও আসতে পারে। যে কেউ তো একজন আসবেই। প্রত্যেক রাতের মত বাড়ীটা সরগরম হয়ে উঠল সে ঘরে বসেই টের পাচ্ছে। সারাদিন রাত একা একা ভালও লাগছে না কি যে করে! সন্ধেবেলাটা ওদের আসা যেন অভ্যেস হয়ে গেছে। যাই করুক কেউ না এলে ভাল লাগেনা, সেটা সে অনুভব ক'রল। মুহূর্তগুলো দীর্ঘ হতে হতে খসে যেতে লাগল। প্রহর পার হয়ে চলল। প্রতীক্ষা তেল ফুরোনো প্রদীপের মত ক্ষীণায়ু হতে হতে এক সময় শেষ হ'ল। নাঃ এতটা রাত যখন হয়ে গেছে আজ আর এল না।

পরদিন সকালে হঠাৎ কি হৈ চৈ। এ ওকে ডাকছে, ও তাকে ডাকছে, কেবল ডাকই শোনা যাচ্ছে নিচের তলার ঘরগুলোতে। এমনটা তো হয় না! সরমার দরজা খোলা ছিল বলেই শব্দটা অনেক মাত্রায় ঢুকে পড়ছিল। সে উঠে দেখতে বেরোবে এমন সময় একটি মেয়ে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে পড়ল, তার মুখে চোখে সীমাহীন ভয়, তোমার ঘরে আমাকে একটু থাকতে দাও ভাই। নইলে ওরা এসে ধরে নে যাবে।

মেয়েটাকে কারা বা ধরে নিয়ে যাবে এই সাত সকালে, কিছুই বুঝল না সরমা। সে হতভম্ব হয়ে মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সোরগোল শুনে সোনামণি এসে হাজির, কি হ'ল রে সৌদামিনী, এত গোল কিসের?

সৌদামিনী জানাল, নিচে দেখনা মাসি একদল হুমদো লোক বাড়ীর মধ্যে ঢুকে এসেচে। মেয়েমানুষও আছে, বলে কলেরার ইংজেকসন দেবে।

বাড়ীর মধ্যে ঢুকে এসেছে? দারোয়ান নেই?

তাকেই তো ধরেছে গো মাসি। সেই তো চেঁচিয়ে পাড়া মাতায় কোরেচে। গীতাকে ধরেও জোর ক'রে দিয়ে দিয়েচে। ঘরে ঘরে গিয়ে ডাকচে। বের ক'রে ক'রে দিচ্ছে। সে এতবড় পিচকিরির মত ইংজেকশন গো মাসি। দারোয়ানজী ধপাস ক'রে পড়ে গেছে।

ওরা কারা? না বলে হুট ক'রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে!

সোনামণি বাড়ীর মালিক সুলভ স্বরে কথা বলছিল বলে সৌদামিনী বলল,

গোল ক'রো না মাসি। টের পেলে এখানে চলে আসবে। কাউকে ছাড়বে না।

কলেরার ইঞ্জেকশান সম্পর্কে ভীতি সকলের আছে বটে, সোনামণির মনে পড়ল দুবছর আগে একদিন এমন একটা সমস্যা হয়েছিল। কর্পোরেশনের লোকেরা এসেছিল ঘরে ঘরে ঢুকে সবাইকে এমনই ছুঁচ দিয়েছিল যে তিনদিনে তার টাটানি কমেনি, ব্যথা মরতে লেগেছিল সতের দিন। এক সপ্তাহ ধরে সকলের আয় রোজগার বন্ধ। সে কি অবস্থা! মেয়েরা সব ব্যথায় নড়তে পারে না এদিকে খদ্দেররা তা বুঝবে না। আর পেটই বা চলবে কি ক'রে? অনেক মেয়েই তো দৈনিক রোজ-গারে ভাত খায়। ও গলির সাত নম্বর আট নম্বর বাড়ীতে তো তাই। সব মেয়েই রোজ আয় করে তবে চলে। রোজ মজুরীর মানুষ সব।

সেই স্মৃতি ভয়ের তো বটেই। তাছাড়া কর্পোরেশনের লোক ওরা কারও কথা মানে না। ওসব পিয়ারা সিং, মনসুর আলি ওদের কাছে সব জুজু। ঐ তো সৌদামিনী বলল, পিয়ারা সিং কাত। এখন কে দোর সামলায়? এ বড় অন্যায়; কোথায় কলেরা তার ঠিক নেই ইঞ্জেকশনের গুঁতোতেই কুপোকাৎ। সোনামণি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

সরমার ব্যাপারটা জানা নেই বলে কি যে হচ্ছে বুঝল না। বাড়ীওয়ালিকে ঐভাবে দরজা বন্ধ ক'রে দিতে দেখে সে ঘটনার ভয়াবহতা অনুমান ক'রল। সৌদামিনী বলল, দরজা বন্ধ ক'রে দাও গো—। সাড়া পেলে এখেনে উঠে আসবে।

কিছু না বুঝেই সরমা দরজায় খিল বন্ধ ক'রে দিল। সৌদামিনী ফিস ফিস ক'রে বলল, তোমার নাম কি? তোমাকে তো আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, কতদিন এসেছ? আমার নাম সৌদামিনী।

আমার নাম সরমা। বাকি প্রশ্নের আর উত্তর পেল না সরমা। সে কেবল দেখছিল বেশ দেখতে এই সৌদামিনী। কি চমৎকার টানাটানা চোখ, মুখখানাও ঢলঢল ক'রছে। মাথায় কত চুল। পাশাপাশি দাঁড়ালে হয়ত দেখা গেল সরমার চেয়ে লম্বা। ভারী ভাল লাগছে দেখতে। কিছুটা সম্ভ্রম সহকারেই জানতে চাইল, আপনি কি এই বাড়িতে থাকেন?

সরমার কথা শুনে খুবই কম শব্দ ক'রে হেসে উঠল সৌদামিনী, না গো। আমি নিমতলাতে থাকি। গঙ্গার মধ্যে থাকি। সেখান থেকে উঠে এসছি।

জবাব শুনে সরমা হাঁ ক'রে রইল। সৌদামিনী কি যে করছে ঠিক বুঝতে পারছে না। বুঝতে পেরে সৌদামিনী বলল, গঙ্গার জল থেকে উঠে এসেছি গো!

দূর! কি জে বলো!

তোমার বাড়ী কোথায়?

সরমা বলে ফেলল, নায়েলেখোলা।

এবার সৌদামিনীর রসিকতা থমকে গেল, ও মা! সে আবার কোথায়?

গেরামে।

চপলতা ক'রে সৌদামিনী বলল, গেরামে তো বুঝলাম সে কোন চুলোর দোরে ?

এবার আবার সরমার বুদ্ধি থমকে গেল। জবাব খুঁজে পেল না। সৌদামিনীই হঠাৎ বলল, যাক গে। এখানে একেবারেই নতুন মনে হচ্ছে। তা বলতো বাপু বারোয়ারী, না কোন বাবুর ?

সরমা এ প্রশ্নেরও অর্থ ক'রতে পারল না। কাজেই উত্তরও দিতে পারল না। এখানকার কথাবার্তা সে কিছুই বোঝে না, কাজকর্মের ধরণ ধারণাও ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি এখনও। লোকজন আসে যায় বটে কি জন্যে আসে যায় তাও বুঝেছে তবে কি সম্পর্কে আসে সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। কারণ সন্ধে হলেই তাকেও ঘরে খিল এঁটে দিতে হয় প্রথমত সুনীলরা কেউ থাকে বলে তাদের ইচ্ছেয়, আর ভয়ে। রাত হলেই এই বাড়ীটা তার কাছে কেমন ভয়ের জায়গা হয়ে ওঠে।

দুঃখের সময় কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে তা গভীর হয়। কলেরা প্রতিরোধক ইঞ্জেকশনের তাড়া খেয়ে সৌদামিনী গিয়ে অচেনা সরমার আশ্রয় নিয়েছিল বলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব একদিনেই হ'ল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। আর সরমাও একজন সমবয়সী মেয়ের সন্ধান পেল যে তার সহবাসী তাই যখন সৌদামিনী বলল, দুপুরে তো কোন কাজ নেই কাল আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব সরমা রাজি হয়ে গেল।

সৌদামিনীর ঘরে এসে সরমা কেবল চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ঘরের এক কোণে মা লক্ষ্মীর ফটো দেখে সরমা ভক্তিভরে জোড়হাতে প্রণাম ক'রল। এক পাশে একটা বিরাট আলমারী তাতে কি সুন্দর নক্সা করা। চকচক ক'রছে আলমারীটা তাতে যেন আয়নাটা অতিরিক্ত, বিনা আয়নাতেই মুখ দেখা যাবে। আয়নাতে গোটা দেহটাই দেখা যাচ্ছে কি চমৎকার আয়না। সামনে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক নিজেকে দেখে মনে হ'ল সৌদামিনীর কাছে সে একান্তই নিষ্প্রভ, সরে গেল। দেয়ালের আর এক দিকে কার যেন একটা সুন্দর ছবি ঝুলছে, কৌতূহল প্রকাশ ক'রল সরমা, কার ছবি গো ওটা ?

জানকীবাই। এই ঘরটাতে উনিই আমাকে বসিয়েছিলেন। এই গোটা বাড়ীটা একদিন ওনার ছিল। উনি যখন দেশে চলেন যান বংশীধর বাড়ীটা কিনে নেয়। আমাকে এই ঘরটায় থাকতে দিয়ে যান। বলা কওয়া আছে আমি যতদিন ইচ্ছে এই ঘরে থাকব। এ বাড়ীতে তাই এই ঘরটায় ভাড়া পায় না সোনামাসিরা। চায়ও না।

কে বংশীধর, সোনামাসি ভাড়া নেবে কেন এর কোন তাৎপর্য খুঁজে পেল না সরমা। তবে কৌতূহল বাড়তে লাগল বলে আবার প্রশ্ন ক'রতে বাধ্য হ'ল, তা সেই তিনি তোমারে দেলেন ক্যান ?

সরমার কথা শুনে হাসল সৌদামিনী, বলল আমি খুব ছোটবেলাতে একজনের সঙ্গে গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রতাম। উনি আমাকে তার কাছ থেকে কিনে নেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল আমাকে গান শেখাবেন, ভিক্ষের গান আর কালোয়াতি গান তো এক

নয়, আমার শেখবার ধৈর্য ছিল না। ওঁর তো বয়েস হয়ে গিয়েছিল, শরীরও খারাপ হয়ে গেল তাই দেশে চলে গেলেন। এ ঘরে যা দেখছ এই খাট আলমারী সবই তাঁর।

সব তোমারে দে গেল!

হ্যাঁ সব। আমাকে টাকাও দিতে চেয়েছিলেন, নিই নি! কেন নেব বল? টাকা তো ওঁর কাজে লাগবে। বুড়ো বয়সে কতদিন বাঁচবেন কে জানে, টাকা ছাড়া আর বন্ধু কে আছে? কিসের জোরে বাঁচবেন?

তুমি নেলে না! আশ্চর্য হয়ে গেল সরমা।

কেন নেব? বাড়ীর ঠিকানা জানলে আমিই এখন টাকা পাঠাতাম তাঁকে। ভুল হয়েছে ঠিকানা রাখিনি। তবে হিন্দি ঠিকানা তো, হিন্দি দেশ! বুঝবো না বলেই রাখিনি।

সে আবার কোন দেশ?

কি জানি বাপু। দারোয়ান আছে না, সে বলে ফৈজাবাদ না কি যেন। কোথায় তা জানি না।

তিনি তোমার কি?

মা বলতাম। মায়ের চেয়ে বড়। উনি যতদিন ছিলেন আমি লাইনে নামি নি। উনি খুব ভাল নাচতেন। বয়েস হয়ে যাবার পর নাচ শেখাতেন। তাতে কি আর চলে? ভাড়ার টাকায় চলত। নিজেই রান্না ক'রতেন আমরা দুজন খেতাম। মাঝে মাঝে খুব বুড়ো লালু পণ্ডিত আসতেন, তিনিও খেয়ে যেতেন। লালু পণ্ডিত না কি ভাল গাইয়ে ছিলেন, ওঁর নাচের সঙ্গে তবলা বাজাতেন। দুজনে খুব ভাব ছিল। গত শীতকালে লালু পণ্ডিত মারা গেলেন, কাশীপুরে থাকতেন। মার কথায় লালু পণ্ডিত রোজ আমাকে গান শেখাতে আসতেন।

অল্প বিরাম দিয়ে সৌদামিনী বলল, মা চলে যাবার পর আমি লাইনে নামলাম।

তার মানে?

এ প্রশ্ন শুনে সৌদামিনী যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সরমার চোখে চেয়ে রইল তারপরই বলল, তোর মত ন্যাকা মাইরি জীবনে দেখিনি। খানকি পাড়ায় ঘর নিয়ে আছিস আর বলছিস লাইনে নামার মানে বলে দিতে! মাইরি! কোনদিন যে আরও কি বলবি তাই ভাবছি। বলি সোনা বাড়ীউলির বাবু কি তোকে মশলা ঝাড়তে রেখেছে?—আকস্মিক ভাবেই বদলে গেল সৌদামিনী এমন সব অশ্লীল ভাষা বলতে লাগল অর্দ্ধেক শব্দের অর্থ জানে না সরমা। যেগুলো জানে তাতেই তার মাথা ঝিম ঝিম ক'রতে লাগল। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে গালাগালি দিয়ে সৌদামিনী বলল, তোর গেঁয়োগিরি ছাড়তো! ওতে চোদ্দবার পেট খসাবি, পেটের ভাত হবে না। এ লাইনে তোর মত বোকা আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাবি না। পেট ভাতায় কাপড় খুলবি স্বামীর ঘরে, এখানে কি মাগ ভাতারের সম্পর্ক! পয়সা নিবি কাপড় খুলবি।

অনেকক্ষণ ধরে অনেক শেখালো সৌদামিনী, অনেক কিছুই শেখালো। পরামর্শ দিল, ভাল ক'রে সাজবি। তোদের গেঁয়ো কথা একদম বলবি না, খদ্দের ভেগে যাবে। সাজবি কি তোর তো কাপড়ও নেই। আচ্ছা এই আমার শাড়ী সায়া নিয়ে যা। আজ পরবি।

সরমা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এবং সে উপলব্ধি ক'রল সে যা জেনেছে তা সত্য নয় এখানে মায়াময় মানুষও আছে।

সেদিনই সন্ধে একটু গভীর হ'তে বাড়ীউলি এসে ডাকল, সরমা শোন?

দরজা খোলাই ছিল, ভেজানো। সরমা সৌদামিনীর কথা রাখবার জন্যেই তার শাড়ীটা পরেছিল, সোনা তারিফ ক'রল, বাঃ শাড়ীটা কোথায় পেলি? যাক শোন আমার জানা খুব ভাল খদ্দের এসেছে তোর ঘরে বসে সরবৎ টরবৎ খাবে। যা খাবে সে আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব তুই কেবল খাতির করে যা বলে শুনবি। অমান্য ক'রবি না ভাল খদ্দের, আখেরে ভাল হবে।

শুনেই সরমা ভয় পেয়ে গেল। সোনা তাকে অভয় দিল, আজ তোর খচ্চর বাবুরা আসবে না। ওরা কাল দুপুরে আসবে।

সরমা ভেবে পেল না ওরা আসছে না কেন। হরেন তো হঠাৎ এল হঠাৎ বিয়েটা হ'ল আবার হঠাৎই উধাও। সুনীল না এলেই সর্বনাশ। সোনামণিই আবার বলল, তোর কোন চিন্তা নেই, ওদের দায়িত্ব আমার। তুই কেবল খদ্দেরটাকে সন্তুষ্ট ক'রবি, অনেক ট্যাকা পাবি। এই নে, বলে দুটো দশ টাকার নোট হাতে ধরিয়ে দিতে সরমা সবিস্ময়ে সোনাবাড়ীউলির মুখের দিকে চেয়ে রইল। সোনা বলল, এ ট্যাকা তোর। যে বাবুটি এসেছে, তোকে দিল। তুই থাক আমি আসছি, বলেই চলে গেল।

দুমিনিটও সময় গেল না দাসী একজন মাঝ বয়সী মানুষকে এনে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। লোকটার অতি পরিচ্ছন্ন পোষাক, ফিনফিনে ধুতি, তেমনই পাঞ্জাবী গায়ে, সবই সাদা ধপধপ ক'রছে, চেহারাটিও বেশ সুন্দর, পোষাকের সঙ্গে মানানসই। দাসী নিজেই দরজাটা টেনে দিল। বাইরের একজন অজানা অচেনা লোক দেখে সরমার যেন ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি ধরে গেল। সুনীলরা দুদিন কেউ আসছে না, যদি নাই আসে তবে তো ওদের খুঁজে পাবারও কোন উপায় নেই, সেক্ষেত্রে এই বাড়ীউলির ওপর নির্ভর ক'রেই বেঁচে থাকতে হবে। তাছাড়া বাড়ীউলি মানুষ ভাল, কতগুলো টাকা দিয়ে গেল তাকে। অত টাকা জীবনে হাতে ধরে নি সরমা; সত্যি কথা কি টাকাই কখনও ছুঁয়ে দেখেনি, যা এখনও হাতে এসেছে সে হ'ল পয়সা। আনি, দু আনি, এক পয়সা, আধলা অথবা পাই পয়সার মুদ্রা; তাও অবরে সবরে, দৈবাৎ। দশ টাকার নোট সে জীবনে প্রথম এমন ভালভাবে হাতে নিয়ে দেখল তাও এক সঙ্গে দু খানা। নিজের বলে তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না। বাড়ীউলি দিয়ে গেলেও অনেকক্ষণ হাতেই ধরেছিল সত্যিই কাছে রাখবে কি না

ভাবছিল, রাখবেই বা কোথায় ? ফেরৎ চাইবে না তো ? চাইলে চাইবে—তার তো রাখবারই জায়গা নেই।

এই লোকটাই নাকি অতগুলো টাকা দিয়েছে। যে লোক অত টাকা দিল সে যে কি ক'রতে বলবে কে জানে! ভয়ে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে সিঁটকে যাচ্ছে সরমা। এই সময় আবার দরজা ঠেলে দাসী ঢুকল, হাতে সরবতের গ্লাস। সেটা নামিয়ে রেখেই সে চলে গেল। বাবুটি নিজের জামা খুলে দেয়ালে জায়গা দেখে ঝুলিয়ে দিল। অন্য মেয়েরা দৌড়ে এসে হাত থেকে জামা নিয়ে নিজেরাই ঝুলিয়ে দেয়, কেউ কেউ খুলতেও সাহায্য করে অথচ এই মেয়েটা এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীউলি অবশ্য বলেই দিয়েছে 'একদম নয়া—বাগেচাকা তাজা চায়'। ইচ্ছা করেই এ ঘরে আসতে রাজি হয়েছে শেঠ করমচাঁদ। সোনা সত্যি কথাই বলে বলেছে বিশ্বাস করা যায়। এবার নিজের গেঞ্জিটা খুলে সরমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, রাখ।

ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে গেঞ্জিটা নিয়ে খুলে রাখা পাঞ্জাবীর পাশে টাঙিয়ে দিল সরমা। শেঠজী বিছানার ওপর বসে হুকুম দিল, কাপড়া উতারো।

সরমা কিছুই বুঝতে পারল না। শেঠ আবার বলল, বদনকা কাপড় উতার লেও।—বলে নিজেই বুঝল নতুন মেয়েটি তার ভাষা বুঝছে না তাই সে হাতের ইসারায় কাছে ডাকতে সরমা গিয়ে এলে পাশে বসালো। তারপর শাড়ীতে হাত দিয়ে বলল, কাপড় খুলো।

এ কি বিড়ম্বনায় পড়ল সরমা, সুনীল যা করবার করেছে কাপড় খুলতে তো কখনও বলে নি। সৌদামিনীও অবশ্য কবারই কাপড় খোলবার কথা বলেছিল তাহলে বোধ হয় খুলতেই হয়। অতি সন্তর্পনে একান্ত দ্বিধার সঙ্গে নিজের শাড়ীখানা খুলে রাখল সরমা। শেঠ করমচাঁদ সরবতে চুমুক দিতে দিতে বলল, আর ভি খুলো।—সরমা দ্বিধা করছে দেখে বলল, হামি তুমার বদনমে হাত দিবোনা। লেকিন কাপড়া উতারতে হবে।

এবার খুললে ন্যাংটো হয়ে যাব তো—মনে মনেই আতঙ্ক প্রকাশ করল সরমা। সে পারব না। পরক্ষণেই টাকাগুলোর কথা মনে পড়ল সরমার, সেগুলো বুকের খাঁজে ব্লাউজের ভেতরে ভাঁজ করে রাখা আছে, দেবার সময় বাড়ীউলি বার বার বলেছে, যা বলবে শুনবি। কথা শুনিস কিন্তু। তা বলে এই রকম কথা এ কি শোনা সম্ভব ? ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে যদি যা খুশি ক'রত চেনা হোক অচেনা হোক না হয় চোখ বুঁজে মেনে নিত, এই একঘর আলোর মধ্যে বলে ন্যাংটো হও। অসম্ভব।

লোকটার একটাই জেদ কাপড় খোল। একদম খুলে ফেল।

অদ্ভুৎ লাগল ; লোকটা গায়ে হাত দেয় না, জোর করে না ; তা যদি ক'রত সে না হয় বাধা না দিয়ে যা ক'রছে করুক বলে মেনে নিত। তাও নয় বলে নিজে

খোল। তা কি সম্ভব ? নিজে কি ক'রে নিজের কাপড় খুলে ন্যাংটো হয়ে একজন লোকের সামনে দাঁড়াবে! কিছুতেই পারবে না সরমা।

সরমাকে অনঢ় দেখে করমচাঁদ বলল, দাসী কো ডাকো।

সরমা দরজা খুলে বাইরে বেরোতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বারান্দাতেই মাসীকে পেয়ে গেল। ডাকছে শুনেই দাসী বলল, এত ভাল খদ্দের বাড়ীউলি তোমাকে দিল, রাখতে পারলে না ? পরে এর জন্যে পস্তাবে এও বলে রাখলুম। চল যাই।

ঘরে ঢুকতেই করমচাঁদ বলল, সৌদামিনীর ঘর খালি আছে কি না দেখ।

দাসী জানাল, আমি এখনই সারা বাড়ী ঘুরে আসছি। সৌদামিনী বন্ধ, সত্যবলার ঘর খালি আছে দেখলুম। নীরজাও আছে।

ওদেরকে অত পছন্দ নয় শেঠ করমচাঁদের। ওর প্রথম পছন্দ সৌদামিনী। এসে তাকে না পেয়ে সোনামণির প্রস্তাব মত এ ঘরে আসা। মেয়েটা সুগঠনা, ভালই শরীর তাই মোটামুটি পছন্দও হয়েছিল, কিন্তু একেবারে আনাড়ী যে! নাঃ সারাদিন কাজ কর্মের পর একটু আরাম ক'রতে এখানে আসা, তাও যদি এরকম হয় তো কি করা যাবে ? বংশীধর যেমন পাকাপাকি ভাবে একজনকে বেঁধে রেখেছে করমচাঁদকেও তাই রাখতে পরামর্শ দেয়, ওর তাতে আপত্তি। ধরাবাঁধা একমাত্র স্ত্রী-ই থাকতে পারে অন্য কেউ নয়। এ ব্যাপারে করমচাঁদ স্বতন্ত্র ভাবে চিন্তা করে, স্ত্রীর সঙ্গে যে সম্পর্ক তা অন্য কারও সঙ্গে হ'তে পারে না। বাড়ীতে যেটা সম্ভব নয় সেই আরামের জন্যে তার এখানে আসা। ওর ভাষায় তার নাম দেহ মালিশ। এই মালিশের ব্যাপারে তার সৌখিনতা আছে। কোন কর্কশ পুরুষ হাত নয় নরম নারীর করস্পর্শ তার সারা দেহে সুর তুলবে। এবং সেই নারী হবে নগ্ন এবং সুতনু। তার দেহ সৌন্দর্য উপভোগ ক'রবে করমচাঁদ।

শেঠ করমচাঁদের অদ্ভুত ক্ষমতা এই যে সে নিজে শরীরের গোপনাংশটুকু কখনই উন্মুক্ত ক'রবে না এবং কোনদিনই সে আত্মসংযম হারিয়ে দেহ মিলনে নিরত হয় না। এই বিস্ময়কর সংযমে এ পাড়ার মেয়েরাও অবাক হয় না এমন নয়, সুরসিকা সৌদামিনী পরদিন সরমাকে দুঃখ ক'রে বলল, তুই যা ভুল ক'রলি সরমা তার আর কোন মাপজোপ নেই। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি শেঠকে কাবু ক'রতে পারিনি। কোনদিন লোকটাকে ভাঙ্গতে পারলাম না। একদিন এমন অবস্থা হ'ল যে উঠে পালিয়ে গেল, থাকতে না পেরে বাড়ী ফিরে গেল আমাকে বলল, তুমি বড় বদমাস। আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছেন! আমাকে বকে দিয়ে বলল, ঘরে যাচ্ছি। ঘরে কি বউ নেই ? সে তো আমারই জন্যে অপেক্ষা করে—। শেঠজী সকলের ঘরে যায় না। সোনামাসি তোকে সত্যিই ভালবাসে যে জন্যে অমন সোনার খদ্দেরকে তোর ঘরে পাঠিয়েছিল। তোকে শেঠজীর পছন্দও হয়েছিল আর তুই বোকা ওকে ছেড়ে দিলি! দূর হতভাগী!

সরমাকে বার বার ধিক্কার দিয়ে সৌদামিনী বলল, লোকটার একটাই জেদ শরীরে কাপড় রাখতে দেবে না। কাপড় ছেড়ে ওর গা হাত পা টিপে দাও, সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দাও চুপচাপ পড়ে থাকবে। বিশেষ তাকাবেও না; এ আধবার হয়ত তাকাতে পারে। গায়ে হাত পর্যন্ত দেবে না। টাকা? অন্য লোকে এক টাকা দিলে শেঠজী পাঁচ টাকা দেবে, এত ভাল। সোনামাসির বাবু তো টাকা খসায় না। বরং এখান থেকে টাকা তোলে। বাড়ী ভাড়ার টাকা মাঝে মাঝে নিয়ে যায় লোকটা। অথচ জানিস তো ওর ছেলে পিলে নেই। কিছু না। বাড়ীতে বউ একা। এখানে সোনামাসি যেমন ওর বউও তেমন, একা পড়ে থাকে। কোন এক আত্মীয়ের ছেলেকে না কি মানুষ ক'রছে। সেই ছেলের বিয়ে থা দিয়েছে। দারোয়ান মাঝে মাঝে বাবুর গদিতে যায়, সব জানে।

সরমার বোকামী নিয়ে সোনা বাড়ীউলিও কম দুষলো না। অনেক কথাই বলল। সে সব কথার মধ্যে শালীনতা প্রায় সময়েই রইল না, অশ্লীল শব্দ ও ভাষা অনর্গল এসে গেল মনের আবেগে। সরমা সব চুপচাপ শুনল। কারণ মেনেই নিয়েছিল তার বোকামা হয়েছে। শেঠ করমচাঁদের নাম ক'রে তাকে ফেরৎ দিতে হবে বলে সরমাকে দেওয়া টাকাও সে ফেরৎ নিয়ে নিল। এমনিতে গালাগালি খেয়ে কোন কষ্ট হয়নি সরমার বুকের মধ্যে থেকে টাকাটা ফেরৎ দেবার সময় হ'ল। মনে হ'ল জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে সে নোট দুটো তুলে আনছে না, বুকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বুঝি নিজের হৃদয়টাকেই উপড়ে আনছে।

এতক্ষণ তার যে কথা মনে হয়নি এখন হ'ল; ভুলই হয়েছে। একজন তো নয় এর মধ্যেই তো তিনজন লোক তাতে উপগত হয়েছে কি ক্ষতি তাতে হয়েছে! সে তো যেমনকার তেমনই আছে। বন্ধ দরজার মধ্যে সে যাই ক'রত—কিছুই তো ক'রতে হ'ত না বলছে—যদি কারও বাড়ীতে কাজই ক'রত গা হাত পা টিপতে তো হ'ত! এখানেও তো তার বেশি কিছু নয়! না হয় শরীরে কোন কাপড় থাকবে না, তা না থাকল! কে আর দেখতে যাচ্ছে তাকে! বাইরে বেরোলে তো কাপড়চোপড়ই দেখে সবাই, কে আর শরীর খুলে দেখে?

যে সোনামণিকে এতদিন ধরে এত মমতা প্রকাশ ক'রতে দেখেছিল এখন হঠাৎ আবিষ্কার ক'রল সে বড়ই নির্মম। টাকা ফেরৎ নেবার ব্যাপারে তার একটুও দুর্বলতা নেই, শক্ত হয়ে সে ধমকালো, নাও নাও, তাড়াতাড়ি কর।

টাকা হাতে নিয়ে বলল, এ যুগে কারও ভাল ক'রতে নেই। তোমার ভালমন্দ তুমি দেখবে আমি আর কিছুতে নেই। তোমার পীরিতের নাঙেরা টাকা না দিলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেব। ভাড়া যখন দিইচি তখন ভাড়া নিয়েই আমার কাজ। তোমার ভালমন্দ তুমি দ্যাখ।

সৌদামিনীর ঘরে গিয়ে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল সরমা। সেই অবস্থাতেই

বলল, আমি কি করবো দিদি বুঝতে পারতিছি না।

খালিগায়ে বুকের তলায় বালিশ রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিল সৌদামিনী। পরণে শুধু একটা সায়া ছিল তাও না থাকার মত, পায়ের দিক থেকে গুটিয়ে হাঁটুর কাছে জড় হয়ে গিয়েছিল।

মুখের সামনে বসে অমন অঝোরে মেয়েটা কাঁদছে দেখে সৌদামিনী উঠে বসল, বইটা মুড়ে পাশে রেখে প্রশ্ন ক'রল, আবার কি হ'ল!

দুদিন হলো কেউ আমার খবর নেয় নি।

কে নেয়নি, তোর বাবুরা? সে আর তুই কি ক'রবি! ওদের বাড়ী চিনিস?

আমি কিছু চিনি নে।—ধীরে ধীরে নিজের ইতিহাস সমস্তই জানাল সরমা কেবল নিজের গ্রামের নাম, বাবার নাম ইত্যাদি নামধামগুলো গোপন রাখল!

সমস্তই মনযোগ শুনল সৌদামিনী, সে এতটা জানত না। আগের দিন কিছুটা শুনেছিল তা থেকেই তার মমতা হয়েছিল আজ এই অসহায় মেয়েটির করুণ অবস্থায় নিজের অসহায়তা মনেই এল না। তারই বা কি আছে? চারপাশে শূন্যতা ছাড়া যে কিছু নেই সেকথা মনেই এল না, কেবল সরমার দুঃখে কাতর হয়ে বলল, তোর ঘর ভাড়ার জন্যে ভাবিস না, খাবার পরবার জন্যেও নয়। আমি যদি খেতে পাই তো তোরও জুটবে। কিন্তু তোর কি আছে বল তো? ঐ বজ্জাতগুলোকে ছেড়ে দে, তোর কোন উপকার করে নি, তোকে মুরগী ক'রেছে ঐ খচ্চরটা ওকে আমিও চিনি অনেকদিন ধরে এ বাড়ীতে আসে। একটু মোটা সোটা মত দেখতে তো? আস্তে আস্তে কথা বলে? ও একটি তিলে খচ্চর। একদিন আমার ঘরে এসেছিল তারপর থেকে আমি ঢুকতে দিই না, মায়ার কাছে আসে। ওকে একদম পাত্তা দিবি না, এলে ঘরে তুলবি না। আমাদের পাড়ার দারোয়ানগুলো সব হারামী, পয়সা পেতে শালা গরু ঢুকিয়ে দেবে বাড়ীতে, নইলে পিয়ারা সিংকে বলে দিতাম ঢুকতে দিত না। তবে পিয়ারা সিং আবার সোনাবাড়ীউলির খুব বাধক। এক ঐ দাসী ছাড়া কেউ জানে না আগে মাঝে মাঝে পিয়ারা সোনার সঙ্গে শুতে আসত। সোনার তো কোন বাবু তোলবার হুকুম নেই কিন্তু ঐ জালানবাবুকে দিয়ে যখন না হ'ত তখন মাঝে মাঝে নিজের দরকারে পিয়ারাকে ডেকে নিত সোনা। আমি একদিন খুব ভোর বেলা পিয়ারাকে ঢুকতে দেখেছি সোনার ঘরে।

কথাগুলো খুব সন্তর্পনে বলে জানাল, একথা যদি একবার বংশীধর জানতে পারে তো সোনারও শেষ পিয়ারার চাকরীও শেষ। আমি বলব না, একজনের ক্ষতি ক'রব কেন বল? শরীরের খিদে তো সকলেরই আছে। সোনামাসির কি দোষ? তা তুই বোকা সোনামাসি তোর এত সাহায্য করল তুই বোকামী করলি কেন? তুই ঐ হুমদোটাকে ভাতার ভেবে বসে আছিস বুঝি? সত্যি মাইরি তোর মত—বলেই একটি অতি অশ্লীল গালাগালি দিয়ে বলল—মেয়েমানুষ আর নেই। এখানে এসেছিস যতদিন শরীর ততদিন পয়সা, তারপর সব ফাঁকা। ছেঁড়া ন্যাকড়া,

বুঝলি! আমরা যেমন ন্যাকড়া ফেলে দিই তেমনি সব গতর ফুরোলে মাসিকের ন্যাকড়া। আগে যা পারবি; যদি রাখতে পারিস তো সরমারাণী, না পারলে সরমাদাসী। আমাদের এই দুটোই ভবিষ্যত, তিন নম্বর নেই।

সরমা চুপ করেই সব শুনল। সে বলবার মত কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। যা শুনছিল সব কথা যে তার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল এমনও নয়, অনেক কথা কেবল কানে ঢুকল মাত্র। চুপ করে শুনছে বলে সৌদামিনী মনের আবেগে বলে যাচ্ছিল, তুই পুতুলদিকে চিনিস? সরমা মাথা নাড়তে বলল, দেখবি এই বাড়ীতে ঐ কোণের ঘরটায় সন্ধেবেলা আসে। এটাই ওর আসল ঘর। ওর একটা মেয়ে আছে, মেয়েটা যে কি সুন্দর দেখতে সে আর তোকে কি বলব! কেষ্ট নগরের পালেরা কুমোর টুলিতে অমন মুর্তি গড়তে পারবে না। সেই মেয়েটার এখন বার বছর বয়েস। পুতুলদি তাকে শীলেদের ইস্কুলে পড়ায় রাত্তির বেলা খাটাখাটনি করে ভোরের সূর্য উঠতে না উঠতে নীলমনি মিত্তিরের গলিতে যে বাড়ীতে মেয়েটাকে রেখেছে সেখানে চলে যায়। মেয়েটা জন্মানোর কিছুদিন পরেই ঐ ঘর ভাড়া নেয় পুতুলদি। সারাদিন মেয়ের সঙ্গেই ওখানে থাকে, রান্না খাওয়া করে, মেয়েকে ইস্কুলে পাঠায়, তাকে পড়ানোর জন্যে মাস্টার রেখেছে, সেই মাস্টার রোজ সকালে পড়াতে আসে।

এবার সরমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, মেয়েটার বাপ কোথায় থাকে?

সৌদামিনী হেসে বলল, বাপ আবার কোথায় পাওয়া যাবে রে? মায়ের পেট বাধালেই কি কেউ বাপ হয়? মেয়ের বাপ থাকলে পুতুলদির মত মানুষ কি কখনও রাজ্যের মানুষের বিছানা সাজে? পুতুলদি ঘরোয়া মেয়ে, অনেকটা তোর মত। তা কথায় কি আছে জানিস, অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর অতি সুন্দরী না পায় বর। পুতুলদিকেই তো তাই দেখছি। আবার পুতুলদি যা চাইছে তাও হবে না, ভাবছে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্দর লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘর ক'রতে দেবে—পারবে না। ঐ ভদ্দলোকেরাই মেয়েটাকে ছিঁড়ে খেতে চাইবে, সবাই মিলে চেটে চেটেই ফুরিয়ে ফেলতে চাইবে। যাদের ভদ্দরলোক বলিস সব এক একটা গাছ খচ্চর।

একটানা গল্প শুনতে শুনতে সরমা প্রশ্ন ক'রল, তুমি লেখা পড়া জান?

এবার বেশ মন খুলে হাসল সৌদামিনী, প্রতিপ্রশ্ন ক'রল, হঠাৎ তোর একথা মনে হ'ল কেন?

বই পড়ছ যে!

তুই জানিস না?

গাঁয়ের নন্দমাষ্টারের পাঠশালায় চার ক্লাস পড়েছি।

তবে তো অনেক পড়েছিস রে। আমার পড়া বাড়ীতেই। এখানেই একজন নিমাই মাষ্টার আসত সবাইকে পড়াতো। এ পাড়ার অনেক ছেলে মেয়েকে পড়াতো। আমার জন্যে তাকেই রেখেছিল ঐ যে বলেছিলাম জানকীবাই। আমার জন্যে

বেচারী অনেক ক'রেছেন, মায়ের চেয়ে বেশি।

তুমি তাঁকে মা বলে ডাকতে ?

'পেয়ারীমা'। যাকগে শোন আমি এখন ঘুমোবো। তুই যা শুয়ে নে। আজ রাতে আমি খদ্দের পাঠাব। ঝামেলা করিস নি। ভাল খদ্দের নষ্ট ক'রবি না। মানী খদ্দেররা একবার ফিরে গেলে আর আসে না। লোকসান হয়।

কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা ঘটল সেদিন সন্ধেবেলা। আবার এল শেঠ করমচাঁদ, সোনাকে বলল, ও হি লেড়কি কো চাহিয়ে যো কি কাল গোলমাল কিয়া।

সোনামণি তো অবাক। বলে কি শেঠজী! সে কিনা ভেবেছিল শেঠ আর এ বাড়ীর মুখ দেখবে না আর সেই শেঠ এসে সেই মেয়েরই ঘরে ঢুকতে চায় যার ওপর বিরক্ত হয়ে কাল চলে গিয়েছিল! কালে কালে আরও কি দেখতে হবে! সে যা হয় হোক মালিকের বন্ধু বলে কথা, তার মর্জির মূল্যও কম নয়। তাড়াতাড়ি খাতির ক'রে বসালো সোনামণি, দাসীকে বলল, যাও সরমাকে খবর দাও।

দাসী অবাক হয় না, সে যা দেখে ভাবলেশহীন ভাবেই দেখে কোন কিছুই তার মনে রেখাপাত করে না। সরমাকে বলতেই সে মানসিকভাবে শক্ত হয়ে গেল, কাল সৌদামিনী শুধু মুখেই তাকে বোঝায়নি কাজে ক'রেও দেখিয়েছে। ঘরের মধ্যে প্রায় বিবস্ত্র হয়েই তো ছিল, যতক্ষণ সরমার সঙ্গে কথা বলল ঐ ভাবেই বলল। কোমরে সায়াটা যে বাঁধা ছিল, তাও ছিল হেলফেলা ক'রে নেহাৎই না বাঁধলে নয় তাই বাঁধা, তবে বাঁধতে না পারলেই যেন ভাল হয় এমন ভাব। তা সরমাও একজন মানুষ তো বটে, ঐ লোকটাও মানুষ। তবে আর কিসের তফাৎ? আসুক। দাসীকে বলল, হ্যাঁ মাসী আমি কি ভাল শাড়ীখানা পরে নেব ?

নেবে নাও—নির্লিপ্তভাবে বলল দাসী। তারপর সংযোজন ক'রল, তবে দেরি ক'রো না। যা ক'রবে তাড়াতাড়ি কর।

শেঠ করমচাঁদ আজ আর সরবৎ খেল না, সে এক প্যাকেট ধূপকাঠি এনেছিল সরমার হাতে দিয়ে বলল, দু'টা কাঠি জ্বালিয়ে দাও।

সরমা অতি বাধ্য মেয়ের মত দুটো কাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে প্রতীক্ষা ক'রে রইল পরবর্তী হুকুমের জন্যে। করমচাঁদ গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলতে গিয়ে একতাড়া নোট পড়ে ছিটিয়ে যেতে শেঠ বলল, উঠাও।

তুলতে গিয়ে সরমা দেখল নোটগুলো বড় বড়। দশটাকার তো নয়। ইংরিজিতে এক তারপর দুটো শূন্য আঁকা। ওরে বাবা এতগুলো একশো টাকার নোট! কত টাকা ? গোনবার কথা মনেও এল না সরমার, তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। অতগুলো নোট কুড়িয়ে তুলতে গিয়েই তার শরীরে শিহরণ জাগছিল। এতটাকা এক সঙ্গে—এ যেন স্বপ্নের পক্ষেও অসম্ভব। ইতিমধ্যে ধূপের গন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত হয়ে উঠল, কি মিষ্টি গন্ধ! এমন সুঘ্রাণও কোনদিন পায়নি সরমা।

টাকাগুলো কুড়িয়ে দিয়ে ঘরের অপরপ্রান্তে গিয়ে দেখল সেই সুগন্ধ সেখানেও ছড়িয়ে আছে। আজ শ্বাস নিতেও যেন অন্য রকম লাগছে, আনন্দ হচ্ছে। মনপ্রাণ তৃপ্তিতে ভরে উঠল। প্রচুর টাকা অথবা অমেয় সুবাস যে কোনও একটা অথবা দুটো মিলেই প্রভাবিত ক'রল সরমাকে। কিংবা হয়ত সোনামণির ধিক্কার এবং সৌদামিনীর সুপরামর্শ তাকে বাস্তবমুখী ক'রে তুলেছিল যে জন্যে সে নিজেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত ক'রে নিয়েছিল। কেবল দ্বিধান্বিত অপেক্ষা ক'রছিল শেঠ কি হুকুম করে তারই জন্যে। তার বদলে শেঠ বলল, শুনো। ইধার বইঠো।

নিজে বিছানার ওপর জোড়াসন হয়ে বসে সামনে বসবার জায়গা দেখাল ইঙ্গিতে। সরমা সন্তর্পণে গুটিসুটি বসলে করমচাঁদ বলল, এ ভি এক মন্দির আছে, মন্দির মালুম? যেখানে পূজা হোয় !

বাধ্য খুকির মত মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সরমা। করমচাঁদ সন্তুষ্ট হয়ে বলল, হাঁ। হর কামই সেবা আসে। মন্দির মে যেমোন হোয় সেমোন কাম করা উচিত। রুজগারকে কাম ভি মনসে করো। তব কাম বাড়বে রুজগার বাড়বে।

সরমা অনেকটা বুঝল, কিছুটা বুঝল না। যে টুকু বুঝল তাতে তার যে কি করণীয় সে বিষয়ে কোনই নির্দেশ ছিল না। সৌদামিনী বলেছিল এই শেঠকে গা হাত পা টিপে দিতে হয়। কিন্তু কেমন ক'রে তা বলে নি। একজন লোক কেবল গা হাত টেপাতে আসবে তা কেমন ক'রে হয়? সে যদি কারও মাথা ব্যথা করে তো বললে টিপে দেওয়া যায়, কথা নেই বার্তা নেই শুধু শুধু সে টিপতে বসে কি ক'রে? সরমা বড় ধন্দে পড়ল।

এর মধ্যেই করমচাঁদ বলল, আর হাম থোড়া আরাম করে গা। গায়ের গেঞ্জিটাও খুলে ফেলতে আজ সরমা প্রত্যক্ষ ক'রল, কি গায়ের বর্ণ! যেন মাখনের মত। অমন সুন্দর শরীর যে মানুষের হয় সরমার জ্ঞানে ছিল না। তাদের দেশে বহুলোকের দেহ তো অহরহ দেখা যায়, দেখেছে, এখানেও আদুর গায়ে দেখেছে সুনীল আর হরেনকে। সেগুলো ছিল স্বাভাবিক। এ যেন এক অসাধারণ, না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না মানুষের শরীর এমন হ'তে পারে। তার নিজেরই ইচ্ছে হ'ল হাত দিয়ে দেখে এটা মানুষের দেহ কিংবা অন্য কিছু। মানুষের দেহে হাড় থাকে, তাদের গ্রামে অনেক মানুষেরই নগ্ন উর্দ্ধাঙ্গ দেখেছে সরমা, হাড়গুলো সব সারি সারি গুণেও নেওয়া যেত, এর তো তার কিছুমাত্র নেই। তবে কি হাড় নেই মানুষটার শরীরে?

ছোট্ট সুন্দর একটা চ্যাপটা টিনের কৌটো সরমার হাতে দিল করমচাঁদ। সরমা হাতে নিয়ে ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা ক'রল যে বস্তুটা কি। করমচাঁদ বুঝল সরমা খুলতে পারছে না; সে ছোট মুখটার কাছে একটু ঠেলতেই সারবন্দি ফুটো দেখা গেল ঝাঁজরির মত, উপুড় ক'রে হাতে ঝাঁকানো মাত্রই সুগন্ধি সাদা ধুলোর মত কি যেন পড়ল। যেমন মিহি তেমনই তার গন্ধ। করমচাঁদ নিজের

ডান বাহুতে লাগিয়ে দিতে বলল। একে যে পাউডার বলে সে ধারণা সরমার ছিল, তাদের গ্রামের নিশি ঘোষ, তাদেরই জ্ঞাতি, লোকটা দরিয়া মেজাজের ছিল, বাইরে কোথায় যেন কি চাকরী ক'রত বাড়ী যাবার সময় বৌ মেয়ের জন্যে এইসব বিলাসের উপকরণ নিয়ে যেত, তার মেয়ে মেখে বেড়াতো, গ্রামের আর পাঁচটা মেয়ে যাদের ওসব চল ছিল না পাউডার মাখা সঙ্গিনীকে দেখে বলত মেমগুঁড়ো মেখেছে। তাদের সকলেরই ধারণা ছিল 'মেমগুঁড়ো মাখলি ফর্সা হয়।' তবে কি এই শেঠ পাউডার মেখে মেখেই এমন ফর্সা! যে হাতে পাউডার লেগেছিল তা নাকের কাছে ধরে শুঁকলো সরমা—আঃ কি সুঘ্রাণ? খুব মৃদু কিন্তু খুবই মনোরম। কোনও ফুলের মত? নয় তো! তবে কিসের মত? কোনই উপমেয় খুঁজে পেল না স্মৃতি ভাণ্ডারে, শুধু বিভোর হয়ে গেল সরমা। তার ওপর ঘরের মধ্যেটা ভরে গেছে ধূপের সুবাসে। কি ভালই যে লাগছে—! ঘরটা যেন বদলে গেছে। রোজ ঘরটা থাকে ভ্যাপসা গন্ধে ভরা, রোজ বোঝা যায় না, আজ বোঝাচ্ছে। এই মানুষটা যদি রোজ আসে তবেই না এই ঘর এমন গন্ধ আমোদিত হয়ে থাকবে। সৌদামিনী বুঝিয়েছিল, কোন মানুষ কিসে সন্তুষ্ট হয় সেটা বুঝতে পারা আমাদের ব্যবসার সবচেয়ে বড় গুণ। তুই যদি না বুঝিস তবে কেউ তোর কাছে যাবে না। যে যা চায় বাড়ীতে তা পায় না বলেই না এখানে আসে। আমরা দিতে পারলে তবেই আসবে। না দিতে পারলে আসবে কেন?

প্রিয় বান্ধবীর কথাগুলো মনে পড়া মাত্রই নিজের শাড়ী খুলে ফেলল সরমা। ডানহাতের পাতায় পাউডার ঢেলে করমচাঁদের পিঠে বুলিয়ে দিতে দিতে মনে হ'ল, আপনার শোবার মত বিছানা তো আমার এখানে নেই—। তার যা মনে হ'ল অকপটে বলে ফেলল। সে ভাবল, একটা ভাল চাদর থাকলে অন্তত পেতে দিতে পারত, তাও নেই।

সরমার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে করমচাঁদ শয্যার দিকে চেয়ে দেখল সেটি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্নও বটে। সে তাই সেখানেই শুয়ে পড়ল। সরমা তার দেহে পাউডার মালিশ করা সুরু ক'রতেই করমচাঁদ বলল, বদনকে কাপড়া উতার লোও—কথার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলের ইসারায় গায়ের সেমিজ খুলে ফেলবার কথাটা বুঝিয়ে দিল।

সরমা অত্যন্ত সংকোচ সত্ত্বেও বাধ্য মেয়ের মত এক ঝটকায় নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে ফেলল, এবং জীবনে এই প্রথম পরিণত বয়সে কোন মানুষের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র ক'রল। করমচাঁদ ওর শরীরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বলল, তুম বহুৎ পেয়ারে হো।

প্রায় একঘণ্টা বাদে উঠে বসল করমচাঁদ, নিজের কাপড় জামা পরে নিল, সরমার পোষাক পরা হ'লে তার হাতে একটা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল আপনা কাছে রাখবো। কিসিকো বলো মাত, নেহি তো ও লোগ পৈসা লে লেগা।

সরমা পুরো কথাটাই অনুমানে বুঝে টাকাগুলো লুকিয়ে ফেলল। করমচাঁদ যখন চলে যাচ্ছে ও হঠাৎ কেঁদে ফেলল আনন্দে এবং বিস্ময়ের বিহ্বলতায়—লোকটা কি আশ্চর্য তার গায়ে একবার হাত পর্যন্ত দিল না!

অল্পক্ষণ বাদে সোনা ডেকে বলল, তোর তো কপাল খুলে গেল রে! শেঠজী বলে গেল তোর ঘরে খাট পাঠাবে। তোর জন্যে দশটা টাকা মজুরী দিয়ে গেছে আমার কাছে আছে। পাঁচটাকা তুই পাবি। এ মাসটা তোর খাবার খরচ ওতেই চলে যাবে, আর ভাবনা রইল না। অল্পক্ষণ থেমে সোনামণি বলল, গা থেকে তোর এখনও গাঁয়ের গন্ধ ছাড়েনি কি তুক্ ক'রলি তুই শেঠজীকে? যাক ভালই হয়েছে ঐ পোড়ার মুখো হুমদোর জন্যে আর তোকে অপেক্ষা ক'রতে হবে না। এবার এেল বলবি ফেল কড়ি মাখো তেল। এখেনে সম্পক্কটাই হ'ল টাকার, পীরিত ঘরের বৌ-এর সঙ্গে করুক গে যাক।

স্নানটা সকলকে কলতলাতেই ক'রতে হয়। সকালে কলে জল থাকতে থাকতে অনেকেই ক'রে ফেলে নইলে বেলাতে চৌবাচ্চায় জমে থাকা সাতবাসী ঠাণ্ডা জলে ক'রতে হয়, অনেকের তাও ভাল লাগে। সরমার লাগে না। আরও যাদের অপছন্দ তাদের সকলের ভিড় লেগে যায় সকালের কলে। তাতে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, কখনও কথা হয় কখনো হয় না। কেউ কেউ কারও কারও সঙ্গে কথা বলে কেউ বলে না।

সরমা নামা মাত্রই একটা রোগা কৃষ্ণাভ মেয়ে খ্যান খ্যান ক'রে উঠল, সর সর। আমি এলেই দেখি তোমার কলে দরকার হয়ে পড়ে। আমরা আর কেউ চান ক'রব না। তোমারই একার কল দরকার। বাড়ীউলির পেয়ারের লোক বলে কি দুদিন এসে মাথা কিনে নেবে!

অন্যের সঙ্গে অন্যের কলহ আগে দুচারদিন দেখেছে সরমা, তা কেবল কাছে দাঁড়িয়েই দেখেছে, সরে দেখেছে; আচমকা এমন যে তারই ঘাড়ের ওপর ঝগড়া এসে লাফিয়ে পড়বে সে কথা কে জানত? সৌদামিনী এ সময়টায় ঘুমোয়। এখন তার মাঝরাত। নইলে সে নিশ্চয়ই তাকে পরিত্রাণে সাহায্য ক'রতে আসত, এবার কি যে হবে—। কোনদিন কলহ না ক'রে এ কাজটা তার অভ্যাসের বাইরেই রয়ে গেছে। তাই সে ভেবে পেল না এ মেয়েটাকে কি বলবে। ও যা বলছে তার কোনই ভঙ্গি নেই তবু এমন জোরে এবং চিৎকার ক'রে কথাগুলো বলছে যেন কোন কাঁসার বাসন উঁচু থেকে পড়ে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল।

একতলারই একজন মেয়ে ঘরের সামনে উঠোনের ধারে বসে গুড়াখু তামাক দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে নিজের মতই বলল, আ মলো যা—।

কথাটা যে কাকে কি জন্যে বলা তা কেউ বুঝল না, হয়ত তার কানেই গেল না।

সরমা সদ্য গায়ে জল ঢেলেছিল, শাড়ী কিছুটা ভিজেছে কিছু ভেজেনি মেয়েটি গায়ের ওপর এসে পড়ল। ভাবটা এমন যেন তাকে ঠেলেই সরিয়ে দেবে। তার ভাবভঙ্গী দেখে সরমা একটু সরে দাঁড়াল। কালো মেয়েটা একটা গামছা মাত্র পরে

এসেছিল তারই ওপর জল ঢালতে সে গামছার অর্দ্ধেক আবরণ যা ছিল অনর্থক হয়ে দাঁড়ানোয় তা খুলেই স্নান ক'রতে লাগল। সরমা মেয়েটির শ্রীহীন শরীর থেকে চোখ সরিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল। অমনি মেয়েটি ঝংকার দিয়ে উঠল, ওঃ কত দেমাক! ক'রতে এসছিস তো খানকিগিরি তার আবার অত দেমাক কিসের রে? আমার দিকে দিকে পেছন ক'রে দাঁড়ানো! মারবো পেছনে এক লাথি। আসলে নিতম্বের নিরুচ্চার্য প্রতিশব্দে লাথি মারবার কথা বলে অশালীন কদর্য শব্দ প্রয়োগ ক'রল মেয়েটি। তাতেই তার আনন্দ।

এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সরমা কি ক'রবে ভেবে পেল না। যতই হোক সে এখানে নতুন, কটা দিন মাত্র এসেছে। কারও সঙ্গে কথা বলতেই সাহস হয় না কলহ তো দূরের কথা। সে ভাবল এখান থেকে সরে ঘরে চলে যায়। কিন্তু অংশত ভিজে শরীরে, স্নানই যেখানে হয়নি এমন অবস্থায় ঘরে যাওয়া কি সম্ভব? আর সরেই বা কোথায় দাঁড়াবে? অথচ মেয়েটি এতই সোচ্চার ভাবে তাকে গালাগালি দিচ্ছে যে এই সকালবেলা অযথা এইসব কদর্য গালাগালি অকারণে শুনতে তার ভালও লাগছে না। তবু তার নীরবতাতে সম্ভবত বিচলিত হয়েই পাশের ঘর থেকে একটি অদৃশ্য বামাকণ্ঠ প্রতিবাদ ঘোষণা ক'রল, কেন লা! দিক্ করছিস কেন লা তরলা? গাঁয়ের মেয়ে নতুন এসেচে বলে যা খুশি তাই বলে যাচ্ছিস! আর কাউকে পারবি? চান ক'রচিস ক'রে নে না চুপচাপ।

স্নানরতা কুটিলা তার অভ্যাস বশে লক্ষ্য ব্যক্তি পরিবর্তন ক'রে যেন বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল, আমার যার সঙ্গে যা হচ্ছে হোক তাতে তোর কি রে! অন্য লোকের অত দালালীর কি আছে?

এই কথা ক'টি ফোটামাত্র ঘরের বক্তা রণরঙ্গিনী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ ক'রল, কি বললি! দালালী! মেরে মুখের থোবড়া বদলে দেব হারামজাদী! এক ঘা মারলে দ্বিতীয়টার জায়গা নেই শরীরে তার আবার কত কথা! নতুন নিরীহ মানুষ পেয়ে তখন থেকে যা নয় তাই বলে যাচ্ছে, বাড়ীতে যেন আর কোন মানুষ নেই!

অন্য একজন মহিলা বারান্দা দিয়ে যেতে যেতেই বলল, কেন মিছে ওর সঙ্গে মুখ নষ্ট ক'রছিস নন্দা? ওর হল গে হিংসের জ্বলুনি গায়ে জল ঢেলে একটু ঠাণ্ডা হ'তে চায় হোক না।

খদ্দের তো ওর এই ব্যাভারের জন্যেই ছায়া মাড়াবেনা—

কথাগুলো, কানে যেতেই তরলা বন্যার বেগে লাফিয়ে পড়ল, কার ঘরে দুমরদ একসঙ্গে ঢোকে রে চোখখাগী খানকি কুত্তা ছেনালী মাগী!

তরলার কথাগুলো বেরোনো মাত্রই নন্দা তার শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়াতে জড়াতে দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ওর রণচণ্ডী মূর্তি দেখে সরমা খুবই ভয় পেয়ে গেল। ওর যা স্বাস্থ্য তাতে দৈবাৎ একটা চড় তরলাকে কষালে আর ঐ ক্ষীণ দেহ মেয়েটাকে হেঁটে নিজের ঘরে ঢুকতে হবে না। এখনই একটা বিষম অঘটন ঘটে

যাবার ভয়ে সম্পূর্ণ অচেনা নন্দাকে অনুরোধ করে বলল সরমা, থাক থাক। ছাড় দিদি, যা হয়েছে হোক যেতে দাও।

ঝগড়াটা তখন সরমাকে ছেড়ে তরলা ও নন্দাকে ভর ক'রেছে বলে ওর কথায় কিছু তারতম্য হ'ল না বরং সকলকে বিস্মিত ও হতবাক্ ক'রে তরলা বুনোবিড়ালের মত লাফিয়ে পড়ল নন্দার ওপর এবং চকিতে তার স্তন কামড়ে ধরল! নন্দার বিক্রম পলকে মিইয়ে গেলেও সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তরলার নাকচোখ জুড়ে এমন এক আঘাত ক'রল যে তার নাক মুখ দিয়ে অবিশ্রান্ত রক্ত ঝরতে লাগল। তরলা ছিটকে যেতে যেতে নন্দার চুল চেপে ধরল দুই হাতে। সরমা ভয়ে যেন সিঁটিয়ে গেল। তার ইচ্ছে হ'ল এই মুহূর্তে এক লাফে ওপরে চলে যায় নিজের ঘরে। পরক্ষণেই মনে হ'ল ওরই জন্যে নন্দা নিজের ঘাড়ে এমন একটা ঝগড়া তুলে নিল এ অবস্থায় ওর চলে যাওয়া কি ঠিক হবে! কে পরের জন্যে ঝগড়া টেনে নেয়?

পিয়ারা সিং কোত্থেকে এসে হাজির হয়ে গালাগালি দিয়ে দুজনকে নিবৃত্ত ক'রল। পিয়ারাই তরলার অবস্থা দেখে বলল, চল, ডাগদারখানামে চল।

তরলা জেদ ধরল কিছুতেই যাবে না। বাড়ীর প্রায় সব মেয়েই এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। সবাই মজা দেখতে লাগল। সরমা লক্ষ ক'রল তরলার জন্যে কারও যেন বিশেষ সহানুভূতি হচ্ছে না। পিয়ারা সিং তো ঝগড়া ছাড়াতে গিয়ে তার রোগা পটকা বাহু ধরে একটা হ্যাঁচকা টানে ছিটকে দিয়েছিল তরলাকে। কেবল সৌদামিনী চেঁচামেচি শুনে নেমে এসে সহানুভূতিসিক্ত কণ্ঠে রক্ত মুছে দিতে দিতে বলল, কেন যে তুই এমন সব অনাসৃষ্টি করিস বুঝিনা।

তরলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে শিশুর মত করে কি যেন বলবার চেষ্টা ক'রতেই সৌদামিনী ধমকে উঠল, থাম তুই। আগে দুগগা ডাক্তারের কাছে যা। একে তো এই চেহারা তাতে কতটা রক্ত ঝরল—চিন্তিত সৌদামিনী পিয়ারা সিংকে বলল, দারোয়ানজী একে একটু ডাক্তার দেখিয়ে দিন না। যা টাকা লাগে দিয়ে নিয়ে আসুন আমি দিয়ে দিচ্ছি।

পিয়ারা সিং সঙ্গে সঙ্গেই বলল, চল তরলা, জলদি চল। একঠো রিকসামে বৈঠকে চল। সামান্য তো রাস্তা তরলাকে রিকসায় পাঠিয়ে নিজে হেঁটেই পোঁছাবে পিয়ারা, রাণ্ডীলোকেদের সঙ্গে রিকসামে বসে সে যাবে না। তাতে তার সম্মান নষ্ট হয়। সে বারবনিতাদের বাড়ীর দারোয়ানগিরি ক'রবে কারণ তাতে নানারকম অর্থার্জন আছে, তাদের প্রতিটি কাজ ক'রে বাড়তি টাকা বের ক'রে নিতে তার কোন সংকোচ নেই, সংকোচ কেবল তার প্রকাশে। বাড়ীর মালিকের রক্ষিতা সোনা-র সঙ্গে শয্যা গ্রহণও তার সেই একই কারণে, সোনা সেজন্যে তাকে রীতিমত টাকাপয়সা জোগায়। পিয়ারা সিং সৌদামিনীর কথায় তরলাকে ডাক্তার দেখাতে রাজি শুধু ঐ কারণেই যে সেখানে তার কিছু রোজগার হবে। দুটাকা খরচ হলে আড়াই টাকা নিয়ে নেবে সে সৌদামিনীর কাছে। পিয়ারা সিং জানে টাকার কোন জাতও নেই, কোন চরিত্রও

নেই। টাকার নাম টাকা।

তরলা ডাক্তারের কাছে যাবার আগেই হতভম্ব সরমার দিকে দেখে সৌদামিনী বলল, তুমি অমন ভিজে গায়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চান ক'রে নাও। আরও তো সবাই ক'রবে। নে নে তরলা শীগগির একটা কাপড় পরে নে। যা। তোর কি বুদ্ধি বল তো? নন্দাকে কেমন ক'রে কামড়ে দিয়েছিস! তোর কি কোনদিনই বুদ্ধি হবে না? পাগলি হয়ে গেলি নাকি? ভাগ্যিস দাঁত বসে নি!

নন্দা ততক্ষণ গা খুলে ফেলেছে। সবাই দেখছে তার স্তনের ওপর তরলার দাঁতের দাগ। আর একটু হলেই রক্তপাত হ'ত এবং সমস্যাও অনেক বাড়ত। সৌদামিনীও তাতে যোগ দিল। তরলার স্বভাব-দোষ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন বলেই নন্দাকে বলল, ওর স্বভাবের জন্যেই সবাই ওকে এড়িয়ে চলে। তোমার হঠাৎ কি হ'ল ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলে? তরলাকে কতদিন বলেছি তুই লাইন ছেড়ে দে। আমাদের সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাক, সকলের কাজকর্ম ক'রে দে তোর ভাতকাপড়ের অভাব হবে না। তা শুনবে না।

সৌদামিনীর কথায় নন্দা কোন উত্তর ক'রল না সুরবালা বলল, কোন ভাল কথা কি ও শুনবে! ভাল কথা শোনবার মেয়েই তরলা নয়। কার ঘরে ভাল খদ্দের গেল, ওর কেবল সেই নিয়ে হিংসে। হিংসেতেই জ্বলে ম'লো। তুই আবার আদিখ্যেতা ক'রে ওকে ডাক্তারখানায় পাঠাতে গেলি কেন বল দিকি?

কি ক'রব সুরোদিদি যে রকম রক্ত পড়ছে দেখে মায়া লাগল। শেষ কালটায় যদি রক্ত পড়ে পড়ে মরে যায় তা হ'লে কি ঝকমারিটা হবে বল তো? ওর দোষ তো হবে না সব গিয়ে পড়বে নন্দার ওপর। পুলিশে নন্দাকে নিয়ে পড়বে।

সৌদামিনীর ওপর অভিমান হয়েছিল নন্দার। ও এসে তরলাকে যে ভাবে ডাক্তারখানায় পাঠাল তাতে নন্দার মনে লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন পুলিশের কথা শুনে মনে হ'ল সৌদামিনী তারই উপকার ক'রেছে, তাই বলল, বাড়ীউলিকে বলে ওকে এখান থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত। কার সঙ্গে ঝগড়া না করে বল তো? সকলের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায়।

সুরবালাও সায় দিল, ওর জ্বালায় কেউ চান ক'রতে পর্যন্ত পারবে না। এমনই বদ। ওপরের নতুন মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে কলের তলায় বসে পড়লে! কি লোক রে বাবা!

সেই জমায়েতে যে কজন ছিল তরলাকে বাড়ী ছাড়া করবার ব্যাপারে দেখা গেল এক সৌদামিনী ছাড়া সকলেই এক মত। সকলের সমবেত বিক্ষোভের মধ্যেও সৌদামিনীই একা প্রতিবাদ ক'রল, তার প্রতিবাদী স্বর বিশেষ সোচ্চার হতে পারল না ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, এখান থেকে গেলে কে ওকে জায়গা দেবে?

সবাই এ ভাবনাকে উপেক্ষা দেখিয়ে জানাল, সে দায় তরলার। সকলের অশান্তির বিনিময়ে তো ওকে আশ্রয় দেওয়া যায় না। সকলের প্রবল বিক্ষোভের

ধাক্কায় সৌদামিনীর শুভেচ্ছা খড়কুটোর মত উড়ে গেল। সে চুপ ক'রে সমবেত মত ও মন্তব্য শুনতে লাগল।

আলোচনাটা যেহেতু একতলায় স্বভাবতঃ সোনামণির অসাক্ষাতেই হচ্ছিল। সিদ্ধান্ত হ'ল, আজই বাড়ীউলিকে জানাতে হবে। বাড়ীউলির দাসীর মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হবে। সিদ্ধান্তটা সৌদামিনীর বিবেক বোধে আঘাত ক'রল। তার ধারণা তরলা মেয়েটি এমনিতেই অসহায়, আপন ভাগ্যের কষাঘাতে জর্জরিত। দুর্ভাগ্যই ওর শারীরিক গঠনকে এমন আকর্ষণহীন ক'রেছে। আর এই দুর্ভাগ্যের জন্যেই ওর প্রায় রাত্রেই কোন রোজগার হয় না, যে রাত্রে দৈবাৎ হয় তাও এমনই সামান্য যে তাতে দিনযাপনের পুঁজি গড়ে ওঠে না। এই ভবিষ্যৎহীন, দুর্বল বর্তমান, ওকে ঈর্ষাপরায়ণ ক'রে তোলে, তুলেছে। সৌদামিনীর আশঙ্কা একদিন হয়ত নিজেই আশ্রয় হারাতে বাধ্য হবে মেয়েটি, কাজেই ওকে আঘাত ক'রে কি প্রয়োজন? কাউকে আশ্রয়চ্যুত করা পাপ।

সৌদামিনী এই পাপের ভার বইবে না বলে নিঃশব্দ ওপরে উঠে গেল।

সোনামণি ভাড়া বসায়, ভাড়াটে তোলে। তোলবার হলে পিয়ারা সিং তোলে। কেউ ভাড়া দিতে না পারলেই তোলে, তখন আর খাতির করে না। এমনিতে পিয়ারা সিং রুক্ষ মানুষ। কারও সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা তো দূরের কথা ভাল ভাবে কথাই বলে না। একতলায় তার নিজের ঘরে থাকে, দিনের বেলা নিজের রান্না নিজেই করে, বিকাল বেলা তার কাছে দুচারজন স্বভাষী হয়ত আসে, পাথরের শিলে সে সময় সিদ্ধি পিষে ভিজে বাদাম পিষে দুধ দিয়ে সরবৎ ক'রে সবাই মিলে খেয়ে নেয়। যেদিন কেউ না আসে সেদিনও করে, একাই খায়। সোনামণিরও জানা আছে তার যেদিন সরবৎ দরকার হয় মাসিকে দিয়ে সময় থাকতে বলে পাঠালে তার জন্যেও ক'রে দেয় পিয়ারা। বংশীধরের অন্য কোন নেশার অভ্যেস নেই মাঝে মধ্যে পিয়ারা সিং এর সিদ্ধির সরবৎ তারও ভাল লাগে সেদিন ওপর থেকে হুকুম আসে, মাসী এসে বলে, আজ ভাল ক'রে বানাও দারোয়ানজী মালকিন বলে পাঠাল। সেদিন সরবতে দুচারটে বাদাম বেশি ক'রে দেয় পিয়ারা। মিছরিলালের পানের দোকান থেকে বরফ এনে তাও দেয় ঘটির মধ্যে। সেই ঘটি ওপরে পাঠিয়ে দেয়। পিয়ারা জানে সরবৎ কে খাবে বংশীধরও জানে পিয়ারা সিং-এর সরবৎ কিন্তু দুজনের আড়াল থাকে। আপাতভাবে পিয়ারা সকলের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক কিন্তু ঝামেলা ঝঞ্ঝাট কিছু হলে তখন পিয়ারা সিং-ই সব সামলায়।

আঙ্গুরবালার ঘরে প্রায়ই আসে গুণধর রায়। ঢাকায় ঠাকুর্দার তেজারতি কারবার ছিল সেই টাকার ভার সামলাতে না পেরে ছেলে শশধর কলকাতায় এসে সম্পত্তি কেনে। থাক না কেন কলকাতায় দুচারখানা বাড়ী, কেনা থাকলে অনেক টাকা ভাড়া পাওয়া যাবে। বাপের ব্যবসা তার দেহান্তের সঙ্গেই

গুটিয়ে গেল, শশধর রাখতে পারল না। একমাত্র পুত্র শশধর যা পেল তা ছিল ভাবনার অতীত। শশধর জানে মা লক্ষ্মীকে আটকাতে হ'লে প্রতিষ্ঠা ক'রতে হয়, সম্পত্তিই হ'ল সেই প্রতিষ্ঠা। ঢাকার চেয়ে শহর হিসেবে কলকাতা অনেক বড় বলে কলকাতাতেই তা গড়ল শশধর। এবং বসবাস করবার জন্যে নতুন যে রাস্তা বেরোচ্ছে তারই ওপরে পূব দক্ষিণ খোলা একটা দুরাস্তার সংযোগস্থলের জমি কিনে যে বাড়ী বানাল ঢাকা শহরে তখন তা সম্ভব ছিল না। সে অট্টালিকা বানাবার স্থপতিই সেখানে ছিল না। বাপের বন্ধকী সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির কিছু বেচে দুচারটে ভাড়া বসিয়ে বসবাসের পাট গুটিয়ে শশধরই কলকাতা আসে। এখানে সম্পত্তি বেশি, আরও অনেক কাজেই কাছাকাছি থাকা দরকার।

যৌবনের প্রারম্ভেই গুণধর কলকাতা এল। পিতার কনিষ্ঠ পুত্র মায়ের আদরের দুলাল গুণধর অচিরে উপলব্ধি ক'রল কলকাতা মুক্ত নগরী। ঢাকার মত চারিদিকে পরিচিতির আগল নেই। এখানে নতুন বন্ধুবান্ধব কেউ কারও পারিবারিক পরিচয়ে সংবদ্ধ নয়। আবহাওয়া অনেকের মতে উদারনৈতিক প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক। যে বয়সে গুণধর কলকাতা এল সেটা রোমাঞ্চপ্রিয়তার সময়। সমবয়স্ক যে বন্ধুমণ্ডলী জুটে গেল তারাও সমপর্যায়ের বটে। অর্থে দীন পরিবারের যাদের সঙ্গে প্রথম ঝোঁকে আলাপ হয়েছিল তারা সব সামর্থের অভাবে সরে গেল, মোটামুটি ভাবে সম্পন্ন ঘরের সন্তানেরাই রয়ে গেল সঙ্গে। হাতে প্রয়োজন মত অর্থ মনে রোমাঞ্চের বাসনা—দুয়ে মিলে জীবন চলতে লাগল সবেগ রথের সওয়ার হয়ে। থিয়েটার, বায়োস্কোপ সমানে দেখে আগ্রহ কমে গেল, ধর্মতলার ভাল ভাল রেষ্টুরেণ্টে খাওয়ার মধ্যে রুচিকর আনন্দের সন্ধান পেল সকলে। সেখানেই আলাপ চুনিলালের সঙ্গে। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবীর নিচে ধবধবে ফর্সা চুনিলাল মিত্র বেশ ক'দিন ধরেই নজর করছিল ছেলে ক'টির ওপরে। চলাচল, আদবকায়দা এবং পকেটের রেস্ত সবই তার আয়ত্তে যখন এসে পড়ল সে-ই একদিন প্রস্তাব ক'রল, কলকাতার মত স্ফূর্তির জায়গা কি আর দেশের কোথাও আছে?

টেবিলে চুনির ঠিক পাশেই বসেছিল পরেশ দত্ত সে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল, দূর মশাই। কি যে আপনি বলেন আমরা তো একই থিয়েটার দুতিনবারও দেখি। কি ক'রব বলুন, ক'টাই বা থিয়েটার হল? বায়স্কোপ গুণধরের আবার ভাল লাগে না। বিশেষ যেতে চায় না।

চুনিলাল একথায় ওদের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে বলল, ঘরে বসে থাকলে কি আর আমোদ করা যায়? আমোদের কাছে গেলে তবে না তা পাওয়া যাবে! রেসের মাঠে গেছেন কখনও? তবে আর কি আমোদ খুঁজছেন? ও পাড়ায় গেছেন?

কোথায়? বোকার মত প্রশ্ন ক'রল গুণধর।

সোনাগাছিতে? বউবাজারের বাইজী পাড়ায়?

ইয়ারবন্ধ হতভম্ব হয়ে বোকার মত মাথা নাড়ল।

তবে আর কি আনন্দ পাবেন ? ফুল খ‍ুঁজতে হলে বাগানে যাবেন না রান্নাঘরে খ‍ুঁজবেন ? রেস তো আর এখন হচ্ছে না এখন ইচ্ছে ক'রলে বাইজী পাড়ায় গিয়ে গান শ‍ুনে আসতে পারেন। অবশ্য যদি গান আপনাদের ভাল লাগে।

গান—গ‍ুণধর বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকাল গান মানে থিয়েটারে তো শোনা যায় সেই তো গান তার বাইরে আবার গান কি হয় ? এর বাইরে আবার গান কি শোনা যায় ? পরেশ জানাল সে গান ভালবাসে।

চল‍ুন তবে গান শ‍ুনে আসবেন, চল‍ুন দেখ‍ুন আমোদ পেলেও পেতে পারেন।

গ‍ুণধর দীক্ষিত হ'ল। বাইজীর গানের কিছ‍ুই সে ব‍ুঝল না, বোঝবার মত মানসিক পরিণতিও তার ছিল না। মার্গ সঙ্গীত ভাল লাগতে হলে যে শিক্ষা বা মানসিক বিকাশ প্রয়োজন তার বিন্দ‍ুমাত্র তার জীবনে ঘটেনি। গ‍ুণধর কেবল বেড়েই উঠেছিল, গড়ে ওঠে নি ফলে প্রাকৃতিক প্রয়োজনের উর্দ্ধে যে মানসিক জীবন অন্যপ্রাণী থেকে মান‍ুষকে প‍ৃথক করে তার লেশমাত্র তার মধ্যে ছিল না। তাই কোন স‍ুকুমার ব‍ৃত্তির অন‍ুপস্থিতি ললিতকলা বোধের জন্ম দেয়নি তার মনে। সেই অকাট গ‍ুণধরের কাছে সঙ্গীত নয় আবেদন হ'ল বাঈজীর দেহ ভঙ্গিমার, তার লাস্যময়ী ভ্র‍ূয‍ুগলের। গানের মীড়, গমক ম‍ূর্ছনা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে দেহের যে ঠাট ও ঠমক যৌবন রসে মদির ক'রে বাঈজী পরিবেশন ক'রছিল তাতেই আপ্ল‍ুত হয়ে গেল তার প্রাকৃতিক যৌবন। সঙ্গী যে ক'জন ছিল পর্যায়ে সব একই পদের বলে একই পরিণতির দোলায় সবাই দ‍ুলতে লাগল, পরেশ, গ‍ুণধর এবং নাড়‍ু, যার ভাল নাম শ্রীমান নাড়‍ুগোপাল ম‍ুখার্জী। চুনিলালের দরকার ছিল পরের অর্থে স্ফুর্তি করা। অনেক দিনই তার রেস্ত ফুরিয়েছে রসনা ফুরোয়নি, তাই এই আনাড়ী সঙ্গীরা এখন তার বরলাভ। তবে দীর্ঘদিনের সঙ্গীত অন‍ুসঙ্গে প্রীতি বোধ তার আয়ত্তাধীন, সে কারণে তার আগ্রহ যতটা দেহে ততটাই স‍ুরেও। এ তার নেশার মত ; কেন আসে সে জানে না, আকর্ষণ অন‍ুভব করে তাই আসে। বাঈজী পাড়ায় রিক্ত হয়েও সে বাব‍ু, গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে, সবাই দেখা হ'লেই কুর্নিশ করে। রৌশন বাই, গহরজান, গ‍ুলশন বেগমরা তো নেমন্তন্নই করে, দেখা হলেই বলে, মেহেরবানী সে পধারিয়ে গা বাব‍ুজী।—কোন বাড়ীতে গেলে গান থামিয়েও অনেক সময় বলে, তসরিফ রাখিয়ে বাব‍ুজী।

এই খাতিরটুকু ধরে রাখবার জন্যে, অথবা খাতিরের বিনিময়ে চুনিলাল সচেষ্ট থাকে কখন কোন মালদার লোককে এনে দিতে পারে। তাতে তার ইজ্জত অটুট থাকে।

কিন্তু এই দলটি তার পরামর্শমত সঙ্গী হয়ে এল, তাদের কাছে মাল ছিল এলেম ছিল না তাই তাদের সেখানে সইলো না। গানের পর গাইয়েকে পাবার আশায় বার দ‍ুয়েক অপেক্ষা ক'রে দেখল দ‍ু জায়গাতেই নিষ্ফলতা। দ্বিতীয় যাত্রার পর গ‍ুণধর বলল, কি যে নিয়া যান চুনিবাব‍ু—গান দিয়া কি হইবো ? কি গায় কিস‍ুং ব‍ুঝি না—।

তারপরই চুনি সোজা এনে হাজির ক'রল আঙ্গুরবালার আস্তানায়। এখানে গান ছিল না, পান ছিল। তরল পান এবং চর্ব্য পান—দুটোই। আর দুটোতেই আমেজ। প্রথম রাত্রে আঙ্গুরবালার হাতের পান খেয়েই মাত হ'ল গুণধর; আঃ কি অনুভব! সমস্ত মস্তিষ্ক-কোষ যেন ঝিম ঝিম ক'রছে। যেন যাদু পান। মোহিত হয়ে গেল গুণধর। কি আপ্যায়ণ! এমন ক'রে কেউ কোনদিন কথা বলে নি তার সঙ্গে। দশজনের সারিতে বসে ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ক'রে ঘষা বাজনার সঙ্গে বমি করার শব্দের মত সা আা আা শব্দ শোনা আর এখানে একা বসে একজন যুবতীর সোহাগ— যেন কত দিনের চেনা। কি হবে ওসব ফালতু গানে? এখানে সেই জেল্লাদার জামাকাপড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা বাঈজীর শারীরী আক্ষেপ নয়, কাঁচুলি পরা আঙ্গুর-বালা ধপধবে শরীর গুণধরের শরীরে ঠেকিয়ে বসে চিবুক ধরে জানতে চাইছে, আর আর এক খিলি পান দেব নাগর?

নাগর! কি মানে? গুণধর জানেনা, কখনও শোনেনি তবে বলার ভাবে বুঝছে এর চেয়ে মধুর সম্ভাষণ বুঝি আর হয়না। কি মিষ্টি ডাক—নাগর!

যতক্ষণ আঙ্গুরবালার সান্নিধ্যে রইল গুণধরের মনেও এল না পরেশ বা নাড়ু এখন কোথায়। চুনিলাল এই স্বর্গে তাকে পৌঁছে দিয়ে কোথায় গেল।

এমন খদ্দের পেয়ে আঙ্গুরবালাও সন্তুষ্ট। কোন চাহিদা নেই, ঝামেলা নেই, পান খেয়েই বিভোর, গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থেকেই পরম সুখী। চুনিবাবু বলেছিল নতুন মাল তবে এই যে অভিষেক তা আঙ্গুরবালা ভাবেনি। বুঝে বলল, আবার এসো কিন্তু—।

নিশ্চয় আসব। কি ক'রে আসব?

সে কি গো, চিনতে পারবে না? কেমন পুরুষ মানুষ গো? পার্কের পাশ দিয়ে মসজিদ পেরিয়ে সোজা চলে এসে বলবে সতের নম্বর বাড়ী মানদাসুন্দরীর বাড়ী বলবে। সাবধান রাস্তায় অনেক রাক্ষুসী ধরবে কিন্তু—তাদের হাতে প'ড়ো না। খবরদার। আমার দিব্বি রইলো। কবে আসবে?

পরদিনই আবার এসে হাজির হ'ল গুণধর। সারাদিন সে আঙ্গুরবালাকে অনুভব করেছে। মনে হচ্ছে পিঠে তার শরীরের কোমলতম অঙ্গ এখনও লেগে আছে কখন কখন মনে হ'ল আঙ্গুরবালার নরম দেহ লেপটে আছে তার দেহে।

অতি কষ্টে সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়ে সে আর কিছুতেই থাকতে পারল না। খোঁজ ক'রে ক'রে আঙ্গুরবালার ঘরে যখন হাজির হ'ল সে তখন ঘরে ধূপ দিচ্ছে। ঘুমিয়ে উঠতে একটু দেরী হওয়ায় সন্ধে দিতেও দেরী হয়ে গেছে। বহু খদ্দের আসা যাওয়া করেছে, কাউকেই প্রায় মনে নেই, গুণধরকে দেখে প্রসন্ন হ'ল আঙ্গুর, এসো এসো তোমার বন্ধুরা সব কোথায়?

গুণধর উত্তর দিতে পারল না। ভাবল বোধ হয় চুনিবাবুকে আনা হয়নি বলে একথা বলেছে। সভয়ে বলল, চুনিবাবুর সঙ্গে আজ দেখা হয়নি।

ওর জন্য চিন্তা নেই, সে ঠিক আসবে। তুমি ওকে চিনলে কি ক'রে ?

এমনই আলাপ।

আঙ্গুর কাল রাতের কথা তুলল না। চুনিলাল গুণধর বেরোনো মাত্রই এসে সুদে আসলে নিজের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে গেছে। না, চুনিলাল দালাল নয়, সে টাকা নেয় না, সে প্রাপ্য বুঝে নেয় শরীরে। যাকে এনেছে সে তো কেবল সঙ্গ পেয়েই পরিতৃপ্ত তার পয়সাটা তো সে কম দেয় নি, ঐ পয়সার বিনিময়ে সে যা পেতে পারত সেই প্রাপ্যটুকু তার হয়ে বুঝে নিয়েছে চুনিলাল। আঙ্গুরবালা আপত্তি করেনি এমন একটা শাঁসালো মক্কেল জুটিয়ে দিয়ে সামান্য এ মূল্যটুকু তো চাইতেই পারে এক-কালের রইস বাবু চুনিলাল মিত্তির। টাকা তো সেও এককালে এপাড়ায় কম দেয় নি। মানদা সুন্দরীর বাড়ী, লোকে তো জানে, এই চুনিলাল মিত্তিরেরই অকৃপণ দানে পাওয়া, এই আঙ্গুরও যে না পেয়েছে এমন নয়।

আজকের চুনিলালও তাই বাবু। পোষাকে পরিচ্ছদে এখনও সেই ফুলবাবুটিই আছে যদিও পকেটে তেমন টাকার গোছাটি আর নেই। তা বলে একদম সমাদর পাবে না এমন কাজ সে করে না। ভিক্ষে চায় না চুনিলাল মিত্তির, বিনিময় মূল্য চায়, তা চাইতেই পারে। অন্যে কত চায় এ তো সামান্য। আঙ্গুরবালা বলল, এই তো তুমি চিনে গেছ একাই আসতে পারলে। বন্ধুরা এল না কেন তাই জিজ্ঞেস ক'রছি।

আসলে আঙ্গুরও মানসিক তৃপ্তির সন্ধানী। গুণধরের আর দুজন বন্ধু যাদের ঘরে গেছে তারা তাদের আকৃষ্ট করতে পারে নি, ও পেরেছে এই সার্থকতার আনন্দেই ওর জিজ্ঞাসা। গুণধর যে বন্ধুদের কথা না ভেবেই এখানে এসেছে এই কথাটা জানতে পেরেও আঙ্গুর তৃপ্তি কম পেল না। তার বেশ ভাল লাগল। নিজেকে সার্থক মনে ক'রতে পারল। হৃষ্ট চিত্তে সে বলল, তুমি একটু ব'সো। আমি সন্ধেটা দিই।

এমন আপনজনের মত কথা শুনে গুণধর যেন গলে গেল, তবু সে সংকুচিত হয়ে বসাতে আঙ্গুর বলল, অমন জড়সড় হয়ে বসছ কেন ? ভাল ক'রে উঠে ব'সো। পা গুটিয়ে বসো।

ধুনো ধরানো ধুনুচিটা দরজায় ঘুরিয়ে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল আঙ্গুর। সুগন্ধি ধোঁয়াতে ঘর ভরে গেল। আঙ্গুরবালা খাটের কাছে এসে বলল, মশা তাড়ানোর জন্যে ধুনো দিলাম আর তুমি ঠিক এই ধোঁয়ায় মধ্যেই এলে। তা ভালই ক'রেছ।

অঙ্গুরবালার কথাতে কেমন তাল-গোল পাকিয়ে যেতে লাগল গুণধরের। এই বলে ধোঁয়াতে কেন এলে তারপরই বলে এসে ভাল ক'রেছ! এই ধন্দের উত্তর সে জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস ক'রল না। কিন্তু উত্তর পাবার জন্যে মন তার আঁকুপাঁকু ক'রতে লাগল। হঠাৎ সে বলেই ফেলল, আইয়া ভাল ক'রছি ক্যান কইলা ?

ঘরের মধ্যেই এক কোণে দাঁড়িয়ে একটা শাড়ী ভাঁজ ক'রে রাখছিল আঙ্গুর, মুখ না ফিরিয়ে খুব স্বাভাবিক স্বরে বলল, কে আবার এসে পড়বে—

গুণধর দমে গেল। কে এসে পড়বে ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ বুঝল তা নয়, তবু তার কেমন খারাপ লাগল। শাড়ীখানা আলনায় গুছিয়ে রেখে কাছাকাছি এসে আঙ্গুর বলল, আজ কি খাবে বল ?

পান।

দুর বোকা—বলেই ওর গালে আলতো ক'রে ঠোনা মারল আঙ্গুর তারপর বলল, পান খেয়ে কি পেট ভরে ? মাসিকে ডাকি কিছু আনতে পাঠাই। এক কাজ করা যাক এলেন হোটেলের চিংড়ি কাটলেট আনা যাক।

খাবার কথায় গুণধর অনুভব করল তার খিদে পেয়েছে। দাসী আসা মাত্র আঙ্গুর বলল, টাকা দাও।

চিংড়ি কাটলেট খাবার পর গুণধর হুকুম দিল, আবার যখন আনাইবা আমার লাইগা দুইখান আনাইবা।

আঙ্গুর অর্দ্ধেকটা খেয়ে ফেলেছিল বলে বলল, এত ভাল লেগেছে একটু আগে জানলে তোমাকে দিয়ে দিতাম।

না না তুমি খাও। তুমিও দুইখান খাইবা।

আঙ্গুর নিঃশব্দে একটু হাসল মাত্র। এই যুবকটির সরলতা তাকে মাঝে মাঝে হাসায়, পাছে সেই হাসির অর্থ ব্যঙ্গাত্মক বোঝায় তাই সে হাসি চাপা দিয়ে অন্যভাবে প্রকাশ করে যাতে ও আঘাত না পায়। নেহাৎ-ই গোবেচারা গোছের ছোকরাটির বুদ্ধি যে কম একথা বুঝতে আঙ্গুরের সময় লাগেনি। তাই ওর প্রতি কিছুটা অনুকম্পা মেশানো মমতা প্রকাশ ক'রল, তুমি বুঝি খেতে খুব ভালবাস ?

হু।

ঠিক আছে, তোমাকে আর একটা ভাল খাবার খাওয়াবো।

কয়েকটা দিন পান খাইয়ে আর মেকি সোহাগ দেখিয়েই কাটিয়ে দিল আঙ্গুরবালা। আরও কিছুদিন পারত বাদ সাধল গুণধরের বন্ধুরা। তাদের প্রথম রাতের অভিযানের অভিজ্ঞতার কথা জানতে ক'দিন দেরি হ'ল গুণধরের। তাদের সঙ্গে ক'দিন দেখা না হওয়ায় পরেশ আর নাড়ু একদিন বাড়ীতে এসে হাজির, কি ব্যাপার বল তো গুণো সেই যে সন্ধেবেলা আমাদের সঙ্গ ছাড়লি আর দেখা নেই কেন ? তোর কিছু হয়েছে মনে ক'রে দেখতে এলাম। কোথায় ছিলি ক'দিন ?

গুণধর ঠিক জবাব দেওয়া এড়িয়ে গেল। স্থির ক'রল গোপন সম্পর্কের কথা বন্ধুদেরও বলবে না। আঙ্গুরবালার কথা শুনলে আকৃষ্ট হয়ে পাছে ওরা চলে যায় সেটা ওর অভিপ্রেত নয়। তাই সে চটজলদি মিথ্যা নির্মাণের অক্ষমতায় আমতা আমতা ক'রে বলল, হ্যাঁ মানে কয়দিন বাড়ীতে কাজ আছিল।

তোর আবার কি কাজ রে ? বাড়ীর ছোট ছেলে ? পরেশ উঁড়িয়ে দিতে চাইল।

থাকতেও তো পারে, তুই কি জানবি ? নাড়ু সমর্থন ক'রল গুণধরকে, এই তো আমার বাবা-ই কদিন আমাকে কারখানায় যেতে বলল, যেতে হল। আমার বাবা যা কিপ্পণ, নইলে একটা টাকা বের ক'রতে পারতাম ?

সত্যি মাইরি পাড়ার সবাই বলে তোর বাবা যুদ্ধের বাজারে যা মাল কামিয়েছে অমন আর কেউ নয়। আর এখন শালা আট আনার গেঞ্জি হয়েছে পাঁচ শিকে! তোর বাবা টাকা কোথায় রাখে বলতে পারিস ?

ব্যাংকে।

মাইরি ব্যাংকে অত টাকা ধরে ?

তুই একদিন বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাংকে গিয়ে দেখে আয় ধরছে কিনা। যতটা না ধরবে উপচে পড়বে তুই নিয়ে আসবি।

পরেশ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, যাক গে যাক। তোর বাপের টাকার হিসেব তুই রাখ, গুণো শালা বল তুই সেদিন কি ক'রলি ? চুনিবাবু আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা ছুকরির ঘরে ঢুকিয়ে দিল, রোগা হাল্‌কা চেহারা হ'লে কি হবে একেবারে চাবুক মাল।

বন্ধুদের কাছেই গুণধর জানতে পারল সে যা পেয়েছে ওটাই সব নয়, আঙ্গুর-বালা তাকে আসল ব্যাপারটাই চেপেছে। আরও কিছু পাবার আছে, পরেশরা দুজনেই দুটো মেয়ের কাছেই তা পেয়েছে। এই প্রথম মনে হ'ল আঙ্গুরবালা তাকে বঞ্চিত ক'রেছে। নাড়ু বলল, কদিন তো হয়ে গেল আবার একদিন চল।

পরেশ বলল, আমি আসার সময় আর একটা মেয়ে দেখে এসেছি তার কাছে যাব।

নাড়ু জানাল সে প্রথম রাতের চেনা নিভাননীর কাছেই যাবে।

গুণধর পরেশের কাছে জানতে চাইল, আর একজনের কাছে যাবি কেন ?

দূর বোকা। পরেশ মন্তব্য ক'রল, এ তো ঘরের বউ নয় যে একজনের সঙ্গেই শুতে হবে এ শালা ফুলের মেলা কত আছে এক-একদিন এক-একটা শুঁকে দেখতে হবে।

গুণধর কথা ভাঙ্গল না। স্থির ক'রল সে-ও অন্য কারও কাছে যাবে। ঐ পাড়াতে গেলে তো কত মেয়ে। আঙ্গুরবালা যখন ফাঁকি দিয়েছে তার কাছে আর যাবে না। আরও তো দুটো মেয়ের কথা শুনল তারা তো কেউ ফাঁকি দেয় নি! বন্ধুরা মাত্র একদিনই গেছে তাও যা পেয়েছে গুণধর চারদিন গিয়েও তা পায়নি, আর যাবে না আঙ্গুরের কাছে।

যুদ্ধের সময় সমুদ্রের জলের তলায় পেতে রাখা চুম্বক যেমন ক'রে চলমান জাহাজ টেনে ডোবাতো তেমনই টানে অভিমান ক্ষুব্ধ গুণধর শেষ পর্যন্ত আঙ্গুর-বালার কাছেই গিয়ে হাজির হ'ল। মাঝে দুটো দিন সে ইচ্ছে ক'রেই আসেনি।

আঙ্গুরবালা যেন ব্যাকুল হয়েছিল গুণধর পেঁছানো মাত্র তাকে সমাদর ক'রে বলল, এসো এসো। তোমাকে দুদিন না দেখে আমার মন যে কি ক'রছিল তোমাকে বোঝাতে পারব না।

গুণধর ইচ্ছে করেই গম্ভীর হয়ে ছিল। তার ক্ষোভ প্রকাশ করবার জন্যেই যেন সে এসেছে তেমনই ভাব দেখাতে চাইল। আঙ্গুরবালা চট ক'রে দুবাহু দিয়ে গুণধরের কণ্ঠ বেষ্টন করে সপ্রীতি হাসিতে স্মিত আনন্দে জানতে চাইল, কি গো নাগর মুখখানা আজ অমন তেলো হাঁড়ির মত হয়ে আছে কেন ?

গুণধর কোন উত্তর করল না। আঙ্গুর চপলতা করে ওর গম্ভীর গালে নিজের গাল ঠেকিয়ে সোহাগী স্বরে বলল, কি গো মশাই, বোবা হয়ে গেলে নাকি ? ঠাট্টা ক'রল, যা হও তা হও বোবা হয়ো না।

অভিমান আহত গুণধর হাতের অল্প চাপে আঙ্গুরবালাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রল। মুখে বলল, আর এইখানে আমু না।

তার মানে ? 'আমু না' কথাটির অর্থ বুঝতে না পেরে আঙ্গুর প্রশ্ন করল।

এবার কিছুটা ঋজু স্বরেই স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিল গুণধর, আসুম না।

কলাপটিয়সী আঙ্গুরবালা গুণধরকে নিজের বুকের মধ্যে জাপটে ধরে জানতে চাইল, কেন, আমি কি দোষ ক'রলাম ? বল ?

তুমি আমারে ফাঁকি দিছ।

সেইভাবে জাপটে ধরেই তাকে বিছানার ওপর শুয়ে নিজের উর্ধ্বাঙ্গ দিয়ে চেপে ধরে আঙ্গুর ওর মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন ক'রল, সত্যি বলছ আমি তোমাকে ফাঁকি দিয়েছি ? তোমার মনে হয় ?

আঙ্গুরের যুবতী শরীরে মেদ নেই কিন্তু মাংসল। তার ভরা শরীরের ভারে গুণধরের যথেষ্টই প্রীতি উৎপন্ন হচ্ছিল, তবু সে ছেলেমানুষী স্বরে বলল, দিছই তো ?

বহুদর্শী আঙ্গুর ওর ব্যাকুলতার কারণ বুঝে নিয়েছিল এবং এও ধরেছিল যে ওর বন্ধুদের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এই অনভিজ্ঞ যুবক। সে তার কলা কৌশল প্রয়োগ ক'রে অকস্মাৎ গুণধরকে ছেড়ে উঠে পড়ল, বলল, ঠিক আছে যদি আমি ফাঁকি দিয়ে থাকি তবে তুমি অন্য কারও কাছে যাও যে ফাঁকি দেবে না।

গুণধর উঠে আঙ্গুরকে জড়িয়ে ধরে বলল, যামু না। তোমারেই দিতে হইবো।

রসিকা রমণী কপটতা ক'রে বলল, আমার কাছে কিছু নেই। তুমি অন্য কোথাও দেখ।

গুণধর তার বন্ধন খুলল না, আলগাও ক'রল না। আঙ্গুর সেই ফাঁকে গুণধরের কোঁচাটা ধরে টেনে খুলে দিতেই সে যখন হাত ছেড়ে কাপড় সামলাতে চেষ্টা ক'রছে তখন ধুতিখানাই খুলে দিল আর একটা হ্যাঁচকা টানে। মুখে বলল, পাঞ্জাবী খোল না হ'লে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

গুণধরের সম্বিৎ ফিরেও ফিরছে না সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল। তার শরীরে যে বস্ত্র মাত্র নেই সে খেয়াল নেই, বহুদিন ধরে বহুবল্লভা হলেও আঙ্গুর আজ এই নবীন যুবকের কাছে সর্বাঙ্গ সমর্পণ ক'রেছে ওর সরলতার জন্যে। অকপট যুবকটিকে যৌবনের দীক্ষা দিয়ে সে-ও আজ পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে সমাচ্ছন্ন। অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ হয়ে থাকার জন্যে দরজায় করাঘাত বেজে উঠল। নিয়ম মত সাড়া দিল আঙ্গুর জড়িত স্বরে, আঃ দিক ক'রো না মাসী।

করাঘাত থেমে গেল। না, সব ঠিক আছে। একটানা দরজা বন্ধ থাকলে বাড়ীর পরিচারিকাকে টোকা দিয়ে দেখতে হয় ভেতরে কোন অঘটন ঘটে গেছে কিনা। সাড়া দেওয়াটাও ভেতরের মেয়ের কর্তব্য। সাড়া না পেলে বুঝতে হবে গোলমাল হয়েছে। তখনই সতর্ক বার্তা যাবে বাড়ীউলির কাছে, সেখান থেকে দারোয়ান, বেশি প্রয়োজনে বাহিনী।

আজ বোতলে হাত পর্যন্ত দেয়নি তবু তার সাড়া দেবার স্বর যে নেশা জড়ানো সেটা নিজেই বুঝল আঙ্গুরবালা, তার খারাপ লাগল না। গভীর তৃপ্তিতে মগ্ন থাকবার জন্যে সে সমস্ত রকম ব্যবধান ঘুচিয়ে গুণধরের কণ্ঠলগ্না হয়ে শুয়ে আছে। সুখের অনুভূতিটুকু সে পরিপূর্ণভাবে ভোগ ক'রতে চায়। এখন অর্থ নয়, নিরাপত্তা নয়, এখন চাই সম্পূর্ণ সুখ। এমন সুযোগ বারবণিতার জীবনে বড় একটা আসে না, যদি এসেছে তবে তার রেশ যতক্ষণ থাকে থাক, এই বাসনা নিয়ে সে তার সব ভুলে গেল।

কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে দিলু কোন কাজেই মন বসাতে পারল না। তার হঠাৎ কলকাতা চলে যাবার ব্যাপারটাকে ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়ে ভুলে চলে যাওয়া বলে চালানো গেল। হারানদা নিজেই পরামর্শ দিয়েছিল সরমার প্রসঙ্গ গ্রামে গিয়ে না বলতে তা হ'লে তার মামা বাড়ীকে এক ঘরে হয়ে থাকতে হতে পারে। কোন লোকই দিলুর শুভ কাজের দাম দেবে না, উল্টো ক'রে ধরবে। দিলুদের বাড়ীতে জানলে পাছে সর্বত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই ব্যাপারটা বাড়ী ফিরে একদম ভুলে যাবার নির্দেশ দিয়েছে হারানদা। কাজেই সেদিক থেকে কো.. ভয় নেই, সবাই এটাকে স্বাভাবিক ভাবেই ধরেছে। কিন্তু তার মন থেকে সরমা কিছুতেই বেরোচ্ছে না। শরীরাভ্যন্তরের কোন বেদনা যেমন সর্বক্ষণ আত্মপ্রকাশ করে, ওষুধে তা চাপা দিয়ে রাখতে হয় তেমনি ক'রে একাজে-সেকাজে ভুলে থাকতে চাইলেও সরমার স্মৃতি তাকে নিরন্তর খোঁচাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

কিছুদিনের মধ্যেই তার মানসিক পরিবর্তন শারীরিক বিপর্যয়ে পরিবর্তিত হ'তে বাড়ীতে সকলেই চিন্তিত ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মা বাবা ব্যাকুল হয়ে বুঝতে চাইলেও ছেলের অসুস্থতার হদিশ ক'রতে পারল না। আত্মীয় স্বজনও বৃথা প্রশ্নে বিব্রত ক'রতে

লাগল দিল্কে। প্রকৃতপক্ষে দিল্রও মনোবিজ্ঞানগত জ্ঞান এমন ছিল না যে সে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্ঝবে। সে কোন প্রশ্নেরই যথার্থ উত্তর দিতে পারল না। সরমার চিন্তা, তাকে দিন-রাত পীড়া দিচ্ছে বলেই যে শরীরে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা না বোঝার জন্যে এবং সরমার কথা কাউকে বলতে না পারবার জন্যে সে কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। গ্রামের মধ্যে চাপা স্বরে সরমা প্রসঙ্গ কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়ে সকলের আন্মানিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা সরমার দেহগত অস্তিত্বের সঙ্গেই ভৈবরের জলে ভেসে গেল। এই গ্রামের মান্ষদের ধারণা ও জানার মধ্যে দেহগত আত্মত্যাগের ঘটনা আরও আছে, গৃহত্যাগের ঘটনা অভিজ্ঞতার বাইরে বলে প্রথমটাকেই সত্য ধরে নিয়ে সব নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ল। অনেকে স্বস্তিও পেল! আত্মজন এবং সম্পর্কিতগণ সহজে বিস্মৃত হ'তে পারলেও সম্পূর্ণই অসম্পর্কিত এবং সর্বৈব উপেক্ষিত দিল্ তা পারল না বলেই তার ব্কের মধ্যে একবোঝা বেদনা দিনে দিনে ভারী হয়ে উঠতে লাগল। তার বাউণ্ডুলের মতো ঘ্রে বেড়ানো দেখে বাবা একদিন প্রস্তাব ক'রল, দোলতপ্রী স্নীলরে লিখি দিল্ তার কাছে চলে যাক, কোন এট্‌টা কাজে কামে লাগ্যে গেলি মনডা শ্দ্রোবে। শরীরডাও সারতি পারে।

মায়ের মাধ্যমে প্রস্তাবটা কানে আসতে দিল্ই স্থির করল, আমি কইলকেতা জাই মা। সেহেনে সাইজে-দারে ধয়রে কোন এট্‌টা কাজ পায়ে জাবানে।

এ প্রস্তাব আরও ভাল। সবাই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করল।

শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নেমে মাটিতে পা রাখা মাত্র দিল্র অন্ভূতি হ'ল যেন দীর্ঘদিনের কালা জ্বর নিমেষে তার শরীর ছেড়ে গেল। আগের বার তার যে ধারণা হয়ে গিয়েছিল তারই বশে সে ট্রাম ধরে বড়বাজারে নেমে নিমতলার ট্রামে উঠে ডিপোতে নেমে কয়েক পা পেরিয়ে গিয়েই গোপাল মিত্রের গোলায় দাঁড়াল। কাঠ মাপার কাজে ব্যস্ত ছিল হারাণ। কাজ শেষে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম ঝলকে চিনতে না পেরে বলে উঠল, কি রে দিল্! শরীরডা কি করিছিস? কি হলো তোর?

দাদার পায়ের ধ্লো নিয়ে দিল্ জানাল, কিছ্ না।

বলিস কি রে? কিছ্ না হলি এমন চেহারা হয়? ক'লিই মানবো? আয়না দে নিজির ম্খখান কহনো দেহিছিস?

দিল্ নির্বাক রইল, সে দেখেনি। সত্যিই আয়নার ম্খোম্খি হয়নি সে কখনও। উদ্বিগ্ন হারাণ জানতে চাইল, অস্খ হইছিল?

দিল্ নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

চিন্তিত হারাণ নিজের ঘরে এনে বলল, হাত-পা ধো। ছান ক'রলি কর। আগে কিছ্ খা পরে কথা হবে নে।

দিল্ নিজের পোঁটলা থেকে ছোট একটা প্ট্লি বের ক'রে বলল, মা তোমার জন্যি ম্ড়কি দেছে।

নিমেষে উদ্ভাসিত হল হারাণের ম্খমণ্ডল, সানন্দে বলল, দে দে বার কর।

হাত না ধুয়েই সে এক মুঠো মুড়কি মুখে পুরে দিল। সেটুকু উদরস্থ হ'লে বলল, আমাগে মুড়কি এ হেনে পাবিনে এহেনে যত্তো আইখো গুড়ির মুড়কি তার না স্বাদ না গোন্দ। আঃ। অনেকদিন পর মামীর হাতের মুড়কি খালাম রে। রাখ রাখ পরে জুত কোয়রে খাবানে। তুই হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নে দি—। আমি গোলার থে আসতিছি। মালডা মাপা হলো সামারি ক'রে থুয়ে আসি।

কাঠগোলার ওপরেই ঘর। বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকের থাকবার ব্যবস্থা। পেছন দিয়ে সিঁড়ি, নিচে গেলে কল পায়খানা—আগেরবার দিলু সব চিনে গেছে। কাঠের দোতলা। কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী মেঝে। নিচে কিছু দেখা যায় না রান্নাঘর আর খাবার জায়গাটা সিমেন্ট বাঁধানো। এ গোলাটা বন্ধই থাকে, গুদোম। সামনের দিকে আর একটা গোলাতে গদি, কাজ কর্ম সেখানেই। হারাণ ফিরে যেতে দিলু একা। হঠাৎ তার মনে হ'ল আচ্ছা এখানেই যদি সরমা থাকত—এখন যদি দেখা হয়ে যেত। কোথায় আছে কেমন আছে খুঁজে বের ক'রতে হবে— কি ক'রে যে ক'রবে! দাদাকে কি ক'রে বলবে! ভালই নিশ্চয় আছে; সুনীল বোস তো ভাল লোক, বড় লোক সে, ঠিকই ভাল একটা কাজ দেখে দিয়েছে সরমাকে। একবার কি দেখা করা যাবে না? কলকাতার বাড়ীগুলো যেন এক একটা ঘেরাটোপ, ভেতরে কেউ থাকলে বাইরে থেকে বোঝবার উপায়ই নেই। গ্রামের বাড়ী অনেক ভাল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার শেষে নানা খবরাখবরের মাঝখানে দিলু খুব হালকা ভাবেই বলল, আমাগে গেরামের সেই মায়েডারে কোয়ানে কাজে দেলে?

হারাণের মাথার মধ্যে থেকে ব্যাপারটা সম্পূর্ণই বেরিয়ে চলে গিয়েছিল, এখন মনে পড়ে যেতে স্বীকার ক'রল, ও তো সুনীল জানে। সুনীলরি বলিছেলাম সে কোথায় লাগায়ে দেছে। তুই কাল ওরে জিজ্ঞেস করিস বলবে নে।

দিলু সকাল হবার অপেক্ষা ক'রতে লাগল।

কিন্তু সকালে কোনই সদুত্তর পেল না। সদুত্তর তো কোন দূরের কথা তাকে দেখে চিনতেই পারল না সুনীল। যদিবা চিনল উপেক্ষায় জবাব দিল, এই হেনেই কুথায় আছে, আমি ক্যাম্বায় জানবো? তারে যে বাড়ী রাখিছেলাম সেহেনের থে পালায়ে গেছে।

বিডনস্ট্রীটের যে বাড়ীতে সরমাকে দেখে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে কোনই হদিশ পেল না। দেখল সেখানে তালা বন্ধ। কোথায় খুঁজবে সে? আবার সুনীলকে ধরল, ওর বড়ীর থে আমারে খবর নিতে বললো তাই তো আলাম। আমি গিয়ে বলতি না পারলি আমারে বকবে।

তার আমি কি করবো? আমি কি এহেনে জ্যোতিষীর দোকান খুলে বসিছি। কাজের মদ্যি আসে এ দেহি ভারি জ্বালায়!

দিলুকে দূর ক'রে দেবার জন্যেই যেন বেশি ক'রে বিরক্তি প্রকাশ ক'রল সুনীল। এরকম ব্যবহারের জন্যে দিলু প্রস্তুত ছিল না, প্রথমটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে

রইল, সুনীল যখন খেরো খাতা খুলে তার মধ্যে মনোনিবেশের ভঙ্গী ক'রল তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ হয়েই ফিরে এল। এ তো ভারী মুস্কিল হ'ল, এখন কি করা যায়! সরমার খোঁজ পাওয়া যায় কি ক'রে? লোকটা অমন রেগেই বা গেল কেন? কোথায় দিয়েছে বললেই তো মিটে যায়, তা না বলে অযথা রেগে যাবার কারণ কি? রাগের মধ্যে অবশ্য বলল যেখানে রেখেছিল সেখান থেকে সরমা পালিয়ে গেছে। কোথায় পালাবে সে? কি চেনে? একজন মেয়েমানুষের পক্ষে কি এই বিশাল নগরীর কিছু চেনা সম্ভব? সে একবারে নতুন মানুষ, কোনদিন ঘরের বাইরে কোথাও যায়নি। কি ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কোথায় দিয়েছিল সেটুকু তো অন্তত বলতে পারত!

হারাণদাকে এ নিয়ে বারবার বলা হয় যে উচিত হবে না এ বোধ দিলুর ছিল। কিন্তু কাকে বা বলা যায়? কাউকে না বলেও তো উপায় নেই। এখানে দিলু চেনেই বা কাকে? চিনলেই বা কি হ'ত, তারা কি সরমার কথা জানত? সরমার দায়িত্ব তো ঐ সুনীলকেই দিয়েছিল হারাণদা। দিলু কোনই দিশা পেল না।

দিলুর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে তার অন্তর কখনও উন্মুক্ত হয় না। মনের কথা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা তার স্বভাবের অন্তর্গত। কটা দিন মনে মনেই খুঁজল সে সরমাকে। এরই মধ্যে একদিন হারাণকে জানাল তার বাবা বলে পাঠিয়েছে এখানে কোন একটা কাজ খুঁজে দিতে। কথাটা শুনে হারাণ খুশিই হ'ল, থাকবি? তা'লি তো ভালই হবে, থাক। তো গে গেরামের কেউ তো এহেনে নাই, আমাগে সাথেই থাকতি হবে।

গেরামের মানুষ দিয়ে কি হবে, তুমিই তো আছো—দিলু জানাল।

হারাণ বেশ হৃষ্টচিত্তে বলল, আমি এমনি ক'চ্চি। তুই আমাগে সাথেই থাকবি। দাঁড়া তোর কাজের জন্যি আজিই বকসীরাম বাবুরে কচ্ছি। ক'দিন আগেই বকসীরামবাবু আমারে লোকের কথা বলতি ছেল।

কে বকসীরাম আর কে কি কিছুই জানে না দিলু শুধু হারাণকে জানে, সে যেখানে দেবে যা ঠিক ক'রে দেবে সেখানেই থাকবে দিলু। তার এখানে থাকা দরকার, সরমাকে খুঁজে পেতেই হবে।

প্রথম মাসের বেতন পেয়ে হারাণের হাতে তুলে দিল দিলু। শিক্ষানবিশ হিসেবে সামান্যই বেতন, সারামাসের খোরাকী খরচ তো আছে। হারাণও অল্প বেতনের কর্মচারী, তাই ইচ্ছে থাকলেও তার পক্ষে ভাই-এর খোরাকি খরচ প্রতি মাসে চালানো অসম্ভব। বার তের জনের মেস, সকলে খরচ দিয়েই চলে, তাই সকলকেই সমান হারে দিতে হয়। দুচারদিনের অতিথি হলে পয়সা নেবার প্রশ্ন ওঠেনা তাই মেস ম্যানেজার গিরীনদাকে খরচের টাকা দিয়ে বাকি দিলুকেই ফেরৎ দিল হারাণ। জীবনে প্রথম রোজগারের টাকা খুব আদরের হয়। সামান্য টাকা ক'টি অসামান্য

মনে হ'ল দিলুর কাছে। হারাণদাই বুদ্ধি দিল, পেরথম টাকা পালি মা আনন্দময়ীরে পুজো দে।

সেইজন্যেই সন্ধেবেলা মোড়ের দোকানে প্যাঁড়া কিনে কালীমন্দিরে গিয়ে দাঁড়াল দিলু। সেখানেই হরেনের সঙ্গে দেখা! হরেন চুপচাপ কালীতলায় দাঁড়িয়ে আছে। দিলুই চিনে প্রথম কথা বলল, হরেনদা এহেনে কি ক'রতিছিলে?

হরেন প্রথমটা একটু থমকে গেল সন্ধের অন্ধকারে ঠিকমত চিনতে না পেরে। রাস্তার গ্যাসের আলো এমন প্রখর নয় যে মানুষকে ঠিক দেখাবে তার ওপর আবার বিস্মৃতি, সেই কবে একবার দেখা। দিলু ধরা দিল, আমারে চিনতি পারলেন না আমি হারাণদার ভাই। সেই যে—

বাকি কথা আর বলতে হ'ল না হরেন খুব খাতির ক'রল, আরে অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারি নি। কবে এলে?

ছোকরাটিকে চেনা হরেনের দরকার ছিল। এ তো সরমার ভাই। ইদানীং সরমার কাছে ঘন ঘন যাওয়া যায় না সরমাও ঠিক পছন্দ করে না, খাতির তো করেই না তাই ভাই এসেছে খবরটা নিয়ে গেলে একবার তো অন্তত যাবার রাস্তাটা খুলবে। এই মোদ্দা কথা ভেবেই সে বলল, তুমি হলে আমার বড় কুটুম তোমাকে না চিনে পারি? তা তোমার দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

দিদি! থমকে গেল দিলু, কার কথা বলছে হরেনবাবু? তাকে ঠিক চিনতে পেরেছে তো? ওকে অমন থমকে থাকতে দেখে হরেনই বলল, তোমরা দুজন সেবার দেশ থেকে এসেছিলে না? সঙ্গে সরমা ছিল?

এবার যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল দিলু। হ্যাঁ। বলেন।

সরমাকে সে বিয়ে ক'রেছে এই কথাটা দিলুর কাছে বলে সে খুব শ্লাঘা অনুভব ক'রল। হরেন প্রথমদিকে ঠিকমত জানত না, কোন খবরই রাখেনি বলে নিজেই ধরে নিয়েছিল এই যুবকটি সরমার ভাই। নিজের না হলেও কোনরকম ভাই তো বটে। অতএব এর কাছে দিদিকে বিয়ে করেছে বললে এ খুব খুশিই হবে। তবু সেকথা শুনে দিলুর কোন অভিব্যক্তি না হওয়াতে জানাল, ঐ সুনীলটা তো কেবল মুখে বলেই খালাস। যখন দেখল মেয়েটার কোন গতি হচ্ছে না আমাকে বিয়ে ক'রতে বলল। আমি দেখলাম ঠিক আছে ক'রে নিই!

আপনার বাড়ীডে কোয়ানে? দিলু প্রশ্ন ক'রল।

দিলুর কাছে সবই যেন কেমন রহস্যময় লাগল। সুনীল বলেছে, যা তার সঙ্গে এই লোকটির কথার কিছুমাত্র মিল নেই। বরং যে-কোন একজনের কথা একেবারেই মিথ্যে? রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে দিলু বলল সরমার সঙ্গে আমারে দেখা ক'রতি হবে। অনেক দরকার—

ঠিক আছে, দেখা তো ক'রবেই, হরেন বলল, কাল দুপুরে আমার সঙ্গে যাবে।

আপনারে কোথায় পাব?

তুমি আমাদের ডাক্তারখানা চেনো না? আঙ্গুল তুলে পূবদিকে দেখাল হরেন, ঐ বাড়ীটায় দেখবে সাইন বোর্ড আছে, কায় চিকিৎসালয়।

এখন তো সন্ধে হয়ে গেছে বাড়ী যাবেন না?

হরেন বিপদে পড়ল, কোনক্রমে সামাল দেবার মত ক'রে বলল, আজ কাজ আছে। রাত্রে যাব না। কাল দুপুরে খাবার ছুটিতে তোমাকে নিয়ে যাব।—সন্ধেবেলা সেখানে যাবার যে হুকুম নেই সেই কথাটা দিলুর কাছে ভাঙ্গল না।

সরমার বিয়ের খবরে দিলুর মনে হঠাৎ আঘাত লাগল। ওর প্রতি দারুণ অভিমান হলেও একবার দেখা করবার জন্যে সে অধৈর্য হয়ে উঠল। আবার তার মনে সংশয়ও এল, এ লোকটির কথার কোন স্থিরতা আছে বলে মনে হয় না। কোন লোক সন্ধেবেলা বা রাত্তির হলে ঘরে না ফেরে? এ বলছে দুপুরে যাবে। অন্য সব কাঠগোলার মতই বক্সীরাম জোয়ালা প্রসাদের গদিও ঠিক বারটা বাজলেই বন্ধ হয়ে যায়, বেলা দুটো পর্যন্ত খাবার ছুটি। এই সময়টা নিজস্ব, যা খুশি ক'রতে পারে। তাই ছুটি হওয়া মাত্র ফিরে এসে সে কোনক্রমে দুটা ভাত খেয়েই নিমতলা স্ট্রীটের সেই বাড়ীটার সামনে হাজির হয়ে দেখল একটু উঁচুতে ছোট্ট একটা ঘরের দরজায় বিরাট সাইন বোর্ড টাঙ্গানো আছে 'কায় চিকিৎসালয়'। তিন-চারটে সিঁড়ি উঠতে হ'ল—ঘরটা জোড়া চৌকি পাতা পেছনে একটা আলমারী কোনক্রমে খাড়া হয়ে আছে। সেই চৌকির ওপর একজন বয়স্ক ভদ্রলোক সরু নিকেল করা ফ্রেমের চশমা চোখে বসে কি যেন পড়ছেন। দিলুকে দেখামাত্র জানতে চাইলেন, কি চাই?

দিলু উত্তর দেবার আগেই আলমারীর আড়াল থেকে শশব্যস্ত হয়ে হরেন বেরিয়ে এল, মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ ক'রে থাকবার ইশারা ক'রল। দিলু অবাক হয়ে দেখল আলমারীর পেছনেও জায়গা আছে। সে বেরিয়ে এসে চৌকিতে বসা ভদ্রলোককে বলল, এ ছেলেটা কাঠ গোলাতেই থাকে। গোপাল মিস্তিরের গোলাতে।

কোন প্রত্যুত্তর না ক'রে ভদ্রলোক কাগজ পড়াতেই মন দিলেন।

হরেন বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি বাবা। ভদ্রলোক শুনলেন কি শুনতে পেলেন না কিছুই বোঝা গেল না। একই রকম বসে রইলেন নির্বিকার নিস্তব্ধতায়। দিলু ঘরের বাইরে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে দেখল বিরাট সাইনবোর্ডটায় বেশ বড় ক'রেই লেখা কবিরাজ বাধারমন দাশগুপ্ত, ভিষকাচার্য। দিলু শেষ শব্দটির অর্থ বুঝল না। অর্থ-টর্থ নিয়ে সে কখনও মাথাও ঘামায় না তার প্রয়োজন হয় না বলে।

দিলুকে নিয়ে নিমতলা ঘাট স্ট্রীট ধরে গঙ্গা পেছনে ফেলে সোজা পূর্বগামী হ'ল হরেন। অল্পই পথ, ফুরোলে চিৎপুর রোডে পড়ল, ট্রাম লাইন। দিলু আগেও নিমতলা স্ট্রীটের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষা একজোড়া ট্রাম লাইন দেখেছে আজ প্রথম দেখল সেই লাইন চিৎপুরে পৌঁছে সেখানকার লাইনের সঙ্গে মিশে গেছে। এতদিন এসেছে দিলু নিমতলা থেকে স্ট্রান্ড রোড দিয়ে নিয়মিত ট্রাম চলতে দেখে মিনিটে মিনিটে, কিন্তু এ লাইন দিয়ে একদিন মাত্র একটা বিচিত্র ট্রামকে পশ্চিম দিকে আসতে

দেখেছিল, হারাণদাকে পরে প্রশ্ন ক'রে জেনেছিল সেটি জলের ট্রাম, অর্থাৎ তার শরীরে বিশাল ট্যাঙ্কে জল থাকে, পথে জল দেয় আর ডিপোতেও প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে।

চিৎপুরে পড়ে বাঁ দিকে অর্থাৎ উত্তর মুখী হল হরেন, কিছুটা চলেই দিক বদলে ডানদিকে আবার একটা পূর্বগামী কম পরিসর পথে ঢুকল। দিলু হরেনের পেছন পেছন চলতে চলতে অচেনা পথের দুদিক ভাল করে দেখতে লাগল। দুপাশে অল্পই দোকান ছোট ছোট, একটাই কেবল সাইনবোর্ড দেখল লক্ষ্মী হোটেল। দোকানগুলোর মধ্যে পানের দোকানই বেশি। একটা পানের দোকানের ওপরে টুপি মাথায় সিগারেট মুখে একজন লোকের মাথার অংশের ছবি—পাসিং শো সিগারেটের বিজ্ঞাপনের বোর্ড। কলকাতায় এসে এই একই সাইনবোর্ড অনেকই জায়গায় দেখেছে দিলু।

আচমকা একটা সরু গলির মধ্যে বাঁক দিল হরেন। দিলু প্রথমটা থমকে গেল, এ কি সরু পথ! পথ তো, না কি কোথাও ঢুকে পড়েছে? দুদিকে পুরনো বাড়ীগুলো যেন গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কেমন স্যাঁত স্যাঁত ক'রছে, অন্ধকার জমে আছে যেন। একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল হরেন, দরজার সামনে দাঁড়াতে ইঙ্গিত ক'রে নিজে ঢুকে গেল।

দিলু অল্পক্ষণ দাঁড়িয়েই কেমন অস্বস্তি অনুভব ক'রতে লাগল, যেন অন্যরকম এখানকার সব লোকগুলো। কি রকম ঠিক বুঝতে পারছে না কিন্তু অন্যরকম তা মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি মেয়ে এদিক ওদিক ক'রল যাদের দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল দিলু। এ সব কেমন মেয়েমানুষ! যেমনটি নিজেদের সংসারে দেখা যায় তেমন নয়। পুরুষ মানুষরাও সব কেমন কদর্য চেহারার, দেখলে ভয় ভয় লাগে। এ তাকে কোথায় রেখে গেল লোকটা, গেলই বা কোথায়? একটা ছুকরি এসে বলল; কি গো নাগর বসবে?

মেয়েটির চালচলন ভাবভঙ্গী দেখে হতভম্ব হয়ে গেল দিলু, কথা কিছু বুঝল না। ওকে বোকা হতে দেখে মেয়েটি হঠাৎ ওর সার্ট ধরে সামান্য টেনে দিল মজা করবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে যেন সে ঘেমে উঠতে লাগল। ওর নাস্তানাবুদ অবস্থায় আরও কৌতুকের সুযোগ পেয়ে মেয়েটি কাকে যেন ডেকে উঠল, পলকে দুটি অল্পবয়স্ক মেয়ে পাশের বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে এসে এমন চোখ মটকালো যে দিলুর হাফসার্টের তলা দিয়ে পিঠ বয়ে ঘাম ঝরতে লাগল সরীসৃপের মত। সে কি যে ক'রবে স্থির ক'রতে পারল না। দুপা দৌড়ে গেলেই গলির বাইরের চওড়া রাস্তাটা, যাবে নাকি সেখানে?

ইদানীং সরমার সঙ্গে দেখা করা বিশেষ সম্ভব হচ্ছে না; কখন দারোয়ানের কাছ থেকে কখন দোতলায় উঠে মাসীর কাছে বাধা আসবে। আজ ভেবেছিল সরমার ভাই-এর নাম বললে যাবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নিচে দারোয়ানই আটকে দিল, হবে না। বাড়ীউলির বারণ আছে, কোন লোক যাবে না।

হরেন সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'রল, আমার জন্য নয় দারোয়ানজী, ওর ভাই এসেছে দেশ থেকে। সে দেখা ক'রবে।

ভাই উই হোবে না। কোই কো যানা মানা আছে।

তুমি একবার নিজে যাও দারোয়ানজী, বল দেশ থেকে ওর ভাই এসেছে যে ভাই-এর সঙ্গে কলকাতা এসেছিল। নিচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

অনিচ্ছার সঙ্গে নেহাৎ উপরোধে পড়ে ঢেঁকি গেলবার মত ক'রে ওপরে গেল পিয়ারা সিং অল্পক্ষণ পরে ঘুরে এসে বলল, না আভি কারও সাথমে মিলবে না সরমা।

হরেন হতাশ হয়ে পড়ল। এরপর কি বলবে বা কি ক'রবে কিছু স্থির ক'রতে না পেরে কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিষাদগ্রস্ত ভাবে বাইরে বেরিয়ে এসে বিপর্যস্ত দিলুকে দেখে জিজ্ঞাসা ক'রল, কি হ'ল?

মেয়ে কটির মধ্যে একজন বলে উঠল, বাইরে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছে তাই ঘরে আসতে বলছি।

হরেন এতদিন ধরে যাতায়াত ক'রছে বটে এ পাড়ার মেয়েদের ব্যাপারে জড়তামুক্ত নয় সুনীলের মত। এ ব্যাপারে সুনীল সত্যিই ওস্তাদ। হরেন যে কদিন এসেছে সোজা ওপরে উঠে সরমার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে ভয়েই আর কোনদিকে তাকায়নি। তার ভয়ের কারণ পকেটের দুর্বলতা। আপন আর্থিক অক্ষমতার জন্যে সর্বত্রই যেমন নিষ্প্রভ হয়ে থাকে তেমনই নির্বল থাকে এইখানে এসেও। হরেন মেয়েদের সঙ্গে কোন কথা না বলে দিলুকে বলল; চলে এস। দিলুকে সঙ্গে নিয়ে গলির বাইরে বেরিয়ে এল, দিলু শুনতে পেল মেয়েগুলো পেছনে সমস্বরে বেশ জোরে শব্দ ক'রে হাসছে। শব্দের সীমার বাইরে পৌঁছোতেও তার মনে হ'ল হাসির শব্দ তাকে সমানে বিঁধছে।

বড় রাস্তাটায় এসেও দিলুর সন্ত্রাস কাটল না। সে নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল। পরাজিত সেনাপতির মানসিকতা নিয়ে হরেন একটু আগে পর্যন্ত এই ছেলেটির কাছে জবাবদিহির ভাবনায় বিব্রত ছিল এখন তা থেকে মুক্তি পেয়ে সে যেন স্বস্তি পেল। কোনক্রমে ট্রাম রাস্তায় এসে ভয় কাটল দিলুর। তবু সে কোন কথা বলতে পারল না, বাবাঃ এ কোথায় নিয়ে গিয়েছিল লোকটা! তাদের দেশ গ্রামে যে কলকাতার নামে সবাই ভয় পায় সে তাহ'লে এই লোকগুলোর জন্যেই। কি সব লোক! এখানে মানুষেরা সব স্বাভাবিক, ওখানেই বা অমন কেন? ভাবনাটা দিলুর মাথার মধ্যে ক্রমাগত ঘূর্ণিপাক দিতে লাগল।

ধীরে ধীরে হরেন নামক লোকটার ওপর তার ঘৃণা জমতে লাগল, ও রকম ভয়াবহ জায়গায় তাকে নিয়ে গেল কি ভয় দেখাতে? কেন কি দোষ ক'রেছিল দিলু? ও রকম ভয়ের মধ্যে সরমা যাবে কেন, যাবেই বা কি ক'রে! এ লোকটা বোধহয় ভুল ক'রে অন্য কারও কথা বলছে যে জন্যে বার বার দিদি দিদি বলছে। তাছাড়া এ লোকটাও কেমন যেন, হারাণদা, সুনীলবাবু বা আর পাঁচজন লোকের মত নয়।

একটু বোকা, না কি—কেমন তা ঠিক ধরতে পারছে না দিলু তবে ওদের থেকে যে বোকা তা অনুমান করতে পারছে। সে কিছুটা দূরে চলে আসবার পর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, সরমার কাছে জাবেন যে কলেন, এ তো দেহি ফিরে জাতিছি।

গুণ্ডাটা যেতে দিল না যে—হরেনের কণ্ঠে অসহায়তা ফুটে উঠল।

গুণ্ডো! কোন গুণ্ডো? গুণ্ডো আ'লো কোয়ানের থে? সরমা গুণ্ডোগে মাজে গ্যালো কি ক'রে? আপনি না কলেন বিয়ে করিছেন!

হরেন জানাল, বিয়ে তো হয়েছিল কিন্তু—

দিলু যতই শোনবার জন্যে ব্যাকুল থাক হরেন কথা শেষ ক'রতে পারল না, সে কি বলবে খুঁজে পেল না। সরমা কোনদিনই যে সে বিয়ে স্বীকার ক'রেছে এমন নয়, সামান্য কিছুদিন সে যেন বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিল তাও মেনেছিল সুনীলের চাপেই, তখন সুনীল ভিন্ন গতি ছিল না বলেই সুনীলের সব কিছুই মানতে হয়েছিল তাকে। মাস কয়েক হ'ল প্রকাশ হয়েছে সে সন্তান ধারণ ক'রেছে; হরেন ভালভাবেই জানে সে সন্তান সুনীলেরই তবু ভেবে আনন্দ পায় তারও হতে পারে। সেও তো সরমা গমন ক'রেছে, অনেক দিনই ক'রেছে। সরমা তার সন্তান ধারণ ক'রে আছে এতে তার কি বিপুল আনন্দ—এ আনন্দ সে প্রকাশ ক'রতে পারল না দিলুর কাছে কারণ আজকের পরাজয় ঢাকতে পারবার মত ঘটনা ছাড়া জয় প্রকাশ অসম্ভব—এ সে বোঝে। দিলুকে সে সরমার কাছে নিয়ে যেতেই পারেনি।

সমস্ত ব্যাপারটাতেই সরমা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার দেহের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গমের আভাস স্পষ্ট হওয়া মাত্র সে স্থির ক'রতে পারল না—এখন কি ক'রবে। তার যে আর আপনজনদের কাছে ফিরে যাবার পথ নেই সেই কথাটা মনে আসে নি। সে যেন নিজের সমাজে নিন্দিত হয়ে পড়ছে এই তার একান্ত ভয়। একেই তাকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে করুণাশঙ্কর গত হওয়াতে, তার ওপর যদি আবার সবাই জেনে যায় তার এ অবস্থা তা হ'লে তো আর রক্ষে নেই, দশখানা গ্রাম জুড়ে ঢি ঢি পড়ে যাবে।

সোনামণি প্রথমে জানা মাত্রই বলেছিল, ওসব হ'ল গে শত্তুর, পেটে যদি শত্তুর এসেছে নিকেশ ক'রে দে। ওসবের ওষুধ আছে। ওষুধ খেলেই পেট সাফ হয়ে যাবে।

সৌদামিনীই একমাত্র পরামর্শ দিল, কারও কথা তোকে শুনতে হবে না, মন যা চায় তুই তাই কর। এই তো প্রথম, একটা ছেলে মেয়ে অনেকে রাখে। তুই চাইলে রাখ। আমি তেমন মনের মানুষ পেলে তার বাচ্চা পেটে নিশ্চয়ই ধরতাম, তেমন লোক তো পাই নি।

সরমা চুপ ক'রে থেকেছিল। আসলে সে কিছু ভেবে স্থির ক'রতেই পারে নি। কি করা উচিত, অথবা কি ক'রে কি করা সম্ভব সবই তার না জানা। কেবল ভয়

তাকে প্রবলভাবে গ্রাস ক'রেছিল, লোক ভয় এবং সোনামনির কথা শুনতে গেলে মৃত্যু ভয়ও। কারণ সোদামিনীই তাকে একটা ঘটনার কথা জানিয়েছিল একতলার কোনার ঘরটায় একটা ছেলেমানুষ মেয়ে কাউকে কিছু না বলে চারটে মাস কেটে যাবার পর যখন দেখল ব্যবসার অসুবিধে হচ্ছে তখন 'পেটখালাস' করতে গিয়ে শেষটায় মরেই গেল। সে কী কান্ড! হুলুস্থুল ব্যাপার। কত হাঙ্গামা ক'রে বাড়ীউলি সেই ঝঞ্ঝাট মেটায়। আবার তোকে বুদ্ধি দিচ্ছে?

অদেখা সেই মেয়েটির মৃত্যু সংবাদই বেশি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল সরমাকে। সোদামিনী আর একটা কথাও বলেছিল, বাচ্চা যদি রাখতে চাস তবে কিন্তু অনেক অসুবিধে। বেঁচে যদি থাকে তবে তো কয়েকটা বছরের মত কাজ কম্মের বারোটা আর যদি না বাঁচে তাহ'লেও তোর আট ন'টা মাস কাজ কর্ম সব বন্ধ। এখন বুঝে দেখ কি ক'রবি।

কিছুই বুঝতে পারে নি সরমা, এখনও বোঝে না। যা হবার হোক। এর মধ্যে আশার কথা এই যে করমচাঁদকে হাতে-পায়ে ধরে রাজি করিয়েছে এরপর সে সেমিজ গায়ে দিয়ে শেঠজীর সেবা ক'রবে। এখন পর্যন্ত দেখতে খারাপ লাগছে না, যখন লাগবে তখন দেখা যাবে, এই শর্তে রাজি হয়েছে শেঠ করমচাঁদ এবং সরমাকে সে ত্যাগ করে নি।

করমচাঁদের ভালই লাগে, সরমার ভরন্ত দেহে এক নতুন রূপের সন্ধান পায় করমচাঁদ। একটি দেহে দিনে দিনে কি নীরব পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। নারী দেহের সৌন্দর্যই তাকে আকর্ষণ করে। ছাড়া আর কিছুতেই তার আগ্রহ নেই। প্রথমে ধীরে ধীরে ভরে উঠল সরমা তারপর বেড়ে উঠল। করমচাঁদ স্পর্শ করে না, স্পর্শ পেয়ে আনন্দ লাভ করে। তার প্রকৃত আনন্দ দৃশ্যে। দৃশ্যে যার আনন্দ, দৃশ্যান্তরে আনন্দ স্বাভাবিকভাবেই অধিক। করমচাঁদ দেখেছে অনেক, তবে সবাই যে ওর শর্তে রাজি হয়েছে এমন নয়, সোদামিনীর দেহে আকর্ষণ বেশি কিন্তু সে-ও বেশিদিন সঙ্গ দিতে রাজি হয় নি। বেশি টাকার সর্তেও রাজি করা যায় নি সোদামিনীকে, সে-ই সরমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। একথা স্বীকার ক'রতে করমচাঁদ আনন্দ পায় যে সোদামিনী শিল্পী। শরীরকে সে কাজে লাগাতে পারে, সরমা সাদামাঠা মেয়ে, শারীরী কৌশলে অপারদর্শী। ছলা-কলা না জানলেও ফাঁকিও জানে না।

সরমার সিদ্ধান্তে সোনা অসন্তুষ্ট। ব্যবহারে প্রকাশ করে না বটে তবে মুখে যথেষ্টই বলেছে, এ তুই ভুল ক'রলি সরমা, একদিন বুঝবি। শুনেছে সরমা, রা কাড়ে নি। প্রতিবাদ করে নি কারণ ভুল কি ঠিক হচ্ছে তার জানা নেই। যা হয় হবে, নারীমাত্রেই তো সন্তান ধারণ করে ক্ষতি তো কিছু হয় না বরং সোনা যা বলছে সে তার ধারণার বাইরে। তাই সাহস হয় না। সোনার কথাটাও ফেলবার নয়, রাগ ক'রে গজগজ ক'রলেও কথাটা সত্যি যে এ পাড়ায় সন্তান জন্ম দিয়ে তাকে বড় করা

হাঙ্গামার কাজ। তাতে লাভও নেই।

শুনে সৌদামিনী মন্তব্য করে, বাড়ীউলি মিথ্যে বলছে না। কথাটা ফেলবার নয়। তবে তোর যদি সখ হয়েছে কর। তোকে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হবে। তাছাড়া তুই তো ইচ্ছে ক'রে করিস নি ঐ হারামজাদা তোকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তুই তো এখন অনেক দিন খদ্দের তুলতে পারবি না। হাতে পয়সাও নেই যে এতগুলো দিন চলবে। বাড়ীউলি তো রেয়াৎ ক'রবে না! তুই এক কাজ কর ঐ শেঠকে ভাল ক'রে পটা, লোকটার বহু টাকা। কত টাকা তোর ধারণা নেই, জানারও নয়। ও যদি কিছু সাহায্য করে তো অসুবিধে থাকবে না। আর একটা কাজ ক'রতে পারিস, সৌদামিনী পরামর্শ দিল, যে হারামজাদাটা আসে তার বাচ্চা পেটে ধরেছিস তাকে খরচা চালাতে বল।

সে আর আসে না।

ঐ যে বললি তার কে এক স্যাঙ্গাৎ আসে সেটাকে দিয়ে খবর পাঠা।

ওর কথা শুনবে না।

তবে দূর ক'রে দে সব শালাকে। একদম আসতে দিবি না।

বন্ধু সৌদামিনীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে নি সরমা। এ ব্যবস্থা সোমামণিও আগেই কিছুটা ক'রেছিল। দারোয়ান এসে যখন হরেনের কথা বলল, সরমার ভাইকে সঙ্গে ক'রে এনেছে বলছে সরমা প্রথমটা বিশ্বাস ক'রল না। মনে ক'রল হরেন দেখা করবার অছিলা খুঁজছে। দিলুর কথা তার মনে হয়নি। সে দেশে ফিরে গেছে এটা জানত। ফিরে আসবে সরমা ভাবতেই পারেনি। দিলু এলেও সরমা দেখা ক'রবে না। মুখ দেখাবে কি ক'রে? দিলুর সামনে যাবার মুখ নেই তার। কি ক'রে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! শৈশবের সঙ্গী দিলু, কতদিন রাঙ্গা বকুলতলার মাঠে খেলতে খেলতে ঝগড়া আবার ভাব হয়েছে। তখন থেকেই বড় ভাল ছিল দিলু। শ্যামল, নীলু, ভোম্বল—সকলের নাম মনেও পড়ে না, তাদের সবার চেয়ে ভাল। শান্ত স্থির। শৈশবের দিনগুলো এত দূরে সরে গেছে যে তাদের মনে আনতেও বেগ পেতে হয়। আয়াস-সিদ্ধ স্মৃতি যখন সামনে আসে উঁকি মারে একটি শান্ত শিশু যার অসন্তোষ কখনও কলহ না হয়ে অভিমানে পেঁছে নীরব বেদনার মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকত আমন্ত্রণের আন্তরিকতার অপেক্ষায়। বয়সে খুব কাছাকাছি হলেও সরমা যতটুকু বড় ছিল সে তুলনায় দেহগত উচ্চতায় একটু বেশি বড় ছিল সে সময়টায় দিলুর তুলনায়। পরে একদিন দিলুর মধ্যেকার পুরুষ জেগে উঠল প্রাকৃতিক ভাবে নারীত্বকে ছাপিয়ে গেল বলেই দিলু এখন মাথায় বড় হয়ে আছে। গ্রাম সম্পর্কে খুড়ি দিলুর মা বলতেন, সরমা যে বছর বৈশাখে জন্মালো আমাগে দিলু হলো সেই আশ্বিনে। মাছ ছয়েক পেছিয়ে গিয়ে দিলু অনেক যোজন পিছিয়ে পড়েছে। দেশজ সংস্কার তার এবং সরমারও রক্তের মধ্যে মিশে থাকায় সে আর কখনই সরমার ওপরে উঠতে পারল না। জীবন তাকে অনুজের

ভূমিকায় বেঁধে পিষে মারতে লাগল।

অথচ অকারণেই সরমা তার সমস্ত মনোভূমি অধিকার ক'রে নিজের বিস্তার বাড়াল সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের অক্ষয় অবয়বে। তাই প্রত্যাখ্যাত দিলুর প্রত্যাশা উন্মুখ হয়ে রইল রহস্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্খায়—সত্যিই সরমা ওখানে আছে কিনা, থাকলে কি ক'রছে। এই যে লোকটা তাকে জানিয়েছে সরমাকে বিয়ে ক'রেছে এ কথারই বা উৎস কি। সত্যমিথ্যা নিরূপণের সংশয় তার মনে নতুন এক ঘূর্ণাবিত সৃষ্টি ক'রল। দেশে মাকে সংবাদ পাঠাল সে ভাল আছে অথচ ভাল না থাকার সমস্ত উপকরণের কর্মশালা ওর মনের মধ্যে নিরন্তর ক্রিয়াশীল রইল, সে উপকরণের নাম সরমাচিন্তা। কাউকে কিছু বলতে না পেরে এই চিন্তা তাকে প্রায়শ বিবশ ক'রে তোলে। হরেনদের অতিক্ষুদ্র কবিরাজী দোকান তার কর্মস্থলের অতি কাছে বলে অনেক সময়ই তাকে চোখে পড়ে, দিলু কোনই আগ্রহ বোধ করে না। সুনীল তার স্বকর্মের মানুষ কিন্তু তাকে কদর্য মনে হয় বলে তার দিকে তাকাতে দিলুর কেমন ঘৃণা হয়। যে এলাকাটায় হরেন তাকে সরমার সঙ্গে দেখা করাবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল সে জায়গাটা কষ্ট ক'রলে হয়ত চিনতে পারবে দিলু ভাবে, তবে তার সাহস আসে না সেখানে যাবার। প্রথম দিনের প্রখর আলোর দুপুরেই তার যা অভিজ্ঞতা আবার ওপথে যাবার কথা ভাবা যায়! দিলুর সাহস হয় না। যদি অতগুলো নির্লজ্জ মেয়ের আক্রমণ না থাকত তবে অন্য ভয় তাকে নিবৃত্ত ক'রতে পারত না, কারণ ভয় ব্যাপারটার সঙ্গে তার পরিচয় কোনদিনই খুব ঘনিষ্ঠ নয়। ভয় হচ্ছে বুদ্ধিমানদের মনোবিকার, দিলুর সে নামে খ্যাত হবার লক্ষণ কোনদিনই দেখা যায় নি। বরং তার বসবাস বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কহীনতার আশ্রয়ে।

কাঠগোলায় থাকতে থাকতে স্বাভাবিক ভাবেই অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল দিলুর, কর্মসূত্রে সমস্ত কাঠগোলা অঞ্চলটাই প্রত্যহ ঘুরতে হয়। ব্রহ্মদেশ থেকে জাহাজ যোগে কাঠ এসে পৌঁছালে এলাকার শতাধিক গোলায় তা বিক্রি হয়ে যায়, দিলুর কাজ সে সব গোলায় যাওয়া, হিসাবপত্র লেন দেন—কত কি। কাঠগোলা গুলোর প্রায় প্রত্যেকটির ওপরেই শক্তপোক্ত দোতলা ঘরে অনেকেরই বসবাস, অনেক ব্যবসায়ীরও। ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত বড় ব্যবসায়ীও অনেকে সে দেশের অনুকরণে ভাল ভাল কাঠের দোতলা নির্মাণ ক'রে কর্মস্থলেই বসবাস করে, তাদের অনুসরণে আরও অনেকে। সে রকমই একজন যদুনাথ সাহা-র ছেলে রাখালের সঙ্গে দিলুর পরিচয় গভীর হল। প্রায় সমবয়স্ক বলে পরিচয় বন্ধুত্বের সীমানায় এসে হাত ধরাধরি ক'রল। রাখাল ততদিনে বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে বিদ্যালয়ের মধ্যেই আছড়ে পড়ে সেই যে বাড়ী ফিরেছে আর সে মুখো হয় নি। প্রয়োজনই বা কি? বান্ধবেরা বলেছে, তোর বাপের মত কাঠগোলা থাকলে কে এই ঝামেলায় আসে! কোনও 'গুরুবাক্য' সামনে না থাকায় বন্ধুদের অভিমতকেই গ্রহণ করে আরামে আছে রাখাল। স্বদেশীয়

কর্মচারী যদুনন্দন দাস বাপের তত্ত্বাবধানে গোলার কাজ দেখাশোনা করে তার অনন্ত অবসর কেবল উদর পূর্তি ও অবকাশ যাপনের। সে সে-কাজে বেশ সনিষ্ঠ। এর মধ্যে সদানন্দ ব্যানার্জীর ছেলে সনাতনই একমাত্র বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে বিদ্যালয়ের বেড়া ডিঙ্গিয়ে। সদানন্দের কাঠের কারবার থাকলেও সনাতন সেই ভরসায় আত্মসমর্পণ করে নি। দিলুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তারও কিন্তু জমে নি। রাখালই তাকে আপন ক'রে নিয়ে একান্তভাবে পরিচয় জানিয়েছে, এই এলাকার ওই যে পণ্ডু দত্তকে দেখ আমার জ্যাঠামশায় আর উনি হইল গিয়া জুড়ি। সন্ধ্যা হইলেই দুজনেই যাইবো সোনাগাছি।

গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কোন বোধ না থাকায় প্রথম দিন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে রাখালের দিকে চেয়ে থেকেছে দিলু। কোথাও কেউ যেতেই পারে, তবে যেমন ক'রে রাখাল বলছে তাতে মনে হচ্ছে স্থানটির কোন বিশেষত্ব আছে। তাই জানতে চেয়েছে, সেখানে কি ?

দিলুর নিবুদ্ধিতায় দেশীয় ভাষা এসেছে রাখালের মুখে, আ হালা ! আমরা হইলাম গিয়া ঢাকাইয়া, তুমি দেখি আরও বাঙ্গাল ! কিছুই বোজ না !

সেই প্রথম সোনাগাছি বুঝল দিলু। রাখাল বোঝালো। এলাকার যা বর্ণনা দিল তাতে দিলু বুঝতে পারল হরেন তাকে ওখানেই নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে সরমা কেমন ক'রে যাবে ? কেন যাবে ? রাখালের কাছে সরমা প্রসঙ্গ কোনদিনই প্রকাশ করেনি দিলু প্রথম প্রকাশ ক'রল, আমাগে জানা চেনা একজন মাইয়ে মানুষ ওহেনে থাকে বলে শুনিছি। আমারে একদিন নিয়ে জাতি পারো ?

রাখাল চিন্তান্বিত হয়ে বলল, ঐখানে গ্যালে ক্যারা হালা দেইখা ফালাইবো। অনেক হালাই তো যায়। তোমাগো গলির শশী কুণ্ডু, ব্রিজমোহন মারোয়ারী আমার জ্যাঠার লাগে যশোদা শা, মুনি মামু—কয়জনের নাম কমু ? এগো মইদ্যে এক নম্বর আসামী হইলো গিয়া সুনীল। বর্মা টিম্বারের সুনীল বাবুরে চিনো না ? হ্যায় হইলো গিয়া চাম্পিয়ান যারে কয়। লুকে ট্যাকা দিয়া আসে আর ঐ পুঙ্গির ভাই ঐহান থিকা একজন মাইয়া লুকের ট্যাকা মাইরা আনছে।

এই সংবাদ শুনে দিলুর যেন চেতনা খুলে গেল। তা'হলে পাওয়া গেছে। হবে হয়ত—কি ক'রে দেখা হতে পারে ? মনের মধ্যে আলোড়ন চলতে লাগল।

হরেনকে দিয়ে হবে না। বোঝা গেছে হরেন নিতে পারবে না। রাখালের কাছে জেনে গেল চেনা জানা কোন মানুষকে, সে যদি মেয়েমানুষ হয়, ও এলাকায় খুঁজে নেওয়া অসম্ভব। শুধু যদি জানা যায় কোন বাড়ীতে আছে তবেই কেবল পাওয়া যেতে পারে। সেই বাড়ীতে যাবার পদ্ধতিও জেনে গেল, পকেটে টাকা নিয়ে খদ্দের সেজে যেতে হবে। বাড়ীতে ঢুকে গিয়ে খুঁজে নিতে হবে।

কদিন বাদেই মাস মাইনের টাকা ক'টা পেয়ে মেস-এর খরচা মিটিয়ে যে ক'টাকা বাঁচল তা তাকে সমানে খোঁচাতে লাগল। ভাবল রাখালকে ও পাড়াতে নিয়ে যাবার

জন্যে ধরবে। কিন্তু রাখাল যা বলেছে তাতে সরমা ওখানে থাকলেও তাকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তাছাড়া রাখাল পরিচিত জনেদের সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে ওখানে যেতে চায় না। সে একদিন বলেছে, বৌবাজারে অনেক বেশ্যাবাড়ী আছে দিলু চাইলে সেখানে নিয়ে যেতে পারে তবে সোনাগাছি যাবে না। রাখাল নিজের বুদ্ধিমত কথা বলেছে, দিলুর তো দরকার সরমাকে, তাকেই খুঁজতে হবে। সে যেখানে আছে বলে বুঝেছে সেখানেই যাবে দিলু, আর কোথাও নয়। তাই রাখালের সাহস তার কাজে লাগবে না। রাখালকে সব কথা বলাও যে ঠিক হবে না সে কথা এখানকার সুনীল আর হরেনের জটিল ব্যবহার দেখেই টের পেয়েছে দিলু। কাজেই সঙ্গী হিসেবে তাকে নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না বরং নিজেই সে একদিন দুপুরবেলা গলিটার ভেতরে না ঢুকে চেষ্টা ক'রে দেখবে বাড়ী খুঁজে বের ক'রতে পারে কি না। পরক্ষণেই আশংকা হ'ল যদি সেই মেয়েরা আবার তেমনি করে! কি সাংঘাতিক মেয়ের দল রে বাবা! মনে পড়েই যেন দিলুর ঘাম ঝরতে লাগল। একটা মেয়ে আবার জামা টেনে ধরেছিল! লজ্জা সরম বলে কিছু নেই! রাখাল বলেছে ওরা সব বেশ্যা। সে আবার কি? বেশ্যা কি? দিলু তো অনেক কিছুই জানে কিন্তু এ যে কি তা তো জানে না! এ আবার কি জিনিষ? এমনটা জীবনে দেখে নি দিলু। জীবনে তো অনেক কিছুই দেখা হয়নি, এখন হচ্ছে। এই কলকাতা মহানগরী কি দেখা হয়েছিল! এ যখন দেখছে তার নানা রূপও তো দেখতে হবে!

বিভ্রান্ত মানুষ বিপরীত বুদ্ধি চালিত হয়। দিলুও দীর্ঘকাল যাবৎ বিভ্রান্তির কবলে পড়ে থাকার জন্যে দিশাহারা। সে ভেবেছিল সরমাকে কলকাতাতে ভাল একটা আশ্রয়ে রেখে গেছে। এখানে ফিরে যখন দেখল সরমার সন্ধান নেই তখন তার বিভ্রান্তি বাড়ল। তার হতাশা প্রকাশের কোন জায়গাও ছিল না। ছিদ্রহীন আধারের মধ্যে উৎপন্ন বাষ্প যেমন আধারকেই ধ্বংস করে তেমনই আবদ্ধ হতাশাও মানুষকে বিধ্বস্ত করে আপন নেতিবাচকতার বেগে। দুঃখ, বেদনা, হতাশা যদি মুক্তির পথ পায় তাহ'লে তার ক্রমবর্দ্ধমান চাপ নিয়ন্ত্রিত থাকবার সুযোগ পায় বলে ক্ষতির আশঙ্কা কমে। দিলুর সে উপায় ছিল না, তার এমন কোন সমবয়স্ক প্রিয়জন ছিল না যার কাছে সে নিজের মনকে উন্মোচন ক'রতে পারে। এমন কি যে সরমাকে নিয়ে তার মনের এত বিভ্রাট সেই সরমাকেও প্রকাশ ক'রতে পারে নি ওর জন্যে কি নীরব বেদনা তাকে নিরন্তর পীড়া দিয়ে চলেছে। বেশি কিছু নয় একটি দিন যদি সে সরমার হাত ধরে বলতে পারত, সরমা ছেলেবেলার খেলার দিনগুলো আমার হৃদয়ে সমুদ্র হয়ে উঠেছে, তুমি কি তার উত্তাল তরঙ্গের ধ্বনি কখনও শুনতে পাও না, অথবা এমনি কোন মামুলি শব্দ তাহ'লেও শান্তি পেত সে। সরমার উত্তর তাকে আঘাত ক'রলেও এই অহেতুক নিত্য ভাবনার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। হয়ত এক ঝটকায় ছিটকে পড়ে মনের কিছুটা ভাঙ্গত কিন্তু সেই ক্ষতস্থানের বেদনা অল্পদিন বাদেই মিলিয়ে যেত ক্ষত শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে।

তার বদলে সরমা একটা সর্বমনব্যাপ্ত ক্যানসারের ক্ষতের মত কেবলই বিস্তৃতি পেয়ে চলেছে।

বুদ্ধি কম থাকলে অনেক সময় একটা বিরাট সুবিধা থাকে সাহসের পরিমাপ বেড়ে যায়। অগ্রপশ্চাৎ বিচারের যে সূক্ষ্ম চিন্তা তা বিড়ম্বিত করে না, যা হোক একটা ক'রে ফেলবার প্রেরণা এসে যায়। দিলুর একমুখী ভাবনা তাকে সরমার সন্ধান নিতে সমানে অনুপ্রাণিত ক'রছিল। সেই প্রেরণা তাকে মাঝে মাঝে উত্যক্ত ক'রে তোলে, তখন মনে হয় এখনই যাই খুঁজে দেখি। সেদিন যেমন ক'রে ট্রাম লাইন ধরে বাঁদিকে গিয়ে ডানদিকের রাস্তাটায় ঢুকে পড়েছিল বিহারী জর্দার দোকানের পাশ দিয়ে ঠিক তেমনি ক'রেই চলে যাবে। কিছুটা গিয়ে একটা দোকান, আর একটু গেলে একটা খাবারের দোকান সেটার পরেই গলিটা। সে ঠিকই যেতে পারবে। কিন্তু যদি সেই দারোয়ান পথ আটকায়? বাড়ীটা তো দেখেছে ভেতর তো দেখা হয়নি। ভেতরে গেলেই কি সরমাকে পাওয়া যাবে? এখানে যা সব বড় বড় বাড়ী—কোথায় কে থাকে বোঝা-ই যায় না। ভেতরে ঢুকলে সব তাল গোল পাকিয়ে যায়। দিলু ঠিক রাখতে পারে না। এই কলকাতা জায়গাটাকেই তার কেমন গোলক ধাঁধার মত লাগে। সব কেমন গুলিয়ে যায়, এই মাত্র দেখা জায়গা ভুল হয়ে যায় একটু পরেই। ঠিক রাখতে পারে না। এই যার অবস্থা সে কি ক'রে যাবে? নিজের মনেই প্রশ্ন উঠে নিবৃত্ত করে তাকে। ফলে এক ভাবনায় যতটা এগোয় ঠিক ততটাই পেছিয়ে সেই একই জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকে দিলু।

ধীরে ধীরে একটা বিষয় তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে ঐ পল্লীটা যে কারণেই হোক ভাল নয় এবং সাধারণ মানুষ এড়িয়ে যেতে চায়। যারা যায় যে কোন কারণেই হোক তারাই মাত্র যায়। সকলেরই কেমন চাপা দেবার ভাব আছে ওপাড়ার কথায়। রাখাল যে রাখাল ব্যবহারে যার কোন আগল নেই, সে-ও ওপাড়ার প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়ে যেতে চায়। একমাত্র হরেনই একজন লোক যে তাকে বিনা বাক্যে নিয়ে হাজির ক'রেছিল। তবে কি আর একবার তাকেই আশ্রয় ক'রবে ওখানে যাবার জন্যে? সরমার কাছে পেঁছাতে? কিন্তু হরেনকে তার কেমন খারাপ লাগে, সহ্য ক'রতে পারে না। কেমন যেন লোকটা। এই বাজে লোকটাকে বিয়ে ক'রেছে সরমা? বিশ্বাস হয় না। অযথাই হরেনের ওপর রাগও হয়। এ লোকটাও আর কাজ পেল না সরমাকে বিয়ে ক'রতে গেল! কেন ক'রল? বিয়ে ক'রে তো মানুষ বউ নিয়ে নিজের বাড়ীতে রাখে ওটাই যদি এর বাড়ী হবে তাহ'লে নিজেই তাতে ঢুকতে পারল না কেন? তাকেই বা নিয়ে যেতে পারল না কেন? সবই কেমন ঘোলাটে মনে হয়। বিরক্তিও হয় তার। কেবল সীমাবদ্ধ ক্ষমতার জন্যে সে কিছুই বলতে ও ক'রতে পারে না, এতে তার চিত্ত বিক্ষোভই বেড়ে চলে। হারাণ-এর কাছে শুনেছে হরেন দোকানেই শুয়ে থাকে, ঘুমোয়। তার মা এবং ভাইবোনেরা দেশে থাকে, এখান থেকে খরচের টাকা গেলে খায়। তাই

বাপের সঙ্গে হরেনকেও কৃচ্ছ্রসাধন ক'রতে হয়।

বেশ কয়েকদিন ভেবেচিন্তে দিলু একদিন একাই বেরিয়ে পড়ল রহস্য উদ্ঘাটন ক'রতে। তার মনে কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল, সেই জেদ তাকে ক্রমাগত তাড়না ক'রছিল, আর সেই তাড়নার চোটেই মাসের আট তারিখে দুপুরবেলা আহারান্তে নিজের কর্মস্থলে না গিয়ে নিমতলা ষ্ট্রীট ধরে পূর্বগামী হ'ল। অল্প এগোলেই বাঁ দিকে সুবিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকায় জোড়াবাগান থানা, তারপরই বাঁ দিকে নতুন প্রসারিত রাস্তা বেরিয়েছে, দেখবার মত রাস্তা; হেঁটে বেড়িয়েও আরাম বলে লোকে অযথাই পদচারণা ক'রে বেড়ায়। সেই রাস্তার সংযোগ পার হয়ে এগিয়ে চলল দিলু। অবশেষে পথ চিনে ঠিক মতই পৌঁছাল বটে, বাড়ীটার সামনে এসে দ্বিধায় পড়ল। সময়টা অবসন্ন দুপুর বলে ভিড় অনেকটাই কম। বাড়ীগুলো নিঝুম হয়ে আছে, হঠাৎ কি করে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়বে সে ভাবল। কাউকে জিজ্ঞাসা ক'রলে ভাল হ'ত, কিন্তু কাকে বা প্রশ্ন ক'রবে, কেউ তো নেই। মিস্টির দোকানটায় জিজ্ঞাসা ক'রলে কি আর বলতে পারবে মেয়েমানুষের নাম বলে কথা, পুরুষ মানুষ বাড়ীর কর্তার নাম হলেও না হয় হ'ত। অনেক বুদ্ধি বিবেচনা ক'রে গলি থেকে বেরিয়ে আসা একজন লোককে প্রশ্ন ক'রল, এই বাড়ীডে কার গো মশাই বলতি পারেন? অর্থাৎ তাহ'লে সে সেই নামটি ধরে বাড়ীর ভেতরটা গিয়ে যাকে পাবে ডেকে কথা বলবে।

দিলুর বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনে লোকটা প্রথমে স্থির হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াতে গিয়ে সে বেশ হেলে দুলে পড়ছিল তবু চেষ্টা ক'রে সম্ভব মত দাঁড়িয়ে দিলুর চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তোমার বাবার। আগে আমার বাবার ছিল আমি মাল খাই বলে রাগ ক'রে তোমার বাবাকে বেচে দিয়েছে। বুঝলে?

খুব বুঝেছে দিলু। যা-বা বোঝবার ছিল তাও গোলমাল হয়ে গেল। কি বলল লোকটা? এসব কি কথা? পাগল নাকি? অমন দুলছেই বা কেন? এরপর ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা চোখের সামনে তুলে ধরে কাঁপা হাতে আঙ্গুল দুটো নাড়তে নাড়তে প্রশ্ন ক'রল, তুই কে বাবা? কোথাকার বাঙাল? খানকি বাড়ীতে বাপের নাম জিজ্ঞেস ক'রিস? এখানে বাপের নাম থাকে নাকি? শাল্লা! এই একমাত্র কাশীনাথ মল্লিক আছে গোটা জেলায়—যার বাপের নাম আছে। আর শালা যে সে নাম নয় নিধিরাম মল্লিক—বত্তিরিশ খানা ঘোড়ার গাড়ী আর রিক্সা ছিল যার।

মহা ঝামেলায় পড়ল দিলু। এখন এই লোকটার হাত থেকে সে ছাড়া পায় কি ক'রে? ও তো আর যাচ্ছেও না! সেই যে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে টলতে লেগেছে একইভাবে বকে চলেছে। কি বিপদেই না পড়া গেল। ভয়ও লাগছে লোকটাকে, যে ভাবে ধমকে কথা বলছে কখন না কি ক'রে বসে! আগে এমন পাগল বুঝলে কি আর ডেকে কথা বলত দিলু! ওর এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি গোছের অবস্থা।

এ বিপদ থেকে উদ্ধার না পেলে খুঁজবে কি ক'রে সরমাকে ?

নিধিরাম মল্লিক—শালা হাড় কেপ্পন ছেলো। একটা পয়সার মাল খেত না। আমি শালা সব ফুঁকে দিলাম। না মানে এই রাঁড় পাড়াতে জমা ক'রে দিলাম। যাঃ শাল্লা জমা থাক। ভুবনমোহিনী দাসী—আহা মন মাতানো হাসি। ছড়াও কাটল লোকটা! আর কত কি যে বলছে কি ক'রবে কিছুরই আঁচ পাচ্ছে না দিলু। তবে মারবার হলে এতক্ষণ মেরে দিত বা খারাপ কিছু করবার হ'লে তাও ক'রে ফেলত। এতক্ষণ ধরে কথা যখন বলছে তখন বেশি আর কিছু ক'রবে না। কিছু করুক আর না করুক এর কাছ থেকে ছাড়া না পেলে নিজের কাজ তো হবে না। কাজেই এর হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই।

পায়ে পায়ে পেছিয়ে গলির মুখ ছেড়ে বড় পথটায় পড়ল দিলু, চট ক'রে মিষ্টির দোকানটায় উঠে পড়ল। ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখল লোকটা আবার চলে এল না তো এখানেও ? দোকানে যে বিক্রেতা সামনে আছে তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রল, আস্ছা ভাইডি ক'তি পারেন সরমা নামে এ্যাট্টা মায়ে কোন বাড়ীডায় থায়ে ?

দোকানী প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে প্রশ্ন কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন প্রশ্ন সত্যিই সে কখনও শোনে নি। বছর ছয় হ'ল এই দোকানে কাকার সঙ্গে এসে কাজ ক'রছে, একটু পাকাপোক্ত হয়ে দোকানদারীর দায়িত্ব পেয়ে অবধি অনেক রকম জিজ্ঞাসার সামনে সে পড়েছে কিন্তু আজকের মত প্রশ্ন এই প্রথম। বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল। এখানে এসে অবধি যত রকম মানুষ সে দেখেছে তাদের সঙ্গে এই লোকটির কথা মেলে না। মাতাল অনেক আসে যাদের কোন কথা বোঝা যায় না, জড়িয়ে জড়িয়ে কি যে বলে—এ লোকটি জড়িয়ে বলছে না কিন্তু কি যে জিজ্ঞাসা ক'রল বোঝা গেল না। সে কিছু না বুঝেই নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

দিলু তাতে আপন প্রশ্নের যথার্থ জবাব পেয়ে গেল। এই দোকানী সরমার সন্ধান জানে না। অথচ এখানটাতেই তো এসেছিল হরেন। এই গলিটার প্রথম বাড়ীটাতেই যেন ঢুকেছিল! তাদের গাঁয়ের সব লোককে তো সবাই চেনে! পর-ক্ষণেই মনে হ'ল তা বলে মেয়েদের কি আর চিনবে ? কেনই বা চিনবে না ? নিত্য ঘোষের বাড়ীর মেয়েদের, কালীপদ বিশ্বাসের বোনের মেয়ে দুলু, নিজের মেয়ে মায়ু, লতু, চাঁপা, মনে ক'রতে চেষ্টা ক'রল দিলু—আসলে এখানে কেউ কাউকে চেনে না। কত মানুষ এখানে কে কাকে চিনবে ? এ কি আর অজ গাঁয়ের পঞ্চাশ যাট ঘর মানুষ ? হাজার হাজার ঘর বাড়ীতে কত হাজার হাজার মানুষের ভিড় এখানে। কে কাকে চিনবে ? কত জনকে চিনবে ? এই বাড়ীর গায়ে লেগে থাকা বাড়ী ঘিঞ্জি গলির মধ্যে থেকে সে-ই বা খুঁজে বের ক'রবে কি ক'রে যে সরমা কোথায় থাকে ? তবে সেদিন যেন ঐ বাড়ীটাতে ঢুকেছিল হরেন, দিলুর মন বলছে ওটাতে একবার ঢুকতে পারলে হ'ত। কিন্তু সেদিনের অভিজ্ঞতার জন্যে আজও ভয় ভয় করছে। কি সাংঘাতিক সব মেয়েরা এখানকার! তারা কি রোজই থাকবে ? নাঃ।

সেদিন ছিল বলে আজও যে থাকবে তার কোন কথা নেই। সেদিনের স্মৃতিমাত্র আতঙ্কিত চোখে চারদিকে চেয়ে নিল দিলু। না, নেই। খাঁ খাঁ ক'রছে দুপুর। কয়েকটা কাক ডাকাডাকি ক'রে পাড়াটাকে জাগিয়ে রেখেছে নইলে যেন বাড়ীঘর, রাস্তা, দোকান সব ঝিমিয়ে রয়েছে। এতবড় একটা জমজমাট জনপদ এমন ক'রে ঘুমোতে পারে দিলু তা দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন নিঝুম দুপুরের নির্জনতায় তার কিছুটা সাহস হ'ল। ভাবল এসময় সরমার সঙ্গে দেখা হ'লেও হতে পারে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে সে গলির মধ্যে ঢুকে বাড়ীটার সামনে দাঁড়াল। সদর দরজা হাট ক'রে খোলা। ভেতর পর্যন্ত পুরো দেখা যাচ্ছে—জনপ্রাণী নেই। এ বাড়ীতে কেউ থাকে তো ? কোনও মানুষ ? অবস্থা দেখে সন্দেহ হ'ল দিলুর। ঠিক এই সময় একটি পথিক কুকুর কোথা থেকে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। কুকুরটার অসংকোচ অনুপ্রবেশ দেখে দিলুরও মনে সাহস এল। সদর পেরিয়ে ঢুকে পড়ল।

বাড়ীর ভেতরেই একটা চতুষ্কোণ উঠোন ঘিরে তিন দিকেই ঘর বলে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু সব দরজাই বন্ধ। কোন ঘরে মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছে না, দেখাও যাচ্ছে না কাউকে কার কাছেই বা জানতে চাইবে সরমার কথা ? একবার ভাবল ডেকে উঠবে নাকি সরমার নাম ধরে! নিঝুম পুরীতে কে বা সে ডাক শুনবে ? তাছাড়া এমন নিস্তব্ধতা নষ্ট ক'রতেও তার ভয় ক'রল।

সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ একটা ঘরের দরজা খুলে লুঙ্গি পরা হাতে বোনা গেঞ্জী গায়ে একজন লোক বেরিয়ে এল। দিলু যেন প্রাণ পেল তাকেই ধরে বসল, ভাইডি ক'তি পারেন এই বাড়িতি সরমা বলে কোন মায়ে থায়ে কিনা ?

লোকটা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দিলুর দিকে এমন ভাবে তাকাল যে ওর মনের মধ্যে কেমন ভয় বিদ্যুতের মত চমকে গেল। লোকটি বলল, এস এস।—বলেই দিলুকে নিয়ে সেই ঘরেই ফের ঢুকে পড়ল। দিলু দরজা টুকু পার হয়েই যে দৃশ্য দেখল তাতে তার শরীর নিমেষে বরফ হয়ে গেল। সে পিছিয়ে যাবে সেই মুহূর্তে লোকটি খপ ক'রে ওর হাত ধরে একটানে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল, বলল, শেফালী এই দেখ এক নতুন মুর্গা। কাকে খুঁজছে দেখ।

ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে যেন ঘুমোচ্ছিল। লোকটির কথা শুনেই ঘুম জড়ানো স্বরে জানতে চাইল, কে গো ?

ততক্ষণে দিলুকে নিয়ে পড়েছে লোকটা, ছাড় মাইরি দুটো টাকা ছাড়। মাল ভিড়িয়ে দিলাম। সরমা শেফালী সব একই মাল। তারপরই একটা এমন অশ্লীল কথা বলল যে সে কথার অর্দ্ধেক অনুমান ক'রেই দিলুর মাথা ভোঁ ভোঁ ক'রতে লাগল। ইতিমধ্যেই লোকটির প্রকৃতি বদল হ'তে শুরু ক'রেছে, ভাষা বদলে যাচ্ছে, আ বে মাত্তর দুটাকা তো চেয়েছি একটা পাঁইটের দাম। পকেটে হাত ঢোকালে সব মাল বিলা ক'রে দেব, তখন শালা যা দেখলে শুধু দেখেই হড়কে যেতে হবে। কাছে যেতে পারবে না।

লোকটির ভাবভঙ্গী দেখে আর ভাষা শুনে দিলুর শরীরের রক্ত জমে যেতে লাগল। এ কোথায় যে এসে পড়ল। কি বিড়ম্বনায় পড়া গেল শেষ পর্যন্ত! কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে যে ক'টা টাকা ছিল নিয়ে লোকটা ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল হতভম্ব দিলুকে পুতুলের মত দাঁড় করিয়ে রেখে। মেয়েটি একটি শব্দ ক'রল না, নড়ল না, লোকটি চলে যেতে কেবল শরীরের আড় ভাঙ্গতে উপুড় হয়ে শুলো। দিলু সভয়ে দেখল মেয়েটির শরীরে সুতো টুকু নেই, সে জন্যে ওর কোন সংকোচ নেই। এমন দৃশ্য অতীতে কখনও দেখেনি দিলু। ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়েই ছিল এবার যেন জবুথবু হয়ে গেল। শুয়ে থাকা যুবতী যেন দিব্য দৃষ্টিতে ওকে দেখতে পাচ্ছিল, তেমনি উপুড় হয়েই বলল, অমন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল কেন নাগর? ট্যাঁকে রেস্ত যদি কিছু থাকে এসে শুয়ে পড় নইলে রাস্তা দ্যাকো। কেবল তো পকেটের ট্যাকা কেড়েচে, এবার এসে যদি বাবুয়া তোমাকে দ্যাকে তো তোমার ঐ জিনিষটি কেটে নেবে।

মেয়েটির শান্ত কথার ধারা যেন দিলুর শিরদাঁড়া বেয়ে হিম শীতল জলের মত অথবা কোন সরীসৃপের মত নামছিল। অন্য সময় হলে তার এতদিনের শ্রমের পরিশ্রমিক নিঃশেষ হয়ে যাবার জন্যে কষ্ট হ'ত, এখন সে কথা মনে এল না। কেমন একটা আতঙ্ক তাকে এমনই ভাবে বেষ্টন ক'রে ধরল যে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। যে পথ দিয়ে লোকটা গেছে ওকে তো এখন সেই পথেই বেরোতে হবে! কি ক'রবে? যদি লোকটা দরজার বাইরে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, বাঘ শিকারের জন্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকে আড়ালে! যা সাঙ্ঘাতিক লোক, টাকা-গুলো তো নিয়েছেই এখন যে কি ক'রবে কে জানে!

হঠাৎ মেয়েটা ধমকে উঠল, আচ্ছা হারামী জুটেছে তো! কি দেখছে দাঁড়িয়ে? ডাকব পিয়ারা সিংকে? এক রদ্দায় শালাকে রাস্তায় ফেলে দেবে। ট্যাঁকে রেস্ত নেই তো মায়ের ন্যাংটো দেখগে যা—বলে একটা অতি অশ্লীল গালি দিতেই দিলুর কান ঝাঁ ঝাঁ ক'রতে লাগল। সে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পথে নেমে পড়ল।

কিছুটা দূরে, ট্রামলাইনে এসে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে টাকাগুলোর জন্যে তার শোক হ'তে লাগল। অন্যসব মুছে গেল, টাকা হারানোর বেদনা তাকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলল। শ্রান্ত পায়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত দিলু প্রত্যাবর্তনের পথ ধরল। অন্যসময় যে পথ দশ মিনিটে চলত সেই পথ আধ ঘণ্টায় পার হয়ে সে গঙ্গার ধারে নিমতলা শ্মশানের পাশে একটা পাকুড় গাছের তলায় বসে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল। সরমার জন্যে নয়, মনোবেদনার চাপে। বাষ্প যেমন পথ চলতে গিয়ে জল হয়ে যায় দিলুর বাষ্পীভূত বেদনা তেমনই অশ্রু হয়ে ঝরতে লাগল।

দুদিন হেনস্তা হয়ে দিলুর জেদ চেপে গেল। রবিবার বিশেষ কোন কাজ থাকে না। কাঠগোলা বন্ধ বলে ছুটি থাকে। হারাণদা ঐ একটা দিনই মেস-এর

বাজার করে, রান্নাতে যোগ দেয় অনেকেই। শক্তি এ ব্যাপারে বেশি উৎসাহী বলে সে সকাল থেকেই গামছা পরে নেমে পড়ে। একমাত্র দিলুর কোনই কাজ থাকে না। সে সকলকেই সাহায্য করে। যে যখন ডাকে তার কাজেই দিলু লেগে পড়ে। ননীদত্ত পিঁয়াজ কাটতে কাটতে দিলুকে বলল, ভাইটি তুমি এটটু লঙ্কাগুলোন চিরে দাও দেহি!—দিলু তাই কাঁচা লঙ্কার বোঁটা ছাড়াচ্ছিল ঠিক এমন সময়ে সুনীল এসে হাজির। আত্মীয়তা অনেকের সঙ্গে আছে আবার হারাণের সঙ্গে আছে বন্ধুত্ব তাই সমবয়স্কদের আসরে সুনীল মাঝে মাঝে আসে। এসেই বলল, আজ তোমাগে বড় ভোজ মনে হচ্ছে!

ননী দত্ত সামনে ছিল, উত্তর দিল, আমাগে ভোজ তোমাগে রোজকার খাওয়ার মতো।

কি যে কচ্চো ননী দা! ভোজের নাম ভোজ। সে যদি কুমড়োর ঘ্যাটও হয় তবু তারে ভোজই বলতি হবে।

হতি পারে। তবে সে ভোজের খাওয়া তোমাগে মুখে রোচবে না নে।

খতি তো কচ্ছো না।

এবার হারাণ মুখ খুলল, তোমারে খাতি বললি তো দুই জনরে না খায়ে থাকতি হবে।

বেশি কোরে চাল নেবা—সুনীল বলতেই হারাণ পালটা বলল, মাংস! সিডা কোয়ানের থে আসপে? তুমি তো এক সের মাংস খায়ে ফালাবে আমাগে আছেই তো মাত্তর দেড় সের।

ঠিক আছে আমি এক সের আনায়ে দিচ্ছি।

সুনীলের গলা পেয়ে গামছা পরা শক্তিপদ এদিকে সরে এসে জিজ্ঞাসা ক'রল, তুই সত্যিই খাবি?

খাবো বলেই তো আলাম।

তা'লি বয় তোরে আর টাকা দিতি হবে না, পণ্ডা দা দেবে নে। যাও দিলু ভাই একসের মাংস চিৎপুরির থে নিয়ে আসো।

সুনীল নামের এই লোকটির প্রতি এমনই অশ্রাদ্ধা দিলুর যে এর কোন ব্যাপারেই তার কোন আগ্রহ ছিল না; এ লোকটি খাবে বলে একসের মাংস আনতে এখন সেই চিৎপুর রোডের পাঁঠার দোকানে যেতে হবে মনের তাতে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও নেহাৎ মেসের সর্বজন মান্য শক্তিপদ খুড়ো বলছে বলেই দিলু মনোভাব প্রকাশ ক'রতে পারল না।

হারাণ দিলুর অন্য অসুবিধের কথা বুঝে বলল, একখানা সাইকেল থাকলি ভাল হতো, যাতি আসতি সময় লাগতো না। যাইক গে এটটু পা চালায়ে আয়স খন।

দাদার কথায় সায় দিয়ে দিলু বলল, আলাম ব'য়লে।

সত্যিই সে অতি দ্রুতই ফিরে এল। মাংস চড়িয়ে দিতে আর কারও কোন কাজ রইল না। সেই অবসরে সুনীলকে ধরে হারাণ অন্যসকলের অগোচরে প্রশ্ন ক'রল, আচ্ছা সুনীল তোরে আজ এটুটা কথা জিজ্ঞেস করি ঠিক জবাব দিবা— এগে গাঁয়ের মায়েডারে কোথায় কাজে দেছে? তোমাগে বাড়ীতি তো নেই!

সুনীল আজ মাংসের ভোজের জন্যেই হোক আর বা অন্য কারণে বিশেষ প্রসন্ন ছিল, বেশ জোরেই উত্তর দিল, এই ডে তুমি না জিজ্ঞেস করলিই ভাল ক'রতে। আমি খরচ বরচ কোয়রে হরেনের সাথে মায়েডার বিয়ে দেলাম তা তোমারে কি কবো হারামজাদা মায়েডারে রাখতি পারল না! সে তো শুনতিছি এখন বেবুশ্যে গে পাড়াতি আঠারো নম্বর বাড়ীতি থায়ে।

কি কচ্ছো তুমি?

যা শুনিছি তাই তোমারে ক'লাম। কে আর দেখতি গেছে বলো?

ও পল্লীতে যে সুনীলের যাতায়াত আছে অনেকেই তা জানে, হারাণ সেদিকে ইঙ্গিত ক'রে বলল, শুনিছো না দেহিছো?

সুনীল এ প্রশ্নের সোজা জবাব এড়িয়ে একমুখ হেসে বলল, তোমাগে যা খুশি বলতি পারো।

দিলুর কানে সব কথাই পেঁছাল, সুনীল যেন তাকে শোনানোর জন্যেই অমন জোরে জোরে বলল কথাগুলো। হরেনবাবু তো তাহ'লে ঠিক কথাই বলেছিল। ওটাই নিশ্চয় আঠার নম্বর বাড়ী, ওখানেই থাকে সরমা। যে ঘরটায় গুণ্ডাটা টাকা কেড়ে নিল সেটা নয়, অন্য কোন ঘরে হবে। এবার সে নিশ্চয় খুঁজে বের ক'রবে সরমাকে, ঐ জঘন্য জায়গা থেকে বের ক'রে আনবে। ওখানে কি মানুষ থাকে, কি সব মেয়েমানুষ! অমন অসভ্য লজ্জাহীন মেয়েছেলে সে জীবনে দেখেনি, ভাবেইনি এমন সব থাকতে পারে। ওর মধ্যে কেমন ক'রে বা টিকে আছে সরমা? এবার একটা দিন আর সময় ঠিক ক'রে নিয়ে শেষবারের মত সে ওখানে যাবে, যে ক'রেই হোক সরমার সঙ্গে দেখা ক'রবে।

কদিন বাদেই দুপুরে বেলায় নির্মলা এসে ঘরে ঢুকে সৌদামিনীর আলস্য ভাঙ্গিয়ে দিল। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে সে এসে ঢুকে পড়েই বলল, ও সৌদামিনী তোমাদের বাড়ীতে সরমা বলে কোন মেয়ে থাকে?

হ্যাঁ। কেন?

তার দেশের কে একটা লোককে সোলেমান আর হীরা মারতে মারতে প্রায় মেরেই ফেলছে আমাদের বাড়ীর দরজার ভেতরে।

সৌদামিনীর কি হ'ল সে পিয়ারা সিংকে ডেকে বলল, সামনের বাড়ীর দরজার মধ্যে কাকে সোলেমান আর হীরারা মারছে ছাড়িয়ে আন তো? যে ক'রেই হোক আনবে।—পিয়ারাকে ছেড়ে নির্মলাকে বলল, তুমি মাসী লক্ষ্মীটি একবার ওপরে

যাও। বাড়ীউলির পাশের ঘরে সরমা থাকে, তাকে খবরটা বলো।

জীবনের যে অংশটা এখানে কাজে লাগে সেটা সম্পূর্ণ ফুরিয়ে ফেলে নির্মলা এখন একান্তই বেকার। নিজের পুঁজি এমন নেই যে বসে পেট চলবে আবার রোজগার করবার ক্ষমতাও নেই তাই অনেকের কাছে দয়া পেয়ে দিন চলে আর তার বিনিময়ে কখন কখন কিছু কিছু কাজও ক'রে দেয় কেউ বললে।

সরমার কাছে খবরটা দিতে সে ভেবে পেল না তার দেশের লোক কেমন ক'রে এখানে আসবে। হবে হয়ত কাঠগোলা পাড়ারই কোন লোক। তাদেরই বা এ ঠিকানা জানার উপায় কি? কেউ তো জানে না। দেশের লোক কখনই নয়, কে দেশের লোক আসবে?

দাসী সোনামণির পান আনতে নিচে গিয়েছিল ফিরে এসে প্রথমেই সরমার কাছে এসে বলল, হ্যাঁ গা তোমাদের কে দিলু আছে হারামীর বাচ্চারা তাকে পেরায় মেরেই ফেলেছিল আমাদের দারোয়ানজী গিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। রক্তে নাকমুখ ভেসে যাচ্ছে। সৌদামিনী জল দিয়ে ধুচ্চে।

সরমা স্তম্ভিত হয়ে গেল দিলু এখানে কি ক'রে এল! ও কি তবে দেশে ফিরে যায়নি? এখানেই রয়ে গেছে সেই থেকে! না কি আবার ঘুরে এসেছে দেশ থেকে? কেনই বা এসেছে? আর এখানেই বা এল কি ক'রে, এই ঠিকানায়? দিলু না হ'লে ঐ নামটাই বা এরা জানবে কি ক'রে? এক ঝাঁক প্রশ্নের মধ্যে নিজের অসহায়তার কথাও মনে এল সরমার। তার পেটের মধ্যে সন্তান এখন পূর্ণ মাত্রা পেয়েছে যে কোন দিন ভূমিষ্ঠ হবে। সে নিজেই বিপন্ন এবং অনেকটাই দশজনের দয়াতে আছে তার মধ্যে বাড়ীউলির দয়াই প্রধান। পরে কাজ ক'রে ফেরৎ দেবে এই চুক্তিতে সে খরচ চালাচ্ছে। শেঠজী অবশ্য অনেকটাই দিয়েছিল তার অর্দ্ধেক সোনামণিকে ভাগ দিতে না হ'লে অবশ্য এত টান পড়ত না, হয়ত বাকি সময়টা কেটে যেত। আধিয়া সে—চুক্তিমত আয়ের অর্দ্ধেক তো বাড়ীউলিকে তার দিতেই হবে। সৌদামিনী মাঝে মাঝে বলে, অত টাকা ওর কি হবে বল তো? সোনামাসি অত জমিয়ে কি ক'রবে? ও মরলে তো মারবে ঐ পিয়ারা সিং, সব ঐ দারোয়ানের খপ্পরে যাবে আর যা বাঁচবে পাবে বংশীধর মাড়োয়ারীর ছেলে। নেশা। জানিস, ও নেশাতে টাকা জমায়। তা নেশাতেই জমাক বা যে কারণেই হোক সে তো দিতে বাধ্য।—এই অসময়টা তো বাড়ীউলি চালাচ্ছে। প্রথম দিকে অবশ্য অনেক নিষেধ ক'রেছিল সোনামণি, বলেছিল, অযথা এসব ঝামেলা রাকিস নি। এসব সখ আমাদের মানায় নে। ছেলে বড় হলে কি খাওয়াবে ভাবছিস? ওসব ভদ্দর-লোকেদের হয়, রাঁঢ়ের ছেলেরা কোনদিন রোজকার ক'রে খাওয়ায়! সে আরও বোঝা হয়।

কোন কথাই শোনে নি সরমা। আশংকা এবং সংস্কার মিলে তাকে গর্ভমোচনে রাজি হ'তে দেয় নি। এখন সত্যিই বড় সমস্যা হয়েছে সরমার। নিজেই এক

বোঝা হয়েছে যেন। উঠতে বসতে চলাচল ক'রতে কি কষ্ট। এখন মাঝে মাঝেই মনে হয় কিসের জন্যে কি? সুনীল কি মানবে যে সে এই হচ্ছে-সন্তানের বাপ? হরেনকে বললে সে মেনে নেবে তবে কিন্তু কি ক'রে হবে? চাষ তো সুনীলই সমানে করেছে—এ ফসল তারই। তখন এখানকার জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, ধারণাও নয়। তাই যা করেছে এখন হ'লে তা ক'রত না সরমা। বাপেরই পাত্তা না থাকলে ছেলে দিয়ে কি হবে? সত্যিই সে দেখছে তো এখানে জন্মানো ছেলেরা কারও কোন কাজে লাগে না। যে যার নিজের মত বেড়ে ওঠে। ঐ হীরা, খালু, ন্যাপলা, আরমাদ—যে ক'টা নাম শোনা যায় এখানকারই কারও না কারও ছেলে সব। মেয়ে হ'লে পেশাতেই লেগে যায়, মেয়ে তবু কিছু দেখে মাকে। বুড়ো হ'লে দুটো খেতে দিয়ে অন্তত বাঁচিয়ে রাখে।

এখন সমস্যা যতই হোক দিলু যখন এতটা খুঁজে এসেছে তার কাছ থেকে আর লুকোবে কি ক'রে? এখন লুকোতে গেলে দিলুর বিপদ বাড়বে। এখন দিলুকে বাঁচানোর প্রশ্ন। মাসি যা বলছে তাতে এখনই ওকে ডাক্তার দেখানো দরকার। সৌদামিনী যখন দেখছে তখন ও যা হোক ক'রবে। ও তো সবই জানে, একথাও জানে একটা টাকা দরকার হ'লে এখন ধার ক'রতে হবে সোনামণির কাছে। তাই ও নির্মলাকে বলল, মাসি তুমি গিয়ে সৌদামিনীকে বল যা করবার ও-ই করুক। সুস্থ হ'লে যেন আত্মীয়কে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। বেচারী বোধ হয় কোন খবর নিয়ে এসেছে আমাকে খুঁজতে।

দিলু যখন ওপরে এল ওর সমস্ত মুখমণ্ডলে তুলো পট্টি বাঁধা। ডাক্তারখানা থেকে করিয়ে এনেছে সৌদামিনী।

দিলুর অত আঘাত, মুখমণ্ডলের অবস্থা প্রচণ্ড বিব্রত ক'রে তুললেও সরমা প্রথম প্রশ্ন করল, তোমারে কে এহেনে আসতি কলো?

দিলু এতক্ষণ সব আঘাত সহ্য ক'রেছে, শারীরিক নিপীড়নও মেনে নিয়েছে অতি ক্লেশে, কিন্তু এবার সে হঠাৎই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল। সরমা বলল, আসো ঘরের মদ্দি আসো। দিলু এতই ভেঙ্গে পড়েছে যে সরমারও তাতে আঘাত লাগল।

ঘরের মধ্যে ঢোকবার সময়ই একটা পাল্লা ঠেলে ভেজিয়ে দিল সরমা। বিছানার ওপর বসতে বলে নিজে মাটিতে বসে পড়ল, পরক্ষণেই জানতে চাইল তোমারে ঠিকানা দিলো কে?

দিলু তখন কথার উত্তর দেবার অবস্থায় নেই, সে তার শারীরিক আঘাতের ব্যথা, ততোধিক কষ্টকর অন্তর্বেদনা চাপা দেবার প্রয়াসে সমানে ফোঁপাতে লাগল। এভাবে সরমার দেখা পাবে এই পরিবেশে এই কথা তার যে একবারে জানা ছিল না এমন তো নয় তবু দেখা পেয়ে সরমাকে খুবই ক্লিষ্ট এবং বিষণ্ণ মনে হ'ল। ওর বিষণ্ণতা দিলুর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রল তার বেদনা চাপা দিতে গিয়েই

বাষ্পীভূত হয়ে প্রবল অস্বস্তির কারণ ঘটালো। তাই সে সরমার কথার কোনই উত্তর দিতে পারল না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে সবই জানল সরমা, দিলুই সবিস্তারে জানাল সব কথা ও ঘটনা। সরমা দূরে বসেই সব প্রতিক্রিয়াশূন্য ভাবে শুনল। তারই জন্যে যে দিলুর ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার ওর আবেগপূর্ণ কথার মধ্যে সবেরই প্রকাশ পূর্ণ রূপে ঘটল, কিন্তু তাতেও সরমার কোন অভিব্যক্তি দেখা গেল না। সে নির্বিকার ভাবে সব শুনে অতি শান্ত নিরুত্তাপ স্বরে মন্তব্য ক'রল, তুমি অনর্থক গ্রাম ছাড়ে আলে কেন?

দিলুর মনের মধ্যে উত্তর এসে গেল, 'তোমারে ছাড়তি পারব না ব'লে'—কথাটা শব্দ হ'ল না। সে বিছানার চাদরে ফুলের ছাপে চোখ নামাল। ওর কাছে কোন উত্তর না পেয়ে সরমা বলল, আমার জন্যি চিন্তা কোয়রে লাভ নেই, আমি তো এহেনে আছি, ভালই থাকপো। মন্দ থাকলিই বা কি, এহেনের থে তো আর যাতি পারবো না। যাতামইবা কোয়ানে?

তুমি আমার সাথে চলো, হঠাৎ-ই বলে ফেলল দিলু। আগে গ্রাম্য সরমা যা পেরেছে এখন তার বাস্তব বোধ অনেক বেড়ে যাওয়ায় তা আর পারে না। দিলুর সে ব্যাপারটা একেবারেই নেই বলে যা বলছে তা শুনে কেবল একটু হাসল সরমা, সে হাসিতে কিছুটা অনুকম্পা অনেকটাই উপেক্ষা মেশানো। তার বাক্‌হীনতা, নিঃশব্দ হাসি, বিদ্রূপাত্মক ওষ্ঠাধর ভঙ্গী—সবই চোখে পড়ল দিলুর; সে সবকিছু যথাযথ না বুঝলেও যতটা বুঝল তাতেই হতাশ হতে পারল। এবং অকস্মাৎ সে যেন অন্য এক সরমাকে প্রত্যক্ষ করল যে সেই নায়েলেখোলার নিবারণ ঘোষের কন্যাটি নয়, গ্রামের যুবতী বিধবাও নয়, আদৌ অসহায় অবলা নয়, রীতিমত আত্ম-সচেতন ঋজু, কঠিন এক মহিলা। দিলু একটু দমে গেল। সামান্য এই ক'টা মাসের মধ্যে এত পরিবর্তন! দিলুর সংশয় হ'ল সে ঠিক দেখছে তো? ভুল বুঝছে না তো? সরমা কি তার প্রতি এতটা রূঢ় হবে? হওয়া সম্ভব! মাথায় মুখে যখন প্রবল আঘাত পড়ছিল কিল, চড়, ঘুষি—তেমনই অনুভূতি কিংবা হয়ত তার চেয়ে বেশি আঘাত এখন তার মনের মধ্যে এসে হাতুড়ি পেটাতে লাগল।

প্রাথমিক আঘাত সামলাতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। বেশ কিছু সময় নির্বাক বসে থেকে দিলু তার বিবশতা অতিক্রম ক'রল! এখন তার আঘাতগুলোতে বেশ বেদনা ক'রছে। নিচের মহিলাটি বড় হৃদয়বান। কেবল শারীরিক ভাবেই সুন্দর নয় মানসিক ভাবেও সুন্দর। ওকে লোক দিয়ে গুণ্ডাগুলোর হাত থেকে ছাড়িয়ে আনিয়ে নিজে হাতে তুলো দিয়ে ক্ষতস্থান মুছে একজন মহিলাকে দিয়ে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিল। টাকা পয়সা সব সেই তো দিয়েছে, নিজে কি যত্নটাই না ক'রেছে অথচ তার নিজের লোক—যার জন্যে এই হেনস্তা, ক্ষতি ও ত্যাগ, সে তো একবার গায়ে হাত দিয়েও দেখল না, এমন কি বিছানাটা পড়ে আছে শুতে

পর্যন্ত বলছে না। ওর শরীর ভেঙ্গে আসছে, শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া এমন চুপচাপ বসে থাকতেও খুবই অস্বস্তি হচ্ছে।

সোনামণি এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সরমাকে উদ্দেশ্য ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'রল, কে গা ছেলেটা ?

এই প্রশ্নেই যেন ভয় ছিল সরমার, সে চট ক'রে জানাল, আমার ভাই হয় দেশের থেকে এসেছে।

তা ওকে ওরা ধরেছিল কেন, টাকা পয়সা ছেল ?

না। টাকা নেয় নি, ও দেশের ভাষায় কথা বলে, এখানকার ভাষা জানে না। তাই ওকে নিয়ে মজা ক'রছিল ও কি বলেছে সেই জন্যেই মেরেছে।

তা বলে এমন মারবে ? হীরেটা আজকাল বড় বেশি বেড়েছে। ওর মা-টা যক্ষ্মা হয়ে অকালে মরল আর তো কেউ দেখবার নেই—।

সরমা কারও ইতিহাস জানেনা। ও তো এখানে একেবারেই নতুন, কেমন ক'রেই বা জানবে। সোলেমান যে বিখ্যাত এক ওস্তাদের ছেলে সে কথাও ওর জানবার নয়, জানে সোনামণি আরও বেশি জানে সামনের বাড়ীর মালিক, আসল মালিক পদ্ম রাণী। কলকাতার এক বিখ্যাত বাবু রসময় মল্লিকের খাস মেয়েমানুষ সে। রসময় মল্লিক মারা গেছে কিন্তু আশু বসাকের কাছে এই বিশাল বাড়ীটি কিনে দিয়ে গেছে যার ভাড়াতেই পদ্মর রাণীর হালে দিন চলে। পদ্ম রাণীর বয়েস হয়েছে সত্যি কিন্তু বয়েস হবার আগে থেকেই তাকে এলাকার সবাই সমীহ করে। সারাটা জীবন পদ্ম একমাত্র রসময় মল্লিক ছাড়া কারও মুখ দেখে নি। কত লোক চেষ্টা ক'রেছে কাছে ঘেঁষতে দেয় নি কাউকে। কোন আগলদার নয়, বাবু নয়, পীরিতের লোক নয়—কেউ নয়। দুজন ক'রে দাসী নিয়ে সারাটা জীবন একাই কাটিয়ে দিল। সারাদিন কোন কাজ কর্ম নেই বলে এলাকার ইতিহাসে তার বিশেষ আগ্রহ আর আছে কেবল বই পড়া। চৈতন্য লাইব্রেরী থেকে প্রতিদিন দাসী গিয়ে বই নিয়ে আসে সারাদিন পড়ে শেষ করা এক বিশেষ কাজ। এখন যে বয়েস হয়ে গেছে তবু বই রোজ চাই। সোনামণি পদ্ম রাণীর খবর খুবই রাখে, কবে নাকি একদিন রসময় মল্লিকের ছেলেদের ডেকে পাঠিয়েছিল পদ্ম রাণী লেখাপড়া ক'রে বাড়ী তাদের ফেরৎ দেবে বলে, যাতে ওর মৃত্যুর পর ও বাড়ী মল্লিক বাড়ীর ছেলেরা পেয়ে যায়। তা ছেলেরা আসে নি বলেই পদ্মর যা দুঃখ।

পদ্ম রাণী জানে এ পাড়ার অনেক পুরানো ইতিহাস। এখন যেখান দিয়ে যতীন্দ্র মোহন এভেনু্য বেরিয়ে গেছে সেখানে একদিন অনেক বাড়ী ছিল। কামিনী দাসীরও ছিল। গায়ের রঙ ছিল বটে কামিনীর। কাঁচের মত ঝকঝকে যে মানুষের গায়ের বর্ণ হতে পারে এ দৃশ্য জীবনে ঐ একটাই দেখেছে পদ্মরাণী। কামিনী দাসীর শেষ বয়েসটা দেখেছে পদ্ম যখন আর যৌবন ছিল না, তাতেই যেন গা থেকে আলো ঠিকরোতে। বহু টাকা রোজগার ক'রেছিল কামিনী দাসী। জমা টাকাও অঢেল

ছিল। নিজের বাড়ীতে কৃষ্ণমূর্তি রেখে রোজ পুজোর ব্যবস্থা সে বরাবরই করেছিল, একদম আলাদা ক'রে ছাদের ওপর ঘর ক'রে কৃষ্ণের থাকবার ব্যবস্থা করা ছিল, পঞ্চানন পুরোহিত এসে প্রতিদিন সকালে সন্ধেয় পুজো ক'রে যেত, দুপুরে সেই পুরোহিতই এসে ভাত রান্না ক'রে ভোগ দিয়ে যেত। কামিনীর ইচ্ছে হ'ল সময় থাকতে থাকতে তার গৃহদেবতার সুব্যবস্থা ক'রে যায়। তাই সে এই পল্লীর বাইরে, ভদ্র পল্লীতে বিশাল বাড়ী কিনে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে গেল। আর এক-জনের কথাও মনে আছে পদ্মরাণীর, রেণুবালা—নিজের সব কিছু দিয়ে, এমনকি রাশি রাশি গয়না যা সারাজীবনে উপহার পেয়েছিল তা পর্যন্ত বিক্রি ক'রে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছে রেণুবালা। তাকে অবশ্য পরামর্শ দিয়েছিল হিতেন ডাক্তার। তখন তো হিতেন ডাক্তারই ছিল এ পাড়ার মেয়েদের একমাত্র ভরসা।

পদ্মরাণীর তো আর অত টাকা নেই, সে ওসব ক'রতেও চায় না। সারাটা জীবন সে তো কোনই রোজগার করে নি যা অনায়াসেই ক'রতে পারত, ইচ্ছেই করে নি, এক ঐ রসময় মল্লিককেই স্বামীজ্ঞানে সেবা ক'রে গেছে, এখন তাই তার ইচ্ছে স্বামীর ছেলেরা তাকে কিনে দেওয়া বাড়ীর মালিক হোক। বাড়ীতে ক'খানা ঘর খালি পড়ে আছে ইচ্ছে ক'রেই সে আর ভাড়া দেয় নি, দিলে ছেলেরা দেবে, যাকে খুশি দেবে, দিক।

পদ্ম রাণীর কাছে নির্মলার যাতায়াত আছে, প্রয়োজন মত কাজকর্মও ক'রে দেয় তার। সৌদামিনীই তাই নির্মলাকে ধরল, ও মাসী, ও বাড়ীর মালিকানিকে বলে বাইরের দিকে যে দোকান ঘরটা পড়ে আছে একজন ভদ্দরলোকের ছেলেকে দিতে বলনা। বেচারীর কেউ কোথাও নেই দেশ থেকে এসেছে—।

নির্মলা তো অবাক, ওমা! সে কি গো! ভদ্দরলোকের ছেলে দেশ থেকে এয়েচে তা এপাড়ায় কি ক'রবে? মেয়ে হলেও না হয় কথা ছিল।

উপায় নেই গো মাসি। এখানে সে কিছু চেনে না, কেউ কোথাও নেই। একমাত্র সরমা আছে তা সে-ও দেখছি বিশেষ পাত্তা দেয় না।

তা তোমার কি? তুমি এত ক'রে কি লাভ পাবে?

সৌদামিনী মস্করা ক'রে বলল, সে তুমি বুঝবে না মাসি। তবে আমি যে একথা বলেছি এটি দয়া ক'রে কাউকে ব'লে না, সরমাকেও নয়। আমি দেখিয়ে দেব তুমিই ডেকে নিয়ে যাবে তাকে। আগে পদ্ম বাড়ীউলিকে বলে রাজি করাও, দরকার হলে ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেয়ো।

ক'দিনে মুখের ফোলাটোলা কমে গেছে, তুলোটুলোও খসে গেছে। সস্তা ছিটের হাফসার্ট গায়ে দেওয়া মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা ছেলেটাকে দেখে পদ্মরাণী প্রশ্ন ক'রল, তুমি এখানে ঘর চাও? কি ক'রবে?

মহিলাটিকে দেখে অবাক হয়ে গেল দিলু বৃদ্ধা বটে তা বলে এমন গায়ের রঙ আর এমনই চেহারা! কি রূপ ছিল তাহ'লে! যেমন নাক, তেমনই চোখ বৃদ্ধ বয়সেই এত সুন্দর। দিলু যেন প্রতিমা দেখছে এমনই বিস্ময়ে চেয়ে রইল। উনি যে কি বলছেন তাও তার কানে পেঁছাল না। নিজে বহুবল্লভা না হ'লেও মানুষ অনেকেই দেখেছে পদ্মরাণী, তাই ছেলেটিকে দেখেই বুঝল অতি সরল মনের মানুষ হবে, এমন একটি ছেলে থাকা দরকার। এখানে কাউকেই তো বিশ্বাস করবার উপায় নেই, কাউকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। অল্পক্ষণেই সিদ্ধান্ত ক'রে নিল পদ্মরাণী, জানতে চাইল, থাকবে কোথায় ?

দিলু মহিলাকে দেখে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে যে সৌদামিনীর সেখানো কথা সব ভুলে গিয়ে বলল, এহেনেই থাকপো।

দিনরাত থাকবে তো ?

কি বললে যে কি হবে ভেবে পেল না দিলু; কোন কথা বলে ফেললে যে উনি অসন্তুষ্ট হবেন এই ভয়ে শংকিত সে চট করে বলে ফেলল, এহানে ছাড়া আর কোয়ানে জাব ?

ওর কথা বুঝতে না পেরে পদ্মরাণী নির্মলাকেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রল, ও কি বলে লো নির্মলা ? ওর কথা কিছু বুঝছিস ?

নির্মলাও সামান্যই বুঝেছে তবু সে সৌদামিনীর কাছে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে বলল, হ্যাঁ গা। ওর আর চালচুলো কি আচে যে কোতাও যাবে! একেনেই পড়ে থাকবে। তারপরই যোগ ক'রল, একেবারে গেঁয়ো ভূত গো, পোষমানালে কাজে লাগবে। তোমারও তো হাত নুড়কুৎ একজন দরকার।

পদ্মরাণী মনে মনেই একটা 'হুঁ' বলে নিল। অতঃপর বলল, ঠিক আছে থাকতে দেব শুতে খেতে ও পারবে কিন্তু কয়লার আগুন ক'রে বাড়ী নোংরা ক'রতে পারবে না বাপু। আর, পাঁচ টাকা ভাড়া লাগবে—দোকান ঘর বলে কথা নইলে না হয় আট আনা কম ক'রে নিতুম।

সৌদামিনী বলে কয়ে পাঠিয়েছে তাই নইলে ঘর ভাড়া নেবার সঙ্গতি তার কোথায় ? ভাড়া নিয়ে সে ক'রবেই বা কি ? কাঠগোলায় চাকরী ক'রতে গেলে কি আর এখানে ফিরে এসে রোজ বাস করা যাবে ? তার চেয়ে বড় কথা আর তো কাঠগোলায় ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। এ' কদিন কোথায় ছিল সে কথার কি জবাব দেবে ? কাজেই এখানেই তাকেও যে থাকতে হবে সে কথা সত্যি কিন্তু ভাড়া দেবে কি ক'রে ? পাঁচটা টাকা—তার কাঠগোলার বেতনই তো মাত্র পঁচিশ টাকা। তাও নাকি যুদ্ধের পর বাজারে দাম বেশি বলে নাকি এত, নইলে আরও অনেক কম হ'ত। শিবনাথ বাবুরা নাকি সাতটাকা বেতনে কাজে ঢুকেছিল।

নির্মলাই যা হোক ধরে বসল, এত ভাড়া টানতে পারবে কেন গো ? তুমি দয়া ধম্ম ক'রে তিনটে ট্যাকা নাও যেমন ক'রেই হোক দেবে।

পদ্মারাণী এ অনুরোধ মেনে না নিয়ে বলল, আমি ভেবে দেখি।

দিলুরও সামনে একটা সমস্যা সমাধানের পথ, সে বলল, ঘর আপনারই আমাকে কেবল একটু থাকতি দ্যান। আপনার বাড়ী কাজ জারা করে তাগে থাকতি দিলি তো আপনি ভাড়া নেন না, সেই মনে কোয়রে আমারে দেন; আমিও কোন সময় অনেক কাজ কোয়রে দেবানে।

ওর কথা পদ্ম সামান্যই বুঝছিল কিন্তু ছেলেটা যেমন ক'রে বলছে তাতে মন কিছুটা নরম হ'ল; কি হবে বা? অনেকদিনই তো পড়ে আছে ঘরখানা, বাড়ীর ভেতরেও তো বেশ কখানা ঘর খালি আছে, যাকে তাকে ভাড়া দিতে ইচ্ছে নেই বলে দিচ্ছে না, থাক এ ঘরটায় যদিও থাকে তো থাক। মনে মনে রাজি হ'লেও বাড়ীউলি সুলভ ভাব বজায় রেখে দৃঢ়স্বরে বলল, দেখ বাপু ঘর তোমাকে নির্মলার কথাতেই দিচ্ছি কিন্তু মনে রাখবে মাস ফুরোলেই টাকাটি আমার চাই। সামান্য টাকা যেন চাইতে না হয়। তুমি তাহ'লে বাংলা মাসের পয়লা তোমার জিনিষপত্তর নিয়ে চলে এসো।

নির্মলা অমনি বলে উঠল, পয়লা কি গো! ভাড়া সে নয় তুমি মাস পয়লা থেকে নিয়ো থাকবে আজ থেকেই।

পদ্মরাণী অবাক হ'ল, এ আবার কেমন লোক গো! কা'কে সঙ্গে ক'রে আনল নির্মলা, তবে দেখে শুনে ভদ্দরই মনে হচ্ছে এই যা। তা থাকে থাক।

এই হ'ল দিলু মিত্তিরের লন্ড্রী ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। লন্ড্রী করবার পরামর্শটা অবশ্য তাকে কদিন বাদে সৌদামিনীই দিয়েছিল, বলেছিল, আমাদের এখানে কাপড় কাচানোর বড় কষ্ট। সপ্তাহে একটা দিন সেই উল্টোডিঙ্গি থেকে রজক আসে যা নেয় সাতদিন বাদে ফেরৎ দেয়। তুমি একটা লন্ড্রী কর তো ভাল চলবে। সৌদামিনীর স্নেহ ও দয়াতেই প্রতিষ্ঠা কিন্তু মানুষের বিচিত্র মানসিকতা যে সরমা দিলুর ক্ষতস্থান পর্যন্ত কোনদিন স্পর্শ ক'রল না, তার প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতার প্রকাশ যার মধ্যে দেখা গেল না লন্ড্রীর নামকরণ ক'রল সেই সরমার নামে, সরমা লন্ড্রী। সৌদামিনীর নিঃস্বার্থ অনুকম্পার অণুমাত্র স্বীকৃতি তার কোন কাজে কোন ব্যবহারে দেখা গেল না। কেবল মানুষের মুখে মুখে সোনাগাছি এলাকা জুড়ে নাম রয়ে গেল দিলুদার লন্ড্রী, সে নাম সৌদামিনীর মত উদার ও দয়ালু মেয়েই দিয়েছিল এবং দিলু ও পাড়ারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল বলে। নইলে 'দিলুদা' তেমন কোন মস্তান বা ডাকসাইটে গুন্ডার নাম নয় যে নামের কুখ্যাতি এলাকা ছড়াতে পারে। দিনে দিনে সাধারণ একজন কাপড় কাচার দোকানীর নামটা প্রচারিত হয়ে গেল লোকটি এখানকার আর কারও মত নয় বলে, সকলের থেকে আলাদা বলে। অবশ্য তার আগে হেনস্তা তাকে কম হ'তে হয়নি। সেও বেশ দীর্ঘ ইতিহাস, যার কিছুটা ছড়িয়ে আছে প্রকাশ না হলে এ রূপকথার রাজ্যের এই গলিটার প্রতি অবিচার করা হবে।

তাই আবার সরমাতে সরমার ফিরে যাওয়া। সোনামণির কাছে যথেষ্ট হেনস্তা হবার পর সরমা সময়মতই একটি পুত্র প্রসব ক'রে ভারমুক্ত হ'ল। সোনামণির কথাছিল, নিজেরই যার টিকে ধরাবার জামিন নেই তার আবার এত সখ কেন বাপু ? নিজে আগে বাঁচ তা নয় ছেলে নামানোর সখ। কে পেট ক'রল তার নেই ঠিকানা খসিয়ে ফেললেই হ'ত—তা না ক'রে এখন কে খাওয়ায় কে কি ব্যবস্থা করে তার কিছু ঠিক নেই—। বাড়ীসুদ্ধ লোককে শুনিয়ে এমন অনেক কথাই বললেও কপালের জোরে শেঠ করমচাঁদের সাহায্য জুটে যাওয়ায় সোনামণি ঐ কুকথা বলেই শেষ ক'রতে থাকল কারণ অনেকটা দয়াবশ হয়েই শেঠ প্রচুর দিয়েছিল সরমাকে। সোনামণি তার অর্দ্ধেক ভাগ না নিয়ে নিলে তাতেই বছর কেটে যেতে পারত সরমার। কিন্তু বাড়ীউলি তার হকের টাকা ছাড়বে কেন ? তাই তাকে অংশ মিটিয়ে তারই কাছে দেনাগ্রস্ত হয়ে প্রসবের কাজটা শেষ ক'রল সরমা। আর সেই দেনার জন্যে নিয়ত গঞ্জনা চলল তার। কবে এই থেকে মুক্ত হয়ে আবার রোজগারে বসতে পারবে সোনামণির কেবল সেই চিন্তা। মধ্যে একদিন পাড়ার লোকেরা বাৎসরিক শীতলা পুজোর চাঁদা চাইতে এলে আর এক দফা চেঁচাল সোনামণি, ও ঘরটি এখন বাদ রাখ বাবা। উনি এখন পেট বাধিয়েছেন, আয় রোজগার বন্ধ। আমার ঘাড় ভেঙ্গেই চলচে আমার যে কি অবস্থা সে আমিই বুজচি।

লক্ষ্মীদাসীর ছেলে কেলোই এ পুজোর মাতব্বর। চাঁদা তোলা থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সব সে নিজে করে তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে। চুলে, ন্যাবা গোপাল, ট্যারা পিণ্টু, বিশে, ছোটুয়া সঙ্গে থাকে সবাই। চাঁদা কত উঠছে কেউ কিছু মাঝ পথে 'ঝেড়ে দিচ্ছে' কিনা এ ভাবনা সবার বড় তীব্র। চাঁদা আদায় কম হ'লে স্ফূর্তির মাত্রা কমে যাবে বলে ওটা যাতে কম না হয় সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে হয় যৌথ ভাবে।

ওদের মধ্যে থেকে প্যালা ছোকরাটার কথাবার্তা কিছুটা ভাল, সোনামণির কথায় সে চট ক'রে বলল, তবে তো আরও ভাল গো মাসি। এবার তো চাঁদা আরও বেশি দেবে।

আ মলো যা ! বেশি দেব কোত্থকে ?

মা রক্ষেকালী কি তোমাকে কিছু কম দিয়েচে ?

তোমরা তো বাছা বলবেই। তোমাদের কি দোষ বল ? পরের ট্যাকা সবাই বেশি দ্যাখে।

এসব ছেলে-ছোকরা কোন যুক্তির ধার ধারে না। কেলো চড়া গলায় বলল, ছাড় মাসি, চাঁদাটা ছাড়। ঘর-ঘর পয়সা তুলতে হবে। অত টাইম নেই।

ব্যবসা বজায় রাখতে হ'লে এসব ছোকরাকে ঘাঁটানো চলে না সোনামণিরা একথা জানে। তাই তাড়াতাড়ি নিজের চাঁদার পয়সা এনে তুলে দিল ওদের হাতে। ট্যারা পিণ্টু পয়সা হাতে নিয়ে কেলোকে দেখাতেই কেলো বলল, ও-ঘরের চাঁদাটা ছাড় মাসি।

ওমা! তোমাকে এতক্ষণ কি বললুম?

নিমেষে কণ্ঠস্বর বদলে গেল কেলোর, ম্যালা ঝামেলা ক'রো না। সিধে হয়ে চাঁদাটা ছাড়।

রাজার হুকুম বলে একটা শব্দের কল্পনা মনুষ্য সমাজে আছে, অতীতে রাজ-তন্ত্রের কালে যাদের সে শব্দ শোনবার ভাগ্য হয়েছিল তারাও হয়ত চমকে উঠত কেলোর কথা শুনলে। ফলে সোনামণির সমস্ত প্রতিবাদ মনের মধ্যে গুটিয়ে গেল। এখানকার মেয়েদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে 'জলে বাস ক'রে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না।' তা এই বিশাল পল্লীর ঘোলা জলে কেলো ধলো বহু কুমীরেরা চলে যাদের ওপর নির্ভর ক'রে এবং যাদের জন্যে এই পাড়া, যাদের নিয়ে এই বিরাট এলাকা তাদের, অর্থাৎ এখানকার মেয়েদের সর্বদা সমঝে এবং শঙ্কিত হয়েই থাকতে হয়।

সোনামণি সরমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ক'রতে ক'রতে চাঁদার টাকাটা বের ক'রে দিল। গজ গজ ক'রে যা বলল তা সে নিজেই বেশি শুনল কিন্তু সকলকে শুনিয়ে বলল, এই সকলের সামনে চাঁদার ট্যাকা মিটিয়ে দিলাম। এ কিন্তু ধারে রইল পরে সব দিয়ে দিতে হবে।

যাকে উদ্দেশ্য ক'রে কথাগুলো বলা সে নীরব, আর যাদের সাক্ষী রেখে রণ-হুংকার তারা টাকা হাতে পেতেই সিঁড়ি ধরল। এদের কোন পালক নেই বলে পিতা নেই, মায়ের প্রতিপালনের অধীন নয় বলে এরা বাপেরও নয়, মায়েরও নয়, পাড়ার ছেলে। পাড়া পালিত এবং যথার্থই এদের রক্ষা করা মা শেতলা এবং মা রক্ষেকালীর দয়াতে। যারা রক্ষা না পায় তারা সব কম বয়সেই যে কোন একটা উপলক্ষ্য ধরে খরচা হয়ে যায়। কেউ ওলাওঠায়, কেউ বসন্তে, কেউ সান্নিপাতিক জ্বরে। একমাত্র রক্ষেকালীর ভরসায় ওরা থাকে তবে সারা বছর ভরসা স্থলটিকে মনে রাখে না, তখন যথেচ্ছাচার করে, মনে করে কেবল এই কাল বসন্তের শেষ পাদে, কটা দিন ধরে মাত্রাহীন কারণবারি পান ক'রে হাঁড়িকাঠে গলা ঢোকানো আর্ত ছাগলের মত মা মা ক'রে চিৎকার ক'রতে থাকে ভক্তির ভার সামলাতে না পেরে।

ভক্তি এ পাড়ার বাসিন্দামাত্রেই করে, এমনকি পাঁচ নম্বর ইমাম বক্স লেনের পুতুল বিবিও, আসল নাম আয়েশা এখানে এনে ইসমাইল নাম বদলে পুতুল বিবি ক'রেছে তার বোকা বাবু খদ্দেরদের জন্যে সেটা করে। বিশেষ ক'রে বাবু রমাকান্ত শীল— একাই সারা বছরের খরচা জোগায় বাপের রেখে যাওয়া সতেরটা বাড়ীর একটা ক'রে বছর বছর বেচে। ইসমাইলকে চেনে বাবুটি তাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না, মেয়েমানুষ জোটাতে ইসমাইল, বাড়ীর ফিটনের কোচম্যান জোটাবে ইসমাইল। সে না দিলে কোন লোককেই পছন্দ হবে না, আবার স্ফূর্তির মদও সেই ইসমাইলই জোটাবে। বাবু রমাকান্ত কেবল খেতে জানে, কার কি দাম তা জানে না কাজেই এক টাকার বোতল দশ টাকায় এলেও তা জানবে কেবল ইসমাইল শেখ। বাবু কখনও

জানতেও চাইবে না, তার একটা ইজ্জৎ আছে না! সে হ'ল বাবু নটবর শীল-এর একমাত্র বংশধর যার নগদ টাকা নির্ভাবনায় ওড়াতেই বাপ মরবার পর বাইশটা বছর লেগে গেল। মেটেবুরুজ থেকে সালমা খাতুনকে কদিনের জন্য এনে হুজুরে পেশ ক'রে ইসমাইল সোজা লক্ষ্ণৌ থেকে সদ্য আসা মোতি বাঈজী বলে চালিয়ে স্রেফ মেঠো কাওয়ালি শুনিয়ে দশ হাজার টাকা নামিয়ে নিয়েছে তিন রাতে অথচ তখন শীলদের সেরেস্তায় গোমস্তার মজুরী মাস গেলে সাড়ে সাতাশ টাকা। বাড়ীতে গিন্নিদের ঝি-চাকর খাটবার লোকেরা জন প্রতি পায় এগার টাকা চার আনা প্রতি মাসে। তবে হ্যাঁ, সে টাকায় রাণী ভিক্টোরিয়ার ছেলের মাথা ছাপা থাকে। ইংরিজী টাকা, তার দাম এক টাকার চেয়ে কম যায় না। তাই ইসমাইল সর্বদাই 'জো হুজুর' ক'রে রমাকান্তকে মাথায় চড়িয়ে রাখে। ভাব দেখায় বাবু রমাকান্ত পান খেয়ে পিক্ ফেললে সে আপন লুঙ্গির আঁজলায় তা ধরতে চায়, অথবা দুই হাতে।

কিন্তু বাস্তবে কোনটাই করে না ইসমাইল, কেবল ভঙ্গি ক'রে। কেবল একটিই তার বিশেষ লক্ষ্য বাবুটির কথা পড়তে দেয় না, পাছে মাটিতে পড়ে গেলে কুড়িয়ে না পায় তাই মুখ থেকে বেরোনো মাত্র লুফে নেয়। 'আন' বললে সঙ্গে সঙ্গে যেন আলাদীনের দৈত্যের মত চোখের পলকে হাজির করে সেই বস্তু—তা সে মদই হোক আর মেয়েমানুষই হোক। বাবু রমাকান্ত রাসভ তাতেই খুশি। খুশি কথাটা বোধ হয় যথার্থ নয়, কোন দরিদ্র ভোজ বাড়ীতে নেমন্তন্ন পেলে যেমন পেট ভরায় তেমনই, টইটম্বুর খুশি। তা বলে বাবু বধের কাটারিগুলো ইসমাইল কিন্তু কম দামেতেই কেনে। তার নিজস্ব লোক আরসাদ, রশিদ আর নেহারবানুরা আপন আপন এলাকায় নতুন কোন ডবকা 'ছোকরী' এলে দিন কয়েক ভাড়ায় পাঠিয়ে দেয় ইসমাইলের হেফাজতে। সবাই হয় লক্ষ্ণৌ, নয় বেনারস থেকে আসে। মুন্নিজান ঠাকুমার আমল থেকে জানবাজারের সওদা হলেও রমাকান্ত তাকে আতরের শিশি এগিয়ে দেয় দিল্লির বিলকিস বেগমের কালোয়াত কন্যা ভেবে। ওস্তাদেরা কণ্ঠ দেয় শরীর দেয়, না এ সংবাদ রাসভ রমাকান্তের বহুশ্রুত জ্ঞান তাই গানের বদলে মাংস কিনতে পেরে সে বিশ গুণ মজুরী সানন্দে দিয়ে দেয় ইসমাইলকে। বিহারী ইসমাইল তার ব্যবসায়ী বাসনায় বলে, ই সব জানানা গানা গায় হুজোর। স্রিফ আপকে খুশিকে লিয়ে বহুৎ কোশিশসে হামি রাজি করিয়েসি লেকেন পৈসা।

ও তোমাকে ভাবতে হবে না ইসমাইল। টাকা যা লাগে কম দিয়ো না। কম কেন দেব? কি হবে আমার এত ট্যাকা দিয়ে?

আপনি তো রাজা সে ভি বড়া হুজোর—আপকা কি কুছ কমি আসে!

তা সকলেই তো ইসমাইলের ঠিকে ভাড়ার মেয়েমানুষ নয়, বাঁধা বাসিন্দাও আছে যেমন পুতুল বিবি, মরিয়ম বিবি, শবনম। এরা পাকাপাকিই থাকে; বসবাস করে, আর বাস করে বলেই এ পাড়ার দেবীদের ভক্তি করে। সবাই যেমন করে তেমনই, ভয় করে বলেই ভক্তি করে। ইসমাইল এসব কিছুর বাইরে সে ভয় করে

কেবল পুলিশকে, আর জানে এই ভয়ের হাত থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা আল্লাও ক'রতে পারে না কালীও নয়। পারে কেবল একজনই তার নাম বাবু রূপচাঁদ। সে তাই রূপচাঁদের রফায় তার ভয়ের দেবতাকে তুষ্ট রাখে নইলে তার ব্যবসা চলে যাবে। ভয়ের আরও বড় কারণ পঞ্চানন দারোগা। মানুষটা যে কি ক'রে সব খবর রাখে কে জানে, এমনই সে খবর যেন সব নিজের চোখে দেখা। তাঁর কাছে আবার রূপচাঁদ বাবুরও কদর নেই, রূপচাঁদ চেষ্টা ক'রেও খাতির জামাতে পারে নি। তার খাতির বেশি ঐ জমাদার হাবিলদারের সঙ্গে, রূপচাঁদের যোগাযোগে তারাই আগে থেকে সাবধান ক'রে দিয়ে যায়। বলে দিয়ে যায়, ইমতিয়াজ যদি এসে থাকে তো সরে যেতে বল। বড় সাহেব আমাদেরকে বলেছেন আজ ওকে ধরতে।

ইসমাইল অবাক হয়ে যায়। ইমতিয়াজ যে আজ আসবে আসবার আগেই তা পঞ্চানন দারোগা জানল কি ক'রে? মুস্কিল হয়েছে এই যে শবনম মেয়েটা ইমতিয়াজ ইমতিয়াজ ক'রে মাথা খারাপ ক'রছে কদিন ধরেই। অস্থির হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বড় রাগ হয় ইসমাইলের এ শালা আওরত হচ্ছে মানুষের মধ্যে এক নম্বর হারামী, আল্লার দু চোখের বিষ। মনে মনে অশ্লীল খিস্তি দেয় ইসমাইল। এত খদ্দের রাত-ভর আসছে তাতে মাগীদের হয় না বলে ইমতিয়াজকে চাই। কার গোলামকে চাই, শোনা যাচ্ছে পুতলীর পেয়ারা নাকি ঐ কালুয়া ছোকরা। এসব ঝামেলা নিয়ে ইসমাইল হয়রাণ। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে এগুলোকে সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, বাস্তবে তা সম্ভব হয় না, তাহ'লে কারবার চলবে কি ক'রে? রোজগারটা ক'রে দেবে কে? খিদিরপুরে হোটেলটা চালু ক'রলেও তাতে এখনও অনেক টাকা লাগবে। কালাম দশ বিঘা জমি বায়না ক'রেছে দেশে, তাকে এখনও অনেক টাকা পাঠাতে হবে জমি 'লিখা পেড়ি' ক'রে নিতে। টাকা এখনও বহু দরকার। শীলবাবুর মত বাবু যদি আর দু একজন পাওয়া যেত তাহ'লে টাকার অভাব মিটতে পারে! যা কিছু হয়েছে সব তো শীলবাবুর দৌলতেই। লোকটা সব খতম ক'রে ফেলল নইলে ওর হাতে টাকা থাকলে পাবার কোন অসুবিধে ছিল না। টাকা আছে লালুবাবুর কাছে কিন্তু মালিকানা তার নেই। কি 'হিসাব কিতাব' আছে কে জানে এস্টেট থেকে বাঁধা টাকা পায় লালুবাবু। তার মধ্যেই যা করবার করে। লালুবাবুদের ঘর-বাড়ী বাইরে থেকে দেখে এসেছে ইসমাইল। শীল-বাবুর বাড়ীর মত সদর পেরিয়ে ঢুকতে পারে নি। শীলবাবুর বাড়ীতে তার অবারিত দ্বার। তারই দেশের লোক সোলেমান শীলবাবুর গাড়ী চালায়, খাস আদমী বললেই চলে কাজেই ইসমাইলের অবাধ গতি আটকাচ্ছে কে? তাছাড়া শীলবাবুর কোন হিস্যাদার নেই। তারই সব, আর লালুবাবুর বড় পরিবার। দাদা, কাকা,—কে কে সব মিলিজুলি পরিবার। লালুবাবুর হুকমত কম চলে। হাত খরচার টাকা লালু মল্লিক যা পায় তাতে এখানে এসে মেয়েদের মজুরীটাই অতি কষ্টে মেটাতে পারে তার বেশি আর কিছু থাকে না। অথচ অমন পাঁচটা শীলবাবুর মত সম্পত্তি

লালু মল্লিকদের। কি আর করা যাবে লালুবাবু নিয়মিত আসে, হিসেব ঠিকমত মেটায় এই যা লাভ। মেয়েগুলোর মজুরী মিটিয়ে ইসমাইলের যা বাঁচে তাতেই তাকে তুষ্ট থাকতে হয়। বাঁধা খদ্দের তো বটে! আর খদ্দেরগুলো সবই মেয়েদের নিজস্ব। পান্নাবাবু মোতিবাঈকে চিনে রেখেছে মোতি ছাড়া আর কোন কথা নেই। তার আসা-যাওয়ার সময় সেলাম জানায় ইসমাইল সে-ও পাল্টা অভিবাদন ক'রে সম্পর্ক শেষ ক'রে দেয়। পান্নাবাবু ব্যাপারী মানুষ হিসেব ক'রে চলে। তার আসা-যাওয়াটাও হিসেব ক'রে। সে তার নির্দিষ্ট দিন ছাড়া কিছুতেই আসবে না। এলে তার জন্য সিদ্ধির সরবৎ চাই আর সে কিছু খাবে না। তাও জয়রাম মিশিরের দোকানে বলা আছে পান্নাবাবু আসবার সময় দেখা ক'রে আসবে মিশির তার একটা ছোকরাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে মোতি বিবির ঘরে। সেখানে আলাদা কাঁচের গেলাস রাখা আছে পান্নাবাবুর নিজস্ব তাতেই মোতি বিবি নিজে হাতে ঢেলে দেবে তবে বাবুর পান চলবে, মোতি বিবির নিজস্ব চাকরাণী দিলেও চলবে না।

মাঝে মাঝে ইসমাইল ভাবতে চেষ্টা করে এই তো সাধারণ মেয়ে সব, কিন্তু কি জন্যে এত বড় বড় লোকগুলো হন্যে হয়ে এসে পড়ে? কি জন্যে দিনের পর দিন একজন অতি সাধারণ মেয়ের বাধ্য হয়ে পড়ে ঘর সংসার এবং অনেকের ঘরে অনেক সুন্দরী বউ থাকা মালদার মানুষগুলো? সে তো প্রায় সর্বক্ষণই এই কদর্য মেয়েগুলোর মধ্যেই আছে কিছুই তো বিশেষত্ব নেই এগুলোর মধ্যে বরং আছে নানারকম ছলচাতুরী নইলে একই মেয়ে দশজন পুরুষকে বাঁধে কি করে? তবে এই বেকুব লোকগুলো আছে বলেই না তার মত মানুষও চলছে! এরা আছে বলেই কলকাতার বাবুয়ানি আর এই নির্বোধ বাবুয়ানির জন্যেই অর্থের হাত বদল হচ্ছে নইলে তার মত একজন নিঃস্ব নিসম্বল লোক সম্পদশালী হবে কি ক'রে? কাজেই বাবুদের জন্যেই তাকে এইসব হতভাগা আওরতদের মন রেখেও চলতে হয়। দুনিয়ার সব চেয়ে খারাপ কাজ হচ্ছে মেয়েদের মন জুগিয়ে চলা। আল্লা যেখানে মেয়েদের হাজির ক'রছেন পুরুষ মানুষদের খিদমতে সেখানে—না থাক। যত অপ্রিয়ই হোক মানতেই হয়, পুতুল বিবির বায়না হ'ল তার ঘরের সামনে কেউ যেন না চলাচল করে।

ইসমাইল মনের অসন্তোষ চেপে রেখে মেনে নেয়, আমি এখনই নইমুদ্দিনকে বলে দিচ্ছি। আর তোমার ঘরে কি সরাব এনে রাখতে চাইছিলে না?

হাঁ সাব। ভাল র‍্যাম না হ'লে আমার মেহমানরা ঠিক পসন্দ করে না।

ও ভি নইমুদ্দিনকে বলে দিচ্ছি। আচ্ছা কাল নতুন পাটনাইবাবু নাকি তোমাকে পাঁচ টাকা বকশিস ক'রেছিল?

পুতুল বুঝল রাণ্ডী দাই সব বলে দিয়েছে কারণ নতুন বাবু কাল যখন বকশিস করে মাগীটা সামনেই ছিল। এখন তো শাল্লা ইসমাইল অর্দ্ধেক ভাগ চাইবে। তাই চট ক'রে বলল, ও তো সরাব আনতে দিয়েছি।

সরাব তো নইমুদ্দিন দিয়েছে। সে টাকা তো আলাদা দিয়েছে।

পুতুলবাঈ চুপ ক'রে রইল। তার ভীষণ রাগ হচ্ছিল, ভাবল এ নিয়ে লোকটা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে অন্য কোন বাড়ীতে সে উঠে যাবে। উঠে তো যাবে কিন্তু বাড়ীর সন্ধান দিচ্ছে কে? এ পাড়াতে অনেক বাড়ীতেই তো ঘর খালি আছে কে দেখে দেবে? ইসমাইলের ভয়ে তো কেউ কাছেই আসে না তার ওপর এই বাড়ীর চৌহদ্দিতে তারা সবাই বন্দী, সব মেয়েরাই যে যার নিজের নিজের বাসস্থানে বন্দী তাদের বাইরে কোন যোগাযোগ নেই। অন্তত ঘর খুঁজে দেবার মত তো নয়ই।

একই সমস্যা নিয়ে রুকসানা সেদিন কান্নাকাটি ক'রছিল। অল্প বয়েস রুকসানার উনিশও পার হয়নি, হামিদা বেগম তাকে এনে যখন এ বাড়ীতে দেয় বলেছিল বাবুরা যে যা বকশিস বা টাকা পয়সা দেবে সবই ওর হবে অথচ ইসমাইল বলেছে, ওসব হামিদার কথা আমি জানি না। এখানে তারই হুকুমত চলবে। হামিদা নাকি বিক্রি ক'রে গেছে তাকে। খাওয়া থাকা যা লাগবে সব ইসমাইল জোগাবে কিন্তু আমদানী সব ইসমাইলকে জমা দিতে হবে।

টাকা পয়সার ব্যাপারে বাড়ীর বাসিন্দা প্রায় সমস্ত মেয়েই রুকসানার সমর্থক। কিন্তু ইসমাইলের বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে প্রকাশ্যে সাহায্য করবার ক্ষমতা কারও নেই। ওর অসাধ্য নাকি কিছু নেই। যে সব কুকর্মে পটু তাকে কোন সাহসে অবলা মেয়েরা ঘাঁটাবে? তাই রুকসানা আপন মনে একাই কাঁদছিল। তাও এসময়টা ইসমাইল বাড়ী ছিল না বলে সে কান্নাকাটি করবার সাহস ক'রছিল নইলে এসব কান্না বুকের মধ্যেই চেপে রাখতে হ'ত তাকে। এর মধ্যে দিলয়ারা কেবল একবার এসে তাকে সাবধান ক'রে গেল; চুপ কর রুকসানা। এখনই ইসমাইল এসে পড়লে যা ঝামেলা ক'রবে কেউ তা সামলাতে পারবে না। —দিলয়ারার কণ্ঠে আতঙ্ক ছিল, সেই আতঙ্ক রুকসানার মধ্যে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা ক'রে গেল। তার পক্ষে এর বেশি আর কিছু করা সম্ভব ছিল না।

ইসমাইল মেয়েদের মানুষের মধ্যেই ধরে না। তার কাছে মেয়েমানুষ সাধারণ বস্তু মাত্র অথবা গৃহপালিত অন্য যে ক'টি ভোজ্য প্রাণী যেমন হাঁস, মুরগী, ছাগল আছে তেমনই একধরণের ভোগ্য প্রাণী, ভোজ্য নয় এই যা তফাৎ। কাজেই তার কোন মায়া মমতা নেই। বাড়ীতে রাখা মুরগী বা হাঁসকে কাটতে যেমন কোন লোকই মমতা অনুভব করে না ইসমাইল করে না মেয়েদের বেলাতেও। নেহাৎ দেশের আইন প্রতিকূল তাই কেটে ফেলা বা প্রাণে নিধন পেরে ওঠে না তবে নির্মম প্রহারে তার কোনই বাধা নেই কারণ সেই পীড়নের খবর বাড়ীর বাইরে বেরোবার কোনই উপায় নেই, দৈবাৎ বেরোলেও প্রমাণ পাওয়া একান্তই অসম্ভব। বহুদিন আগে এই বাড়ীতেই একজন মেয়ে ছিল হঠাৎ তাকে আর পাওয়া গেল না। তার নিজের লোক কেউ ছিল না বলে কেউ খোঁজও করেনি তেমন, কেবল বাড়ীর মেয়েরা একদিন সকালে দেখল শবানা নেই। নেই তো নেই। ইসমাইল জানিয়ে দিল, রাতে একজন লোকের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে আমজাদ দেখেছে। পরক্ষণেই

সকলকে সমঝে দিল, জানে দো শালী রাণ্ডী কো। উসকে ফিক্‌র মাত করনা, আপনা কাম করো।

সবাই ইঙ্গিতটা বুঝে চুপ ক'রে গেলেও বুঝেছিল ইসমাইলই তাকে গুম ক'রেছে, বিচিত্র নয় খুনও ক'রেছে। প্রশ্ন করবারই কেউ থাকেনি প্রমাণ ক'রবে কে? নিজে খুন হয়ে যাবার ভয়েই বাকি সবাই চুপ ক'রে থেকেছে। যে মরেছে মরুক বেঁচে থাকা তো সকলেরই দরকার! বাঁচতে চায় বলেই সবাই ইচ্ছা মেরে বেঁচে আছে। তার মধ্যে কোন দিন দুপুরবেলা বারটার শো-এ চিত্রলেখা সিনেমা হলে গিয়ে 'হাণ্টার ওয়ালী' বা 'কিসমত' ছবি দেখে বিনোদনের বাইরে আর কোন আনন্দের উপকরণ নেই। এইটুকুতে বাদ সাধে না ইসমাইল। দ্বারী আমজাদ তার প্রতিহার আলগা করে, নইলে সদরের বাইরে পা দেবার অধিকার কোন মেয়েরই নেই। প্রতিহারী হিসেবে আমজাদ বড়ই কঠোর, নামাজের সময় ছাড়া সব সময় সদরে। মালিক ইসমাইলের মত পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে সে যায়না বটে, দুবার যায়। তাও সদরের দায়িত্ব দিয়ে যায় সামনের বাড়ীর বিশুয়াকে। বিশুয়া নিজে ও বাড়ীর দারোয়ান নয়, বাড়ীটায় থাকে মাত্র। মায়ের সুবাদে থাকে। মা আমরতিয়া প্রথম যৌবনে বেনারস থেকে ভাসতে ভাসতে কলকাতার ঘাটে এসে ঠেকেছিল, এখন আর পূর্বাশ্রমের কিছুই মনে পড়ে না এখানেই জীবন, জীবনের সঙ্গে পুত্রলাভ এই বিশুয়া। বিশুয়াকে নিয়ে প্রতিবেশ অশান্ত কিন্তু আমরতিয়ার কোনই উদ্বেগ নেই। ছেলের প্রতি তার আস্থা পরিপূর্ণ। পুলিশের খাতায় বিশুয়া একটি উজ্জ্বল নাম, বিশেষ কালিতে লেখা। তাই গোটা উত্তর কলকাতায় কোথাও কোন ডাকাতি হ'লে পুলিশ তার যথার্থ প্রতিকার চাইলে বিশুয়ার ডাক পড়ে। স্থানীয় থানা থেকে শুরু ক'রে লালবাজারের গোয়েন্দা শাখা পর্যন্ত ডেকে পাঠায় তাকে, জানতে চায়, কে ক'রেছে বল?

জানিনা হুজুর বললে তার দায়িত্ব শেষ হয় না, আবার প্রশ্ন আসে, ঠিক বল। তোর লোকজন সব কোথায়? বাঁকেবিহারী কোথায়? হরিয়াকে কিছুদিন দেখছি না কেন?

বাঁকের অসুখ সার। হরিয়া দেশে গেলো।

দেশে! খিঁচিয়ে ওঠেন ইংরেজ রাজত্বে কাজ শেখা প্রবীণ আধিকারিক। পরক্ষণেই হুংকার ছাড়েন, হরিয়াই এ কাজ ক'রেছে। তোর কাছে মাল আছে।

না হুজুর।

তবে বল কে ক'রেছে?

বিশুয়াকে সময় দিয়ে ডাকাতির খবর নিতে হয়। সে খবর পোঁছেও দিতে হয় গোয়েন্দা কর্তার কাছে নইলে তার ছাড় নেই। তার নিজের দলের লোকেরা যা করে তার ভাগ সে যেমন পায় বাইরের অনেকেই মাল সামাল দিতে বামাল সমেত এসে হাজির হয় তারই হেফাজতে। বিশুয়া ক'দিন তাকে তোফা আরামে রাখে

মদ মেয়েমানুষ মাংস যা যা পূর্ণ ভোগের জন্যে দরকার সবই জোগায় তারপর লুটের মাল হজম হয়ে গেছে বলে অতিথিকে ফেরৎ পাঠায় আবার নতুন কাজে। কেউ বেয়াড়াপনা ক'রলে হরিয়াই গোপন খবর সঙ্গোপনে পুলিশকে পোঁছে দিয়ে শাসন বিভাগের হাতে তুলে দেয় তাকে, স্যার বেনিয়াপোখরমে যে ডাকাতিটা গতসাল হয়েছিল এতোদিনে খবর পেলাম হীরুয়া ক'রেছিল। হাঁ হুজুর পিলখানার হীরুয়া যাদব। ওর সঙ্গে ছিল সব আজমগড়ের পার্টি।

পুলিশ বোঝে যে বিশুয়া আগেই জানত, জানায় নি; তার জন্যে কিছু বলে না। হীরুয়া ভোর রাতে উঠে যায় পুলিশের গাড়ীতে।

সামনা সামনি বাড়ীর বাসিন্দা বলেই নয় ইসমাইল বিশুয়াকে খাতির করে ওর দক্ষতার জন্যেও। অল্পবয়স থেকেই ছোকরা বেপরোয়া আর বুদ্ধিমান। তাই বরাবরই ইসমাইল ওকে বলে ওস্তাদ। শুধু বলা নয় মেনেও চলে। কেউ কারও সঙ্গে সংঘাতে তো যায়ই না বরং পরস্পরকে সামলে চলে। তেমন কোন কঠিন কাজে আগলদারী দরকার হলে বা বিপদের গন্ধ আছে বুঝলে দামী মাল ইসমাইল সামলে দেয় নিমেষে পার ক'রে দেয় পার্কসার্কাস কিংবা মেটেবুরুজের ডেরাতে। কারণ পুলিশ জানে ইসমাইল আর যে কাজই করুক ডাকাতির মাল সামাল দেবার কাজ করে না। এই নিশ্চিন্ততার সুযোগে কঠিন কাজ ইসমাইলকে দিয়েই হয়ে যায়। আর এই কাজের বিনিময়ে ইসমাইল যে কোন অর্থ দাবী ক'রবে কখনই তা করে না, দরকার হ'লে বড় জোর যেখানে মাল গচ্ছিত রাখা হয়েছিল সেখানকার আগলদারী বাবদ তাদের জন্যে কিন্তু খরচ তার বশের লোকেদের পাইয়ে দেয়। ফলে ওস্তাদের যে কোন হুকুম তামিল করবার জন্যে তৎপর থাকতে হয় ইমানদার বিশুয়াকে; ইমাম বক্সের গলির তামাম বাসিন্দাকে তাই সমঝে থাকতে হয় বীভৎস বিশুয়া আর ইসমাইল ওস্তাদের বেরাদরির ভয়ে। তাদের কষ্টকর রোজগারের বড় অংশ তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তুলে দিতে হয় এদের বা চেলাদের হাতে। অনেক সময় চেলাদের স্ফূর্তির উপকরণ জোগাতে মর্তধামে কালী বা শেতলারা আবির্ভূতা হয় এই বিশু কোলেদের চেলাদের হাত ধরেই, বেশ কিছুদিন ধরেই এটা আরম্ভ হয়েছে। বারো-ইয়ারে মিলে যেদিন সার্ব্বোজনীন কল্যাণে পাড়ার মধ্যে পুজোর 'ব্যাবস্তা' 'কোল্ল' সেদিন থেকেই দেবীরা সব উৎসর্গীকৃত এইসব সন্তানদের জন্যে মর্তে আগমন ক'রতে লাগলেন।

অকথিত এই বেরাদরির মূলে যে মিল সে হ'ল নির্মমতা। সেদিকে সকলেই সমান। আপন এক্তিয়ারে যে যাকে পায় শুষে খায়। পরশ্রমজীবি মানুষের চরিত্রে দুটো অথবা দুটোর যে কোন একটা বিশেষত্ব থাকা বিশেষ জরুরী হয়—ভণ্ডামী এবং নিষ্ঠুরতা। বিশুয়ার মা আমরতিয়ার চিরদিনের বাস ছিল অবিনাশ কবিরাজের বাড়ীর যে রাস্তা গ্রে স্ট্রীট থেকে দক্ষিণ দিকে পল্লীর মধ্যে ঢুকে গেল তারই শেষ প্রান্তে, ইমামবক্স লেন এর বাড়ীটা কেনবার সুযোগ এসে যেতেই এখানে

তার উঠে আসা—তাও বছর পাঁচেক হয়ে গেল। এই পাঁচ বছরে বিশুয়া যেন গড়ে এবং বেড়ে উঠল। তবে এই বেড়ে ওঠার পেছনেও যার অবদান সে চেলু, পুরানো পাড়ার পুরানো বাসিন্দা ভানুপ্রিয়া দাসীর অল্পবয়সী নাঙ এই চেলু। পুরানো লোকেরা বলে ভানুপ্রিয়ার কাছে নিয়মিত আসত যে বাবু সেই রসময় বসাককে খুন ক'রেই কিশোর চেলুর হাতেখড়ি। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয় রসময় বসাক ছিল বয়স্ক মানুষ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ হবে, ভানুপ্রিয়ার পনের বছর বয়েস থেকেই রসময়ের যাতায়াত—পনের বছর ধরে। এই সময়ের মধ্যে ভানুপ্রিয়ার কোন সাধই অপূর্ণ রাখেনি বসাকজা। বাপের রেখে যাওয়া কোম্পানীর কাগজ, সাড়ে চারখানা বাড়ী, দক্ষিণেশ্বর পেরিয়ে বড় রাস্তা আর গঙ্গার মাঝামাঝি জায়গায় বাইশ বিঘের বাগান—কাজেই মনের মানুষের মামুলী সাধ অপূর্ণ সে রাখবে কেন? পাঁচভরি সোনার মকর মুখ বালা, দুহাতে নক্সা করা চুড়, মানতাসা, বাজুবন্ধ, মটর মালা, চন্দ্রহার আরও যখন যা ইচ্ছা করেছে ভানুপ্রিয়া।

এত যে পেয়েছে ভানুপ্রিয়া তা বলে সে তো এক ভোগ্যা ছিল না, খদ্দের আরও আসত তবে তা রসময়ের রসের সময় বাঁচিয়ে, সেটা ভানুরই ব্যবস্থা। এই বারোজনের যাতায়াতের পথ ধরে একদিন চেলুও দুম ক'রেই এসে পড়ল। তার আসা খদ্দের হিসেবে নয়, লুকোবার জন্যে। পাড়ার ছেলে। ডানপিটে ছেলে সব, কাজ যে ভাল করে এমন নয়, এমন কিছু অপকর্মও প্রত্যেকদিন ক'রে ফেলে ইংরেজ প্রশাসন যা উপেক্ষার ব্যাপার মনে করে না। সেদিনও তেমন একটা ঘটনার মধ্যে পড়ে পথ থেকে দৌড়ে নিরাপত্তার জন্যেই ভানুপ্রিয়াদের বাড়ীতে ঢুকে পড়া, তাতে কোন পছন্দ বা বাছাই এর সুযোগ ছিল না। কিছুটা ছুটে এসে একটা গলির বাঁক পেরিয়ে সুবিধে জনক সদর দরজা এ বাড়ীরই পেয়েছিল বলে ঢুকে পড়েছিল। এ পাড়ারই ছেলে হলেও ভানুপ্রিয়ার চেনা ছিল না, চেলুও আরও অসংখ্য মেয়েদের কাউকে যেমন চেনে না একেও চিনত না, তাই ঘরে ঢুকে পড়েই একটা চামড়ার ব্যাগ খুলে হাতে যা টাকা পেল ভানুর হাতে গুঁজে দিয়েই দরজায় খিল এঁটে দিল। ভানু কিছু না বুঝেই কম বয়সী ছেলেটাকে খদ্দের হিসেবে জায়গা ক'রে দিল।

বয়স অল্প বলে শুধু নয় ভানু অনুভব ক'রল ছেলেটি শক্তি ধরে। প্রৌঢ় ভোগজীর্ণ রসময় শারীরিক দিক থেকে একান্তই আবেদন শূন্য,—আর যারা খদ্দের হিসেবে আসে তাদের প্রতি মন থাকে না বলেই শরীরও সাড়া দেয় না, বেশির ভাগ থাকে নেশায় মাতাল, তাদের অধিকাংশেরই নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না—এই প্রায় যুবকটি তাকে আরাম দিল বলেই সে ভুলে গেল রসময় আসবে। চেলুর শরীর তাকে নেশাচ্ছন্ন ক'রে রাখল। সে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে তার দরজায় করাঘাত যে ক্রমাগত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে টের পেতে বেশ দেরি হ'ল। চেলু জাগিয়ে দিতে জানল। চেলুর ভয় হচ্ছিল বুঝি পুলিশই এতক্ষণ বাদে টের পেয়েছে সে এখানে। ভানুকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে সে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় উঠে

শাড়ীখানা কোনক্রমে শরীরে জড়িয়ে দরজা ফাঁক ক'রেই দেখল রসময়। তখন তার পূর্ণ সম্বিৎ ফিরল বটে বিরক্ত রসময় তাকে দেখেই ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে চিৎকার সুরু ক'রে দিল। ভানুপ্রিয়া যথেষ্ট বিব্রত হলেও অবস্থা সামাল দেবার পথ খুঁজে পেল না। একদিকে তার ঘরের মধ্যে লোক অন্য দিকে রসময় দরজায় দাঁড়িয়ে। উত্তেজিত রসময় ভানুপ্রিয়াকে ঠেলেই ভেতরে ঢুকে চেলুকে দেখে চিৎকার ক'রে উঠল, কে রে তুই ? শালা !

রসময়ের ধারণা ভানু তার রাখা নিজস্ব মেয়েছেলে, একান্তভাবে তার। ওর ওপর তার একারই অধিকার। সেইভাবে অধিকার জাহির ক'রতে যাওয়া মাত্র চেলু বাঘের বিক্রমে তার টুঁটি টিপে ধরল যাতে লোকটা চেঁচিয়ে লোক জড় ক'রতে না পারে। কারণ অনেকেই তাকে চেনে এখানে আছে জানলে এখনই তার বিপদ হবে সেই বিপদের সম্ভাবনা বন্ধ ক'রতে হ'লে লোকটাকে থামানো দরকার। কিন্তু লোকটা যে এত অল্পেই এমন নেতিয়ে পড়বে তা কি বোঝা গিয়েছিল ! চেলুর নিজেরও আপন কব্জির শক্তি সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না তাই সেও কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেল। কোঁচানো ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবী গায়ে দেওয়া লোকটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়া মাত্রই চেলু থমকে গেল। এর আগে সমকক্ষ সমরে প্রতি-দ্বন্দ্বীকে জখম সে ক'রেছে, খুন নয়। এ লোকটা কি মরেই গেল ! নিমেষের জন্যে বিভ্রান্তি এল তার কিন্তু প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি যাকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে তারই বশে চালিত হয়ে সে ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণ নিমেষেই ক'রে ফেলল, যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি অকস্মাৎ চম্পট দিল। না এবার পথ ধরে নয় চট ক'রে ছাদে উঠে অন্য ছাদে লাফিয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অন্য গলি পথে কোথায় যে রওনা হ'ল বোঝবার অবকাশ পেল না ভানুপ্রিয়া। সে প্রথমটা হতবাক্ হ'লেও চিৎকার ক'রে উঠল এবং ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল।

কথায় আছে 'গায়ে বিষ্ঠা মেখে থাকলেও যম ছাড়ে না'—অনেকটা তেমনই কোন বিহ্বলতাকেই রেহাই দেয় না ইংরেজ প্রশাসনের দেশী পুলিশও। সাধারণ কোন অপরাধেই নয় তার ওপর খুন বলে কথা, জলজ্যান্ত একটা রসলোভে আসা রীতিমত সুস্থ মানুষ। কোন কথাই শুনল না ভানুপ্রিয়াকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে গেল পুলিশ। তার ঘরে খুন হয়েছে তারই বাঁধা বাবু, আর সে জানে না কে তাকে খুন ক'রল এই সরল সত্য পুলিশ অন্তত বিশ্বাস ক'রতে পারে না। তাদের বক্তব্য একাজে ভানুও দোসর। হতে পারে নিজে হাতে করে নি কাকে দিয়ে করিয়েছে সেটা বলতে হবে। কে সেই খুনের দোসর ? দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে ?

চিনি না হুজুর !

চিনিস না ! ধমকে উঠল গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ কর্তাটি। বাঁচতে চাস তো নাম বলে দে। এখনই বড় সাহেবকে যদি বলে দিই তো তুই ও মরবি তোর স্যাঙ্গাৎও বাঁচবে না।

এত বছরের পেশায় এমন বিপদ এই প্রথম বলে সে অনন্যোপায় হয়ে কাঁদতে লাগল সেই অবস্থাতেই বলল, লোকটা আজই প্রথম এসেছিল হুজুর।

এটা তো বিশ্বাসযোগ্য কথা নয় তাই গোয়েন্দা কর্তা বলে উঠল, বদমায়েসীর আর জায়গা পাস না ? আজই অচেনা লোকটা প্রথম এল আর তোকে না মেরে তোর বাবুটিকে মেরে ফেলল ! রসময় তোর কাছে কত টাকা রেখেছিল ?

কোনও টাকা রাখে নি হুজুর।

তবে কি জমা রেখে ছিল যার জন্যে লোকটাকে মারলি ?

কিছু রাখে নি—

বলা মাত্রই গোয়েন্দাটি এমন জোরে ধমক দিল যে ভানুপ্রিয়া চমকে উঠল। বহু পুরুষের বিশ্রম্ভালাপ সে শুনেছে, প্রতিবেশী পুরুষদের গালাগালিও বহু শুনেছে কিন্তু এই শব্দ—আজই প্রথম। স্বভাবতই তার সমস্ত সত্তা নিষ্ক্রিয় হয়ে এল, কোন সহায়তার সম্ভাবনাও কোথাও নেই, সাহায্য তো প্রশ্নাতীত ; একা তাকে এমন ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হ'ল যার দুঃস্বপ্নও সে কোন রাত্রে দেখে নি। আরও কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর জমাদারকে ডেকে কর্তাটি হুকুম দিল, যাও শালীকে লক আপমে দে দেও।

অন্ধকার নোংরা ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ থাকবার পরই আবার একজন আরক্ষী অধিকর্তা এসে নতুন সুরে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ ক'রল, তোমার সব ঝামেলা এখনই মিটে যায় যদি যে মেরেছে তার নামটা বলে দাও। যে যা মনে করে করুক আমি বিশ্বাস করি তুমি এর মধ্যে নেই। তবে দেখছে তো ? তোমার চোখের সামনেই তো হয়েছে ঘটনাটা ! এ তো তুমি অস্বীকার ক'রতে পার না ? তা হ'লে নামটা বলে দেবার দায়িত্বও কিন্তু তোমার থাকছে।

ভানুপ্রিয়া যেন আশার আলো দেখতে পেল, সত্যিই আমি চিনি না হুজুর।

চেন না, কিন্তু দেখেছ তো ? কেমন দেখতে ?

ভানুপ্রিয়া আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল কেমন দেখতে বলবে ? একটা লোককে যেমন দেখতে হয় তেমনই। মানুষ যেমন হয়—কেমন বলা যায় ? সে ভেবে স্থির ক'রতে পারল না। মানুষের বর্ণনা দেওয়া, সে দেখল বড় কঠিন কাজ। গোয়েন্দা কর্তাটি আবার তাকে সাহায্য ক'রতে চাইল, তুমি যে বলেছ তোমার ঘরে খদ্দের হয়ে এসেছিল তারপর এই পুরানো লোকটি আসায় দুজনে ঝগড়া হয়। এই লোকটি গালাগালি দেওয়ায় সে এর গলা টিপে ধরে, এই তো ?

হ্যাঁ—অতিকষ্টে ঘাড় নেড়ে এবং সামান্য উচ্চারণ ক'রে উত্তর দিল ভানুপ্রিয়া।

তা সেই লোকটি কেমন ? বেঁটে, না লম্বা ? মোটা, না রোগা ? কালো, না ফর্সা ?

লম্বা বেশি নয়, মোটা নয় আবার রোগাও না। ফর্সা না কালো কি বলবে ভানুপ্রিয়া গুলিয়ে ফেলল। কি হ'লে ফর্সা বলা যায় আর কতটা হ'লে কালো তার

কোন ভেদ রেখা তো তার জানা নেই। কোনটা বলবে? ফর্সা যদি না হয় কালোও নয় তা হ'লে কি বলবে? প্রশ্নকর্তা সময় নষ্ট হচ্ছে বলে তাড়া দিল, কি হ'ল? কথা বলছ না কেন?

বুঝতে পারছি না—

তার মানে? এতে বোঝবার কি আছে? যেমন দেখেছে তেমন বলবে। তুমি যদি না বল তো এই খুনের দায় তোমার এসে পড়বে। সারাজীবন জেল কিংবা ফাঁসি হতে পারে। আমি তোমাকে বাঁচাতে চাইছি। নাম না জান তো কেমন দেখতে বলে দাও।

তাই তো হুজুর বোঝাতে পারছি না, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ভানুপ্রিয়া।

প্রশ্নকর্তা এবার কতগুলো ফটো বের ক'রে সামনে টেবিলের ওপর মেলে ধরল, একটা একটা ক'রে লক্ষ কর, এদের কেউ কিনা বলবে।

প্রতিটি ছবি এক এক ক'রে দেখাতেও পরিচিত মুখ পাওয়া গেল না। এর মধ্যে একটি ছবি চমকে দিল তাকে, সেই লোকটি অনেক কাল আগে যেন বেশ কয়েকবার এসেছিল তার ঘরে। ওকে থমকে যেতে দেখে আরক্ষী যেন আশা ক'রতে পারল কিন্তু নেহাৎই এক লহমার জন্যে ভানু থমকে ছিল পরমুহূর্তেই অন্য ছবিতে মনোনিবেশ ক'রল। শেষে ছবি ফুরিয়ে গেলেও হত্যাকারীর দেখা পাওয়া গেল না। গোয়েন্দাকর্তা অবিচল; আবার প্রশ্ন ক'রল, এদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারলে না? একজনও নয় তো?

না।

এবার কিন্তু তোমাকেই বলতে হবে দেখতে সে কেমন ছিল।

ভানুপ্রিয়াকে ধরে এনেই আরক্ষী বাহিনী নিশ্চেষ্ট ছিল না। ইতিমধ্যে মৃতের গলায় আঙুলের ছাপ ও অন্যান্য পরীক্ষার ফলশ্রুতি এসে পৌঁছাল, হত্যাকারীর হাত কোন নারীর যে ছিল না সে কথা জানা গিয়েছিল বলেই আসল লোকটিকে খুঁজে পাওয়া জরুরী ছিল। ভানুপ্রিয়ার অবর্তমানে তার বাড়ীর কাছেও অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল গোয়েন্দা বিভাগ সেখান থেকে আসা সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই আধিকারিকটি জানতে চাইল, তুমি ওপাড়ার রমজান কে চেন? খোকা দত্তকে?

না হুজুর। রমজানের নামটা তো জানি।

খোকা দত্তর জান না?

ভানুপ্রিয়া নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

ইতিমধ্যে একজনের গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নেবার দায়ে থানায় ধরা পড়লেও চেলু এ মামলায় পড়ল না। মাস দুয়েক হাজত বাসের পর বাড়ীউলি লক্ষ্মীদাসীর চেষ্টায় জামিনে ছাড়া পেল ভানুপ্রিয়া। বাড়ী ফিরে আসতেই সহবাসীরা এবং লক্ষ্মীদাসী নিজেও প্রশ্ন ক'রল, কে সেদিন ঘরে এসেছিল লা?

ভানুপ্রিয়া সরলভাবেই জবাব দিল, আমি তাকে কোন দিনই দেখিনি মাসি। হঠাৎ এসে ঢুকল আমায় ক'টি টাকা দিলে। বললে, চুপ থাকবে। শব্দ ক'রবে না। অল্প বয়েস, আমার যেন মনে হ'ল লুকোতে এসেচে। খুবই ছেলেমানুষ গাঁটা গোঁট্টা। ইতি মধ্যেই বাবুটি এসে হাঁকডাক সুরু করাতেই সে একদম লাফিয়ে পড়লে বাবুর ঘাড়ে। চোকের পলক ফেলতে না ফেলতেই সে একদম পগার পার।

এবার সবাই নিশ্চিত হ'ল এ তবে চেলুরই কাজ। লক্ষ্মীদাসীই সাহস ক'রে মন্তব্য ক'রল, এদানিং ছোঁড়াটার বড় বাড়বাড়ন্ত হয়েচে দেকচি। একাই যা খুশি ক'রে বেড়াচ্চে। কাউকে গেরাজ্যি করে না। রমজান মিয়ার হাতে পড়লে বাছা টের টি পাবে একদিন। ওর ছুরি খেলে একদিনেই সাবাড় হতে হবে।

বাড়ীর মধ্যে লতিকা সর্বকনিষ্ঠা, অনেক ব্যাপারেই তার আগ্রহ উৎসাহ বেশি, সে-ই সহর্ষে বলল, ওকে কেউ পারবে না, যা চালাক ছেলে!

তুই যেন খুব চিনিস লা ? চপলা ওকে ঠেস দিয়ে বলতেই লতিকা জবাব দিল, এখেনে ওকে কে না জানে গো ? তুমি জান না ? তোমার এক বাবুর টাকা কেড়ে নিয়েছিল না একদিন ?

তা ও তো এই সবই করে বলে শুনি, খুন খারাপির কথা তো শুনিনি, লক্ষ্মীদাসী সংযোজন ক'রল। ভানুপ্রিয়া অবাক হ'ল সবাই চেনে আর পাড়ারই ছেলেকে সেই চিনত না! ওরা বোধহয় আর কারও কথা বলছে।

পুলিশও ততদিনে চেলু নামটার খোঁজ পেয়েছে বলে তাকে হার ছিনতাই এর মামলায় হাজতে ঢুকিয়ে রাখার সময়ই পাড়ার মধ্যে খুনের জন্যে তার নাম ছড়িয়ে গেল। সে নাম বড় কোথাও পেঁছাল না মেয়ে মহলে ঘোরাঘুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল এবং ফল্গু স্রোতের মত অলিগলির স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে বারান্দায় গোপন গল্পে বইতে লাগল।

কিন্তু কলকাতা পুলিশের দুর্ধর্ষ বাহিনীর জাল এমন বিছানো যে অন্তঃ সলিলা ফল্গু ধারা থেকেও তা মৎস শিকারে সক্ষম। তারাই ছ মাস বাদে রসময় হত্যার মামলাতে সন্দেহ ভাজন আসামী হিসেবে জুড়ে দিল চেলুকে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী অপর আসামী ভানুপ্রিয়া তার সাক্ষে পরিষ্কার বলল, একে আমি কখনও দেখিনি, চিনিনা।

চেলু খালাস পেয়ে গেল। কিন্তু গভীর কৃতজ্ঞতা তাকে আটকে রাখল ভানুপ্রিয়ার কাছে। এবং হয়ে উঠল ভয়ংকর, দুর্দান্ত। রমজান মিঞা পর্যন্ত জেনে গেল নতুন সব মস্তান উঠেছে যাদের হাতের পাঞ্জাই ছুরির কাজ করে, হিসেব ক'রে চলতে হবে।

ভানুপ্রিয়ার একটা ছোট্ট শব্দ চেলুর জীবন শেষ ক'রে দিতে পারত কিন্তু সেই ছোট্ট 'হ্যাঁ' শব্দটি না বলে ও যে সমস্ত বিপদ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে চেলুকে বাঁচিয়ে দিল তারই জন্যে চেলু মরিয়া হয়ে একটা বিরাট ডাকাতি ক'রে বসল কদিনের

জেলবাসের সময় আলাপ হওয়া দাগী ডাকাত ফৈজুর সঙ্গে মিলে। আসলে তার ভূমিকা সামান্যই ছিল সে কেবল সন্ধানটা বলে দিয়েছিল, আর তারই বিনিময়ে 'ইমানদার' ফৈজু তাকে অংশ হিসেবে একগাদা টাকা পৌঁছে দিয়ে খানাপিনা আর মৌজ ক'রে গেল একরাত্রি সোনাগাছিতে এসে। আর ফৈজুই বলে গেল যদি কখনও ফৌজদারী উকিলবাবুর দরকার হয় যেন সত্যেন বসুর কাছে সোজা চলে যায় হয়ত ফাঁসিও বাতিল হয়ে যেতে পারে। ফৈজুর দেওয়া টাকায় ফৈজুর বলে যাওয়া উকিলবাবুকে ধরেই চেলু শেষ পর্যন্ত খালাস ক'রল ভানুপ্রিয়াকে রসময় খুনের মামলা থেকে।

এবং এরপরই সদ্য যুবক চেলু বিরাট হয়ে গেল গোটা এলাকায়। এক কথায় সবাই মেনে নিল, হ্যাঁ ইনসানিয়াৎ বটে চেলুয়া ভাইয়া। আর তার চারদিকে জুটে গেল অসংখ্য অনুরাগী শিষ্য এবং সামন্তবর্গ। কিন্তু বুদ্ধিমান চেলু বিনা বিচারে সবাইকে সাকরেদ করে নি যে ক'জনকে ক'রেছিল এই বিশুয়া তাদের মধ্যে একজন। নিজের ক্ষমতার জন্যে ছাড়া চেলুর সাকরেদীর জন্যেও তার মর্যাদা একটু বিশেষ ধরণের। পেছনে চেলুর সব রকমের সমর্থন আছে এটা সবাই জানে, আর জানে চেলুর কাছে দুঃসাধ্য কিছু নেই। যে কোন নির্মমতা তার কাছে চোখের পলক পড়বার ব্যাপার, কুকর্মে সে দ্বিধাহীন, তাই তাকে সকলেরই ভয়। ভয় পুলিশেরও না জানি কখন কি ক'রে বসে। তাই স্থানীয় থানা সর্বদাই সতর্ক থাকে, খবর রাখে চেলু না কিছু করে। জীবনের মধ্যযাম পার ক'রে এসেও লোকটার মধ্যে কোনও পরিবর্তন হয়নি। না অনুতাপ না কোন অপরাধের জন্যে অনুশোচনা। প্রৌঢ় ভানুপ্রিয়ার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক নেই বলে মানসিক সম্পর্ক বজায় রেখে অপেক্ষাকৃত তরুণী, যার সঙ্গে সঙ্গতি থাকা সম্ভব তেমনই একজন রমণী রেখেছে নর্মসহচরী ক'রে। ভানুপ্রিয়া তাতে আপত্তি করেনি নিজের সারাজীবনের সঞ্চয় নির্দ্বিধায় তুলে দিয়েছে চেলুকে, যে কেউ দেহসঙ্গী হয় হোক চেলু কাছে থাক এতেই ভানুর সুখ, তার সার্থকতা। তাই দুই রমণী নিয়ে দুই সংসার তার। সবাই জানে এই একটি মাত্র সততা তার আছে; সমান ব্যবহার সে উভয়ের সঙ্গেই করে বলে বাইরের মানুষ মনে করে। সে দুই রমণীর সঙ্গে কোন তারতম্য করে না বা কাউকে ত্যাগও করেনি।

রমণী বিহারে চেলু আপন অনুচরদের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রেখেছে। যে যত খুশি নারী ধর্ষণ কর, লুটপাট কর, কোনটাতেই আপত্তি নেই কেবল প্রয়োজন মত ডাকলেই যেন পাওয়া যায়—সর্ত কেবল একটিই। তাই রমণী রমণে অনাসক্তি নেই রাহাজানি লুণ্ঠনের সহজ রোজগারে যাদের আকর্ষণ সেই সব দুর্জন প্রকৃতির সকলেই তার দলভুক্ত। চেলু জানে এইসব দস্যু প্রকৃতির লোকেদের যথেচ্ছাচারে প্রশ্রয় না দিলে কেউ দলে থাকবে না, আর এরা হাতে না থাকলে এলাকার ওপর প্রভুত্ব রাখবে সে কিসের জোরে? তাই সাকরেদরা সবাই মানে চেলুদা বড় ভাল-

মানুষ। কিছু বলে না মাইরি। সব সামলে দেয়। পুলিশ ভিড়তে দেয় না। আর কি বুদ্ধি রাখে মাইরি ঠিক লাইন বাতলে পার ক'রে দেয়।

চেলু একদিন বিশুয়াকেই ডেকে ইমামবক্স লেনের বাড়ীটার সন্ধান দিয়েছিল, আ বে ওটা তোর মাকে বলে কিনে নে। চন্দ্রাবতীর বাড়ী, সে বিক্রি ক'রে চলে যাবে। চন্দ্রাবতীর বাবু তাকে বরানগরে বাড়ী কিনে দিয়েছে ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠে যাবে চন্দ্রাবতী।

তুমি ওস্তাদ ঠিক ক'রে দাও।

আগে তোর মাকে বল।

আচ্ছা ওস্তাদ।

আমরতিয়ার কাছে টাকা আছে সবাই জানত, কত আছে কেউ জানত না। ছেলে গিয়ে আমরতিয়াকে বলা মাত্র মা একবারে জ্বলে উঠল, কিতনা দাম তুঝনে পুছা রাণ্ডীকা বাচ্চা? খালি দারু পী পীকে মাথা ভি বরবাদ হো গিয়া।

বিশুয়া মাকে একটা অতি অশ্লীল গালি দিয়ে সম্বোধন ক'রল, বলল, তু যাকে পুছ না লে। কিতনা দাম হামে ক্যা মালুম?

পরবেশ পাণ্ডে মরবার আগে আমরতিয়াকে অনেক টাকাই দিয়ে গেছে বলে সবাই জানে, আমরতিয়াও জানে পরবেশের কেনা সিন্দুকটায় টাকা আছে, পরবেশ মারা যাবার পর একদিনই একা সে সিন্দুকটা খুলেছিল; তাতে কত গয়না, থাক থাক টাকা—গোনে নি আমরতিয়া অতগুলো টাকা গোনা তার পক্ষে সম্ভবও নয় বলে আর ঘাঁটে নি। তেজারতি কারবার ছিল পরবেশের কার কার যে এত গয়না তাও জানা যায় নি লোকটা আচমকা মারা যাওয়ায়। মরাটাও বিচিত্র। সারাজীবন কলকাতাতেই ভগ্নীপতির ডেরাতে থাকত দাসপাড়া খাল ধারে। মারা যাবার তিন দিন আগে সুস্থ মানুষ দেশে যায় যুক্ত প্রদেশের আজমগড়ের সুলতানপুর গ্রামে। আর ফেরে নি। লোকটা এতই চাপা ছিল যে আমরতিয়ার সঙ্গে তার যে এমন ঘনিষ্ঠতা তা তার পরিচিত জনেদের কেউ জানত না। ফলে পরবেশও আর এল না। কেউ তার খবর নিতেও নয়। মাস ছয়েক কেটে যাবার পর আমরতিয়া টাকা কবুল ক'রে বাণেশ্বরকে ধরে খুঁজতে পাঠাতে বাণেশ্বর দালালই ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড় ক'রে আনে যে সে দেশে গিয়ে মারা গেছে। বাণেশ্বরের মুখ থেকে সরাসরি কথাগুলো আমরতিয়ার ওপর এসে পড়ল, তুমি যা কাজ দিয়েছিলে না অন্য কেউ হ'লে পারত না, এই বাণেশ্বর মল্লিকের অসাধ্য কিছু নেই বলেই হয়ে গেল।

বাণেশ্বর দালালকে সবাই যেমন জানে তেমনই আমরতিয়াও, ওর কাজের চেয়ে কথা অনেক বেশি। আমরতিয়া চুপ ক'রে ওর বাজে কথার হাওয়া বেরিয়ে যাবার অপেক্ষা করে, যা বলে বলুক। বাণেশ্বর আপন গতিতে বলে চলে, সে শালা খালি

ধুলো আর কাদা খুঁজেই পাওয়া যায় না কোথায় দাসপাড়া। সে যদি বা পাওয়া গেল পরবেশ পাণ্ডের পাত্তা একজনও জানে না। এ বলে ওখানে যাও, ও বলে ওদিকে যাও, যেতে যেতে হাল্লাক মেরে গেলাম। ঘণ্টা খানেক বাদে একজন বলল, চটাওয়ালা পাণ্ডেজী বলবেন তো? বাঁ দিকে গিয়ে একটা চালকল দেখবেন তার পাশেই থাকে। ঘুরে ঘুরে টাকা ধার দেয় তো—ওর ঠিক ডেরা কেউ জানে না। তবে ওখানটাতেই থাকে। শ্যামচরণ বল্লভের বস্তি ওটা। তার পর খুঁজে শালা পাত্তা করা গেল।

আমরতিয়া জানে এসব অকর্মন্য ব্যর্থকাম লোকেরা অকারণ কথা বেশি বলে। আর এইসব কাজ এরা ছাড়া ক'রবেই বা কে? বেকার লোক একটা টাকার বিনিময়ে গোটা দিন সময় ব্যায় ক'রে বলবে, এক খিলি পান খাওয়াবে না মাইরি? সেটাই এদের যথেষ্ট উপরি পাওনা বলে এরা মনে করে। এত কম পয়সায়, অনেক সময় আবার বিনা পয়সাতেও ফাইফরমাস যে খাটবে সে যদি কিছু কথা বলে তো বলুক ক্ষতি কি তাতে ওর কথা ফুরানো পর্যন্ত চুপ ক'রে থেকে অবশেষে বলল, যাক তুমি যে পেয়েছ এই ঢের। দেখা হ'ল?

দেখা হবে কি গো? সে তো সেই কবে দেশে গিয়ে আর ফেরে নি।

কবে ফিরবে কিছু খবর জানতে পারলে?

ফিরবে কি গো! সে তো মারা গেছে বলে খবর এসেছে।

বাণেশ্বর এতবড় একটা সংবাদ এমন নির্বিকার মুখে সহজ ভাবে বলল যে আমরতিয়া আকস্মিক অতবড় আঘাতের মুখেও অবাক হয়ে গেল। সে হতবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেশহীন চোখে বাণেশ্বরের দিকে চেয়ে থেকে নিজের দুই হাতের পাঞ্জায় মুখ ঢেকে উছলে কেঁদে উঠল।

এবার হতভম্ব হ'ল বাণেশ্বর; একি হ'ল? আমরতিয়ার টাকা পয়সা পাওনা ছিল নাকি লোকটার কাছে? অথবা কোন জিনিষ গচ্ছিত ছিল?—মনে এলেও এ প্রশ্ন মুখে আনতে পারল না বাণেশ্বর, মুখে এল না। এই মহিলাকে তার ভয় লাগে—অথবা একে সমীহ ক'রতে হয়। মেয়েটা সময়ে অসময়ে দুচার আনা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে, হয়ত কোন কাজ করিয়ে পয়সাটা উশুল ক'রে নেয়, তা নিক দরকারে দেয় এটাই কত! বিপদের সময় কে দেয়? আরও তো কত আছে, মিশির তো একটা পয়সা বাকি থাকলে ছাড়ে না। হোটেলে ঢুকলে আগে জেনে নেবে, পয়সা যিতনা হ্যায় উতনাই খায়গা। ঝামেলা মাত করো। ছিল এটা দুগ্‌গা বাবুর হোটেল কদিন হ'ল মিশির পানওয়ালা কিনে নিয়েছে, নিয়েই কত রঙ! পয়সা দিলে ভাতের অভাব? কে না দেবে? বরং পঞ্চানন্দ পাণ্ডার হোটেলে মাছের টুকরোটা বড় দেয় চার আনার ভাতেই পেট ভরে যায়। কিন্তু পয়সা না থাকলে সারাদিন শুকিয়ে থাকলেও কেউ যখন না দেয় আমরতিয়ার কাছে গেলে অন্তত এক আনা দু আনাও দিয়ে দেয়। মুখে একটু কড়া কথা বলে বটে, তবে

বঞ্চিত করে না। মুখে যা বলে বলুক উপকার তো করে। সে কারণেই মান্য করা।

আর এই সৌভাগ্য নিয়েই তাকে ঈর্ষা করে সকলে। আমরতিয়ার মত মেয়েমানুষ খাতির করে থাকে তার আর কিসের অসুবিধে? সবাই জানে আমরতিয়া মালদার আসামী। তার চেয়ে বড় কথা ও বিশুয়ার মা। চরণ তো একদিন বলেই ফেলল, তোমার মত ভাগ্য ক'জনের আছে বল দোস্ত? তোমার খাতির কত!

কথাটা মনের মধ্যে ঢেউ তোলে, বানেশ্বর আর দালাল বাণেশ্বর থাকে না, বাণেশ্বর মল্লিকে পেঁছে যায়। গর্বিত স্বরে ঘোষণা করে তোরা আর দেখলি কি? এখানে পড়ে আছি তাই—বাপ শালা বেইমানী ক'রল বাড়ী ঘর ছোট ভাইকে দিয়ে গেল নইলে আমার পয়সা খায় কে? কত বড় বাড়ী জানিস?

কোথায় বাড়ী গো ওস্তাদ?

সিংহীবাগান মল্লিকবাড়ী দেখিস নি? কি দেউড়ি! যাসনি ওদিকে?

চরণ থমকে রইল। সিংহীবাগান নাম সে শুনেছে কোনদিন যায়নি। হবে সেখানে মল্লিকবাড়ী আছে। তবে সেই বাড়ী ছেড়ে এই নিরাশ্রয় জীবন কেন সে বুঝতে পারে না। তার না হয় কেউ নেই কোনকালে কেউ ছিল কিনা তাও জানে না, তাকে এভাবেই বড় হতে হয়েছে নীলমণি মিত্তিরের গলির রোয়াকে শুয়ে—যার মা বাবা বাড়ী ঘর সব থাকে তাকে এভাবে লোকের দয়ায় দিন কাটাতে হয় কেন? প্রশ্নটি চাপতে পারল না, একটু ঘুরিয়ে বলল, তোমার বাড়ীতে কে আছে ওস্তাদ?

কে আর থাকবে ভাই আছে, ভায়ের বৌ আছে—

ছেলে পিলে নেই?—চরণ জানতে চাইল। তার কণ্ঠস্বরে কেমন আকুতি ফুটে উঠল।

আছে। আমার ঐ শালা বেইমান ভাই-এর একটা ছেলে আছে।

কত বড় ছেলে?

তা দিয়ে তোর কি হবে আমারই বা কি?

চরণ দমে গেল। পথ চলতে রাস্তায় ছোট ছোট ছেলেদের দেখলে তার কেমন ভাল লাগে। কি সুন্দর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। মানুষের ছেলেমেয়ে থাকলে কত ভাল লাগে। তার যদি ভাই থাকত, বাড়ীতে ভাই-এর ছেলে থাকত সে নিশ্চয় বাড়ী চলে যেত। বাণেশ্বরদা যে কেন যায় না কে জানে?—বাড়ী যাওনা কেন বাণেশ্বর দা?

ঐ শালা ভাইটা আমার বাবার কানে মন্তর দিয়ে এমন বিষিয়ে দিলে যে আমাকে বাবা বাড়ী ঢুকতে দিত না। বাবা মরলে ভেবেছিলুম জোর ক'রে ঢুকব, চেষ্টাও ক'রেছিলুম ভাই পুলিশ দিয়ে খেদিয়ে দিলে। বাবা নাকি সব ওকেই লিকে দিয়ে গেছে। থানার বড়বাবু মামলা ক'রতে বলেছিল, টাকা কোতায় পাব? নীহারবালাকে কত বললুম তোমায় তো ট্যাকা কম দিইনি তুমি কিছু দাও উকিল

লাগিয়ে সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে তোমাকেই সব দেব—তা দিলে না। অথচ দ্যাকো নীহারবালাকে ঘরে তুলবো বলেই না যত বিপত্তি।

কি রকম ?

বাবা বে দিতে চাইল। আমি বললুম বে করলে আমি নীহারবালাকেই ক'রবো। তাকেই আমার পচন্দ। শুনে বাবা রেগে কাঁই। বলে মদ গিলিস সে নাই মেনে নিলুম তা বোলে ঘরে তুই বেবুশ্যে নিয়ে আসবি! ওসব হবে না। নিকাল যাও।—বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে তো রোজই আসতুম রাতে কোনদিনই কেউ জেগে থাকতে ফিরতুম না। সেই যখন সেকেণ্ড কেলাশে পড়ি তকোন থেকেই তো এ পাড়ায় আসি, নীহারবালাকে যবে পেলুম তবে থেকে সব বাদ। আর শালা কি ভাগ্য বলব মাইরি বাড়ী ঢোকা বন্ধ হতেই নীহারবালা আমাকে বাদ দিলে ?

কোন নীহারবালা ওস্তাদ ?

এসব বড় দুঃখের কতা মাইরি। যা না এক বোতল কালীমার্কা নিয়ে আয় না! মনটা খারাপ হয়ে গেল।

পয়সা নেই।

যাঃ তোর কাচে পয়সা নেই তা হয় ? তুই বড় কেপ্পন। আচ্ছা এক কাজ কর এখন তুই আন আমি যেদিন কিনব তোকেও খাওয়াবো।

চরণেরও কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। বাণেশ্বরের কথা শুনতে শুনতে তারও দুঃখ দুঃখ ভাব হতে লাগল। কটা পয়সা পকেটে সত্যিই আছে, এক পাইট কিনে আনলে মন্দ হয় না, আসরটা জমে ভাল। ইতিমধ্যেই বাণেশ্বর জিজ্ঞাসা ক'রল, কাল ঐ গাইয়াটাকে মাল খাইয়ে কত পেলি চরণ ?

গাইয়া না গো ওস্তাদ লোকটা খালাসীর কাজ করে। ও যায় ওয়াটগঞ্জে কার কাছে শুনেছে সোনাগাছিতে ভাল ভাল সব মেয়েমানুষ আছে তাই এসেছিল।

তুই কি ক'রলি ?

আমি দুটাকা নিয়ে হেমলতার বাড়ীতে ঢুকিয়ে দিলাম। যাও শালা এবার বুঝে নাও গে। পকেটে যা মাল আছে উপুড় ক'রে ঝেড়ে দিতে হবে। পায়ে হেঁটে খিদিরপুর ডকে ফিরতে হবে। শালা বলে কি খানদানী জানানা চাই। শালা জাহাজী জানে না যে খানদানী মেয়েমানুষের ঊরুৎ দেখতেই এক পাত্তি ঝাঁক হয়ে যায়। ও শালা খালাসী দেখবে খানদানী মেয়েমানুষ।

তা ভালই তো। তুই কেবল হেমলতার বাড়ীর দরজা দেকিয়ে মাইরি দুটো ট্যাকা ঝেড়ে দিলি ?

না গো ওস্তাদ বাড়ীতে ঢুকিয়ে হেমলতার ঝি-এর সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছি।

যা যা। হারামের পয়সা মেরেচিস শীগগির একটা পাইট নিয়ে আয়।

হারামের পয়সা কি গো ওস্তাদ ট্যাসকো বলো! ফুর্তি ট্যাসকো।—বলেই চরণ কালী শা-র শুঁড়ি খানার দিকে পা বাড়াল।

বাণেশ্বরের পুরানো কথা মাথায় থাকে না। তবে ভাই-এর ওপর ভাদ্রবৌ-এর ওপর নিষ্ফল রাগ তার কখনই যায় না। তার ভাবনা ওরাই বাবাকে ফুসলে সব নিজেদের নামে করিয়ে নিয়েছে। ওদের বাবা যে বড় ছেলেকে সুস্থ জীবনে ফেরাতে না পেরে পরিত্যাগ ক'রেছে সে কথা একবারও মনে করে না বাণেশ্বর, অক্ষম বিকারে পরিণত চিত্ত বিক্ষোভ প্রকাশ হয়ে পড়ে সুরাপানের পর্ব কিছুটা এগোলে।—পয়সা ছেল না তাই শালা কিছু ক'রতে পারলুম না নইলে নেদো মল্লিকের বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম এতদিনে। আমার শালা সাত পুরুষের ভিটে—আমাকে ভিটে ছাড়া করে! হকের সম্পত্তি দেবে না মানে! শালা আমাকে দয়া দ্যাকায়; বলে তারা যা ক'রেচেন তাকে তো রদ করা যায় না তুমি ওসব লাইন ছেড়ে বাড়ী এসে থাক, খাও-দাও ঘুমোও আমার আপত্তি নেই। শালা নেদো মল্লিক আমাকে দয়া দেকায়, ও জানে না আমি ওকে দেকে নেবো।

হ্যাঁ ওস্তাদ। সেই ভালো।

ভালো মানে? নিশ্চয় ভাল। মামলা ক'রব ঐ শালা নন্দলাল মল্লিক আর পূর্ণশশী মল্লিকের নামে। আমার অর্দ্ধেক ভাগ আমি যা খুশি ক'রব, তোর বাবার কি?

তুমি কাকে দেবে ওস্তাদ?

নীহারকে দেব।

ও যে তোমাকে টাকা দিল না!

না দিক। নীহার আমার। আমি নীহারকেই দেব।

বেশ দাও। আমাকে তোমার বাড়ীতে থাকতে দেবে তো ওস্তাদ? মাইরি রাত্তিরে শোবার বড় কষ্ট হয়। বিষ্টি হলে বসেই থাকতে হয় মাইরি।—চরণ দুঃখের কথা নেশার ঘোরে বলে ফেলল; তারপর শূন্য বোতলটা তুলে চোখের সামনে ধরে বলল, যাঃ ফিনিশ।

ফিনিশ ক'রে দিলি?

তুমি ক'রলে না ওস্তাদ?

ঠিক আছে ক'রলাম। একশোবার ক'রব। তুই কি ক'রবি শালা?—বাণেশ্বরের মাথায় ততক্ষণে শত্রু নন্দলাল মল্লিক আর সঙ্গী চরণ দাস একাকার হয়ে গেছে। খালি পেটে সুরা গরলের ক্রিয়া সুরু ক'রে দিয়েছে বলে তার মুখ থেকে অশ্রাব্য ভাষা অগ্নুৎপাতের লাভাস্রোতের মত চারিদিকে ছুটে চলেছে। সিংহী-বাগানের মল্লিক পরিবারের ঐতিহ্যের সীমারেখা তখন সম্পূর্ণ মুছে গেছে, বাণেশ্বর তখন একান্তভাবেই কালীশা-র চরণাশ্রিত সোনাগাছির লোক—বাণেশ্বর দালাল; সেই তার সত্য পরিচয়।

বাণেশ্বর দালালকে দিয়ে একটা বড় কাজ হয়েছিল আমরতিয়ার। পরবেশ পাণ্ডের মৃত্যু সংবাদটা এনে দিতে দুঃখ ঠিকই কিছুটা সে পেয়েছিল তার ফলে কিন্তু

যে বিরাট লাভ তার হয়েছিল তার দাম কম কি? পরবেশের যা কিছু গচ্ছিত অর্থ এবং সম্পদ সবই নিমেষের মধ্যে তার হয়ে গিয়েছিল। মানুষ যা করে নিজের আনন্দে করে, করবার নেশাতে করে। তার সঞ্চয় কি হবে, কার হবে, তা দিয়ে অতঃপর কি হবে সে ভাবে না। পরবেশ পাণ্ডে লোককে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে, লোকের গয়না বাঁধা রেখে টাকা যা ক'রেছিল কি জন্যে ক'রেছিল সে নিজেও জানত না। আনন্দের সন্ধান করে মানুষ, যে যাতে আনন্দ পায় তাই করে, তখন তার ভালমন্দের বোধ থাকে না, ন্যায়-নীতিরও চেতনা থাকে না। সব একাকার হয়ে যায় একমাত্র আত্মতৃপ্তিই বড় তার কাছে, সেই তৃপ্তি নিয়ে সে পথ চলে? পরবেশ পাণ্ডেও তার ব্যাতিক্রম নয়। সারাটা জীবন সে শুধু অনর্থক অর্থ ভেবেছে; সত্য কি মিথ্যার সঙ্গে তার গুণগত ব্যবধান কি, ন্যায় কি অন্যায় কোনটা এসব কিছুই ভাবতে চায় নি। তার নেশাসক্ত জীবন টাকার নেশায় বুঁদ হয়ে থেকেছে। অথচ সে বোঝেই নি যে টাকা কার? সে জানেই নি যে টাকা এবং বারবণিতা কখনও কারও নিজের হয় না, যখন যার কাছে থাকে তখন তার।

কাজেই সে নিশ্চিহ্ন হওয়া মাত্রই সঞ্চিত অর্থে তার অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। অপরপক্ষে পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্তির আনন্দ আপ্লুত ক'রেছিল আমরতিয়াকে, সেই আনন্দে সে উদ্বেল হয় নি। পরবেশ পাণ্ডের জন্যে তার যে দুঃখ সে এতই ক্ষণস্থায়ী যে বিদ্যুৎ চমকে গেলে অমাবস্যার পথিকের চোখে সে আলোর প্রতিক্রিয়া যতক্ষণ কাজ করে এও প্রায় তেমনই। একজন তার নিবিড় অনুসঙ্গী ছিল বলে তার জন্যে মমত্ববোধ মাত্র ছিল, অন্তর্বেদনা হয়নি আপন অনুভবে। বহুবল্লভা রমণী সে, কার জন্যে বেদনা বোধ ক'রবে? একভর্তা রমণীর দয়িত বিচ্ছেদে মনোবেদনার অনেকটাই জুড়ে থাকে তার ভবিষ্যৎ চিন্তা। আগামী দিনের অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তা-হীনতার আশঙ্কা তাকে ব্যাকুল ক'রে তোলে বলেই তার শোকের মাত্রাবৃদ্ধি ঘটে। আর্থিক ভাবে নিরাপদ জীবনে শোক ক্ষণস্থায়ী, প্রবল হয় না। আমরতিয়ারাও তাই অশোকা। তাদের শোক হয় না; শোক হতেও নেই। কারও জন্যে শোক হ'লে আগন্তুককে হারাতে হবে যতদিন যৌবন ততদিনই শরীর, আর এই শরীর থাকতেই সন্ধেবেলার প্রদীপ জ্বালবার তেল আর রাত কাটানোর কাঁথা তাকে জুটিয়ে রাখতে হবে। তাই ভাববাদী জীবন যাপন আমরতিয়াদের একদমই চলে না।

আমরতিয়া সুযোগ পাওয়া মাত্র পরবেশ পাঁড়ের সঞ্চয় ইমাম বকস লেনের বাড়ীটার সঙ্গে বিনিময় ক'রে নিল, কারণ এ তার ভবিষ্যৎ জীবন-শীতের আশ্রয়।

ছেলেটা হবার পরই সরমা সিদ্ধান্ত ক'রল, সব যখন ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে এবার তাকেও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। সে-ই বা কম কিসে? কার চেয়ে কম? সোনামণি যদি বাড়ীউলি হতে পারে, থাকমণি, ভবসুন্দরী যদি অত পয়সা ক'রতে

পারে সে-ই বা লোকের লাথি ঝাঁটা খেয়ে পড়ে থাকবে কেন? যতদিন না সোনামণির টাকা শোধ হয় ততদিন ঘাড় গঁুজে নিচু হয়ে না থেকে উপায় নেই, তারপর নয়। বদরী তো স্পষ্টই একদিন বলেছে, তোমার মত মেয়ের আধিয়া খাটবার কি দরকার? খাটছ কেন? ঘর? সে তোমাকে আমি ক'রে দিবো।

সরমা উত্তর দেয়নি। এই একটা বছরে সে রাজা উজীর মারতে দেখেছে অনেককে, কাজের মানুষ তার মধ্যে ক'টা? দশের একজন হয় কি না সন্দেহ। কাজেই বদরী যে কি ক'রে দেবে আর না দেবে তা নিয়ে অতটা ভেবে লাভ নেই। আসলে বদরী তাকে ফুসলাতে চায়। এ পাড়ায়, সরমা এই এক বছরে বিশেষ ভাবে লক্ষ ক'রে দেখেছে যে বদরী জাতীয় পুরুষেরা কোন নারীর কোমলতার সুযোগ নিয়ে তাকে দেখাশোনার নাম ক'রে তার ঘাড়ে বসে খায়। তার কষ্টের রোজগার ভাগ ক'রে নেয়। রেখাকেই তো দেখছে বোকা মেয়েটা কেন যে লালতাকে অত খাতির করে আর কি জন্যে যে ওর মদ খাবার পর্যন্ত পয়সা জুগিয়ে যায় সে বোঝে না। একদিন পয়সা না দিলেই যত ঝামেলা, চিৎকার ক'রে বাড়ি মাথায় ক'রবে, শালী রাণ্ডী! কষ্টের পয়সা কিসের রে? বিছানায় শুয়ে টাকা পাচ্ছিস, মানুষের মেহনতের টাকা—! আমি পয়সা চাইলেই শালা দোষ! আমি না শালী তোকে এ লাইনে এনেছিলাম নইলে রেললাইনের ধারে আঁস্তাকুড়ে পচে মরছিলি!

রেখা নরম প্রকৃতির মেয়ে বলে এদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। পাকিস্তান থেকে কোনক্রমে পালিয়ে এসে বাঁচতে চেয়েছিল। মান ইজ্জত বাঁচাতে চেয়েছিল, আরও কিছু কি বাঁচাতে চেয়ে এই পালিয়ে আসা? সে তবে কি? কিসের কতটুকু বাঁচল শেষ পর্যন্ত? শিয়ালদহ স্টেশনে, রেললাইনের ধারে ঝুপড়িতে—বাটি বাটি খিচুড়ি; অবশেষে নিত্য অনাহার। তারই মধ্যে বাবার অসহায় মৃত্যু, দাদার হারিয়ে যাওয়া এবং হয়ত ইচ্ছে ক'রেই। ঝুপড়ির জীবন থেকে পালিয়ে গেছে দাদা, কোথায় গেছে? লালতা লোকটার দেখা পেয়ে রেখাও পালিয়েছে, ঝুপড়ি থেকে এখানে। হ্যাঁ বেঁচে আছে, মৃত্যু নিত্য ভয় দেখায় না বটে তবে সেই জীবন কোথায় যে জীবনকে বেঁচে থাকা বলে? কিন্তু আছে রেখা, আর এই প্রাণে বেঁচে থাকার পথ বলে দিয়েছে বলে লালতা সিং প্রতিদিন তার মাশুল আদায় ক'রে নিচ্ছে নির্মম নিষ্ঠুরতায়। আর অগুনতি রেখা এসে ভরে তুলেছে এ-অঞ্চলের যত ফাঁকা ঘর। এখন আর ফাঁকা বলতে কিছু নেই, ব্যবসাতেও টান পড়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা এসে অসুবিধেয় ফেলেছে সোনামণির মত মেয়েদের। হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুরের চাষীঘর থেকে আসা মেয়েদের কদর গেছে কমে। তাদের ক্রোধের ভাষায় 'বাঙ্গাল' মেয়েগুলো অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের দেহ নিয়ে এসেছে, দৈহিক পটুতা নিয়েও এসেছে। থাকমণি, রাখমণি, আন্নাকালী, চাঁপাদাসী, শশীতারা থেকে এলাকা সরমা, রেখা, রমা, সবিতার হাতে গিয়ে পড়েছে। এখানকার খদ্দেররা নতুনত্ব পেয়ে সেদিকে ঝুঁকছে যেমন সত্যি তেমনই নতুন মালের খবরে নতুন সব

খদ্দের এসেও জুটছে—এরা সব নব্য খদ্দের, আগের মত গিলে করা পাঞ্জাবীর নিচে সোনার চেন ঝোলানো দক্ষ চাকরের হাতে কোঁচানো কাপড়ের পরিপাটি বাবু নয় যার কানে গোঁজা আতর মাখানো তুলো থেকে ভুর ভুর ক'রে গোলাপ, বকুল কিংবা যুঁইফুলের গন্ধ বেরোবে। খদ্দের আসছে সন্ধেবেলা মশলা ডালের আড়ৎ বন্ধ ক'রে, কাঠের গোলা কর্মচারীর হাতে অবহেলায় ফেলে, আর আসতে সুরু ক'রেছে কলেজে পড়া উৎসুক বকাটে ছেলের দল, স্কুলের বদনামে মার্কা করা দুচারটে আসছে না এমন নয়। এছাড়া কারখানার শ্রমিক মুটে মজুর যাদের দরকার তাদের জন্যে আছে জোড়াবাগান পার্কের দক্ষিণে টিনের চালের সস্তা কারখানা, সার সার শরীর আছে সন্ধে বেলা দাঁড়িয়ে—যাও বেছে নাও। অথবা ইচ্ছে ক'রলে বিডন স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে রামবাগান বা কচুড়ি গলিতেও ঢুকে যেতে পার—এখানে নয় এ এক স্বর্গরাজ্য পরীদের অন্তর্লোক। এখানে পরীদাসী গোলাপবালার মেলা। এখানে মাঝে মাঝে সুরবালারাও আছে, তাদের ঘরে হারমোনিয়াম ডুগিতবলার ছন্দ বাজে রাত একটু ঘন হলে, আসে নামী মানুষের মুখ, ডাক্তার, উকিলবাবু, ব্যারিস্টার সাহেব, কথাকার, কলাকার। আসে ছন্দকার, সুরকার, চিত্রকর, আসে সুধীরলালরা—মদের নেশায় হুঁস হারালেও গানের সুর হারায় না—তাদেরই জন্যে পারিজাত ফুটে ওঠে এ অরণ্যে।

এখানে পুরানো দিনের বাড়ী একটার গায়ে আর একটা যেন হেলান দিয়ে আছে যেমন ক'রে যুবতী বন্ধুরা হাসাহাসি ক'রতে গিয়ে একে অপরের গায়ে ঢলে পড়ে অথবা খুশির আবেশে জড়িয়ে ধরে পাশের জনকে। তবে এ বাড়ীগুলো যুবতী নয় প্রায় সবই পুরানো, তবে একদা তো যৌবন ছিল, রঙ ছিল উজ্জ্বলতা ছিল, সমর্থ সমর্থ ভাব ছিল চেহারায়। এখন প্রায়ই তা নেই, রঙ করা হয় না দেখতে তাই জং ধরা লোহার মত লাগে। তবু পরস্পরকে ছাড়তে পারেনি, বৃদ্ধাবাসের বৃদ্ধরা যেন পরস্পরের ওপর নির্ভর ক'রে আছে। তাই অনেক সময় পাশের বাড়ীর বড় মাপের হাসি বা গানের শব্দ এ ঘরে এসে ছোট্টছেলের চোর চোর খেলার মত লুকিয়ে পড়ে। কলহের শব্দ তো এসে ঢোকেই, সদর্পে ঢোকে। সোনামণিদের পেছনের বাড়ীটা নলিনীবালার। সে নেই, থাকে তার ছেলে প্রবীর স্মৃতিরেখা বলে একটি মেয়েকে নিয়ে সংসার ক'রে থাকে। বাড়ীভাড়ার আয়ই তার আয়, তা থেকেই তার বেঁচে থাকা, সংসার বাঁচানো। স্মৃতিরেখাকে তার যাত্রা পাড়া থেকে পাওয়া; পাশেই চিৎপুরে যাত্রা পাড়া, প্রবীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিতাই অধিকারীর কাছে তালিম নিয়ে তারই দলে বলরাম সাজতো 'কৃষ্ণ বলরাম' পালাতে। স্মৃতিরেখা রাধিকা সাজতে এসেছিল বলে অপেরা পার্টিতেই দেখা। শ্রীরাধিকার সঙ্গে বলরামের কোন রকম সম্পর্কের কথা কোন গ্রন্থেই লেখা না হ'লেও যাত্রাপালার আসরের বাইরে কেমন ক'রে যেন কৃষ্ণকে ছেড়ে বলভদ্রকেই বরণ ক'রে বসল যাত্রার রাধিকা। ব্রজেনবাবুর তাতে কিছুমাত্র ভ্রূ কোঁচকালো না, তবে হয়ত স্মৃতিরেখার

ঘটনায় উৎসাহিত হয়েই নতুন পালা লিখে ফেলল 'নটী হ'ল সতী'। তাতে নাম-গোত্র স্বাভাবিক ভাবে অন্য সব তো থাকলই, গল্পও ব্রজেনবাবুর মগজ থেকেই আসা, তবে সে পালা শশধর গায়েন-এর গণেশ জননী অপেরাকে বেচে দিয়ে স্মৃতিরেখাকে গোপনে প্রস্তাব দিল, গণেশ জননীতে যাবে না কি? ভাল মাইনে দেবে।

স্মৃতিরেখা বলল, না দাদা। ঘর ক'রতে যাব। এ দল ছাড়লে যাত্রাও ছাড়ব।

সে কি!

স্মৃতিরেখা পেটের দায়ে এসেছিল বটে তবে রঙ মেখে সঙ সাজতে তার আর ভাল লাগছে না বলে সে চুপ ক'রে রইল। ব্রজেনবাবু এমনটি দেখেনি, যাত্রা পাড়ায় গাইতে এসে নায়িকা হয়েও যাত্রা ছেড়ে যায় এ তার নতুন দেখা। কত আচ্ছা আচ্ছা মেয়ে বরং ঘর ভেঙ্গে নটী সাজে।

এবং বলরামের হাত ধরে রাধিকা পালাল। প্রবীর ছাড়ল অন্য কারণে। নিতাই অধিকারী জানত নলিনীবালার গর্ভে জন্মানো প্রবীর শুদ্ধভাবেই বাবু বরদা ভট্টাচার্যের জাতক। বাংলা ঠিয়েটারের বিখ্যাত নটের ঔরসজাত সন্তান প্রবীর, সে হয়ত রক্তে অভিনয়টা পেয়েছে কিন্তু কার্যত দেখা গেল বলরাম কান্তিময় হলেও কর্মদক্ষ নয়। আসলে পৌরাণিক ঘটনা নিতাই অধিকারীর অজানা তবে ব্রজেনবাবুর পালা অনুসারে ঠিকমত অভিনয় হলে আসরে কৃষ্ণকে তার ছাপিয়ে যাবার কথা। সে জায়গায় প্রবীরের আড়ষ্টতার জন্যই পালাটা ঝিমিয়ে গেল, প্রবীরও বুঝতে পারছিল ব্যাপারটা তার পক্ষে বিশেষ সুবিধে জনক হচ্ছে না সে তাই যা পাই তাই লাভ ভেবে মজুরীর বদলে নায়িকাকে নিয়েই সরে পড়ল।

চলে যাচ্ছে। ঘর ভাড়াতেই চলে যাচ্ছে। ঘর ঘর ভাড়া, এখন তো আর খালিই পড়ে থাকছে না, সৌভাগ্য যোগে কোনটা খালি হ'লে পরের দিনই দালাল এসে বলছে, কিছু বেশিই নিন প্রবীরবাবু। না হয় দুটাকা বেশিই নেবেন। এ মেয়ে দারুণ জমাটি, খদ্দেরও অনেক, আপনার ভাড়া আটকাবে না। এর মধ্যে সুখী দালালই শেখাল, আজকাল আবার রোজ হিসেবে ভাড়া হচ্ছে চান তো আমি সেটাও করিয়ে দিতে পারি।

সেই সুখী দালালই একদিন বলল, আপনার তিনতলার পশ্চিমের কোনার ঘর তো খালি হয়ে যাচ্ছে প্রবীরবাবু। যে মেয়েটা আছে উঠে যাচ্ছে। দিন না ঘরটা মতিলাল ওস্তাদকে। বেনারসী মানুষ, কলকাতাতেও মাঝে মধ্যে থাকে, এখন থেকে থাকতে চায়, এখানে সে গান শেখাবে।

গান শেখাবে শুনে স্মৃতিরেখা উৎসাহিত হয়ে বলল, দাও দাও গো, তাকেই দাও।

সেই সুবাদে শান্তিকে সঙ্গে নিয়ে মতিলালের এ বাড়ীতে এসে ওঠা। আর

মতিলাল আসাতে গলিটার এই অংশটার অবস্থাই বদলে গেল। আগে গান বলতে ছিল কেবল রেডিয়োতে লালচাঁদ বড়ালের বা গিরিজাদেবীর গান, কৃষ্ণচন্দ্র দের ভজন, হীরাবাঈ-এর খেয়াল বা অন্য না দেখা শিল্পীদের দূরের কণ্ঠস্বর। রেডিয়োই বা ক'টা ? হাতে গোনা রেডিয়ো যাদের পয়সা আছে তাদের। আর সুররসিক বাবুরা বাঁধা মেয়েমানুষকে চোঙ্গাওয়ালা কলের গান কিনে দিয়ে থাকলে মাঝে মাঝে সেই চোঙা থেকে গান বেরোয় তাও সেই একই সব গান—যা রেডিয়োতে কলের গানেও তাই। মতিলাল বেনারসী গানের সুর ছেড়ে দিল। সেই সব সুর জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে আকাশের দেখা পেয়ে ছিটিয়ে যেতে লাগল, টুকরো টুকরো হয়ে আশে পাশের বাড়ীর খোলা জানালা গলে ঢুকে পড়তে সুরু ক'রল চারপাশের বাড়ীগুলোতে। মতিলালের গানগুলোতে কালোয়াতি গিটকিরি আর সরগম। সেগুলোর টুকরো রসিক মনের দরজাতে অনবরত ঠোকরাতে লাগল বন্ধ খাঁচায় নতুন রাখা চন্দনার মত। তখন কলকাতা নগরীর মাইফেল জুড়ে গহরজানের খুব নাম ; নাম করা সব ধনীবাড়ীর বকাটে ছেলেরা গান বুঝুক না বুঝুক রোজ রাতে গহরজানকে স্বপ্নে দেখে। বউবাজার, মেটেবুরুজের গানের পাড়া থেকে বেরিয়ে সে সব গান ও গাইয়ের নাম এই পরীতলাতেও এসে ঢুকে পড়েছে, কারও কারও কাছে স্বপ্ন হয়েও। তাদের দুচারজন মতিলালের খবর পেয়ে তাকে আপন এক্তিয়ারের মানুষ বুঝে ধরে বসল, ওস্তদজী আমার মেয়েটাকে গান শিখিয়ে দাও না। মনে বড় ক্ষোভ যে ছিল সে নিজেও বোঝে নি, প্রাণে যে গানের যে আকুতি ছিল তাও জানা ছিল না, সেই সব গোপন বাসনা আকুতি হয়ে পড়ল মতিলালের সঙ্গে কথা বলতে। নিজের সুযোগ হয়নি বলেই মেয়ের সংযোগ ঘটিয়ে আর্তি পূরণ ক'রতে যারা চাইল তাদের মধ্যে একজন প্রবীরের বাড়ীর গায়ে লাগা বাড়ীর মানদা। মুখে মুখে মানদা সুন্দরী। লিখতে জানে বলে সব শেষে দাসী কথাটা নাম শেষ ক'রে লেখে বটে তবে সুন্দরীটাই শেষ কথা। সত্যি বটে সুন্দরী সে। তার সাত বছরের মেয়েটিও সুন্দরী। লোকে গায়ের রঙ-এর বর্ণনা দিতে দুধ আর আলতার কোন একটা সংমিশ্রণকে কল্পনা করে, মেয়েটির বেলাতে তা করা চলে স্বচ্ছন্দেই।

মোতিলাল বাড়ী এসেই তাকে গান শেখাতে লাগল। এবং আরও কিছু বাড়ী ঘুরে গান শেখানার বায়না জুটল তার। ভালই হ'ল, যেমনটি চাইতে এসেছিল জুটে গেল। এক সময় মনে হচ্ছিল তার প্রতিদিন যে পান লাগে তাতেই টান পড়েছে এখানে এসে পান চিবানোর মাত্রা বেড়ে গেল মানদাসুন্দরী প্রশ্রয় পেয়ে। মেয়ের গুরুগিরির জন্যে বরাদ্দ টাকার বাইরেও মানদা ওস্তাদজীর জন্যে পানের বরাদ্দটা নিজেই ক'রল গানের আকর্ষণে। সত্যিই বড় ভাল গায় মানুষটা। গলায় সুর অমন উঁচুমানের না থাকলেও সুরে দখলটা উঁচু মাপের। রাগ রাগিনী মোতিলালের গলায় জলপরীদের মত খেলা করে। গলার স্বর কিছুটা কর্কশ বটে তবে তাল লয় সব ঠিক ধারা ধরে চলে। তানের বিস্তার বলে দেয় মানুষটার সাধনা ধ্রুপদী।

নাচের যেমন মুদ্রা গায়নেরও তেমনই বিশেষ মুদ্রা থাকে যেটা মোতিলালের অনায়ত্ত গায়নের মুদ্রা বরং দোষযুক্তই তাই অনাকর্ষক। মানদাসুন্দরী নিজে সঙ্গীত চর্চার সুযোগ পায়নি ঠিকই তবে রসবোধ তার যথেষ্ট, সর্বোপরি তার সামগ্রিক বোধ আনুপাতিক ভাবে বেশি বলে সবই সে যথাযথ অনুধাবন ক'রতে পারে। ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে গোটা মোতিলালকে সে বুঝে নিল বলেই ব্যবহারে প্রচ্ছন্ন একটা ব্যবধান রেখে চলতে লাগল। তার গানের জন্যে তাকে কদর ক'রে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা ক'রলেও ব্যক্তিগত ব্যবহারে এমন একটা কঠিন আবরণ রাখল যা দুর্ভেদ্য। মেয়ে যতক্ষণ গান শিখবে, দাসী নিত্যবালার ওপর নির্দেশ ছিল ঠায় দরজার ওপর বসে থাকতে হবে, চোখের আড়াল হওয়া চলবে না।

মানদাসুন্দরী বেলেল্লাপনা পছন্দ করে না। তার বাড়ীতে বিশেষ মানুষেরা আসে, যারা আসে হয়ত আনন্দ স্ফূর্তির জন্যে আসে কিন্তু ব্যবহারে কারও কোন অশালীনতা থাকে না। দৈবাৎ কেউ এদিক ওদিক ক'রলে মানদাই তাকে পরিষ্কার বলে দেয়, কিছু মনে ক'রবেন না বাবুমশায়, এ বাড়ীতে আপনাকে একটু ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে হবে। এ বাড়ীটাও যদি বাজার হয়ে ওঠে তাহ'লে বাজরে ছেড়ে এখানে আপনারা আসবেন কেন ?

এমনিতে মানদা অত্যন্তই ভদ্র, চারুবাক্ কিন্তু নিমেষেই তার বাক্ ভঙ্গী বদলে যায় সে যে কোন অপ্রিয় কথা যে কোন লোককেই শান্তভাবে অবলীলাক্রমে বলে দেয়, তখন তার কোন দ্বিধা থাকে না। মোতিলাল সেটা অচিরেই বুঝে গেল একদিন নেশা ক'রে গান শেখাতে এসে। অভিজ্ঞ মানদাসুন্দরী দেখামাত্রই বুঝে তাকে শুনিয়েই নিত্যবালাকে বলে উঠল, ওস্তাদজীকে বলে দাও আজ ওনার শরীর সুস্থ নেই। আজ বাড়ী চলে যান, অন্য দিন এসে গান শেখাবেন।

বার ঘাটের জল খেয়ে বেড়ানো মোতিলাল অনেক ভাষাই কিছু না কিছু বুঝতে পারে, বাংলাটাও। সে তার আপন ভাষাতেই জবাব দেবার চেষ্টা ক'রল, কোন বাত নেহি। হাম ঠিক হ্যায়। মানদা তার প্রত্যুত্তর নিত্যবালাকেই দিল বেশ কঠোর ভাষায়, ওঁকে আজ যেতে বলো নিত্য, খুকু আজ গান শিখবে না।

এই স্বরের পর আর কথা চলে না। মেয়ে এবাড়ীর আবহাওয়ার বাইরে তিনতলার একটা ঘরে থাকে, সেখানে আর ওঠা হ'ল না মোতিলালের। চাকরীটা তার কাছে দামী, অভ্যেসের কাছে দাসত্ব তার যতই থাকুক সে আখের হারাতে রাজি নয়, গোছা গোছা পানের খিলির জন্যে তার পয়সা লাগছে না, মাইনে বাদ এমন উপরি সে কোথায় পাবে ?

এবাড়ীর সংযম সে মেনে চলে বলে মানদা একদিন নিজেই তার সাশ্রয় ক'রতে চাইল। ব্যারিস্টার নটবর সেন যেদিন আসে আগে থেকে খবর করা থাকে। নিজের ফিটন ছেড়ে ভাড়া গাড়ী ক'রে এসে হাজির হয়। মানদা সুন্দরীর অতিথিরা সবাই সমান গুরুত্বপূর্ণ, সবার জন্যেই 'বিশেষ' ব্যবস্থা এমনই করা থাকে যে সবাই

ভাবে তাকে মানদা যেমন খাতির করে তেমনটি কেউ কাউকে ক'রতে পারে কিনা সন্দেহ। তার সমাদরে সবাই মোহিত। যে যেমনটি পছন্দ করে তার জন্যে তেমনই ব্যবস্থা তার। নটবর সেন যেদিন আসবার থাকে 'কলের গানের বাক্সটা' আগে থেকে ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে রাখে নিত্যবালা। কারণ এই একমাত্র নটবর সেনই এখানে হুইস্কির বোতল আনবার অধিকারী। সে যখনই আসবে দুবোতল তার বিশেষ ফরাসী হুইস্কি আর নতুন বেরোনো গানের রেকর্ড হাতে ক'রে আসবে। একটি বোতল সে মানদার সঙ্গে শেষ ক'রবে অন্যটি দিয়ে যাবে মানদাকে, রেকর্ড সে মানদার জন্যেই আনে। তবে একটা কথা ঠিক যে লোকটা গান ভালবাসে, যতক্ষণ থাকবে একটু একটু ক'রে হুইস্কি খাবে আর গান শুনবে সারাক্ষণ। তবে সেই সময় যা-ই হোক মানদা কাছ ছাড়া হ'তে পারবে না। শুয়ে বসে যে ভাবেই থাকুক মানদাকে কাছটিতেই থাকতে হবে। এবং মানদা সেটা নির্দ্বিধায় পারে বলেই সে প্রেয়। রূপে শুধু নয় গুনেও সে আদরনীয়া।

মানদাই একদিন প্রস্তাব ক'রল, আজ আর রেকর্ডের গান নয় এমন এক গানের ব্যবস্থা ক'রেছি যা কখনও শোনাই হয়নি।

কি রকম? উৎসাহ প্রকাশ ক'রল নটবর।

আছে আছে। এমন গান আজ শোনাব যে গহরজানের রেকর্ড বন্ধ ক'রে শুনতে হবে।

তাই নাকি পেয়ারে? কি এমন গান?

কিছুদিন হ'ল এক বেনারসী ওস্তাদ এসেছে গলির একটা বাড়ীতে শান্তি বলে একটা মেয়ের সঙ্গে থাকে, বড় ভাল গায়। তন্দ্রাকে গান শেখবার জন্যে তাকে রেখেছি। সপ্তাহে দুদিন আসে, আপনার আসা হবে বলে আজ সেই ওস্তাদজীকে ডেকেছি।

বাঃ। তাহ'লে আগে বলতে হয় তো! আমিও তাবে একজনকে সঙ্গে আনতাম।

কে সে?

আমাদের বন্ধু, রমেন মিত্তির। সে বড় সমঝদার লোক।

সে আর একদিন হবে। টাকা তো বেশি দিতে হবে না—কুড়িটা টাকা দিলেই চলবে।

ঠিক আছে।

অল্পক্ষণ বাদেই মোতিলাল পান্না তবলচিকে সঙ্গে ক'রে এসে হাজির হ'ল। পান্না দাস এপাড়াতেই পড়ে থাকে। বাড়ীঘর সংসার সব কোথায় ফেলে এসেছে কেউ জানে না, তাদেরও কেউ খোঁজ নিতে আসেনি এখানে। হীরাদাসীর কাছে খদ্দের হয়ে এসে রয়েই গেছে। আগে বেশ আয় রোজগার ছিল তখন যা পেয়েছে দিয়েছে এখন আর কিছু নেই হীরা তাড়িয়ে দেয়নি, আপন সঙ্গী হিসেবে

রেখেছে। তার আয়েতেই চলে, মাঝে মাঝে যাত্রা গানের আসরে তবলা বাজিয়ে যা পায় সে-ই তার নিজস্ব রোজগার। তবে সে আয় দৈনিক নয় যেদিন ডাক আসে সেদিন হয়। মোতিলাল এ পাড়াতে আসবার খবরটা গন্ধে গন্ধে পেঁছে যেতে পান্না তার কাছে জুটে গেছে—ওস্তাদ ঠেকা দেবার দরকার হ'লে খবর দেবেন। মুখে যা-ই বলুক ডাকের জন্যে অপেক্ষা করেনি পান্না, নিজেই যখন তখন হাজির হয়ে গেছে। আর তারপর তো জমেই গেছে দুজনের মনের সম্পর্ক। দুজনেই রসিক মানুষ বলে একমাত্র সুরের নেশাতেই মজে উঠেছে দুজনে। কোথাও কোন আমদানীর সূত্রে হঠাৎ কিছু টাকা এসে গেলে সুরের সঙ্গে সুরা যোগ দিয়ে জমিয়ে তোলে আসর। শান্তি নীরবে সব জোগান দেয়, পান সাজে, জল দেয়, পান পাত্রে মদ ঢেলেও দেয় সময়ে সময়ে। নিজে শান্তি গানের মানুষ নয় কিন্তু গাইয়েটি তার প্রাণের মানুষ বলেই মেটেবুরুজের বাস তুলে সে এখানে এসেছে মোতিলালের সঙ্গে। গান ছাড়া মোতিলালের নিজস্ব কোন স্বপ্ন নেই, সে স্বপ্ন ঝাপসা হয়ে গেলেও সেই আবছা ছবি নিয়েই সে বেঁচে আছে। শান্তির নিজস্ব স্বপ্ন এই সুরের মানুষটার সঙ্গে সে ঘর বাঁধবে। তাই সব ছেড়েই তার আসা। সে ছেড়েছে আপন স্বামী, পুত্র; সংসার। সব চেয়ে বড় যা ছেড়েছে সে হচ্ছে একখানা নিশ্চিত ঘর, সে ঘরে তার সুখ দুঃখের জীবন ছিল, সে ঘরের আশ্রয়ে তার মৃত্যু পর্যন্ত চলতে পারত। কুলি বস্তির ছোট ঘরটির মধ্যে অভাব ছিল, স্বামীটা মাতাল ছিল, ছেলেটা ছিঁচকে চোরের দলে ঢুকে প্রায়ই ঘরে ফিরত না—সব ঠিক; তবু ঘরটিতে তার বাস নিশ্চিত ছিল। সেই অভাব ও দুঃখের ঝড় প্লাবনে ধোয়া দ্বীপ ছেড়ে সে একত্রিশ বছর বয়সে মোতিলালকে নিয়ে নতুন ঘরবাঁধার স্বপ্ন কোথায় পেল তা কে জানে? চোদ্দ বছর বয়সে একমাত্র সন্তানের জন্মের পর থেকে সে বন্ধ্যা। কাজেই স্বাস্থ্যের দীপ্তি যুবতীর। তা বলে মনও যে তেমনই হবে এমন তো কোন কথা নেই, তবু হ'ল। এবং যুবতী নয়, কিশোরীর মন নিয়ে সে ঘর পালাল মোতিলালের সঙ্গে।

মোতিলালই বা কি দিল তাকে! অর্থ যা রোজগার করে তাতে দুজনের সংসার হয়ত কায়ক্লেশে দিন সাতেক চলতে পারে, অনিয়মিত আয় যোগ ক'রলে যাবে আরও তিনদিন, কুল্যে দশ। কিন্তু বদখেয়ালে তার প্রায় সবটাই শুঁড়িখানায় আর মিছরি লালের পান দোকানে জমা পড়ে যায় বলে শান্তিকে এখানে পেশা খুঁজে নিতে হয়েছে, এপাড়ার পরাধীন নারীদের স্বাধীন পেশা। তাতে পান্না বা পরোক্ষে মোতিলালও সাহায্য কিছু করে, লোক জুটিয়ে দেয়। মোতিলালের কাছে আসে যারা গানের পরেও অন্য কিছু চাইলে এখানেই পেয়ে যায় আর পান্না জোটায় হঠাৎ কাউকে পেলে। নতুন ঘরের খরচ শান্তির এমনি ভাবেই চলছে।

তা সেই পান্না দাসকে সাকরেদ নিয়েই মোতিলাল এল মানদার বাড়ীতে। কাজ চলবার মত হারমোনিয়াম ডোয়ার্কিনের দোকান থেকে মেয়ের জন্যে আনিয়ে ছিল

মানদা, আজ সেটাকে তিনতলা থেকে দোতলায় নামানো হ'ল সঙ্গে মেয়ের বাঁয়া তবলাও। এসে বসে বাক্য ব্যায় না ক'রে নটবরকে আফগানী কায়দায় একটা কুর্নিশ ক'রল মোতিলাল আর হারমোনিয়ামটা নিজের কোলে তুলে নিল। পান্নাকে তবলা বাঁধবার অবসর দিয়ে আচমকাই হারমোনিয়ামটাকে বাজাতে সুরু ক'রল। তার রেওয়াজী বাজনার এক ঝলক শুনেই নটবর মানদাকে ইসারা ক'রল, হাঁ সাবাস।

মোতিলাল ততক্ষণে চোখ বুঁজে বাজনার মধ্যে ডুবেই গিয়েছে। কারও অপেক্ষা না ক'রে সে যেন সুরের তুফান তুলে চলেছে তার হারমোনিয়ামে। নটবরের তারিফ নয়; মানদার সপ্রশংস দৃষ্টি নয়, কোন কিছুতেই তার নজর নেই, সে এক অন্য মোতিলাল বিভোর এক শিল্পী; সুরের এক লাল রঙের মুক্তো যেন! নটবর সেন বিস্ময় মানল। গান সে অনেক শুনেছে, অনেক বড় মাপের জলসায়, সঙ্গীত সম্মেলনে—ধ্রুপদী শিল্পীরা সেখানে নানা পদের গান গেয়েছেন নানা রাগ-রাগিনীকে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে স্বমহিমায় সাজিয়ে। যশস্বী সেই সব শিল্পীর একাগ্রতা এই অখ্যাত মানুষটারও সর্বসত্তা জুড়ে যেন বিরাজ ক'রছে। এ কি অদ্ভুৎ অভিনিবেশ!

তবলার প্রস্তুতি থামা মাত্র তান ধরল মোতিলাল, একলহমায় যন্ত্র থেকে কণ্ঠে চলে গেল 'সৈঁয়া মেরে পুকারু দিনরাত' পদটিকে আশ্রয় ক'রে। আর সেই একটি মাত্র পংক্তি আশ্রয় ক'রে তার কণ্ঠে নানা সুর এমনই খেলা ক'রে বেড়াতে লাগল যে নটবর অভিভুত হয়ে গেল। আর ঐ একটি পদ নিয়েই মোতিলাল যখন আলাপ থেকে সঞ্চারীতে পৌঁছে গেল নটবর যেন আর স্থির থাকতে পারল না—ব্যারিস্টার নটবর সেন-এর মধ্যে থেকে ভবানীপুরের সেনবাড়ীর কিশোর নটবর বেরিয়ে এল একত্রিশ বছর বাদে, যে নটবর বাড়ীর আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তবলায় তালিম নিয়েছিল বাড়িতে আসা ওস্তাদ কানাই মিশ্রর কাছে এবং সে তালিম দীর্ঘ তিনটে বছর। অতঃপর বিদ্যালয়ের রাশি রাশি পাঠ্য পুস্তকের তলায় সে তবলা চাপা পড়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে তার আর হদিশ পায় নি সে এতগুলো বছর। আজ এই একান্ত আসরে আবার সেই অতীত যেন ফিরে এল, সে হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের দরবার ছেড়ে নিজেকে উপস্থাপিত ক'রতে চাইল ছন্নছাড়া শ্রী হীন ঐ পান্নাদাস-এর পদে। সে অনুভব ক'রতে লাগল তার মধ্যে সুর ফিরে আসছে, তাল ফিরে আসছে, তাকে যেন ফিরিয়ে দিতে চাইছে একত্রিশ বছর পূর্বেকার সেই ভবানীপুরের জীবন। কিছুক্ষণের বিভ্রান্তি কেটে যেতেই বুঝল সে অসম্ভব। যে অভ্যাস একত্রিশ বছর আগে হারিয়েছে তা আর ফিরে পাবে না কিছুতেই। মন যতই হাহাকার করুক, যতই আবেদন সে অনুভব করুক—এখন সে নটবর সেন, ব্যারিস্টার এট ল। এখন তাকে শুনেই আনন্দ পেতে হবে, বড় জোর তাল ঠুকবে তার আসনে বা বসনে। আর তারও চেয়ে বেশি হ'লে বিভোর হয়ে যাবে যেমন

হয়ে যায় হুইস্কির মাত্রা কোনদিন বেশি হ'লে।

পান্না দাস তবলায় বোল তুলতে তুলতেও চোখ রাখছিল অর্ধেক খালি হওয়া হুইস্কির বোতলটার দিকে। এ সে জীবনে দেখেনি, চাখা তো স্বপ্নেরও অসম্ভব। এমন ওস্তাদের সঙ্গে কেরামতি দেখবার মত বিদ্যা তার অনায়ত্ত। সে কেবল ঠেকা চালানোর মত কাজ চালায়। অন্য কোন সাধারণ গাইয়ে হ'লে পান্না তার ওস্তাদী দেখাতে সাহস ক'রত, বুঝিয়ে দিত সে পান্না তবলচি। এর কাছে নয়। সত্যি লোকটা গানে তালিম নিয়েছে বটে। কার কাছে গান শিখেছ ওস্তাদ, একদিন পান্না প্রশ্ন ক'রে ফেলেছিল। প্রশ্ন শুনে মোতিলালের কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখবার জন্যে তার মুখের দিকে তাকিয়েই ছিল পান্না। বেশ কিছুক্ষণ পর দেখল তার চোখে যেন তারার আলো ফুটে উঠল, হয়ত বা তা সন্ধ্যাতারা হবে, তেমনই স্নিগ্ধস্বরে মোতিলাল বলল, গুরু লছমন পাণ্ডেকে পাস। গুরুজী নে হমকো নেহি শিখায়া, শিখাতা থা মধুবালাকো। উসনে নেহি শিখিতো হামনে শিখ লিয়া।

সে আবার কি!

মধুবালা ভাগ গেয়ী। তো হামনে গুরুজী কো পায়ের পাকড়লী। গুরুজী নে পুছা তু কিতনা শিখা?

যিতনা আপনে মধুবালা কো শিখায়া! গুরুজী নে অচানক হো গয়ে। কুছক্ষণ বাদ হাম কো বোলে* কি শুনা দো।

হাম নে থোড়াহি শুনানে কে বাদ উনহে হামে স্বীকার করলি। ব্যাস তিন সাল হামকো শিখায়ে* ও। ফির গুরু গ্যায়ে*।

তারপর থেকে একাই চলেছে মোতিলাল। আর কোন গুরু সে পায়নি চায়ও নি। সব ইতিহাস শেষ ক'রে আক্ষেপ ক'রেছে মোতিলাল, বেলাইন হয়ে গেলাম দোস্ত বেলাইন হ'লে কিছুই হয় না। আমার গুরুজী সাধক ছিলেন, আমি তাঁর নাম রাখতে পারলাম না।

পান্না যেন পেয়ে বসেছে এমনি ক'রে বলল, বেলাইন কেন হ'লে ওস্তাদ?

সে-ও ঐ মধুবালার জন্যে। গান ছাড়ল মেয়েটা আমাকে ধরল। আমি যখন গান শিখলাম ওর মনে হ'ল আমি খুব দামী মানুষ হয়ে গেছি। তার আগে যে কত বছর আমি গান গেয়ে যাচ্ছি সে সাধনার কোনই দাম ধরল না। তা না ধরুক আমিও ওর ফাঁদে পড়ে গেলাম। ও আমাকে নানা ভাবে ঘোরাতে লাগল, আমি হয়রাণ হয়ে গেলাম। কিন্তু ও যে কি চায় আমি বুঝতে পারছিলাম না।

তুমি কি চাইছিলে ওস্তাদ? পান্না প্রশ্ন ক'রে বসল।

স্বাভাবিক ভাবেই ওকে বিয়ে ক'রতে চাইছিলাম।

ও ক'রল না?

কোথায় আর ক'রল? ও বলত তুমি গানের মানুষ, প্রাণের মানুষ।

তার মানে?

মানে আমি কি জানি ? জানি না বলেই তো হয়রাণ হয়ে ওর আশা ছেড়ে চৌখাম্বার পথ ধরলাম ও গেল বোম্বাই।

বোম্বাই কেন ?

জানি না।

কার সঙ্গে গেল ?

তাও জানি না, একদিন শুনলাম সে বোম্বাই চলে গেছে। হতে পারে বোম্বাই না গিয়ে আর কোথাও গেছে বা অন্য কোথাও—। খুঁজিনি। সামনে থেকেই যার মন পাইনি দূরে তাকে কোথায় খুঁজব ? কেনই বা খুঁজব ?

আচ্ছা ওস্তাদ তুমি কি কিছুই পাওনি তার কাছে ?

তা কি ক'রে বলব, সবাই তো পেয়েছিলাম। অনেকদিনই তো এক সঙ্গে ছিলাম কিন্তু কিছুই না, জীবন পেলাম না। যে পরিপূর্ণতার নাম জীবন সেটা নয়।

কেন ?—বেশ অবাক হ'ল পান্না। যে পান্না মাঝে মাঝে ঠাট্টা ক'রে নিজের সম্পর্কে বলে পান্নালাল দাস, ক্লাস সিক্স।

মোতিলাল কখনও ধূম পান করে না, কোন বিশেষ ভাবনার মধ্যে পড়ে গেলে তার সবসময় পান চিবানো মুখ থেমে যায়। সে স্থির হয়ে যায়। চোখ উদাস হয়ে যায়। পান্নার এই সামান্য একটা 'কেন' শুনে মোতিলাল স্থির হয়ে গেল। অনেকটা সময় ধরে স্থির হয়ে থাকল তারপর ধীরে ধীরে নেতিবাচক মাথা নাড়ল, উত্তর সে জানে না। সময়ের পথ ধরে চলতে চলতে মধুবালাকে সে ভুলেই গেছে, সে একটা নাম মাত্র, স্মৃতি, বে-দাগ ইতিহাস, মধুবালা এখন আর কোন ব্যথাও নয়, বেদনাও না। কিন্তু এটাও ঘটনা সে মধুবালাকে সে কিছুতেই বুঝতে পারেনি, চির রহস্যময়ী হয়ে রয়ে গেল তার মনে।

সরমা গানটান কিছুই বোঝে না। শ্যামা সঙ্গীত, ভক্তিগীত অথবা খুব বেশি হ'ল তো কীর্তন দুকলি এই তার বাল্য স্মৃতির অভ্যাস, তার ভাল লাগা। তাও অনুরাগ নয়, ওসব তার নেই। নিজে কখনও চেষ্টাও করে নি, ছেলেবেলায় পুকুর ঘাটে একলা বসেও নয়। তবু সুর তার কানে গেলে সে উৎকর্ণ হয়। কিন্তু তার ঘরের পেছন দিকটায় যে তিনতলা বাড়ীটা তার ঠিক পিঠোপিঠি ঘরে কিছুদিন হ'ল হারমোনিয়াম বাঁয়া তবলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে প্রায় প্রত্যেক দিন। কখনও দুপুরে, বিকালে কদাচিৎ সন্ধ্যায়। তার সঙ্গে গান। তবে সে যে কি গান কিছুই বোঝেনা সরমা, বাড়ীর পেছন দিকে বলে ছোট্ট জানালাটা দিয়ে ঘরটি থেকে আওয়াজ আসে কিন্তু দৃশ্য আসে না, তাই শব্দগুলো বুঝতে না পারার মত শব্দের উৎস মানুষগুলো সম্পর্কেও কোন ধারণা ক'রতে পারে না। এতদিন এই বাজারের মধ্যে বাস ক'রে তার যা ধারণা হয়েছে তারই বলে বোঝে যে গানের শব্দগুলো হিন্দি, কি যে ছাতা সব বলে কিচ্ছু আন্দাজ করা যায় না। পেছন দিকের বাড়ীটার

অতি সামান্য অংশ তার জানালা দিয়ে দেখা যায়, বাড়ীর মানুষজনকে নয় বাড়ীর পুরনো ইট এবং একটা বন্ধ জানালার অংশ মাত্র।

সরমার ঘরের ঐ জানালাটা কোন কাজ করে না, আলো যা আসে তা একান্তই অপ্রতুল জানালার ফাঁকটুকু আলোকিত দেখা যায় মাত্র, সে আলো ঘরে আসে না। ইদানীং অনর্থক শব্দ আসছে, হোক সে শব্দ কোন গানের—যার গান তার গান কার তাতে কি? ওর কোন কাজে লাগছে ঐ গান? কাজেই সে স্থির ক'রল জানালার পাল্লা বন্ধ ক'রে রাখবে আর ঐ বন্ধ জানালায় যে জায়গা হবে সেখানে লক্ষ্মীর পট বসাবে যেমনটি সোনামণির ঘরে বসানো আছে লক্ষ্মী আর গণেশ। গণেশ কেন কে জানে? সে শুধু লক্ষ্মীর পট বসাবে; রোজ তাতে ফুল জল আর বাতাসার ভোগ দেবে। সোনামণির ঘরে তো রোজ একজন পুজারী এসে কি সব মন্ত্র বলে পুজো ক'রে দিয়ে যায় ফুল বেলপাতা দিয়ে। সৌদামিনীর কাছে শোনা ঐ নিত্য পুজোর ব্যবস্থা নাকি বংশীধর জালানের, তারই আনানো মূর্তি, সে-ই পুজারীর পয়সা দেয়। পুজারীর মাসে আট আনা মাইনে কোথায় পাবে সরমা, ফুলই বা রোজ কোথায় পাবে? দেশের বাড়ীতে সবাই নিজেরাই দেয়, সরমাও তাই দেবে। কিন্তু একটা সমস্যা থাকছে রোজ ফুল পাবে কোথায়? তা বরং ফুলের বদলে একটু ক'রে গঙ্গাজলই দেবে, মেয়েরা তো অনেকেই গঙ্গায় যায় স্নান ক'রতে তাদেরই কাউকে বলে এক বোতল গঙ্গাজল আনিয়ে রাখবে, একটু একটু ক'রে তো দেওয়া, অনেক দিন চলবে।

মাসীকে পয়সা দিয়ে লক্ষ্মীর একটা ছোট্ট ছবি কিনে আনানোতেই কাল হ'ল সরমার, হয়ত হবারই ছিল, প্রকাশ হবার পথ পেল বলা চলে। সোনামণি ডেকে বলল, তা তোমার বাপু জোড়া লক্ষ্মী আসুক খেতি নেই আমার পাওনাটা তো মিটবে?

সরমা এবার আর না বলে পারল না, চার পয়সার একটা লক্ষ্মীর পট না আনলি ঐ পয়সার থে তোমার দেনা মিটতো মাসী?

তা কে বলেছে?

তবে তুমি যে লক্ষ্মীর কথা তুলতিছো?

না, আমি ঘটার কথা বলছি। আজ খাড়া একটা বছর আমি চালালাম—

সোনামণির কথা শেষ ক'রতে না দিয়ে সরমা বলল, আমিও একটা বছর খাইটে তোমার সব শোধ ক'রে দেবানে। কিছুটি তোমার বাকি থাকবে না। যা দেছো তার বেশিই পাবা। গতর থাকলি শোধ ক'রতি কি?

তা সে গতর খানা একটা বছর যে নষ্ট ক'রলে এ সময়টা কি ফিরে পাবে? এ লাইনে একটা মেয়ে ক'বছর কাজ ক'রতে পারে সে কি আর আমার জানা নেই?

এবার সরমা চুপ ক'রল। এ একটা হক কথা বলেছে সোনামণি। ক'বছর থাকে বা শরীর, আর শরীর না থাকলে কারই বা কি দাম? তখন তো ভাগাড়ও জুটবে না। যার কপালে দাসীগিরি জুটে যায় সে তবু দুবেলা দু মুঠো খেতে

পায়, নইলে—কি যে গতি হয় সরমা জানে না। সৌদামিনী বলে, ফুটপাথ। একদিন এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল তখনই সে বলেছিল, এই সোনাগাছির কত বাড়ি যে সেরেফ ফুটপাথে পড়ে মরেছে কে তার হিসেব রেখেছে—

ও মেয়েটা অনেক জানে। অনেক খবর রাখে। বদ্রীকে যাতায়াত ক'রতে দেখে একদিন বলে বসল, বদ্রীটা কেন আসছে গো ? ও ব্যাটা কিন্তু লোক ভাল নয়। বেশি পাত্তা দেবে না।

সেই মুহূর্তে সংশয়ী হ'ল সরমা, সতর্ক হবার কথা ভাবল না। বদ্রীর কথাবার্তা তার মনে ইতিমধ্যেই মোহ বিস্তার ক'রে ফেলেছিল। তাই সৌদামিনীর মত মানুষের কথাও তার মনে ধরল না। তার মনে হ'ল এখানে সবাই যেমন অন্যের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করে সৌদামিনীও তেমনই ঈর্ষা প্রণোদিত কথা বলছে। আসলে বদ্রী উপকারী মানুষ সে যা বলছে ঠিকই বলছে, নেহাৎ ওর প্রতি উপচীকির্ষা বশেই বলছে। শেঠ করমচাঁদ নাকি আর এ দেশে নেই, অনেকদিন আসছে না। পিয়ারা সিং মারফৎ বংশীধর বাবুর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে শেঠ করমচাঁদ এখন নতুন দেশের সরকারের সঙ্গে কি চুক্তি ক'রে রাজধানী দিল্লিতে চলে গেছে সেখানে কি সব কাজ কারবার সুরু ক'রেছে। শেঠ থাকলে কারও কোন কথা শোনবার দরকারই হ'ত না। শেঠ যখন আসত সোনামণিও কোন কথা বলত না, আমদানী ভাল থাকলেই সোনামণির মেজাজ ভাল থাকে। এমনিতেই তো আয় আজকাল যথেষ্ট বেড়েছে, ঘর আর একঘণ্টাও খালি থাকছে না, পুরানো মেয়েদের কারও একদিন টাকা বাকি পড়তে পারছে না, বাকি হলেই পিয়ারা সিং উঠিয়ে দিচ্ছে কারণ নতুন মেয়েরা ঘরের জন্যে পা বাড়িয়েই আছে। কোথা থেকে মেয়েরা সব আসছে কে জানে? বদ্রীই কি কম মেয়ে এনে ঘর পাইছে দিয়েছে ? আরও একদিন সে বলেছে, যেমন মেয়ে তেমন ঘর। তোমার এ বাড়ীতে থাকবার কি দরকার ? চল তোমাকে ভানুমতীর বাড়ীতে ঘর দিয়ে দিচ্ছি। ঘর ভাড়া বেশি বটে তবে ও বাড়ীর মেয়েদের কি রেট জান ? পঞ্চাশ, একশ। হাঁ, খানদানী—সব জানানা আছে ওখানে।

বদ্রীর সব কথা সরমা যে বোঝে এমন নয়, শোনে সব বোঝে কম। যতটুকু বোঝে তার সঙ্গে অনুমান মিশিয়ে আপন ধারণা গড়ে তোলে, সেই ধারণার বশেই চলতে থাকে। ফলে বদ্রী সম্পর্কে সম্যক বোধ তার কখনই হয় না। বদ্রীর কথা নিজের মত ক'রে বুঝে নিয়ে আশার সৌধ রচনা ক'রে আনন্দে থাকে। কিন্তু সোনামণি মুখে মুখে যা হিসেব দিল তাতে সরমার দেনা শোধ হ'তে জীবন কেটে যাবে। রাজু ভগত ঘরে ঘরে দরকার মত মালপত্র জুগিয়ে যায়। খবর নেয় তোমার কোন বস্তুটা লাগবে ? খাট, আলমারী, গদি, বালিশ, চাদর প্রসাধন সামগ্রী, কি চাই ? যার যা চাই লিখে নিয়ে যাবে ঠিক ঠিক চাহিদা মত পাঠিয়ে দেবে তাকে। পয়সা এখন নেই ? ঠিক আছে। দামী জিনিষ হ'লে কামাও

শোধ কর। আর দৈনিক ব্যবহারের বস্তু? কাল দিয়ো। যদি কাল খদ্দের না পাও পরশুই না হয় দিয়ো খদ্দের হ'লে। প্রতিদিনে টাকায় এক পয়সা বেশি লাগবে। দামী জিনিষ যা দিয়ে যাবে তার জন্যে রোজ কিস্তি ক'রে টাকা দিলেও চলবে। তবে হ্যাঁ যতদিন ধরে টাকা দেবে তত বেশি দিতে হবে। টাকা প্রতি দিনে এক পয়সা বেশি। আর দাম? সে কথা জানতে চেয়ো না, দাম ন্যায্যই নেওয়া হবে। বাইরে দোকানে যেটা দশটাকা রাজু সেটা বারটাকাতেই দেবে। মেয়েদের তো আর বাইরে দাম জানবার সুযোগ নেই—বন্দিনীর জীবন যা জানবার ঘরে বসেই জানা। তাই হয় রাজু ভগত, নয়ত পিয়ারা সিং জেনে আসবে, নইলে এই রকমই কারও মাধ্যমে জানতে হবে—সে জেনে এসে একটাকার সামগ্রী দু টাকাও বলতে পারে, কম কেউ বলবে না; রাঁড়ের টাকা তো খোলামকুচি—যত পার লুটে খাও। কেবলমাত্র এলাকার আগলদার ও আশ্রিত বেটাছেলেরা নয় সোনামণিরাও সরমাদের যতটা পারে শুষে নেয়। প্রত্যেকেই অপরের বেলা ভাবে ও ওর যোগ্যতার চেয়ে বেশি পাচ্ছে। ওর অত পাওয়া উচিত নয়। ঐ তো চেহারা! তারই এত দেমাক!

সোনামণির হিসেব দেখে সরমার মনে ক্ষোভ হ'ল বাড়ীউলি ওকে ঠকাচ্ছে। বাড়ীউলি লোকটা খারাপ। এখানে তো সবাই প্রায় একই রকম যে যাকে পারে ঠকিয়ে সুখ পায় এই কথাটা তার অভিজ্ঞতার এক্তিয়ারে আসে না বলেই বোঝে না।

এতদিন ধরে প্রায় সদানন্দ পাণ্ডার গণেশজননী হোটেল থেকে ভাত এনেই দিন কাটছিল। দিলু ক'দিন ধরে এক রকম জোর ক'রেই রান্নার ব্যবস্থা করিয়েছে, বলেছে, আমিই না হয় রাঁধব তাতে আমারও সুবিধে হবে। হোটেলে খাওয়া আমার মোটে সহ্য হয় না, পেট জ্বলে।

দিলুর জন্যেই সরমা রান্নার পাট বসাতে রাজি হয়েছে তবে সর্ত দিয়েছে, তুমি পুরুষ মানুষ বসে বসে রাঁধবে সে আবার কেমন হবে?

কেন?

না। আমি মোটেই তা হ'তে দিতি পারি না।—সরমা বড় সংকটে পড়ল তার হাতে দিলু খাক এটা সে চায় না। যেভাবেই হোক নষ্ট মেয়েমানুষ সে। যখন সে মানুষের মধ্যে ছিল তখনই কোনদিন দিলুকে এক গ্লাস জল দেবার সুযোগ পেয়েছে বলে মনে পড়ে না আর এখন বারাঙ্গনার অপবিত্র জীবনে! না! থাক। ও বরং অন্য ব্যবস্থা ক'রে নিক। দিলু সরমাকে তাড়া দিল, কি এত ভাবতিছো বল তো?

সে অনেক কথা। তুমি কি অন্য কোন ভাল হোটেলে খাবার ব্যবস্থা ক'রে নিতি পার না?

এখানে আমি কারে বলবো?

কিন্তু আমারে পাতকি ক'রতি চাও?

কিসের পাতকি ?

আমার হাতে রান্না তুমি খাবে ?

দিলু অবাক হ'ল সেই বিস্ময় প্রকাশ পেল তার প্রতিপ্রশ্নে, কেন। তোমার হাতে রান্না না খাবার কি হলো ? রাঁধতে জাননা নাকি ?—বলে সামান্য থেমে সংযোজন ক'রল, যা জান হোটেলের ঠাকুরের থে খারাপ নিশ্চয় হবে না !

সরমা কথা বলল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মনের সঙ্গে লড়াই ক'রল অতঃপর শক্তি সংহত ক'রে বলল, যে কথা তোমারে এতদিন ক'তি পারিনি আজ বলিতিছি।

দিলু অপেক্ষা ক'রে রইল সরমাকে শুনতে। শুনল, এহেনে কেন আলে ?

দিলু নিরুত্তর রইল। সরমা কি জানে না সে কেন এসেছে ? সত্যিই কি যে বোঝে না তা কি সম্ভব ? সরমা যদি না বোঝে তবে সে না বোঝা ইচ্ছাকৃত। তাই যদি হয় তো হোক। দিলু এ নিয়ে কোনদিনই সোচ্চার হবে না। সে যেমন আছে তেমনই নিঃশব্দে তার মত থেকে যাবে। অপেক্ষা ক'রে থাকবে কোনদিন যদি সরমা জাগে, বোঝে, তার কথা ভাবে।

এমনিতেই দিলুর বুকের মধ্যে অভিমান জমাট বেঁধে আছে। সরমার কাছে তার যাতায়াত অবধি, কথাবার্তাও নিয়মিত, কিন্তু সবই যেন নিষ্প্রাণ। সব যেন কোন দুধমাপা ডিবের মত মাপ মাপ, তাই অচিরেই কথা ফুরিয়ে যায়। প্রয়োজনের কথা কতটুকুই বা ? কাউকে কারও এমন প্রয়োজন নেই যা নিয়ে আলোচনা চলবে, তাই বলার কথা থাকে না বলেই সামনে যাওয়া নিজের কাছেই বোকামীর মত লাগে। তাই আজকাল যেতেও সংকোচ হয়। কি বলবে এ প্রশ্ন মনে আসে। তবু মাঝে মাঝেই উতলা মনে সামনে গিয়ে নিঃশব্দেই দাঁড়ায় যদি কোন প্রয়োজনের কথা বলে সরমা, যদি দৈবাৎ আবেগ আসে মিঠে কথা দুটো শোনা যায় ওর মুখ থেকে, যদি দেখা যায় একটু হাসি। এর বেশি আর কিছু ভাবতেও সাহস হয় না তার। অথচ মনের গভীরে সততই সে সরমার প্রণয় কামনা করে। সে বাসনা চাপা দিয়ে রাখে ইচ্ছা ক'রে, অনিচ্ছাতেও চাপা পড়ে থাকে কারণ সরমার নিরাসক্ত ব্যবহার সে ইচ্ছা জাগতে দেয় না। প্রণয় না হয় নাই জানাল সাধারণ যে সব সরস কথা তাও কি কাউকে বলে না সরমা ? তবে তাকে বলে না কেন ? অথচ তার ব্যাকুল বাসনা মনের অন্তঃস্থলে গুমরোতে থাকে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায়।

তবে কি এই জীবন মেনে নিতে না পেরে তাকেই দায়ী করে সরমা ? এ তো নেহাৎই দুর্ঘটনা। সরমা যেমন ভাবে মুক্তি চেয়েছিল তাতে কোন না কোন দুর্ঘটনা ঘটতই। দিলু বরং সেই সাম্ভাব্য অঘটন থেকে রক্ষা ক'রতে চেয়েছিল কিন্তু এমন দুর্বিপাক যে ঘটবে তা সে কেমন ক'রে ভাববে। এখনও জানে না যে কেমন ক'রে কি ঘটল। সমস্ত ব্যাপার দেখে সে নিজেই প্রথমে কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেবে এমনও কাউকে পায়নি, সরমাকে সরাসরি

জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয়নি। সমস্ত প্রশ্ন মনের মনের মধ্যে হজম ক'রে নিঃশব্দে ঘটনাকে মেনে নিয়েছে দিলু। এবং তার আত্মপীড়ন হয়েছে এই ভেবে যে সে সরমাকে উদ্ধার ক'রতে অক্ষম ছিল বলে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারেনি। তা যদি পারত তবে আর কোন অঘটনই ঘটত না। কাজেই আপন অক্ষমতার লজ্জাতেই সংকুচিত থেকেছে সে। সমস্ত দুর্ঘটনার জন্যে পরোক্ষে নিজেকেই দোষী মনে ক'রে রেখেছে।

কিন্তু সে তো চেষ্টা ক'রেছিল। চেয়েছিল সরমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ক'রতে। প্রতিষ্ঠা দিতে না পারলেও অমর্যাদা তো করেনি! তার চেয়ে বড় কথা সরমাও তো এ জীবন মেনে নিয়েছে, যা ঘটেছে তার সঙ্গে দিলুর কোনই প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না, পরোক্ষ ভাবেও নয়, জীবন রক্ষা ক'রতে সে চেয়েছে রক্ষাও তো পেয়েছে সরমা। তার নিশ্চিত মৃত্যু অথবা জীবনের চরম হেনস্তা তো হয়নি! সে জন্যে কি সামান্য কৃতজ্ঞতাও দিলুর প্রাপ্য ছিল না? দিলু কি কিছুই আশা ক'রতে পারে না? সামান্য একটু অনুরাগ, প্রীতি, প্রেম? না কি সমস্ত প্রেমই এখন পয়সার বিনিময়ে বিলোবে সরমা?

কি ব্যাপার দিলুদা, ক'দিন দেখি নি যে!—সোদামিনী সাগ্রহে সম্বোধন ক'রল দিলুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে।

মেয়েটিকে ভাল লাগে দিলুর, দেখলেই প্রসন্নতায় মন ভরে যায়। ওর উদার হাসি, আন্তরিক ব্যবহার মনোরম। কেন যে এই মেয়েরা এখানে আসে! দুঃখ হয় দিলুর। এমন সুন্দর মেয়েদের জন্যে কি এই নরক? সেই সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে গেল দিলু, ক'দিন আসিনি। সময় পাইনি।

দোকান কেমন চলছে?

তোমরা সবাই আছ চলবে না?

সবাই জেনে যাক দেখো খুব চলবে, উৎসাহ দিল সোদামিনী। তারপর বলল, ফেরবার সময় একবার এসো না আমার ঘরে, তোমার কাছে তোমাদের দেশের গল্প শুনব।

দেশের গল্প তো একদিন বলিছি, আর গল্প নেই। এহন তো দেশই নেই। কাগজ পড়ে বুঝি ও দেশের হিন্দুরা তো ঘরবাড়ী ছাড়ে পলায়ে আসতিছে।

সোদামিনী শেষের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো কানে নিল না। পরিমিত ছোট মাপের জীবনে কখনই বড় ভাবনার স্থান থাকে না, অপরের সমস্যার কথাও তাতে আসে না, দেশের সার্বিক ভাবনার জায়গাই হয় না সেখানে। জীবন একান্তভাবেই আত্মকেন্দ্রিক এবং একান্তভাবেই নিজের বেঁচে থাকা সর্বস্ব হয়।

সোদামিনী তার ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে এমন অনেক কিছু জানে কিন্তু কি দেশ, কোথায় কি, স্বাভাবিক ভাবেই সে সব কিছু জানে না। তাই জানে না দিলু এখন কি বলছে, কোন দেশে তার বাড়ী; কি পরিবর্তন সেখানে

হয়েছে কিছু সে বোঝে না। সে বলল, নামবার সময় একবার এসো দিলুদা।

দিলু ঘাড় নাড়ল। সৌদামিনীর ঘরে সে সানন্দেই আসবে, তার ভাল লাগবে বলেই আসবে। নেহাৎ হুট ক'রে আসা যায় না তাই, নইলে সৌদামিনীর ঘরে বসলে শান্তি পাওয়া যায় কারণ মেয়েটা আন্তরিক। যা বলে মন খুলে বলে। একান্ত আপন জনের মত গল্প করে। কি বা কথা থাকবে ওর সঙ্গে, তবু অনেক কথা বলে। দিলু চুপ ক'রে থাকে, ও-ই ছেলেমানুষের মত কথা বলে চলে। যত বলে তার কোনটাই আর পরে মনে থাকে না, ঘরের বাইরে এলেই হারিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়, তবু যখন বলে মনে হয় একটি বালিকা কথা বলছে। সরমা যেমন ছেলেবেলায় বলত। অবশ্য এত কথা সরমা কখনই বলত না, তবু বলত, এখনকার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলত। কি যে বলত কিছু আর মনে নেই, ছেলেবেলাকার কথা কার বা মনে থাকে ? তবে দু-চারটে থেকে যায়। বিস্মৃতির দুস্তর বাধা ভেদ ক'রে দৈবাৎ দু-চারটে এসে উঁকি মারে। যেমন কার কাছে কি শুনে হঠাৎ একদিন বলে বসেছিল, তোমার রাঙা বৌ হবে দিলু।

ধুৎ।

হ্যাঁ দেখো!

মারব এক থাপ্পড়।

আচ্ছা আমাগে বাড়ী আসবে তোমারে সোনাদার রাঙা বৌ দেখাবো নে। আমাগে বাড়ী আসিছে।

তোমার সোনাদার বৌ আ'লো তো আমার কি ?

বা রে! তোমারও তো আসবে।

শৈশবের স্মৃতি সব। অর্থহীন কথামালা।

সৌদামিনীর সঙ্গ পেয়ে সেই স্মৃতি পলকে উঁকি মেরে লুকিয়ে পড়ে। যেন সৌদামিনীর সরলতায় সেই শৈশবই ধরা দিতে চায়। কিন্তু সে নেহাৎই বিদ্যুচ্চমক, স্থায়িত্ব পলক মাত্র। এখন জীবন সেই কিশোরবেলার নায়েলেখোলা নয়, আম জাম কাঁঠালের বনস্পতিছায়া উপবনও নয়, এ হচ্ছে দ্বিপদ-শ্বাপদ শঙ্কুল জন অরণ্য। বৃক্ষহীন এ অরণ্যে সদাক্ষিপ্ত ক'রে রাখে বিপন্নতা। প্রাকৃতিক অরণ্য যেখানে অকৃপণ দানের আয়োজনে আনন্দময় এখানে তখন নিত্য শোষণের ক্রূর আয়োজন প্রতিটি মুহূর্তকে সজাগ ক'রে রাখে। যখন প্রথম এখানে পা রাখে দিলু বুঝত না এখন খুব ভাল ক'রেই বোঝে, বরং বলা চলে অন্য অনেকের চেয়ে, সম্ভবত এখানকার বাসিন্দাদের চেয়ে অনেক সচেতনভাবে বোঝে। আর সকলে তো অবস্থার দাসত্ব করে অথবা পরিবেশের সঙ্গে পরিকীর্ণ, সব কিছু যেমন তারাও তেমনই। পৃথক সত্তা না থাকবার ফলে বিশেষত্ব বোঝে না কারণ পার্থক্য ক'রতে পারে না। তারা ভাল-মন্দে এলাকার সঙ্গে একাকার।

এখানে দিলু আলাদা, সে এসে মিশে আছে বটে মিশে যায় নি। সারাদিন

নিজের ঘরটিই তার পৃথিবীর পরিধি। যদি কখনও বাইরে বেরোয় এবং বাড়ীটার বাইরে তাহ'লে জানতে হবে সে আঠার নম্বরে এসেছে, সরমার ঘরে তা না হ'লে সোদামিনীর ঘরে। ঘরে পেয়ে সোদামিনী তাকে এক মোক্ষম প্রশ্ন ক'রে বসল, আচ্ছা দিলুদা আমার ঘরে তুমি কিছু খাওনা কেন? আমাকে ঘেন্না করো? কোনদিন এক প্লাস জল পর্যন্ত খাওনা, যা দিই নাও না, কেন বলতে পার?

দিলু কি বলবে ভেবে পেল না। বড় দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে সোদামিনী। ঠিক লক্ষ রেখেছে, এখন কারণ জানতে চায়। সোদামিনী সব মানলেও ওর সহৃদয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও ওর কাছে খাওয়ায় বা নেওয়াতে দিলুর আপত্তি আছে। কি কষ্টের পয়সা ওদের। এত কষ্টের জীবনের সর্বস্ব বিনিময় ক'রে যে অর্থার্জন সেই অর্থে ভাগ বসানোতে আপত্তি দিলুর। এ আপত্তি কেবল সোদামিনীর বেলাতেই নয় প্রত্যেকটি মেয়ের জন্যেই। কিন্তু এ কথাটা ওকে কখনই বলা যাবে না। এখন বলবেই বা কি? এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে দিলু? কি বলবে সোদামিনীকে? কোন সান্ত্বনার কথা? মিথ্যে কোন স্তোক বাক্য? আবার একদিন যদি কোন কিছু খায় তাহ'লে তো আর কোনদিনই ছাড়বে না সোদামিনী। অথচ মেয়েটাকে দুঃখ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব তাই সাত-পাঁচ ভেবে বলল, খাওয়াটাই কি এত বড় হ'ল? এই যে তুমি যখনই ডাক আসি বসি তোমার সঙ্গে গল্প ক'রছি এর কি কোন দাম নেই?

সোদামিনী ছাড়বার পাত্রী নয়, সে চেপে ধরল, কেন দিলুদা সরমার কাছে তো খাও।

দিলু হাসল, বলল, জল তো এখনই তেষ্টা পেয়েছে, যদি দাও তো ভাল হয়। ভেবেছিলাম ঘরে ফিরেই খাব তুমি মনে করিয়ে ভাল ক'রলে।

সোদামিনী এটাকে নেহাৎ সৌজন্যমূলক জলপান ধরে নিয়ে বলল, থাক। এক গেলাস জল তুমি বাড়ী গিয়েই খেয়ো। অযথা কষ্ট ক'রে জল খেতে হবে না।

তুমি বুদ্ধিমতী মায়ে বলে জানতাম, এখন দেখতিছি মায়েই। যেমন আমাগে মা-বোন আর সকলে তুমিও তেমনই।

কেন তাদের কি বুদ্ধি নেই?

নিশ্চয়ই আছে; তবে আবেগে সব চাপা পড়ে যায়।

সোদামিনী বুঝল না। দিলুও আগে হ'লে হয়ত এমন ক'রে ভাবতে পারত না, এখানে যখন এসেছিল নেহাৎ আবেগ বশেই চলত, এখানে এই পরিবেশ তার যেন তার নবজন্ম দিয়েছে। নতুন মানুষে উত্তরণ ঘটেছে তার ভেতরে ভেতরে। এখানে সে দৈবাৎ কারও সঙ্গে মেশে, কদাচ কারও সঙ্গে কথা কয় কিন্তু বাহ্যিক শব্দ বন্ধ হবার জন্যে নিজের সঙ্গে তার সমস্ত বাঙ্ময়তা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। ফলে অসচেতন বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন দৃষ্টির উন্মেষ ঘটেছে তার অন্তর্লোকে। নতুন চেতনা তাকে আশ্রয় ক'রছে বলে সে এখন যা দেখে তার ভেতর পর্যন্ত দেখে। তাই অনেক দৃশ্যকে বিশ্লেষণ ক'রতে পারে, বিশ্লেষণ করে বলেই মূল্যায়ণে তারতম্য ঘটে যায়। সোদা-

মিনীর অভিমানকে বুঝে সে তার মধ্যে মমতার সন্ধান পেয়ে সস্নেহে বলে, ভেবেছিলাম তোমার এখানে বসে একটু সময় কাটবে তা তোমার যা হুকুম তাতে তো জল খাবার জন্যেই এখন চলে যেতে হয়।

স্নেহের স্পর্শ পেয়ে সৌদামিনী হ্লাদিনী স্বরে বলল, সত্যিই তোমার জল তেষ্টা পেয়েছে দিলুদা, আমি ভাবলাম আমার মন রাখতে বলছ।

দিলু ঠাট্টা ক'রে বলল, কারও মন রাখার চেষ্টা করা ছেড়ে দিয়েছি। সারা জীবন ধরে মাত্র একজনের মনই যখন রাখতে পারলাম না—বলে সামান্য থেমে শেষ ক'রল, তখন বুঝলাম ও ক্ষমতা আমার নেই।

দিলু কথাটা হালকা ভাবে বললেও তার মধ্যে যে গভীর দুঃখ ছিল সৌদামিনী তা ধরতে পারল। দিলুর কোন কিছুই এ পাড়ার বাসিন্দাদের মত নয়, তবু সে স্বেচ্ছায় এখানে এসে কেন যে আছে সৌদামিনী তা জানত। সে বোঝে, তার বোঝা মিলিয়ে নিয়েছে বলে জানতে পেরেছে। তাই দিলুর কথার ব্যথা তাকে স্পর্শ ক'রল। এই রাজ্যে প্রেম কেউ প্রার্থনা করে না, হয় অর্থ দিয়ে কেনে, নয় জিতে নেয় সামর্থে। এখানে সারারাত হাজার হাজার প্রেম ও প্রণয় লেনদেন হয়, সে সবই কেনা বেচা, আবেদন নিবেদন নয়। আর যে প্রেম দিনে দুপুরে আদান প্রদান হয় তার পেছনে পেশীবলের চোখরাঙানি প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই সৌদামিনী প্রেমবাজারের প্রসারিণী হয়েও দিলুর নীরব নিবেদন দেখে অভিভূত এবং আপ্লুত। এমনটি সে আর কখনও দেখেনি। সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে সে যে উদ্যত প্রশ্ন মুখের মধ্যে আটকে রেখেছিল আজ অকস্মাৎ উদগার ক'রে ফেলল, তুমি এত কষ্ট ক'রে এখানে পড়ে আছ কেন বলতে পার? তোমার মত মানুষ তো এখানে আর একটাও নেই!

এখানকার সবাইরে তুমি চেন? পালটা প্রশ্ন ক'রল দিলু মিত্র।

কি ক'রে চিনব?

তবে কি ক'রে বলতিছ আমার মত আর একজনও নেই?

নেই বলেই বলছি।

কেন করে জানলে? সবাইরে তো তুমি দেখনি!

যা দেখেছি তার মধ্যে নেই।

তা হ'তি পারে। তুমি আর কতটুকু দেহিছো?

সৌদামিনী কথা থেকে সরে গেল, কষ্ট ছাড়া তুমি কি পেয়েছ?

কিসির কষ্ট? কোথায় কষ্ট?

এই যে একা একটা ঘরে পড়ে থাক—হাত পুড়িয়ে রান্না ক'রে খাও—

দিলু সামান্য হাসল, ম্লান সেই হাসি তার বেদনাকেই যেন বুঝিয়ে দিল। সেই সঙ্গেই সে বলল, হাত তো এহনও কোনদিন পোড়ে নি!

সৌদামিনী আর কথার কুট কচালিতে যেতে চাইল না বলে চুপ ক'রে রইল।

দিল্ হালকা ক'রে দিতে চাইলেও সৌদামিনী হালকা ভাবে মেনে নিতে পারল না, রান্না বান্না ক'রতে তার নিজেরই ভাল লাগেনা কেমন আলস্য আসে বলে প্রায় দিনই হোটেল থেকে ভাত এনে পেট ভরানোর কাজ শেষ করে সে। দৈবাৎ কোনদিন রান্না করে, নিজে যতটা করে তার অনেক বেশি মাসি ক'রে দেয়, রান্নার আড়ম্বরটা সে-ই করে। সে মেয়েমানুষ হয়েই যদি রান্না ক'রতে না পারে তো একজন পুরুষ সে কাজ নিত্য কেমন ক'রে পারবে! সৌদামিনীর আশ্চর্য লাগে সরমা কেমন মেয়ে! যে মানুষটা তার জন্যে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এসে এই নরককুণ্ডে পড়ে থাকল তাকে একটু মায়াও কি ক'রতে নেই! সরমাই তো নিজের সঙ্গে ওনার রান্নাটাও স্বচ্ছন্দে ক'রতে পারত। জোর ক'রে ব'লতে পারত, তুমি একা ওসব ক'রবে না আমরা একসঙ্গেই খাওয়া দাওয়া ক'রব। তাহ'লে তো মানুষটার এমন হ্যাপা হয় না।

এ বাড়ীর বাসিন্দাদের মধ্যে সৌদামিনীর সঙ্গেই সরমার ভালবাসা বেশি। ভালমন্দ সব রকম কথাই তাই সরমা সৌদামিনীকে বলে, দুজনেই বলে দুজনকে। তাই সৌদামিনী একদিন দিলুর কথা তুলেছিল, হ্যাঁ রে সরমা তুই তো দিলুদাকে সঙ্গে রাখলে পারিস? ও তো তোর জন্যেই সব ছেড়ে ছুড়ে এখানে পড়ে আছে!

সরমা কম কথা বললেও অনেক কথারই উত্তর দেয় কিন্তু এই কথার দেয় নি, মুখে কুলুপ এঁটে থেকেছে। সৌদামিনী কিছু একটা কথার অপেক্ষায় বেশ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকেও কিছু বুঝতে পারল না। অবশেষে হতাশ হয়ে বলল, কিছু তো বলবি?

কি বলব?

দিলুদাকে দেখে তোর কি কখনও মায়া হয় না?

আমার মত মানুষের মায়ার কি দাম?

বাঃ বেশ কথা বলিস তো!

সরমা প্রত্যুত্তর ক'রল না। আবার সে নিজের মধ্যে সমস্ত শব্দ গুটিয়ে নিল। সৌদামিনী বিরক্ত হ'ল। এ মেয়েটা কী? এখানকার কত মেয়ে টাকা রোজগার ক'রে দেশে বাপ মা ভাই-এর সংসার চালায়—সে সব তো কিছু নয় একজন মানুষ ঘর সংসার ছেড়ে এসে কি বাজে অবস্থার মধ্যে ওরই জন্যে পড়ে রইল তা দেখেও কি ওর মমতা হয় না! এই মেয়ের জন্যে কারও কোনই দয়ামায়া করা উচিত নয়—সে সিদ্ধান্ত ক'রল। স্থির ক'রল ওর সঙ্গে আর কোন রকম সম্পর্কই রাখবে না।

ক'দিন ধরে পদ্মরাণীর জ্বর। খগেন ডাক্তার রোজই ওষুধ দিচ্ছে। সত্যবালা এসে দিলুকে বলল, তোমাকে মাসি একবার ডাকছে।

পদ্মরাণী ডাকছে শুনে দিলু খুবই খুশি হ'ল, বলল, তুমি দোকানে একটু বসো আমি শুনে আসি।

না বাপ্‌, জ্বরের কোপে কাঁপছে। আমি এখানে থাকলে চলবে না।

দিলু বুঝল ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই দোকানের দরজা বন্ধ ক'রেই বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ল। পদ্মরাণীর ঘরে ঢুকে দেখল সত্যবালা তার আগেই এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, পদ্ম চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। সে ঘরে পা দিতেই সত্যবালা জানাল, দিলুবাবু এসেছে গো।

দিলু দেখল বেশ কষ্ট ক'রে পদ্মরাণী চোখ মেললেন, ক্লান্ত স্বরে বললেন, এসেছ ? তোমাকে বাবা কষ্ট ক'রে একবার শোভাবাজার যেতে হবে। পারবে ?

কেন পারব না ?

আজ ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন এডওয়ার্ডের টনিক ছাড়া নাকি এ জ্বর ছাড়বে না। তুমি বাবা বটকেষ্ট পালের দোকানে গিয়ে এক শিশি আনতে পারবে ?

এখনই যাচ্ছি।

তাহ'লে দুটো টাকা নিয়ে যাও, কত দাম তো জানিনে—।

সত্যমাসি ডাক্তারবাবুর কাছে গিছিলে ? আমারে ক'লে না কেন ?

সত্যবালা মাথার বালিশের তলা থেকে দুটো টাকা বের ক'রে দিতে আর দাঁড়াল না দিলু। আজ ক'দিন ধরে মানুষটা জ্বরে ভুগছে সে নিজে থেকে যতটুকু যা খোঁজখবর নিয়েছে, তাকে ডেকে রোগের ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া এই প্রথম। দিলু এতে খুবই আনন্দ পেল। এই মহিলার কাছে তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। ঘরটি তাকে দেবার আগে ভাড়ার ব্যাপারে যতই কড়াকড়ি করে থাকুন আজ পর্যন্ত ভাড়া এক পয়সাও নেন নি। প্রথম মাসের ভাড়া দিতে গেলে বলেছিলেন, থাক ক'দিন বাদে নেব।—ক'দিন বাদে আবার দিলু গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ভাড়া দিতি আসলাম।

খাটের ওপর বসে কি যেন একটা বই পড়ছিলেন পদ্মরাণী, চোখের চশমা নামিয়ে দিলুর দিকে চাইলেন, কয়েক সেকেণ্ড বাদে বললেন, আমি তোমাকে কি বলেছিলাম ?

দিলু মনে মনে শংকিত হ'ল সে তো জানে না। কি যে বলেছিলেন কি ব্যাপারে বলেছিলেন কিছু তার মনে পড়ছে না। ও চুপ ক'রে আছে দেখে বললেন, ভাড়া যখন নেবার হবে চেয়ে নেব। লণ্ড্রী তো খুলেছ আলমারী কিনতে হবে না ? আগে আলমারী কেন। তোমার লণ্ড্রী চলুক ভাড়া আমিই চেয়ে নেব।

সবই হয়েছে। আঠাশ টাকা দিয়ে দর্জিপাড়ার একটা মিস্ত্রির কাছ থেকে একটা কাঁচের ঠেলা পাল্লাওয়ালা আলমারীও করিয়ে নিয়েছে দোকানে। তাতেই এখন কাচানো কাপড় সারি সারি ভাঁজ করা থাকে। উল্টোডাঙ্গা থেকে ধোপা এসে নিয়মিত ময়লা কাপড় নিয়ে গিয়ে কেচে শুকিয়ে ফেরৎ দিয়ে যায়। এ পাড়ার অনেকেই এখন কাপড় পেঁছে দেয় তবে মাঝে মাঝে বড়ই নোংরা কাপড় এসে পড়ে, সে সব না জানতে হাতে পড়লে বড় ঘেন্না লাগে। আগে নজর পড়লে এসব কাপড়ের জন্যে বেশি পয়সা ধার্য করে দিলু, আলাদা ক'রে পরিষ্কার ক'রতে হবে। অনেক

বাড়ীর ঝি এমনভাবে ভাঁজ ক'রে এনে দেয় যে চট ক'রে বোঝা যায় না। এই জন্যে আজকাল দিলু কাপড়ে হাত দেয় না যে কাচতে দিতে আসে তাকেই বলে গাদায় ফেলে দিতে, তবে কাপড়ের কোনায় কালির মার্কা বসাবার সময় হাত দিতেই হয়। দোকানের মার্কা না লাগালে ধোপার কাছে গিয়ে গুলিয়ে যায়, হিসেব থাকেনা।

অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট আর মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে এমদাদ আলি ওস্তাগরের দোকান। জামাকাপড় করানোর প্রয়োজনে সেখানেই যেতে হয় সবাইকে, অনেককেই। অনেকে আবার মাস্টার টেলার হারুণ-এর কাছেও ক'রতে দেয়। বিশেষ ক'রে মেয়েরা যে যার কাছে হয় তারই কাছে ব্লাউজ বা সায়া সেমিজ সেলাই ক'রতে দেয়। তবে তাদের বেশি যেতে হয় না, গফুর রমজান তারাই সব বাড়ী বাড়ী ঘুরে যার যা দরকার পেঁছে দেয়, তবে তারা সব এখানেই তৈরী করিয়ে নেয়। এর মধ্যে এমদাদ ওস্তাগর দরদাম ঠিক নেয় বলে তার খদ্দেরই বেশি। বেশ একটু দূরে হলেও এমদাদ ওস্তাগরের কাছেই নিজের একটা হাফসার্ট ক'রতে দিয়েছিল দিলু মিত্তির। সেই সুবাদে একদিন তার দোকানে গিয়েছিল। আজ জামাটা নিতে এসে শুনল এমদাদ নিজে তার কারিগর ওসমানকে বলছে, আর কারও বরাত নেবে না। যার যা আছে সব খালাস ক'রে দাও। একটা কিছু যেন না থাকে।

কথাটা কানে যেতে দিলু বেশ অবাক আর কৌতূহলী হল, ওসমানকেই জিজ্ঞাসা ক'রল, কেন গো ওসমান ভাই, নতুন বরাত নেবে না কেন?

ওসমান একটা সূক্ষ্ম সুতোর কাজ ক'রছিল, সুতো ফুঁড়তে ফুঁড়তেই বলল, মালিকের মর্জি।

দিলুর মন খুঁত খুঁত ক'রতে লাগল, এমন একটা সহজ ও সংক্ষিপ্ত জবাবে তার মন মানল না। নিজের সস্তা ছিটের হাফ সার্টটা যখন নিচ্ছে কারিগর বলল, সায়েব আপনাকে ডাকছে।

দিলু পকেট থেকে টাকা বের ক'রে হাতে নিয়েই দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়ল। বিশাল দাড়ির বেশ কিছু অংশ পাকা, মাথায় টুপি দোহারা চেহারার মানুষটা আহবান জানাল—আসুন গো ভাই। বসুন।

সামনেই পাটির ওপর বসতে বলে নিজেও বসল এমদাদ ওস্তাগর। তারপর সরাসরি বলল, শুনেছি আপনার বাড়ী নাকি পাকিস্থান?

পাকিস্থান তো ছেল না শোনলাম পাকিস্থান হলো।

তা আপনাদের ঘর বাড়ী তো আছে; শহরে না গ্রামে?

আমাগে বাড়ী গেরামি।

কোন জেলা?

যশোর।

যশোর তো খুব ভাল জায়গা? কলকাতা থেকে তো কাছেই?

খুব ভাল।—অনেকদিন পর দেশের কথা উঠল বলে দিলু হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল, তাতে আবার অপরের মুখে বলে কথা—। নিজের আত্মীয়স্বজনের কথা হ'লে না হয় চুপ ক'রে যেত, বাড়ীর কথা, স্বজনদের কথা ওঠবার ভয় থাকত এখন তো তা হবার নয়। এমদাদই বলল, যশোরের একজন মানুষ, অবশ্যই যশোর সহরের সম্পত্তি বিনিময় ক'রতে চাচ্ছে।

দিলু ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। বিনিময় তো বুঝল সম্পত্তি বিনিময় ব্যাপারটা কি তার মাথায় এল না, সে চুপ ক'রে রইল। এমদাদও আর কোন কথা না বলে চুপ ক'রে গেল, এ লোকটাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তার কাছে যা খবর তাতে এ একজন চালচুলোহীন মানুষ এখানে এসে টিকে আছে যেমন অনেক অপোগণ্ড থাকে। যদিও ছেলে সিরাজ গিয়ে সব দেখে এসেছে এবং খবরাখবরও ভালই পেয়েছে তবু একবার পাঁচজনের কাছে জানতে পারলে মনটা একটু বেশি খুশি হয় আর কি। তিন পুরুষের দোকান বিক্রি ক'রে বাপ ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে নতুন বসতি ক'রতে যাওয়া—লাভ লোকসান বিবেচনা একটু ভাল ক'রেই ক'রতে হয় বৈকি! তবে যশোর শহরে যদু বিশ্বাসের সম্পত্তি দেখে আসবার পর সিরাজ তো একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বদল করবাব জন্যে। সিরাজ ছেলে হিসেবে যথেষ্ট হুঁশিয়ার, আর ছেলেদের চেয়েও বটে ; এ যদি মোক্তান বা আলমগীর হ'ত এতটা নির্ভর ক'রতে পারত না এমদাদ, সিরাজ বলেই ক'রেছে। তবু মনটা খচখচ ক'রছিল, রাণাঘাটের ঘরবাড়ী আর জমিটুকুর জন্যে নয়, সবই এই দোকানটির জন্যে। কালু ওস্তাগরের আশি পঁচাশী বছরের পুরানো দোকান এটা, গোটা সোনাগাজী এলাকার একমাত্র দরজির দোকান ছিল, হাইকোর্টের উকিল বাবুরা পর্যন্ত জামা প্যাণ্ট ক'রতে দিত এমদাদ ছেলেবেলাতে দেখেছে ; আসলে তখন বুঝত না যে বাবুরা সব পোষাক শেলাই করাবার ছলছুতো ক'রে মেয়েছেলেদের বাড়ী আসে। বাবা বলত, এমদাদ, মাপ লেখ, বত্রিশ ছত্রিশ, বাইশ—কিশোর এমদাদ খাতার পাতার ওপর নামটা লিখে নিয়মিত লিখে চলত ছাতি, ঝুল, গলার মাপ—মানব উকিলবাবুর জামা হবে।

বাবা আরসাদ ওস্তাগরের দশম সন্তান সে, এমদাদ ওস্তাগর। আজ আড়াই-কুড়ি বয়েস হ'ল, এই বয়সে আর ভিটে বদলের ইচ্ছে ছিল না ছেলেরাই ক'জনে ধরপাকড় ক'রছে; পাকিস্তান হয়েছে, সে নাকি সাক্ষাৎ বেহেস্ত। ছ নম্বর ছেলেটা হবার আগে বেগম কি খোয়াব দেখেছিল, গাঁয়ের মৌলবীর কাছে সিরিনকে পাঠিয়ে পরামর্শ নিয়ে নাম রেখেছে হামিদ-উল-হক। এমদাদ সে শব্দের মানে বোঝে না, এক সেই মৌলবী ছাড়া গাঁয়ের কেউ বোঝে না, তা না বুঝুক ছেলেটা কিন্তু সত্যিই এলেমদার হয়েছে, ইস্কুলের পড়ায় পাশ দিয়ে কলকাতায় এসে রিপন কলেজে ভর্তি হয়েছে, সে দেখে এসে বলেছে আব্বা চল পাকিস্তানেই যাই। সেখান থেকে রোজ রেলগাড়ী ভর্তি হয়ে হিন্দুরা সব চলে আসছে শিয়ালদহর স্টেশন ভর্তি, আমাদের

সঙ্গে পড়ে সাবির বলছিল তার আব্বা পুলিশে কাজ করে সবাই পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। ওর আব্বার ট্রান্সফার হয়ে গেছে। ওর আব্বা বলেছে হিন্দুরা সব চলে এলে আমরাও এখানে থাকতে পারব না। সেখানে আগে গেলে ভাল জায়গা জমিন পাওয়া যাবে।

এমদাদের সিদ্ধান্ত পাকা করবার পেছনে সেই এলেমদার ছেলেরও একটা ভূমিকা আছে। তবু শিকড়ের টান বলে কথা; সব ব্যবস্থা পাকা হবার পরও দু-পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা ক'রতে ইচ্ছা হয়, সে দেশটা কেমন? আজকালকার ছেলেরা সব কেমন যেন—মায়া-মমতা বলে কিছু নেই। কি ক'রে থাকবে? এমদাদ-এর মত শিশু বয়স থেকে ছুঁচে সুতো পরায়নি তো এই বাপ দাদার দোকানের পাটির ওপর বসে! ওরা সব ছেলেবেলাতে ইস্কুল কলেজে পড়ে বেরিয়েছে—দোকানের ওপর মায়া হবে কি ক'রে? এমদাদের এতখানি বয়সের প্রতিটি ঘণ্টা এই দোকানের সঙ্গে যুক্ত। এখানে খেয়েছে, শুয়েছে, স্বপ্ন দেখেছে। নিজের জন্যে সরাসরি না ভাবলেও মনের গভীরে অবচেতন অবস্থায় এমনই একটা বাসনা ছিল বলেই কদাচিৎ নিজের বাড়ীতে খেতে শুতে যায় এমদাদ, দোকানেই ভাত আসে সেখানেই বসে খায়, রাত্রের ঘুম, সে-ও সেই দোকানের লম্বা ঘরের পেছনে আলাদা করে রাখা দাদুর আমলের ব্যবস্থায়।

তবু যাবে। যেতে হবে। কেন যেতে হবে এমদাদ বোঝে না, তবে একেবারেই যে বোঝে না এমন নয় সে বোঝে ছেলেরা উচ্চাভিলাষী। মনে করে তাদের জন্যে বেহেস্ত রচনা হয়েছে পৌঁছাতে পারলেই সুখ, ঐশ্বর্য সম্পদ। তারা কেউ ওস্তাগর হতে চায় না, কালু ওস্তাগর আরসাদ ওস্তাগর এমদাদ ওস্তাগরের উত্তরাধিকার নয় অন্য পরিচয়ে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তাদের—বিশেষ ক'রে সেই জোর বরাত ছেলের যার নাম হামিদ-উল-হক। বাকি ভাইদের সে উদ্বুদ্ধ ক'রেছে নতুন স্বপ্নে। সকলকেই আশা জুগিয়েছে সেখানে গেলে সবাই বাদশার মত দিন কাটাতে পারবে। বাপকে আতংকিত ক'রতে চেষ্টা করেছে ওপারের হিন্দুরা যেভাবে বন্যার তোড়ে আসছে এপারে মুসলমানরা তাতে ভেসে যাবে। প্রত্যেকদিন সকালে বাংলা সংবাদ পত্র একখানা দোকানে বহুকাল ধরেই রাখা হয়, সেটা এসে পৌঁছানো মাত্র দোকানের সামনের দিকে মেলে বসা এমদাদের বহুকালের অভ্যাস। আজকাল বীভৎস ছবি ছেপে কাগজগুলো সত্যিই খবর লিখছে বটে, হাজারে হাজারে হিন্দু নর-নারী শিশু কাতারে কাতারে এসে দুঃসহ দুর্গতির মধ্যে আছড়ে পড়ছে স্টেশনে পথে প্রান্তরে। সত্যিই শেষ পর্যন্ত কোন একটা অঘটন না ঘটে যায়।

দিলু ওসবের কিছু বোঝে না, দেশ ভাগ নয়, উদ্বাস্তু স্রোত নয়, কিছু নয়। সে পৃথিবীকে মুছে দিয়ে এখানে আছে, এই গণ্ডির মধ্যে গণ্ডি দেওয়া অন্তর্লীন জগতে। সে সব ভুলে গেছে; অতীত ভুলেছে, ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে তাও ভুলেছে। তার কেবল আছে বর্তমান, তবে তা নিয়েও কোন চিন্তা নেই, কল্পনা

নেই, পরিকল্পনার প্রশ্নই ওঠে না। যখন এসেছিল তখন আবেগ ছিল, কিছু আশাও হয়ত ছিল—সবই চাপা ছিল। এতই চাপা ছিল যে সে নিজেও কোনদিন সেগুলোর মুখ দেখেনি। সসীম বাসনার কোটরে আবন্ধ থাকতে থাকতে সেই আশা নামের ছোট্ট পাখি কবে যে একদিন মরে শুকিয়ে গেছে কেউ খবর পায়নি, এখন যদি সেই কোটরের বন্ধ মুখ খোলা যায় দেখা যাবে একটি ক্ষীণতনু কঙ্কাল। তা নিয়ে দিলুর কোনই মাথা ব্যথা নেই।

সৌদামিনীর মনটা মায়ায় ভরা বলে সে-ই মাঝে মাঝে কেবল নিভন্ত প্রদীপের সলতে উস্‌কে দিতে চায়, আচ্ছা দিলুদা, তোমার কি কোন ইচ্ছা নেই?

ইচ্ছা! অবাক হয়ে দিলু সৌদামিনীর মুখের দিকে তাকায়। নির্বাক ভাবতে চেষ্টা করে, ইচ্ছা কি? কোন বস্তুর নাম ইচ্ছা? কোনদিন তেমন কোন কিছু তার ছিল কি? সারা মন হাতড়ে দিলু কোন হদিশ পায় না। এই শব্দটার সঙ্গে যে তার কোন পরিচয় আছে এমনটাই মনে ক'রতে পারে না। নিঃশব্দ দিলুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে অতিষ্ঠ সৌদামিনী বলে ওঠে, তুমি কি বল তো দিলুদা? লণ্ড্রীটাকে ভাল ক'রে সাজাও না কেন?

টাকা কোথায় পাব যে দোকান সাজাব?

কত টাকা লাগবে?

হাজার টাকা তো বটেই। আমার কাছে বলে কুড়িটা টাকাই নেই!

সৌদামিনী সামান্য হেসে ঠাট্টা করে, ঊনিশ টাকা আছে তো?

তাই বা কোথায় পাব?

এই যে বললে কুড়ি টাকা নেই, তার মানেই তো কুড়ির চেয়ে কম আছে। কুড়ির কম তো ঊনিশ।

মেয়েটির ছেলেমানুষী বড় ভাল লাগে দিলুর। আন্তরিকতার উত্তরে আবেগে আপ্লুত হয়ে সস্নেহে বলল, তুই বড় পাগলী রে!

এই আপন ক'রে 'তুই' সম্বোধন করাতে সৌদামিনীর হৃদয় রৌদ্রের ছোঁয়া লাগা বরফের মত গলতে লাগল। এমন ক'রে কেউ কোনদিন সম্বোধন করেনি তাকে, সৌদামিনী অকস্মাৎ অগ্রজ সহোদরের সন্ধান পেল। বহুদিন বাদে যেন দেখা হ'ল সেই আনন্দে বলল, সত্যি তুমি যে কি আমি বুঝি না। তুমি তোমার এই বোনটাকে তো কোনদিন একথা বলতে পারতে। আচ্ছা ধর আমি যদি এই টাকা তোমাকে দিই, তুমি দোকান চালাতে পারবে?

দিলু বিস্ময়ে কথা হারিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল।

সৌদামিনীই গলা খাটো ক'রে বলল, আমার কাছে একজন অনেক টাকা রেখে গেছে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ক'রে নিয়ে যায়। তুমি তার থেকে তোমার যা লাগবে নিয়ে যাও।

এবার দিলু ভয় পেল, পরের টাকা। কে রাখল?

লাখন। কোথাও ডাকাতি ক'রেছে। তুমি তো আবার ফেরৎ দিয়ে দেবে।

না রে! তাড়াতাড়ি ফেরৎ দিতে পারব না।

বেশ দেরিতেই দিয়ো। অনেক টাকার মধ্যে এইটুকু আমি লাখনকে বলে দেব ও পরে নেবে।

না বলে নিবি না কিন্তু, বলে দিলাম, আমি তাহ'লে নেব না।

লাখন ভকত বলা মাত্র রাজি হয়ে গেল। আকণ্ঠ মদ্যপান ক'রে বুঁদ ছিল লাখন, দরিয়া মেজাজে বলে দিল, আরে দিলকা পেয়ারা রুপেয়া কোন পুছতা হ্যায়? দে দো তুমহারা ভাই-কো। জিতনা চাহো দে দো।

না, আমি হাজার টাকা দেব।

দে দেও।—লাখন-এর তখন রাজার মেজাজ। তার দিল কি রাণীর জন্যে অদেয় কিছুই নেই। বড় মাপের ডাকাতির সিংহভাগই সে তুলে আনতে পেরেছে। এখন বেশ কিছুদিন খেয়ে স্ফূর্তি ক'রেও ফুরোবে না। কাজেই কিসের ভাবনা?

সৌদামিনীর আশা এতগুলো টাকা সামলাবার দায়িত্ব যখন তাকে দিয়েছে সামান্য একটা অংশ ওকে লাখন দেবে না তা কি হয়? দিলুকে দেওয়া হাজারই যদি মজুরী হয় তো ক্ষতি কি? নিজের অংশটাই না হয় দিলুকে দিয়ে দেবে সে। তাহ'লে তো আর লাখনের কিছু বলবার থাকবে না!

সবই ঠিক ঠাক ছিল লাখন বেশ কিছুদিন নিস্পৃহ রইল। সাধারণ দেশী সুরায় যার তৃষ্ণা মিটত তার জন্যে লালমণি দাস-এর দোকান থেকে খাঁটি বিলিতি মানে স্কচ হুইস্কি আসতে লাগল। নির্মলা দুবেলা দুবোতল হুইস্কি নয়ত র‍্যাম জোগান দিতে লাগল সেই সঙ্গে চরণ এর দোকানের কাটলেট, আলতাসের হোটেল থেকে দোপেঁয়াজী, কোর্মা বিরিয়ানী—যেদিন বাদশার যা খুশি। লাখনের মনে এমনই ভাব উঠল যেন সে কুবেরের ভাণ্ডার পেয়ে গেছে যা কোনদিন ফুরোবে না। ঘরের মধ্যেই তার দিন রাত কেটে যেতে লাগল আর সৌদামিনীর সমস্যা হ'ল তার বন্দিত্ব। ঘরের বাইরে স্নান ক'রতে বেরোলেই 'মেরে জান' 'মেরে জান' ক'রে লাখন অস্থির ক'রে তুলতে লাগল তাকে।

ব্যবসায় খদ্দের লক্ষ্মীর মাধ্যম। তাই যে ব্যবসায় প্রচুর প্রতিযোগিতা সেখানে ক্রেতার ব্যবহার সহ্য ক'রতেই হয় বলে সৌদামিনী প্রতিবাদ ক'রতে পারে না। তবে সে জানে দিন মাত্র জ্বালাবে লাখন, কয়েকটা দিনই এমন অস্বাভাবিক থাকবে, সময় অসময় কিছুই মানবে না সঙ্গ চাইবে সৌদামিনীর। তারপর অবসাদ আসবে হয়ত কিছুদিনের জন্যে খোঁজই পাওয়া যাবে না। আবার হঠাৎই একদিন ধূমকেতুর মত উদয় হবে, আবার এই রকমই চলবে একটানা কয়েকটা দিন।

এরই মধ্যে গরাণহাটার দুর্গা একদিন এসে হাজির, কি দোস্ত, শুনলাম তুমি এখানেই আছ। তাই দেখা ক'রতে এলাম।

দুর্গাকে দেখে লাখনও খুব খুশি। দুর্গা সিং-এর বাবা নন্দলাল গরাণহাটার

একটা বাড়ী অল্প টাকায় কিনে অনেকদিন ধরে বাস ক'রছে সেই বাড়ীরই নকুল দাসের মেয়েকে বিয়ে করে। সে অনেক দীর্ঘ ইতিহাস।

দুর্গা সেই নন্দলাল মাহাতোর সন্তান। থেকে সিং। মাহাতো সিংকে বলতে বাধা দিচ্ছে কোন শালা। আর একবার চালু হয়ে গেলে এই বিপুলাকার শহরে আর কে খুঁজতে যাচ্ছে বিহারের কড়োয়া গ্রাম থেকে বানারসী দাগার বাড়ীতে বাসন মাজতে আসা বষ্বন মাহাতোর নাতি, নন্দলাল মাহাতোর দো আঁশলা ছেলে দুর্গা 'সিং' হয়েছে। এখানে যে যা সে তাই। শিকড়ে কারোর বিশেষ টান পড়ে না তেমন প্রয়োজন না হ'লে। কচুরীপানার জীবনে আবার শিকড়ের টান। বাপ নন্দলাল মাতাল নকুলের মেয়ে প্রতিমা দাসকে সঙ্গিনী ক'রে নিয়েছিল, ছেলে দুর্গা লাইন না পেয়ে সোনাগাছিতে বার কয়েক সঙ্গিনী বদল ক'রে এরই মধ্যে বেশ নামী আদমী, এই চব্বিশেই। মালখান সিং-এর জুয়ার বোর্ডের সে একজন হিস্যাদার, গরাণহাটা থেকে এলেন বাজার পর্যন্ত ওর হুকমৎ চলে। তবে হ্যাঁ বাপের মতই ধূর্ত দুর্গা। সে কখনও নিজের ক্ষমতাকে বড় ক'রে দেখে না, দেখায়ও না। এলাকার বড় বড় ওস্তাদদের নিচেই থাকে, মাঝে মাঝেই তাদের ডেরায় গিয়ে, গোড় লাগতানি ওস্তাদ! কা খবর বা? হমনিকে ভি বোলিহে কুছ—বলে বশ্যতা দেখিয়ে আসে। সে কখনও শত্রু তৈরী করে না, শত্রু রেখে চলে না। কোন কারণে কেউ শত্রু হয়ে গেলে আগে তাকে ঠাণ্ডা করে, পরে অন্য কাজ। ওর একমাত্র ধ্যান টাকা। যেখান থেকে যেভাবে হোক টাকা তার চাই।

টাকার গন্ধ পেয়েই তার লাখনের কাছে আসা। ওর কাছে খবর আছে লাখন বড় বাজি মেরেছে। তার একটা প্রমাণও আছে বড় দাঁও না মারলে এতদিন ডুব দিয়ে থাকবার পাত্র লাখন নয়। টাকা ছাড়া তার চলবে কি ক'রে? বিলিতি মাল আর ভাল খানা তার রোজ প্রয়োজন, কে তা জোগাবে? মেয়েরা তো কেবল তার মুখ দেখে রাতে শুতে নেবে না। নিজের ঘর-সংসার বলতে তো তার কোথাও কিছু নেই। আজ এখানে কাল সেখানে রাত কাটে। দিনগুলো পথে বা শুঁড়িয়াখানাতেই পার হয়ে যায়। জীবনে দীর্ঘদিন এক ঘরে বাস ক'রেছে সে একবারই, জেলখানায়। এক হারামী পুলিশ অফিসার কি কি সব কেস দিয়ে বছর দেড়েকের মত ঢুকিয়ে দিয়েছিল বলে গৃহী হয়েছিল লাখন। মা বলে কে যেন ছিল এক সময় জোড়াবাগানের মুচিপট্টিতে, বাপ কি তা জানা হয় নি। ছেলেবেলাটা কি ভাবে কেটেছে মনে পড়ে না, জ্ঞানের পর থেকে বাঁধা ঘরের মধ্যে তো কোন দিনই নয়। এখন যা প্রয়োজন টাকার বিনিময়েই পেতে হয়। খাদ্য, আশ্রয়, প্রেম—সব কিছু। তাই টাকার জন্যে সে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

এই ক'দিনেই বড় বিরক্তি ধরে গেছে লাখনের, একঘেয়েমি তার ভেতরটা যে অস্থির ক'রে তুলেছে সে আরও স্পষ্ট হ'ল দুর্গাকে দেখে। বাইরে যাবার তো কোন উপায়ই নেই, নিশ্চয়ই পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে; যদি ইতিমধ্যে কোনভাবে তার নাম পেয়ে

গিয়ে থাকে তাহ'লে তো আর কথাই নেই, সেটা একমাত্র হ'তে পারে কল্পনাথ ধরা পড়ে থাকলে। কে জানে কল্পনাথ ধরা পড়ে গেছে কিনা, কারণ এই অপারেশনটার কথা সে-ই একমাত্র জানে। জানে বলেই তাকে দশ হাজার টাকা দেবার চুক্তি ক'রে এসেছে লাখন। কল্পনাথের ধরা পড়া অসম্ভব, সে তো কোনভাবেই এ ঘটনায় জড়িত নয়! দোতলার সঙ্গে কল্পনাথের কোন যোগই নেই, তিনতলার একটা গদিতে তার কাজ—কিন্তু বড় কাজের লোক, যেন চিলের নজর। যদি তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্যেও নিয়ে যায় সে বলবে না কারণ বললে লাখন ধরা পড়ে যাবে, তাহ'লে তো আর টাকা পাবার সম্ভাবনা থাকবে না। আগাম এক পয়সাও লাখন তাকে দেয় নি। নেহাৎ সাবধানতার জন্যেই এই আত্মগোপন, এর যে আবার এত যন্ত্রণা কে জানত! দশ হাজার টাকা মানে কল্পনাথের জীবন বদলে যাবে, দেশে বাড়ী বানিয়েও টাকা থেকে যাবে। কল্পনাথ তাকে বাঁচাতেই চেষ্টা ক'রবে। কিন্তু কল্পনাথের খবরটা একবার নেওয়া প্রয়োজন, পাঠাবে নাকি দুর্গাকে? কি বলে পাঠাবে? না থাক।

এক লহমায় সব ভেবে নিয়ে দুর্গাকে অভ্যর্থনা ক'রল, আও দোস্ত, আ যাও।

অভ্যর্থনার জবাবে ঠেট হিন্দিতে আগন্তুক বলল, দেখা-ই তো পাই না আজকাল, কোথায় থাক জানতে পারি না যোগীয়ার ডেরাতেও দেখি না।

আরে ইয়ার আমাকে কি দেখবে, তোমার খবর বল?

ব্যাস সব ঠিক আছে। চলছে।

তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।

ভাল যদি লাগছে তবে কুছ ইন্তেজাম তো করো ইয়ার।

এ পেয়ারে, সৌদামিনীকে সম্বোধন ক'রল লাখন, মেরে দোস্তকে লিয়ে কুছ খানা তো মাঙ্গাও।

অনতি বিলম্বে খাবার এল, বোতল বেরোল খাঁটি বিলাইতি। দুর্গার বড় ইচ্ছে সৌদামিনী সঙ্গ দিক, লাখন এড়িয়ে গেল। দুর্গা লাখনের অনিচ্ছা উপেক্ষা ক'রেই সরাসরি আহ্বান জানাল, ক্যা পিয়ারী নেহি পিয়োগে?

লাখন বেগতিক দেখে বলল, আবে ছোড় না! তেরা পিনা হো তো পী লে।

এমন রসে আপত্তি কোন রসিকের থাকতে পারে? অগত্যা সাকীর আশা ছেড়ে সুরাতেই মন দিল বুদ্ধিমান দুর্গা সিং।

ঘর তো মাত্র একটাই, তাই যোগ দেবার ইচ্ছে না থাকলেও সৌদামিনীকে তো ঘরেই থাকতে হ'ল এবং ঘরে থাকতে হ'ল বলেই প্রয়োজন মত খাবারটা, গ্লাসটা সাজিয়েই দিতে হ'ল। কিন্তু দুর্গা আরও যা আশা ক'রছিল এবং আভাসে ইঙ্গিতে চাইছিল লাখনের তাতে একান্তই আপত্তি ছিল। আর এই আপত্তি যে সর্বদা টিকবে না এটা বুঝেই লাখন বেরিয়ে পড়ল।

দুর্গা এলেই তাকে নিয়ে বাইরে মজা জমাতে লাগল। স্ফূর্তি তো হলেই

হ'লে, যেখানেই হোক। সৌদামিনী যে তার বিয়ে করা বৌ নয় বারভোগ্যা সচেতন ভাবে তা জানে বলেই ওর এত সতর্কতা। সৌদামিনীকে তার ভাল লাগে, সে চায় যে ক'দিন ও থাকবে সে শুধু ওরই থাকবে। এ যেন ওর হিম্মতেরও প্রশ্ন। সৌদামিনীর চাহিদা মিটলেই তো হ'ল! সেটা মেটাবার ক্ষমতা যে ওর আছে এটাই প্রমাণ ক'রতে চায় লাখন। ওর কাছ থেকে সৌদামিনী অন্যের হাতে সরে যাবে তা কি হয়? তাতে লাখন-এর বেইজ্জত না! ইজ্জত ব্যাপারটায় ওর নজর খুব তীক্ষ্ণ। ইজ্জত রাখতেই হবে।

লাখনের এই ব্যাপারটা ভাল লাগে না দুর্গার। একটা বারোয়ারী মেয়ে নিয়ে সবাই মিলে স্ফূর্তি ক'রবে তা নয় লাখন এমন ভাবে আগলাচ্ছে যেন ওর বিয়ে করা বউ। ক'দিন চেষ্টা ক'রেও একটু ঘেঁসতে দিল না তাকে শেষে একদম আটকাতে না পেরে ফন্দি ক'রেই বাইরে খানাপিনার ব্যবস্থা ক'রল। তা করুক। পয়সা যখন কাছে আছে করুক কত খরচা ক'রতে পারে, দুর্গাও ওর ট্যাঁক খালি করিয়ে ছাড়বে। মাগীটার ঘরে বসে মালটাল খেলে মৌজ মস্তি ক'রলে ওরই খরচ বাঁচত তা লাখন যখন তা চাইল না তখন কি আর হবে! বৌবাজারে বাদশা খানের হোটেলে বিরিয়ানি আর শাহীকাবাব খেতে খেতে দুর্গার মাথায় একটা মতলব এসে গেল, প্রস্তাব ক'রল, লাখন দোস্ত এক কাম কিয়া যায় আজ—।

কি কাজ ?

চল আজ মাঠে যাই, আজ মহারাজা গোল্ডকাপ আছে ভাল ভাল সব ঘোড়া দৌড়াবে। চল ওহি খেলা দেখে আসি, মজা জমে যাবে।

রেস! শোনামাত্র মনটা চমকে উঠল লাখনের। ভালই প্রস্তাব দিয়েছে দুর্গা, কোনদিন যাওয়া হয়নি, সেখানে গেলে বাজি জেতাও তো যায়। ভাল দাঁও কিছু মারতে পারলে তো আর কথাই নেই, অন্য কোন ঝামেলার কাজ ক'রতেই হবে না। এখন অনেকদিন বসেই মৌজ করা যাবে। এক লহমায় সিদ্ধান্ত ক'রে নিল, চল ইয়ার আমি কিন্তু হাল চাল কিছু জানি না—

আমি তো আছি, চল।

দুর্গার অভয় পেয়েই যাওয়া। সত্যি এ এক আজব জায়গা। কি দারুণ উত্তেজনা! কি যে মজা লাগছে—লাখন আত্মহারা হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো যখন সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটছে আনন্দে উত্তেজনায় লাখনের হৃৎপিণ্ডই যেন ছুটতে লাগল। কত লোক ঘোড়ার দৌড়ের সঙ্গে হৈচৈ ক'রছে—লাখনেরও ইচ্ছা হ'ল ঐরকম হৈ হল্লা করে। সেও লাফিয়ে পড়ে গ্যালারী থেকে। আঃ কি মজা! কত রকম আনন্দ জীবনে পেয়েছে, এমনটি নয়। মনটা যেন নেচে নেচে উঠছে। অচিরে বুঝতে পারল শুধু ঘোড়ার ছুটে চলার বাইরেও উত্তেজনার কারণ আছে, যারা নাচানাচি লাফালাফি ক'রছে কেবল দৌড় দেখার আনন্দেই ক'রছে না, পেছনে আরও কারণ আছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উদ্বাহু লাফাচ্ছে,

মার দিয়া মার দিয়া। —এই রকম স্যুট-বুট পরা লোক যে এমন লাফাঙ্গাদের মত নাচতে পারে না দেখলে বিশ্বাসই ক'রত না লাখন। কি দেখতে! চেহারা যেন রাজপুত্তুর। একজন বয়স্ক লোক হঠাৎ পাশ থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, সোনে কি চিড়িয়া। আ মেরে সোনে কি চিড়িয়া। ঘোড়াগুলো যখন বলয়ের মধ্যে দিয়ে উদ্দাম বেগে ছুটছে লোকটা সেদিকে চেয়ে উত্তেজনায় লাফাতে লাগল, সোনে কি চিড়িয়া, সোনে কি চিড়িয়া।

লাখন তার ঘোড়দৌড়ের গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রল, ক্যা বাত হো? সুড্ডা কাহে চিল্লাওথন?

দুর্গা শেখাল, ওকর ঘোড়ে কা নাম বা। ছুটতন। ওকে বোলাওতন।

লাখন অতগুলোর মধ্যে সোনে কি চিড়িয়াকে খুঁজে পেল না। কিন্তু তারও মনে হ'ল কেবল দৌড় দেখাই যথেষ্ট নয় তারও বাজি লাগানো উচিত। কথাটা বলামাত্রই লুফে নিল দুর্গা। তার যে সব জানা আছে সেটা জানাবার জন্যেই বলল, চল আগের বাজিতে টাকা লাগাই।

সব বাজি শেষ হতে দেখা গেল কোনটায় খুইয়ে কোনটায় পেয়ে লাখনের মোট উদ্বৃত্ত বত্রিশ টাকা। খুব খুশি হয়ে লাখন মাঠ থেকে বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল। বেশ বড় মাপের স্টুডিবেকার ট্যাক্সি গুলো বড় চমৎকার। মাঝে মাঝেই ট্যাক্সিতে চড়ে লাখন, আজ চড়ে অন্য আনন্দ পেল। একদম কিছু না ক'রে স্রেফ আনন্দ ক'রতে ক'রতে এমন টাকা রোজগার হয় একথা সে প্রথম উপলব্ধি ক'রল। তারই আনন্দে মেট্রো সিনেমার পাশের শুঁড়িখানায় যখন নামল তখন তার কিছুমাত্র মনে নেই যে তার কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে। টাকার একটা নোট দিয়ে ফিরে না তাকাতে ড্রাইভার একটা ছোট মাপের সেলামও ক'রে দিল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে দুজনে পানশালার পেটের মধ্যে প্রবেশ ক'রল যেখানে অনবরত বোতলের শব্দ আর আনন্দ গুঞ্জন।

আনন্দের চোটে খাবার কথা ভুলে গিয়েছিল লাখন, দুর্গা মনে করিয়ে দিতে স্থির হ'ল ওটা মদ্যপানের পরেই হবে।

তাই হ'ল। পান ভোজনের পর ঘরে ফিরতে আমদানীর চেয়ে তিনটাকা বেশি খরচ হয়েছে। তা হোক। ও সব দেখার সময় বা মন কিছুই তখন নেই লাখনের। তার তখন বেসামাল অবস্থা। সৌদামিনী কোনক্রমে ধরে শুইয়ে দিতেই গলগল ক'রে বমি ক'রে ফেলল লাখন। তার গলা পর্যন্ত ভর্তি হ'তে ক বোতল পানীয় যে খালি হয়েছে সৌদামিনী তা ভেবে পেল না। প্রচণ্ড বিরক্তি মনে চেপে সে ঘর পরিষ্কারে লেগে পড়ল, রাত তখন এগারটা। সৌদামিনীর মত সহিষ্ণু মেয়েরও চোখ ফেটে জল আসবার উপক্রম হ'ল।

একদিনের জেতাতেই রেসের নেশা তাকে এমন ভাবে পেয়ে বসল যে দ্বিতীয়দিন নিজেই গিয়ে ডেকে নিল দুর্গাকে। লাখনের হঠাৎ টাকার উৎস জানবার জন্যে

দুর্গার ব্যাগ্রতা ওর উৎসাহকে দ্বিগুণ করে দিল। দুর্গা দেখল লাখনের কাছে বেশ ভাল টাকাই আছে। নেশার ঘোরে অনেক সময়ই মানুষের পেটের কথা বেরিয়ে আসে দুর্গার অনেক চেষ্টাতেও যখন তা বেরোল না দুর্গা সে চেষ্টা ছেড়ে ভোগের দিকে মন দিল। রেসের মাঠে যাওয়া তো নিয়মিতই চলছে নতুন রাস্তা দেখাল, চল ইয়ার আমার কাছে টাকা থাকলে মোহর সিং-এর হিম্মৎ-এর হিসাব নিতে পারতাম, তুমি পার তো চল।

হিম্মতে হারবার পাত্র লাখন নয়। তাই তেমন কোন কথা উঠলে বোকাদের নিয়ম অনুসারেই সে লাফিয়ে পড়ে। যে কোনও একটা বিষয় নিয়েই হোক তাকে আহবান জানালেই হ'ল। সেই আহবানেই সে শ্যামবাজারের আড্ডায় গিয়ে জুটল। বিরাট ঘরটার মধ্যে চারটে ভাগে চারদল লোকের খেলা চলছে। দুর্গা সোজা শেষ দলটির কাছে দাঁড়াতেই একজন কেবল মুখ তুলে দেখেই খেলায় মনযোগ দিল। বাকি লোকগুলোর কেউ তাদের গ্রাহ্য ক'রল না। লাখন দেখল সকলেরই একাগ্র নজর তাসের দিকে। এর মধ্যে একজন লোক হঠাৎ উঠে যেতেই দুর্গা বলল, হমলোগ ভি হ্যায় দোস্ত্।

কেউ কথা বলছে না দেখে দুর্গা আবার বলল, মোহর ভাই ইধার ভি থোড়া খেয়াল করো।

খুবই গম্ভীর প্রকৃতির একজন মুখ না তুলেই বলল দেখো না। মানা কিসনে কিয়া?

দেখনা নেহি, খেলনা হ্যায়।

এবারও চোখ তুলল না লোকটি। লাখন দেখল এবং অনুমান ক'রতে চেষ্টা ক'রল বছর চল্লিশ হবে লোকটির বয়স। শক্ত সমর্থ চেহারা। শক্ত চোয়াল বাইরে একে দেখলে মনেই হবে না যে এই লোক এমন শান্ত হয়ে বসে তাস খেলতে পারে। বরং মনে হবে পৃথিবীর কোন কঠিন কাজ সমাধা করবার জন্যে বিশেষভাবে এই লোকটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদের সৃষ্টি হয়। লোকটি তার মোটা ঠোঁট নেড়ে বলল, দু চারটাকার বাজি আমি খেলি না।

কথাটা কানে যেতেই মাথা গরম হয়ে গেল লাখনের। বলে কি লোকটা! কি অহঙ্কারী কথা! লাখনের রাগ চড়ে গেল কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। টাকা কেবল ওর একারই আছে! মনে করে কি! দুর্গা সাংকেতিক ভাষায় কি যে বলল লাখন শুনতে পেল না, তাতেই তাদের খেলার বসতে দিল।

এই হ'ল সূত্রপাত। ক'দিনের মধ্যেই সৌদামিনীর ঘরে রাখা টাকা ফাঁকা হয়ে গেল। লুটের টাকা লাখনও গোণে নি সৌদামিনীও নয় পরের টাকা বলে। সে যেমন পেয়েছিল তেমনই রেখে দিয়েছিল কেবল মাঝে মাঝে লাখন চাওয়া মাত্র কিছু কিছু তুলে দিত তার হাতে। ফুরিয়ে যে যাচ্ছে একথা সে লাখনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল প্রতিবারই, যখন দ্রুত ফুরোতে লাগল সাবধান করবারও চেষ্টা

ক'রেছিল কিন্তু স্ত্রীলোকের কথা কানে তোলবার মত মেনী মানুষ লাখন নয়। সর্বকিছু অগ্রাহ্য করা তার স্বভাব।

কিন্তু মাথা গোলমাল হয়ে গেল সেদিন সৌদামিনী টাকা নেই বলাতে। লাখনের মনে হয়েছিল সে বুঝি কুবেরের সম্পদের অধিকার পেয়েছে। তাই সক্ষোভে বিস্ময়ে জানতে চাইল, টাকা নেই মানে ?

সৌদামিনী সহজভাবেই বলল, নেই মানে ফুরিয়ে গেছে। আমি তো তোমাকে রোজই বলছি। আমার কথা কানে নিচ্ছ ? অমন ক'রে ওড়ালে টাকা ক'দিন থাকে ?

টাকা নেই শুনেই রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল এখন ঐসব বাণী শুনে সে রক্ত মাথায় উঠে গেল। এতদিনের পেয়ারী, মেরে দিল, প্রভৃতি মন রাঙানো শব্দের বদলে নিমেষে হুংকার দিয়ে উঠল, চোপ! শালী রাণ্ডী কি আওলাদ, বেইমান— নিমেষের মধ্যে একরাশ গালি দিয়ে উঠল যার উচ্চারণ সুস্থ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। লাখন সে সব অনর্গল বলে যেতে লাগল। এমন আকস্মিক ঘটনা এসব জীবনে ঘটতেই থাকে বলে বিস্ময় জাগে না তবে বেইমান শব্দটায় ভয়ানক ভাবে প্রতিবাদ ক'রল সৌদামিনী, খবরদার। বেইমান বলবে না বলে দিচ্ছি।

লাখন সে প্রতিবাদে কর্ণপাত ক'রল না। তার তখন টাকা প্রয়োজন, সময় টানছে নেশার জন্যে। বাপের কাছে শেখা পিতৃপুরুষের বিহারী ভাষায় কদর্য শব্দ যত আছে সমস্ত একে একে প্রয়োগ ক'রতে লাগল সৌদামিনীর ওপর। তার সঙ্গে সে বারবার বলতে লাগল, আলবৎ বেইমান। আমার টাকা তুই সরিয়ে রেখেছিস, কোথায় রেখেছিস বল ?

সৌদামিনী চরম উত্তেজনার মধ্যেও বোঝাতে চাইল লাখনের টাকা থেকে তার মজুরীও পুরো নেয়নি সে মাত্র পাঁচশো টাকা নিয়েছে।

কোন চীজ কা মজদুরি বে শালী হারামী কা বাচ্চা!—লাখন তাকে ন্যায্য মজুরী দিতেও নারাজ। আর এইসব অসুর প্রকৃতির মানুষের কাছে নারী চিরদিনই দুর্বল এবং অসহায়। তাই তার প্রতিবাদ লাখনের হুংকারের তুলনায় নেহাৎই ক্ষীণ শোনায়, তার কার্যকারিতা থাকে না। তবু এ মহল্লারও যে অলিখিত আইন আছে স্বাভাবিক ন্যায়ের ওপর ভিত্তি ক'রেই সেই অলিখিত অথচ প্রচলিত আইনের বলেই সৌদামিনী প্রতিবাদ করে, তার মানে ? এতদিন আমার এখানে বসে থেকে আমার কারবার বন্ধ ক'রেছ তার মজুরী নেই ? হাজার টাকা আমার মজুরী হবে। তাছাড়া তোমার এই বিপদের ঝামেলা সব আমি বইলাম জন্যে ভাগ দেবে না ? ধরা পড়লে বামাল সমেত আমি ফাঁসতাম না ?

চোপ রও শালী। তুম হামারা রুপেয়া দেগা কি নেই ?

বললাম তো তোমার পয়সা নেই। এতদিন ধরে জুয়া খেলে টাকা ওড়ালে এখন সে টাকা ঘরে খুঁজছ ?

সেই যে কবে একদিন দিল্লুর জন্যে টাকা চেয়েছিল সৌদামিনী সেই কথাটা লাখনের মাথায় নেচে উঠল। গর্জন ক'রে উঠল, শালী পেয়ার কা আদমী কো মেরা রুপেয়া কাহে দিয়া ?

দিলুকে ঘর কুড়িয়ে মাত্র পাঁচশো টাকা দিয়েছিল সৌদামিনী বলেছিল, যতটা যা হয় এ দিয়েই দোকান সাজাও দিলুদা সুযোগ পেলে কিছুদিন বাদে আবার দেব।—সে কথা চট ক'রে মাথায় এল না সৌদামিনীর। এলেও লাখনের অভিযোগ সত্য ছিল না। সে এসব মিথ্যা অপবাদ বরদাস্ত ক'রতে না পেরে রাগের ঝোঁকে ঠাস ক'রে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে রণচণ্ডী মূর্তি ধরল, কাকে দিয়েছি রে শালা ? হারামীর বাচ্চা! কোথায় পেয়েছিস টাকা ?—আরও কিছু গালাগালি দিয়ে বলল, পুলিশের ভয়ে এতদিন আমার সায়ার তলায় লুকিয়ে রইলি ফুর্তি ক'রে টাকা উড়িয়ে এখন যত উল্টো কথা! আমার পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে বেরো এখান থেকে।

লাখন মনে মনেই গর্জন ক'রল, ঠিক আছে আসব, তোর হিসেব চুকাবো।

ইতিমধ্যে হৈ হট্টগোল সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াতে পিয়ারা সিং তার কর্তব্যে এসে গেল, লাখনকেই বলল, ক্যা হুয়া বে ?

কুছ নেহি ভাইয়া, আপনেমে—শান্ত শব্দেই চাপা দিল লাখন।

লাখন এতক্ষণে টাকা নিয়ে যত ঝামেলাই করুক, গালাগালি দিক বা ঝগড়া করুক আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সবই সে শান্তভাবে ক'রছিল, সাপের মত শীতল অনুত্তেজিত ছিল। এখনও তার মধ্যে উত্তেজনার কোন লক্ষণ ছিল না তাই পিয়ারা সিং মনে ক'রল হবেও বা ঝগড়া, তবে এ তেমন কিছু নয়।

ওর পেছন পেছন লাখনও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এমনিতেই লাখন থাকুক এটা সৌদামিনী চাইছিল না। টাকা পয়সা সব নেশা আর জুয়াতে শেষ ক'রেছে, এখন কে ওর খরচা চালাবে ? যতদিন টাকা ছিল সর্বদা সে সাবধান ক'রেছে এখন ওর দায় কে বইবে ? গেল বা যদি ওর জামা কাপড় নিয়ে গেল না কেন ?

বিকাল হ'তে না হ'তেই লাখন এসে হাজির। সুস্থভাবেই এল কিন্তু সৌদামিনী বুঝল ও বেশ চড়া নেশায় আছে। ওর জামা কাপড় জিনিসপত্র সব একত্রে গুছিয়ে রেখেছিল সৌদামিনী, ভাবল নিতে এসেছে। বলল, ঐ তোমার জিনিষ আছে বুঝে নাও।

লাখন উত্তর না দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সৌদামিনী বেশ অবাক হয়েই বলল, শুয়ে পড়লে যে! আমাকে খদ্দের তুলতে হবে। চলবে কি ক'রে ?

লাখন কোন কথা না বলে জামার পকেট থেকে চারটে দশটাকার নোট বের ক'রে খাটের ওপরই ছুঁড়ে দিল। নিজে চোখ বন্ধ ক'রেই রইল। সৌদামিনী টাকা তুলছে না বুঝে বলল, লেও তুমহারা মজদুরি কা রুপেয়া।

লাখনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার ইচ্ছা ছিল না সৌদামিনীর। সে জানাল, তোমার টাকারও দরকার নেই তোমার থেকেও দরকার নেই। তুমি অন্য বাড়ী যাও।

লাখন সে কথারও কোন উত্তর দিল না, যেমন ছিল তেমনই শুয়ে রইল। সৌদামিনী অপ্রয়োজনেই ঘরের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া ক'রে সময় কাটাতে লাগল।

আবার কিছুক্ষণ পরে লাখন বলল, যা হয়েছে তা হয়েছে ভুলে যাও। কাল আমি অন্য কোথাও চলে যাব। টাকাটা তুলে রাখ, আমার মাথায় খুব ব্যথা বলে শুয়ে আছি, তুমি আমার 'পেয়ারা আওরত' তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব?

বেশ কিছু সময় পর সৌদামিনী ঘরে ধুপধুনো দিল, সন্ধ্যাবাতি জ্বালাল, লাখন সব শুয়ে শুয়েই উপলব্ধি ক'রল। তারপর হঠাৎ উঠে জড়িয়ে ধরল সৌদামিনীকে, শান্ত স্বরেই মিনতির মত ক'রে বলল, রুপিয়া তো উঠা লেতা! এত রাগ কেন? আরে বাবা আমি না হয় কিছু বলেইছি তুমিও তো আমাকে চড় মারলে তাতে আমার কোন রাগ হয়েছে? কিছু না। ঝামেলা শেষ হয়ে গেছে।

এরকম ঝামেলা এ পাড়ার প্রায় নিত্যকার ব্যাপার। ঝামেলা আছে বলেই পিয়ারা সিং, মন্তাকিন প্রভৃতিদের বাড়ী বাড়ী চাকরি আছে, এ পাড়ায় প্রভুত্ব আছে। কোন না কোন বাড়ী কোন না কোন মেয়ের সঙ্গে এমন ঝামেলা চলছেই। নিত্যই আছে। সৌদামিনী তাই আর বিশেষ গুরুত্ব দিল না। লাখনের হাত থেকে প্রাপ্য টাকাকটি নিয়ে কাঠের আলমারীতে তুলে রাখল। লাখন আবদার ক'রল, ক্যা পান নেহি খিলাও গে?

পান! বিস্ময় প্রকাশ ক'রল সৌদামিনী, তুমি আবার পান খাও নাকি?

কখন কখন খাই না এমন নয়।

সৌদামিনী ঘরে পানের আয়োজন রাখে না, তাহ'লে পিকদানীও রাখতে হয়, তাতে ওর বড় ঘৃণা। পানের পিক সমেত পিকদানী পরিষ্কার করা ভারী বিশ্রী ব্যাপার। অথচ পানের বাটা আর পিকদানী প্রায় প্রতি ঘরেই আছে। অপছন্দ করে বলে পান নিজেও কখনও খায় না। লাখনের হঠাৎ আবদারে ও তাই বলল, থাক আর পান খেতে হবে না।

ঠিক আছে। যা তোমার মর্জি।

মীমাংসা হয়ে গেল বলেই সব ঠিক ঠাক চলতে চলতে রাত বেড়ে চলল। সৌদামিনীর শরীরটাকে ইচ্ছামত ভোগ ক'রল লাখন। গভীর রাতে ক্লান্ত সৌদামিনী যখন ঘুমোচ্ছে বিনিদ্র লাখন তার পাশেই শুয়ে থাকতে থাকতে উঠে বসল, নিমেষমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে সৌদামিনীর অতি লোভনীয় প্রিয় শরীরটার দিকে একবারও না তাকিয়ে দুহাতের পাঞ্জায় ওর গলাটা সর্বশক্তিতে এমন ভাবে টিপে ধরল যে সামান্য একটু ছটফট ক'রেই অমন সুন্দর শরীরটা নেতিয়ে পড়ল। অতঃপর বিছনা থেকে নেমে জামার পকেটে সযত্নে সংগ্রহ ক'রে আনা ছোট একটুকরো শণের দড়ি এনে সৌদামিনীর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আসুরিক জোরে এমন ক'রে টানল যে

সৌদামিনীর জিব বেরিয়ে পড়ল। মাথাটা এক পাশে হেলে যেতে দড়িটা খুলে নিয়ে মৃতদেহের পাশে চুপচাপ শুয়ে পড়ল কারণ পিয়ারা সিং রাত বারাটায় সদর বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েছে এখন বেরোনো বিপদজনক।

ভোর পর্যন্ত অন্ধকার ঘরে মৃতদেহের পাশে জেগেই শুয়ে থাকল লাখন।

তাড়াতাড়ি আলমারী খুলে টিনের তোরঙ্গ খুলে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে সামান্য গয়না গাঁটি যা পেল পকেটে ভরে নিল।

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গলে জোরে জোরে ইষ্ট দেবতাকে বার কয়েক ডাকা পিয়ারা সিং এর পুরানো অভ্যাস লাখন জানে। সেই শব্দ শুনে উৎকর্ণ হয়ে রইল লাখন সদর খোলার শব্দের অপেক্ষায়। শব্দ পাওয়া মাত্র নিচে নেমে একটু আড়াল হয়ে রইল, বাড়ীর সবাই এখন ঘুমোচ্ছে, পিয়ারা সিং আপন মনে পেছন ফিরতেই লাখন সদর পেরিয়ে একদম পথে। তার মনে তখন একটাই চিন্তা টাকাগুলো পাওয়া গেল না কিছুও কি বাড়ীতে রাখেনি সব দিয়েছে ওর পীরিতের নাঙকে! সে শালা আমার টাকা হড়পে নিল। যাক শালা গয়নাগুলো বিক্রি ক'রে যতটুকু পাওয়া যায় যাবে। শালা রাণ্ডী আমার টাকা হজম ক'রবি যা এখন জাহান্নামে। উত্তেজনায় খেয়াল হয়নি জামা কাপড় গুলো রয়ে গেছে, আর আনা যাবে না। গেল ওগুলো। যাক শালা বদলা তো নেওয়া গেছে। শালা! লাখনের সঙ্গে বেইমানী! লাখন ভকত বদলা নিতে কখনও দেরী করেনা। চালাকি! আপন মনেই নিজের সাফাই গাইতে গাইতে পথ চলতে লাগল লাখন। এখন কোথায় যাওয়া যায়? মুন্সীবাজার বিশ্বনাথ স্যাকরার দোকান খুলতে এখনও চারঘণ্টা বাকি। 'বিশ্বনাথ শালা রাণ্ডী সে ভি হারামী'। শালা কখনও অর্দ্ধেক দামও দেবে না। কিন্তু ওকে না দিয়ে তো কোন উপায়ও নেই, আর তো কারও সঙ্গে আলাপ নেই লাখনের, চোর রবি একদিন বলেছিল বটে কোন বাজারে কে এক স্যাকরা আছে ঠিক দাম দেয়। চোরাই মাল হ'লে টাকায় বার আনা দাম দেবে, ন্যায্য হিসেব ক'রেই দেয়, চোর রবি সোনার মাল হ'লে তাকেই বেচে। এখন তো শালা রবির দেখাও পাওয়া যাবে না, কোথায় আছে কে জানে? যাঃ শালা বিস্‌নাথ যা দেয় দিক আর কি উপায়? এখনই মুন্সীবাজার যাবে, সেখানেই ঘোরাঘুরি ক'রে দেখবে যা হয় হবে।

নির্ম্মলা দাসীর দেশ থেকে খবর এসেছে ভাই এর ছেলের খুব অসুখ, ভাই কিছু টাকা চায় চিকিৎসার জন্যে। তা পদ্মরানীর যতই টাকা থাক তার কাছ থেকে সাহায্য বলে তো কিছু জোটবার নয়, এ পাড়াতে একমাত্র যে বিমুখ ক'রবে না সে সৌদামিনী। দায়ে অদায়ে অনেকেরই ভরসা তো ঐ সৌদামিনী। সব সময় দান হিসেবে দিতে পারেনা ধার দেয়; তাই বা কম কি দরকারের সময় খালি হাতে ধারটাই বা দেয় কে? দায় দৈবে পেয়ে সময় মত ফেরৎ দেওয়া চলে। সেই আশাতেই সকালে উঠে সৌদামিনীর কাছে হাজির হওয়া।

বেশ কয়েকবার ডাকাতেও সাড়া পাওয়া গেল না বলে বেশ একটু অবাক হ'ল নির্মলা, এতটা বেলা তো কোনদিনই বিছানায় ঘুমোয় না সৌদামিনী। সকালেই ওঠে দুপুরে কোন কোনদিন হয়ত ঘুমিয়ে নেয় সঙ্গী পেলে তাসে বিন্তি নয়ত গোলক ধাম খেলে। তেমন সঙ্গী না জুটলে ষোলগুটি বাঘ চাল, মেঝেতে ঘর কেটে ভাঙ্গা ভাঁড়ের খোলামকুচি সাজিয়ে খেলা। তাও চলে, তা সকালে এত বেলা বিছানা কখনই নয়। কদিন ধরেই যে ছোকরাটা থাকছে সেই আছে না নতুন কেউ সারা-রাতের বাবু এল বোঝাও যাচ্ছে না যে দরজা ধাক্কাবে। নতুন বাবু হলে দরজা ধাক্কা দেওয়া অপছন্দও ক'রতে পারে তো! সাত পাঁচ ভেবে দরজায় শেকল নাড়তে লাগল নির্মলা। অবশেষে এত জোরে নাড়তে লাগল যে আশেপাশের ঘর থেকে বিরক্তি প্রকাশ ক'রতে অনেকেই বেরিয়ে এল তার মধ্যে হাই তুলতে তুলতে কমলা এসে প্রথম বলল, কি গো মাসি সক্কাল হ'তে না হ'তে এমন হাঙ্গামা লাগালে কেন?

কি জানি বাছা, সদু তো কোনদিন এমন ঘুমায় না!

কোনদিন ঘুমোয় না বলে আজ ঘুমোবে না এমন কি কোন কথা আছে?

ললিতা গরমের চোটে উদোম গায়ে ঘুমোচ্ছিল, সেই অবস্থাতেই সায়াতে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে এসে বলল, ও তো বেশ সকালে উঠেই কলঘরে যায়, দেখ বোধহয় ঘুরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে।

সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটানোর জন্যে লীলাবতী দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল দেখা গেল সৌদামিনী একদম উলঙ্গ হয়ে খাটের ওপর শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে।

বহুদর্শী নির্মলার কেমন সন্দেহ হ'ল, একা এমনভাবে এতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবার মেয়ে তো সৌদামিনী নয়! কি ব্যাপার রাতে কি অত্যাধিক নেশা করে বেঁহুশ হয়ে আছে? কি হ'ল? তেমনটিও তো কোনদিন দেখা যায় নি! লীলাবতীই প্রথম সন্দেহের কথা মুখ ফুটে বলল, মরে যায়নি তো?

যে কথা নির্মলা ভাবতেও পারছে না, মনের সামনে এসেও আটকে যাচ্ছে সেই কথাটা এমন ভাবে শুনতেও ইচ্ছা ক'রছে না তার। বালাই ষাট। মরবে কেন? মরবার বয়েস হয়েছে না কি? এখনও অর্দ্ধেক বয়সই হ'ল না, মনকে প্রবোধ দিল নির্মলা। কিন্তু ঘরের ভেতর ঢুকে আঁতকে উঠল সবাই অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা এবং যারা জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তারাও। কারও বুঝতে বাকি রইল না। নির্মলা প্রথম চিৎকার ক'রে উঠল, মা গো! কি হ'ল গো। কী সব্বোনাশ হ'ল।

তার চিৎকার ছাদ ফুটো করে অথবা ফাঁক ফোকর দিয়ে গলে তিনতলা পর্যন্ত পৌঁছে যেতেই সোনামণি নেমে এল। বাড়িউলি সে তার বাড়িতে কোন অঘটন ঘটে কারও সর্বনাশ হ'লে দেখাশোনার দায়িত্ব তার অবশ্যই এসে পড়ে। যদিও এই এক খানি ঘর তার এক্তিয়ারে পড়ে না তবু গোটাবাড়ীটা তো তার! তারই দেখাশোনা করা উচিত। তাছাড়া বিপদে কোন বাদ বিচার থাকে না।

নিচে নেমে সোনামণি সৌদামিনীর ঘরে উঁকি দিয়েই বলল, তোমরা সব জটলা করে দেখছ কি ? ডাক্তারকে খবর পাঠাও। পিয়ারা সিং এসে দাঁড়িয়ে হায় রামজী বলা মাত্র সোনামণি যেন তেড়ে উঠল, থাক তোমার রামজী আগে ডাক্তার ডাক। দেখ খগেন ডাক্তার আছে কি না ?

অল্পক্ষণের মধ্যেই পিয়ারা সিং খগেন ডাক্তারকে যেন কাঁধে ক'রে বয়ে আনল। ডাক্তার ঘরে ঢুকে বুক পর্যন্ত শাড়ী চাপা দেওয়া সৌদামিনীকে দেখেই বললেন, এ তো খুন। কেউ গলা টিপে মেরেছে।

খুন! শব্দটা যেন সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে কাঁসার থালার মত আছড়ে পড়ল। খুন। শব্দটা হাওয়ার ওপরে চড়ে ভেসে পড়ল। বাড়ীর সমস্ত লোক তো বটেই, সামান্য সময়ের মধ্যেই বহু লোক জমে গেল খুন দেখতে।

ডাক্তার বাবুই বোধহয় থানায় ফোন ক'রে দিয়েছিলেন অচিরে লাল পাগড়ি পুলিশে ছেয়ে গেল সমস্ত গলি, শশব্যস্ত তারা বাড়ীর মধ্যেও ঢুকে পড়ল, একজন পোষাক পরা অফিসার আর একজন সাদা পোষাকের মানুষ ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। অফিসারটি গম্ভীর গলায় জানতে চাইল, কি ক'রে জানলে যে এটা মৃতদেহ ?

ডাক্তার বাবু এসে বলে গেলেন। সোনামণি সাহস ক'রে জানাল।

কে ডাক্তার ডাকল ?

হুজুর আমি নেমে এসে ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম।

আধঘণ্টা ধরে জনে জনে জেরা ক'রল পুলিশ। একই কথা নানা রকম ক'রে নানা লোককে জিজ্ঞাসা ক'রল। বাড়ীসুদ্ধ লোককে এনে দাঁড় করালো মড়ার ঘরের সামনে অবশেষে একটা গাড়ীতে মৃতদেহ এবং দারোয়ান পিয়ারা সিংকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলল অন্য এক গাড়ীতে। কারণ সে বাড়ীর দ্বাররক্ষী দায় এড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব। পরে যা হবার হবে এখন তো চলুক।

বাড়ীর দরজার সামনে জোটা জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে নীরবে সব দেখছিল দিলু। পুলিশের নামে এলাকার রাজারাও যেখানে সন্ত্রস্ত দিলুর কি সাধ্যি আগ বাড়িয়ে মাথা গলায়। একটা কাপড় ঢাকা দেহ গেল সে দেখল, সৌদামিনীকে দেখতে পেল না। সব যখন শেষ স্তম্ভিত হয়ে সে একাই কেবল দাঁড়িয়ে রইল, এও কি সম্ভব! সৌদামিনীর মত মেয়েকে মারতে পারে কেউ ? না বোধ হয় ভুল শুনেছে সে, অন্য কারও কথা। তা বলে খুন! সদরে দুজন পুলিশের পাহারা কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না দিলুর চোখ বেয়ে কেবল জল ঝরতে লাগল। জ্ঞান হবার পর অনেক দুঃখেও কখনও কাঁদে নি দিলু, আজ অশ্রু তার কোন সংযমেরই বাধা মানল না।

পুলিশের গাড়ী কৌতূহলী জনতার ব্যূহ ভেদ করে চলে যাওয়া মাত্র চাঞ্চল্য জাগল। চা-ওয়ালা সন্তোষ সিংও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। পিয়ারার জ্ঞাতি সে, তবে এত দূরের জ্ঞাতি যে উৎসধরে সম্পর্ক নিরূপণ আর অসম্ভব বলে এখন পরিচয় গ্রামতুতো ভ্রাতৃত্বের ; তবু সন্তোষকে বিচলিত করল। বিভ্রান্ত দিলুকেই সে হালকা হিন্দিতে প্রশ্ন করে বলল, এটা কেমন কথা বাবু ! পিয়ারা ভাইয়াকে কেন পুলিশ নিয়ে গেল ? এটা তো ঠিক নয়।

সৌদামিনীর মৃত্যু সংবাদে দিলু এমনই বিচলিত ছিল যে সন্তোষ সিং-এর কথা তার কানেও ঢুকল না। সে উদভ্রান্ত উদাসীন হয়ে সৌদামিনীদের সদর দরজার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পাশের গলির বয়স্ক নবকুমার দত্ত-ও এসে ভিড়ের মধ্যেই ছিল, সন্তোষের কথা তার কানে পৌঁছোতেই সে বলল, তবু তো হাজার হোক দেশ স্বাধীন হয়েছে—এ সেই ইংরেজ রাজত্বের সময়ে হলে এতক্ষণ সকলেরই কোমরে দড়ি পড়ে যেত। একা পিয়ারা সিংকে পুলিশ গারদে যেতে হত না।

এ কথায় সন্তোষ সন্তুষ্ট হল না। ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে মিছরি লালের পান দোকানে গিয়ে ধরল, এ ক্যায়সান জুলম হ ভাইয়া ? পিয়ারা সিং তো দারবান হ্যায়। ওকে ক্যা দোষ ?

মিছরিলালও বেশ উত্তেজিত ছিল। এমন একটা খুনের ঘটনা ঘটলে কে আর শান্ত হয়ে থাকতে পারে ? কিন্তু স্থিরভাবেই সে নিজেদের ভাষাতে বলল, যেতে পারবে থানাতে ? গিয়ে বলতে পারবে ? তবে খবরদার একলা যাবে না, দু দশজনকে নিয়ে যাও। তার চেয়ে ভাল কংগ্রেসী লীডার ভোলানাথ বাবুকে গিয়ে ধর। তিনিই রাস্তা বাতলে দেবেন। কিন্তু কাজটা ক'রল কে ? যত যা-ই কর আসামী ধরা না পড়লে দারোয়ান বলেই পিয়ারা ছাড়া পাবে না। সে আসামী গেল কোথা দিয়ে ? পুলিশ কি ক'রবে ?

এতক্ষণে ব্যাপারটা সন্তোষের মাথায় ঢুকল। ঠিকই তো ! লোকের ঢোকা বেরোনো লক্ষ্য রাখাই তো দারোয়ানের কাজ, দায় তো তাকে নিতেই হবে। তাহ'লে তো এখন অন্য পথ ধরতে হয় ! ভীড়ের মধ্যে থেকে কোন কাজ হবে না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল সন্তোষ। ইমাম বক্স লেন-এ গেলে এখন বিশুয়াকে পাওয়া যেতে পারে। পথ ধরল ইমাম বক্স লেনের। বিশুয়াকে তার দরকার। 'বেবুদাকা আদমী বিশুয়া'—বেবুদা যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারে। ইমাম বক্স লেন-এ গলির মুখেই খবর পাওয়া গেল একটু আগে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে বিশুয়া। হয়ত বেবুদার কাছেই গেছে। কারণ রোজ প্রথমেই একবার বেবুদার সঙ্গে দেখা ক'রতে হয় সবাইকে। কোন নির্দেশ নেই তবে নিয়ম আছে, অনেক সজ্জন যেমন বাড়ী থেকে বেরিয়েই কাছাকাছি মন্দিরে প্রণাম সেরে নেয় তেমনই অভ্যাস বেবুর অনুচরদের। স্যাণ্ডো, পালা, বিশুয়া, জগা, ফক্কুন—সবাই যায়। যে যখন

বেরোয় প্রথম গিয়ে ওখানেই দাঁড়ায়, বেবুর কাউকে কোন নির্দেশ দেবার থাকলে ওখানেই তা জানিয়ে দেয়। নইলে বেবুর সামনে বসে কেউ, আবার কেউ ঘোরাঘুরি করে চলে যায়।

সন্তোষ নিজের চায়ের দোকানের বাইরে বড় একটা পা বাড়ায় না, প্রয়োজন হয়না। আগে দেশে যাবার দিন হ'লে বছরে একবার পা বাড়াত, দু বছর হ'ল 'ভগলুকে মাইকো' এনে কাছেই একটা ঘরে রেখে সে পাট চুকিয়েছে। গ্রাম থেকে এসে প্রথম প্রথম ভগলুর মায়ের সে কি বিড়ম্বনা! চারপাশের ব্যবসা দেখে সে তো অবাক! 'কা বায়েন হো বাবুজী? এ লোক কা বায়েন? ই সব আওরত ক্যা করথন?'

সন্তোষ স্ত্রীর প্রশ্নের জবাব এক কথায় সেরেছে, তোহার ও মে ক্যা বা? তু আপন কাম দেখ।

আপন কাম দেখতে দেখতে এখন আপনি সব বুঝে গেছে ভগলুকে মা, উর্মিলা। সে যে বাড়ীতে দরজার পাশে একতলাতে থাকে সে বাড়ীটার ভেতরে উপযাচিকাতে ভর্তি। সন্ধের পর যখন এলাকার দৃশ্যপট বদলে যায় উর্মিলা ঘর বন্ধ ক'রে ভেতরেই বসে রুটি পাকায় বা গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ সারে। বাবুজী রাত ক'রে দোকান বন্ধ করে, ঘরে ফিরে খেয়ে দেয়ে শুতে শুতে বাড়ী নিঝুম হয়ে যায়। সকালে উঠে সবই স্বাভাবিক, রাতের পরীগুলোই সারাটা দিন সাধারণ মানুষের মত ঘোরে ফেরে কথা বলে; কেউ জানতে চায়,কি গো রান্না হয়ে গেল?

বাংলাভাষা কিছু বোঝে না বলে প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কেবল হাসে উর্মিলা। কম বয়স্ক দু একটি মেয়ে অশ্লীল কথা বলে বাংলায় রসিকতা ক'রেই নিজস্ব হিন্দিতে জানতে চায়, খানা বানায়া দিদি?

হেসে সাড়া দেয় উর্মিলা, হাঁ বানা লিহিস।

কেয়া বানায়া?

রহড় কা ডাল আলু চোখা।

তারপরই বক্তা হয়ত বাংলায় ঠাট্টা করে, আমাদের একদিন খাওয়াতে হবে।

উর্মিলা চুপ ক'রে যায়। বাংলা সে একবারেই বোঝে না, আরও একটা কথা বাংলা মুলুকে এসে সে বুঝছে না দিনের বেলা স্বাভাবিক এই মেয়েগুলোই রাতে অমন সেজেগুজে অন্য হয়ে যায় কি ক'রে? তখন এই মেয়েদের যেন চেনা যায় না। সন্তোষ কাজের মানুষ এসব কথা কানেই তোলে না, প্রশ্ন ক'রলে হাই তুলে পাশ ফিরে শোয়, তারপর কেবল তার নাসিকাগর্জন শোনা যায়। লোকটা সারাদিন দোকান নিয়েই থাকে, ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে।

তাই এলাকার নামগুলো সব শোনা থাকলেও কার কোথায় আস্তানা কিছু জানা নেই, বিশুয়া কাছাকাছি থাকে বলেই জানে। তাছাড়া বিশুয়ার বন্ধুবান্ধব সব তার দোকানেই চা খেতে আসে আড্ডা জমায়। অনেক কথা তাদের নিজেদের গল্প

গুজবের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় বলেই যা জানে। এবার সে সংকটে পড়ল কে বেবু, কোথায় তাকে পাবে, কি ক'রে তার কাছে যাবে। অথচ যাওয়া জরুরী। দেরি হলে কি অঘটন না ঘটে যায়। পুলিশে ধরলে ছাড়া পাওয়া মুস্কিল এক যদি বেবুদা কাউকে ধরে ব্যবস্থা ক'রতে পারে।

শূন্যে হাতড়াবার মত ক'রে ঘুরতে ঘুরতেই মাখনকে পাওয়া গেল, বিশুয়ার ইয়ারদের একজন। বিশুয়ার সন্ধান সে রাখে না তবে সন্তোষের কথা মত তাকে খোঁজবার জন্য 'বেবুদা কা পাস' যেতে সে রাজি হয়ে গেল। সন্তোষকে নিয়ে যাবে।

এত যার নাম ডাক তাকে দেখে সন্তোষ অবাক হয়ে গেল। লম্বা তো নয়ই রোগা গড়ন সাধারণ চেহারার যুবক। বা বয়েস ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হতে পারে। সাধারণ একটা ফুলসার্ট গায়ে দিয়ে একটা বাড়ীর রোয়াকে বসেছিল। তবে তাকে ঘিরে নানা মাপের ছ-সাতজন ছোকরা কেউ বসে বা কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মাখন গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বিশুয়া এসেছে বেবুদা ?

না তো। বলেই অন্যদিকে তাকালো বেবু।

এই সন্তোষজীর বড় দরকার, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

বেবু সরাসরি সন্তোষকে জিজ্ঞাসা ক'রল, কি ব্যাপার ?

সন্তোষ নিজের ভাষাকে যথাসম্ভব ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলল, আঠার নম্বর বাড়িতে রাত্রে একটা খুন হয়ে গেছে। আমার ভাই দারোয়ানী করে তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

খুন! এমনভাবে বেবু উচ্চারণ ক'রল যেন এমন বিষ্ময়কর শব্দ সে কখনও শোনেনি। কে খুন হল ?

একটা মেয়ে।

কোন আঠার নম্বর ?

শংকর লেন।

শোনামাত্র উপস্থিত সবাই যেন সচেতন হয়ে উঠল। চোখে চোখে কি সামান্য ইসারা হ'ল সন্তোষ লক্ষ ক'রলেও অর্থ বুঝল না। কিন্তু সকলের মধ্যে আকষ্মিক চঞ্চলতা দেখে বলল, আমার ভাই বহুৎ ইমানদার মানুষ। কোন কিছু জানে না বাবুজী। ওকে ছাড়িয়ে দিন।

বেবু জানতে চাইল, বাড়ীউলি কে ?

নাম জানি না।

বেবু আর কোন কথা না বলে উঠে পড়ল, তুমি যাও।

খবরটা পেয়ে উপকার হ'ল নইলে পুলিশ আসামী না পেয়ে এখন যাকে তাকেই গ্রেপ্তার করবে তাদেরও করতে পারে সন্দেহ ক'রে। কাজেই এখনই এর বিহিত করা দরকার। একজন সহকারীকে ডেকে বেবু নির্দেশ দিল, মুস্তাকিন ভাইয়ার কাছে

খবর নে সে জানে কিনা। স্যাণ্ডোদাকে ডাক, আমি দু নম্বরে থাকছি।

চারদিকে খবর ছিটিয়ে গেল এবং আধঘন্টার মধ্যে জানা গেল লাখন বলে কে একজন ঐ মেয়েটার ঘরে বিশ পঁচিশ দিন ছিল। কাল রাতেও ছিল।

কে লাখন?

অন্য একজন জানাল মনে হয় লালবিবি চিনবে। লালবিবির বাড়ী এক লাখন আসত বহুত খরচা ক'রত। এসে এইরকম দশ বিশদিন থাকত, আবার চলে যেত। বাজে ধান্দার লোক হবে—পয়সা পেয়ে গেলে চলে আসে। দাঁও মারতে না পারলে এদিকে আসে না।

কানেকশান লাগা।

তাও লেগে গেল, কিছুক্ষণ বাদেই খবর এল জগুয়া তাকে ক'দিন ধরে জুয়ার আসরে দেখেছে। সেখানে খবর নিলে জানা যাবে। তার বাড়ীর খবর কেউ জানে না, তবে বেশির ভাগ সময় রামবাগানে থাকে। শান্তালাল বলে এক সাঙাৎ খবর আনল, লালবিবির ঘরে এসে থাকলেও সে নাম ক'রে লাখনকে চিনতে পারল না, বলল দেখলে হয়ত চিনতে পারবে।

বেবুর ধারণা হ'ল এ সেই লাখনেরই কাজ। জগদেব পাঠক জমাদার এ দিকটা যোগাযোগ এবং এদিকের খবরাখবর রাখে। প্রশাসনিক ভাবে তার দায়িত্ব হচ্ছে 'রেড লাইট' এলাকাটাকে নজরে রাখা এবং সংযোগ রাখা যাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত খবরাখবর পাওয়া যায়। এই কাজের জন্যে তাকে এখানে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয় এবং রাখবার ফলে বিভিন্ন উপায়ে এখান থেকে অর্থার্জনও হয় প্রচুর। নানা সূত্রে অর্থাগম ঘটে। বেবু জানে বেলা এগারটা বাজলেই সোনাগাজীর মসজিদের পাশে পানের দোকানে পাওয়া যায় জগদেব পাঠক জমাদারকে। অনেকেই সেখানে দেখা ক'রতে, প্রণামী দিতে পৌঁছে যায়। দেবু পৌঁছে দেখল একাই দাঁড়িয়ে আছে পাঠক তাই সুবিধে পেয়ে প্রভুর সামনে বিশ্বস্ত কুকুর যেমন তেমনই ভঙ্গিতে বলল, পাঠকজী নমস্তে। তারপরই সন্তুষ্ট করবার জন্য আবার বলল, জয়রামজীকি পাঠকজী।

বীরত্ব ব্যঞ্জক গোঁফ রাখতে গিয়ে তা এমনই বোঝা হয়ে গেছে যে তার বাহাদুরী পেরিয়ে মুখের অভিব্যক্তি কিছুই বোঝায় যায় না। এত তোয়াজ মনোরঞ্জন সত্ত্বেও জগদেব-এর মুখ থেকে কোন বার্তা না এলে বেবু মনে মনে কিঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করল। বলল, বাত কেয়া হ্যায় পাঠকজী?

মামলা বহুত গড়বড় হ—জগৎদেব থেকে লোকের মুখে মুখে জগদেব হয়ে যাওয়া জমাদার জানাল। অতঃপর সংবাদ হিসেবে পরিবেশন ক'রল, লালবাজার সে কাম হোতা। মার্ডারকে লিয়ে সব বড়া পরেশান হ্যায়। আভি বহুত ফাটক হোনেকা হ্যায়। তোহার লোকর নাম ভি ওমে বা। —বেবুদেরও গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে ভয়টা সে নিজেই দেখাল।

ঐ জন্যেই তো আপনার কাছে আসা পাঠকজী।

পাঠক অমনি হাত বাড়াল। সে জানে এই খবরের জন্যে এবং সাম্ভাব্য গ্রেপ্তারী

এড়াতে কিছু পয়সা বেবু নিশ্চয় দেবে। একটা দশটাকার নোট পেয়ে সে জানাল, এ মে ক্যা হোই ? এ কোই চোরি কা মামলা না হ।

তা হোক। তোমাকে আমি আসামীর নাম বলে দিচ্ছি।

বোল ? পাঠক আগ্রহী হ'ল।

লাখন। পদবী জানি না। লাখন বলে এক ছোকরা বেশ কিছুদিন ঐ মাগীটার কাছে ছিল। কাল রাতেও ছিল।

এ নামকা তো পাতা লালবাজার তক সায়েদ মিল চুকা হ্যায়, উসকা ডেরা কাঁহা এ তো বাতা ?

ডেরা কোন নেই। রামবাগানে বেশি থাকে।

উসকো চিনে কোউন ?

ঐ আঠার নম্বর বাড়ীর মেয়েরা নিশ্চয় চিনবে।

জগদেব সন্তুষ্ট হতে পারল না। আরও খবর চাই। আস্তানার খবর দরকার। এখন সেই লাখন কোথায় আছে জানা চাই, কোথাও তো নিশ্চয় আছে, লুকিয়ে আছে। কোথায় আছে খবর দিতে না পারলে গোয়েন্দা বিভাগ যদি এই মামলায় বেবুকে ধরে তো থানার কিছু করবার থাকবে না, এ কথা বলে জগদেব সাবধান করে দিতে চাইল বেবুকে; শাসিয়েই দিল।

এমন একটা ঘটনা ঘটলে ভয় স্বাভাবিক, বিশেষ করে পুলিশের চিহ্নিত লোকেদের তো বটেই। এমনিতে পুলিশ কিছু বলছে না, সময় সময় ভেট নিয়ে ভুলে থাকছে ঠিক কিন্তু তাদের ঘাড়ে বিপদ পড়লে তখন তো আর কাউকে ছাড়বে না। যাকে পাবে তাকে ধরে দিয়ে নিজেদের বিপদ কাটাবে, বদনাম থেকে বাঁচতে চাইবে।

তাই আবার খোঁজ খবর ক'রে জানিয়ে দিল, ক'দিন ধরে মিনার্ভা থিয়েটারের পাশেই থাকে লালা ওর সঙ্গে খুব ঘুরছিল। লালা বলে সবাই চেনে।

এই খবরটুকুই পুলিশের প্রয়োজন ছিল। লালা খুনের সঙ্গে থাক আর না থাক সাম্ভাব্য খুনির সঙ্গে যখন তার ঘনিষ্ঠতা তখন তাকে ধরলেই সব হবে। জগদেব খবর পাবার পনের মিনিটের মধ্যে থানায় থানা থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে লালবাজার এবং গোয়েন্দা বিভাগ একঘণ্টার মধ্যে কাজে নেমে পড়ল কে এই লালা, ঠিক কোন বাড়ীতে থাকে। রামবাগানের ছেনি আর নাটুকে ধরে শাসিয়ে বের ক'রে নিল কোন গলিতে লালা আর তার দুই ভাই বাড়ীতেই জুয়ার বোর্ড চালায়, বেশিরভাগ সময় পাওয়া যায় নতুন বাজারের আড়তে। সেখানেও টাকা খাটায় ওরা। লালাকে চেনানোর জন্যে আর এক জুয়াড়ীকে জোগাড় ক'রে দিল ছেনি। সেই জুয়াড়ীও জানল না কি তার কাজ। তাকে বলা হ'ল লালাকে কেবল জিজ্ঞাসা করবে এই ভদ্রলোককে কিছু সব্জী সস্তায় ক'রে দিতে পারবে কিনা, এঁর আত্মীয় বাড়ীতে শ্রাদ্ধ আছে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক লালাকে চিনে নিল খন্দের সেজে। পরদিন তারই ইসারায়

সাদা পোষাকের পুলিশ বাজার থেকেই লালাকে তুলে নিল।

তারা যে ধরনের কাজ করে তাতে অন্য যে কোন কারণেও পুলিশের হাতে পড়া তাদের কাছে দারুণ বিপর্যয়ের ব্যাপার হ'তে পারে। হয়ত এমনও হ'তে পারে যে সমস্ত অস্তিত্ব ধরেই টান পড়বে। তাই লালা ধরা পড়া মাত্র তার দাদারা তৎপর হয়ে লাখনকে ধরে পুলিশের হাতে জমা ক'রে আসামী হিসেবে লালাকে গারদে ঢোকাবার আগেই তাকে ছাড়িয়ে আনল এই চুক্তিতে যে যখনই প্রয়োজন হবে লালা সাক্ষী হিসেবে হাজির থাকবে। সাক্ষ্য দিতে পারবে যে সে লাখনকে সৌদামিনীর ঘরে থাকতে দেখেছে লাখন তাকে সৌদামিনীর ঘরে ডেকে নিয়ে গেছে। খুনের ব্যাপারটা সে না জানলেও একথাও বলবে যে রাত্রে খুন হয়েছে বলে সে পরে জানল তার পরদিন সকালে লাখন এসে লালার কাছে কিছু টাকা চায় এবং বলে আসানসোল যাবে তার কাছে গাড়ীভাড়ার টাকা নেই। লালা টাকা না দিলে লাখন একটা থাকবার জায়গা দেখে দিতে বলে এবং সেই অনুসারেই পিলখানাতে মাধো সিং-এর কাছে লালা ওকে পাঠায়।

মাধো সিং জাগীন্দার সিং হাওড়া পিলখানার মস্ত বড় নাম। বিরাট এলাকার সামন্ত রাজ। প্রচুর সৈন্য সামন্ত, গাড়ী, লোক লস্কর। এলাকার চোর ডাকাত সব তার অধীন, তাকে নিয়মিত প্রণামী দিলে সেখানে আরামে বসবাস ক'রতে পারা যায়। তবে এলাকার যেখানেই রোজগার করুক জাগীন্দারকে তার ভাগ দিতে হবে। লালাদের সুবাদেই সেখানে জায়গা পেয়েছিল লাখন, ওরা তাই সেখান থেকে ডেকে এনে পুলিশের হাতে হাওয়ালা করে দিতে পারল অতি সহজেই।

সরমার মনে হ'ল তার আর নিজের কেউ রইল না। একান্ত আপনজনটি চলে গেল। এতই আকস্মিক যে শুনে সে হতভম্ব হয়ে রইল। তার চোখ থেকে অঝোর ধারায় জল ঝরতে লাগল। এমনই তার বেগ যে পুলিশ যখন সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রছে সবাই যে যার মত কথা বলল, উত্তর দিল, কিন্তু সে নিজে কেবল কেঁদেই গেল। পুলিশ কর্তার ধমকানির উত্তরেও সে কোন কথা বলল না, তার বলার সাধ্য নেই বুঝে তাকে তখনকার মত রেহাই দিলেও কান্না তাকে ছাড়ল না; অশ্রু ফুরিয়ে গেলেও ব্যথা জমে বরফ হয়ে আটকে রইল। সে নিজেও জমে পাথর হয়ে গেল। আর সকলে দৈনন্দিন কাজে রোজকার মতই মগ্ন হ'ল সরমা পারল না। সে ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে রইল। ঘটনাটা যে বিস্ময় এবং বেদনা বয়ে এনেছিল তা বহনের ক্ষমতা সরমার মনের ছিল না। তাই দুর্বহ বোঝা তাকে স্থবির করে দিল। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে ঢুকল, স্নান ক'রল না, খেল না, কোনকাজ

নয়। বাড়ীতে এমন ডামাডোলের মধ্যে ছেলেটা কাঁদছে দেখে দাসী এসে ছেলের খাবার কথা বলতেও কোন উত্তর ক'রল না।

সোনামনি সৌদামিনীকে খুব যে পছন্দ ক'রত এমন নয় বরং বাড়ীর মধ্যে ঐ একটি মাত্র ঘরে তার মালিকানা না থাকার জন্যে মনের মধ্যে কাঁটা হয়ে বিঁধেই ছিল। এমন আকস্মিকভাবে যে সৌদামিনী ঘর ছেড়ে চলে যাবে এমনটি তার স্বপ্নের আওতার বাইরে ছিল। তবু তা ঘটে যাওয়ায় সে যে খুব খুশি এমনটা মনে হ'ল না অজানা এক আতংকের কারণে। ভয় মানুষের সব অনুভূতি পলকে দূরে সরিয়ে দেয়। একাই সে সমস্ত মনটিকে জুড়ে বসে থাকে। যতক্ষণ থাকে রাজার মত একচ্ছত্র থাকে। সেই অনুভূতিই তাকে ব্যাকুল ক'রে রেখেছিল বলে অন্য ভাবনা আর কাছে আসছিল না। দাসীর কাছে খবর পেয়ে সে নিজেও গিয়ে সরমাকে স্বাভাবিক করবার অনেক চেষ্টা ক'রে ফিরে এসেছিল। ছেলেটা কাঁদছে শুনে বলল, যাও ছেলেটাকে ওর মামার দোকানে দিয়ে এস, হোটেলেই তো খাওয়া, খাইয়ে দেবে।

ছেলেটাকে নিয়ে যাবার সময়ও সরমা কিছু বলল না।

বেশ বেলা হ'লে পুলিশের মড়া-ফেলা গাড়ী যখন সৌদামিনীকে নিতে এল পুতুলদি ওপরে এসে সরমাকে বলল, এতই যদি ভালবাসিস লা, এখন শেষ বেলাতে মেয়েটাকে একবার দেখে নে। ওরা ওকে নিতে এসেছে, আর কোনদিন দেখতে পাবিনি।

পুতুলদির কথায় বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত হু হু ক'রে কেঁদে উঠল সরমা। জীবনে আর কোনদিনই দেখা হবে না। শেষ দেখা। অন্তরময় বয়ে চলেছে বৈশাখের বাতাস, সবই যেন শূন্যময়। কাল বিকালেও যার সঙ্গে দেখা কথা বলা হয়েছে সে আজ আর কোথাও নেই। কি দেখবে সরমা? কাকে দেখবে? ও কি উঠবে? কথা বলবে? তেমনি ক'রে হেসে বলবে, আমি আর এখানে থাকব না সরমা। বাড়ী ক'রে চলে যাব, তুইও আমার সঙ্গে যাবি। বাড়ীউলির সঙ্গে হিসেব মিটিয়ে নে।

চলে সে গেল কিন্তু কোথায় গেল? সরমার জিজ্ঞাসাটা ব্যাকুল হয়ে মনোময় ছুটে বেড়াচ্ছে। এভাবে আমাকে ফেলে কোথায় চলে গেলি?—বুক চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। আছাড় খেতে ইচ্ছা করছে মাটিতে। নিজেকে ধরে রাখছে অন্য একটি সত্তা দিয়ে। পুতুলদি সংযত তবু বেদনাক্রান্ত স্বরে বলল, ওঠ। চল। চলে যাবে। জানি তোকে ও বড়ই ভালবাসত। কাকেই বা না বাসত বল? এই তো আমাদের জীবন, কি বা ক'রবি?

পুতুলদিই সরমাকে ধরে ধরে নিচে নিয়ে এল। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। দেখলেই ভয়ে গা ছম ছম করে। কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে না। তারই মধ্যে দুজন মিশকালো ষণ্ডামত লোক আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে জড়ানো একটা লম্বা পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে গেল, তার মধ্যে একটা মানুষ অনুমান করা গেলেও তাতে সৌদামিনীর চিহ্ন পেল না সরমা। মনে হ'ল সে বোধ হয় ঘরেই আছে। ভিড়

সরে গেলেই দরজা ফাঁক ক'রে বেরিয়ে আসবে, বলবে, এত ভিড় কেন রে? কি হয়েছে?

চোখের সামনেই সৌদামিনীর ঘরে শেকল তুলে তালা লাগাল একজন পুলিশ। সোনামনিকে ডেকে বলল, চল থানায়। তোমাকে কাগজে টিপ দিতে হবে।

বাধ্য মানুষের মত সোনামনি পুলিশের পেছন পেছন বেরিয়ে পড়ল। সকলেই তখন বিমর্ষ, বিষণ্ন, অনেকে চোখের জল মুচছে। বাড়ীর সহবাসীরা সকলেই তখন নিজের অসহায়তাকে পরিষ্কার ভাবে প্রত্যক্ষ করছে। সহবাসী স্বজনের এমন আকস্মিক মৃত্যু সকলকে এমনই এক সত্যের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে আপন দীনতার ক্লেশে কেউ কারও দিকে তাকাতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রত্যেকে এক একটি জড় মূর্তির মত।

এবং সব স্থবির মূর্তিগুলোর সামনে দিয়ে একটি নষ্ট অস্তিত্বের প্রমাণ বয়ে নিয়ে গেল একদল রোবট যাদের হাত পা কর্তব্য সাধনের ক্ষমতা—সবই আছে নেই কেবল নিজের কোন হৃদয়। তারা কেবল কর্তব্যের নির্দেশে নীরবে সব কাজ করে যায় অপরের কাছে প্রিয় অপ্রিয় যাই হোক না কেন। তাই যখন রোবটের উর্দি থাকে তারা হয় পুলিশ। ওরা কেবল সৌদামিনীর শব নিয়ে গেল না সরমার হৃদয় ছিঁড়ে দিয়ে গেল।

বাড়ীর বাইরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দিলু মিত্রও সব দেখছিল। এখানকার জগতে ও অন্যগ্রহের মানুষ। সম্পূর্ণই বহিরাগত, অসহায়। যতদিন আছে একই অবস্থাতে আছে। এই নিবিড় একাকীত্বে ওর যে একটি মাত্র আপনজন ছিল তার অকস্মাৎ হারিয়ে যাওয়া, আর এভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া দিলুকে হতবাক্ করে দিয়েছিল। প্রচণ্ড বেদনা ও অন্তর্বাহিনী অশ্রু তার হৃদয়কে এমনই জারিত ক'রে তুলেছে যে তার সমস্ত ভাবনার পথ রুদ্ধ হয়ে মনের ভেতরে আটকে পড়া বেদনা অবিরাম পাক খেয়ে আঘাত ক'রতে ক'রতে যেন চূর্ণ ক'রে দিতে চাইছে তার হৃদয়টাকেই। দুঃসহ যন্ত্রণা বুকের মধ্যে ধরে সে সৌদামিনীর বাড়ীর দিকে ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রীতিহীনতার মরুভূমিতে যে একটি মাত্র বৃক্ষের তলায় তার আশ্রয় ছিল সেই বৃক্ষটির অকস্মাৎ উন্মূলন তাকে যে অসহায়তার মধ্যে নিক্ষেপ ক'রল তার শূন্যতা অসহ্য। সেই দুঃসহ শূন্যতার বোঝা নিয়ে কৌতূহলী জনতার মধ্যে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মত নিছক একটি অবয়ব হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। তার সামনে চঞ্চল জনতা, পুলিশের নিশ্চল বাধাদান, কিছুই তার দৃষ্টিতে আসছে না, চারপাশের গুঞ্জন ধ্বনি কানে আসছে, শব্দ শুনছে, কোন কথা মনে ঢুকছে না। তার দাঁড়িয়ে থাকাটা থাকা মাত্র, অস্তিত্বহীন অবস্থান।

একসময় ভিড় সরে গেল। কালো একটা বন্ধ গাড়ী লাশ নিয়ে গেল। পুলিশ

বাহিনী চলে গেল, দিলু মিত্র সামনের দেয়ালে হেলান দিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল সরমাদের বাড়ীর সদরে চেয়ে। যে সব ঘটনা তার সামনে ঘটে গেল তার কোনটারই সে সাক্ষী নয়। কারণ সে কিছুই দেখেনি, কোনটাই বোঝে নি কি হ'ল। সরমার ছেলেকে ও বাড়ীর দাসী তার কাছে দিতে এসে বন্ধ দোকান থেকে ফিরে গেছে তাও সে জানে না। সৌদামিনীর অস্তিত্ব তার কাছে যত বাস্তব ছিল মৃত্যু তার চেয়ে বহুগুণ ভারী হয়ে পড়ল। মৃত সৌদামিনী এত প্রবল হ'ল যে দিলুর বুক ভরে রইল সৌদামিনীর ভার।

এত থাকতে ওরই কি মরবার সময় হ'ল! কত জরাজীর্ণ মানুষ নিজের কাছে বোঝা হয়ে কষ্ট পেয়ে বেড়াচ্ছে অথচ এই ভরা যৌবনে জীবন যখন অর্দ্ধেক পার হয়নি তখন কি মরে মানুষ! যে মারল সে-ই বা কেমন! অমন একটা সুন্দর মেয়েকে, যার দেহ সুন্দর তার চেয়ে বেশি সুন্দর মন—তাকে মারতে হাত উঠল! দিলুর মনে এই সব প্রশ্নের আলোড়ন চলতে লাগল। সে মৃত্যুকে এমনভাবে আর কখনও দেখেনি। মৃত্যু শব্দটা চিরদিনই আতঙ্কের, কিন্তু এ যেন সব শূন্য করে দিয়ে যায়। হঠাৎ এসে দুদিনের পরিচয়ে কেউ কাউকে এমন আপন ক'রে নিতে পারে তিলমাত্র স্বার্থ শূন্য সম্পর্কেও এমন ভালবাসতে পারে এখানে না এলে দিলুর সারাজীবন তা না দেখাই থেকে যেত।

জীবনে কোনদিন যা হয়নি এবার তাই হল। নিজেকে বড় অসহায় বোধ হ'তে লাগল দিলুর। তার কোনই ক্ষমতা নেই, প্রতিকার ক'রতে পারছে না সে, মেয়েটাকে রক্ষা ক'রতে পর্যন্ত পারল না। একজন শিশুর যেমন ভরসাস্থল থাকে তার মা, নদীর যেমন নির্ভরতা তার দুই কূল, দিলু জানল তারও ছিল একজন যে তার চেয়ে ছোট, শক্তিতে তার তুলনায় দুর্বল, সঙ্গীতহীন অথচ দিলুর জন্যে সে অসামান্য, অসীম। এই প্রতিকূল পরিবেশে স্বজন বর্জিত বিপন্নতায় অমন নির্ভরযোগ্য আর কেউ ছিল না; সেই নির্ভরতা আর রইল না।

দিলু সেদিন আর দোকান খুলল না। বন্ধ দোকানের মধ্যে শুয়ে নীরবে বিজনে অশ্রুমোচন ক'রে হতভাগ্য বারাঙ্গনার প্রতি মরনোত্তর অর্ঘ নিবেদন ক'রতে লাগল। এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই যে যার মত আসে যায়, প্রকৃতপক্ষে কারও সঙ্গে কারও কোনই সম্পর্ক থাকে না। সম্পর্ক গড়ে নিতে হয়, গড়ে ওঠে। আবার সেই সম্পর্ক মুছে যায় মৃত্যুতে। কারও কোন চিহ্ন থাকে না সম্পর্কেরও কোন জের থাকে না।

পৃথিবীর প্রাণী মাত্রেরই অসহায়তা এইখানে যে, যে মরে সে মরে, তার কিছু করবার থাকে না, আর যে বেঁচে থাকে তাকেও বেঁচে থাকতে হয় তারও কোন বিকল্প থাকে না। সৌদামিনীর মৃত্যু যেমন অসহায়তা তেমনই দিলুর বেঁচে থাকাও। কিছুই যেমন স্থায়ী নয় সৌদামিনীর শোকও তেমনই ভুল হয়ে গেল। জীবনের গতিতেই জীবন চলতে লাগল দিলু মিত্রের। যারা কাপড় কাচতে দিয়ে

ছিল তাদের ডাকেই পরদিন লণ্ড্রী খুলতে হ'ল দিলুকে, খোলার জন্যে কাপড় এল তাও নিতে হ'ল—সবই যথাযথ চলতে লাগল, কেবল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সৌদামিনী নামধারী একটি মনুষ্য প্রাণ। তার উদার হৃদয়, মানুষের জন্যে সহানুভূতি সব নিয়ে সে মুছে গেল এই পৃথিবী থেকে কেবল দিলু মিত্রের মন জুড়ে দাগ হয়ে রইল। রইল তার গোপন ঋণ যা সৌদামিনী সহযোগিতার জন্যেই দিয়েছিল, হয়ত যা তার অকালমৃত্যুর কারণ।

সরমা স্থির ক'রল সে আর এ বাড়ীতে থাকবে না। একদিন দুপুরের দিকে দিলুকে মনের কথা জানিয়ে বলল, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ না ভাল কোন বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়া পাও কিনা।

পাকিস্তান হওয়াতে কলকাতা জুড়ে যেমন জন প্লাবন হঠাৎ এসেছে তার ঢেউ তো এ পাড়াতেও লেগেছে, এখানেও কম কুমারী অধবা হ'তে আসে নি। অধবা কথাটা সৌদামিনীরই আবিষ্কার, বলত এখানে আমরা বিধবা হবো না কারণ সধবা তো নই।

তারই বয়স্ব প্রণতি সেই হাসি মস্করাতে ইন্ধন জোগাতে বলল, বাঃ বেশ বলেচিস। আমরা তবে কি? না বিধবা না সধবা—কি তবে?

আমরা সব অধবা। এটা হ'ল অধবাদের পল্লী। বুঝলি?

কাতারে কাতারে মেয়ে শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দালালদের হাত ধরে এখানে অধবা হবার জন্যে এসে পড়েছে বলে কাঁচা ঘর যা এতদিন চামচিকে থাকত, তা আর ফাঁকা নেই। দিলু অত বিস্তারিত না বলে সংক্ষেপেই জানাল, এ্যাহোন ঘর তো খালি দেখতিছি নে।

ঘর কি এক জায়গা ব'সে দেখতি পাবে? ঘর পাতি গেলি খুঁজতি হবে।

কনে খোজবো?

সে তুমি জানো। আমি কি পুরুষ মানুষ! তবে কথাটা কাউরে কইয়ে না। এহেনে কেউ যেন জানতি না পারে।

দিলু চুপ করে শুনল। এখানে জানতে পারলে নানারকম অসুবিধে সৃষ্টি হবে একথা দিলু বোঝে। এই ক'বছরে সে এখানে যেমন জমে গেছে এখানকার মানুষের ধারাটাও ধরে ফেলেছে ভালভাবেই। সারা সমাজে সৌদামিনীরা সংখ্যায় সামান্য। অসংখ্য হচ্ছে সোনামনির দল, এই পল্লীও তো সেই বৃহৎ সমাজেরই অংশ, সেই মনুষ্য সমাজ থেকে ছিটকে এসে বসত করা মানুষেরই ভগ্নাংশ। যারা আসে তারা মানুষের যা ধর্ম তা সঙ্গে ক'রেই আসে। বরং এখানে এসে তাদের নীচতা আরও নিচে নামে, ক্ষুদ্রতা আরও ক্ষুদ্র হয়। কারণ পারিপার্শ্বিকতাই তাই। ক্ষুদ্রত্বের প্রতিযোগিতা এখানে। এ তো অপরজীবি প্রাণীর সমাবেশ। নানা জাতের জোঁক

এখানে থিক থিক ক'রছে। ছারপোকা, জোঁক, মশা, এঁটুলি প্রভৃতি সমস্ত রকমের রক্তশোষক প্রাণী যদি কোন জীবদেহের ওপর একসঙ্গে বসে তবে যেমন দেখায় এ পল্লী সেই রকম। বাড়ীর মালিক, বাড়ীউলি, দালাল, গলির গুণ্ডা, পুলিশ, সবাই মিলে এই হতভাগ্য মেয়েগুলোকে শোষণ ক'রছে। কাজেই কারও পক্ষেই এই শোষণ থেকে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই অথবা শোষিতের সামান্য স্বাধীনতা এখানে অস্বীকৃত। মানুষ পৃথিবীর দুর্বল প্রাণীদের যেমন শোষণের জন্যে বেঁধে রাখে বা আটকে রাখে তেমনই করে গরু, ছাগল, মুরগী, গাধা বা ঘোড়ার মত আটকে রাখা হয় এখানে মেয়েদেরও। তারা অদৃশ্য বন্ধনে বন্দী! মুক্তি পাবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না ইচ্ছে মত স্থান বদলও ক'রতে পারে না তারা, তাদের ইচ্ছার কোন মূল্যই স্বীকৃত নয়। দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে এখানে আলাদা আইন চলে, যে আইন এখানকার নিজস্ব। যে আইন অলিখিত ইচ্ছামত চলে, যে চালাতে পারে তার ইচ্ছায় চলে।

সরমার কথা মন দিয়ে শুনে দিলু প্রশ্ন করল, এতদিন আছো এহেনে এ বাড়ী ছাড়বা ক্যানো? এহেনে অসুবিদেডা কি হলো?

আমার ঘরখানের মদ্দি কাপড় টাঙ্গায়ে ভাগ কোয়রে রোজ রাত্তিরি আর একজন মায়েরে শুতি দেচে বাড়ীউলি।

কারে দেচে?

তার কোন ঠিক আছে! যারে পাচে তারে দেচে। একখানা ঘরের মদ্দি দুজন কাজ কাম করতি পারে? বাড়ীউলি বলে খুব পারে। কত ঘর দ্যাহো তিন চারজন একসাথে শোচ্চে। তা যে পারে সে থাউক আমি পারবো না নে।

দিলুও মনে মনে বিচলিত হ'ল, সত্যিই তো সম্ভব বলে একটা কিছু তো আছে। পাশাপাশি কেবল একটা কাপড়ের পর্দার আড়াল ক'রে শোয়া কি ক'রে সম্ভব? এই পাড়াতে প্রকাশ্যে দেহ সম্পর্কের বাজারে একই সঙ্গে এতদিন আছে দিলু কিন্তু সরমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা কখনও সে করেনি, সরমাও তার কাজের ব্যাপারে কথা বলেনি কোনদিন। তাদের দুজনের ব্যবহারেও যেন অমনই একটা পর্দার আড়াল মাত্র যার দুপাশ দেখা যায়, কেউ দেখে না অথবা দেখছে তা বলে না।

দিলুর ঘাড়ে সরমার সংকট চড়ে বসতেই সে বিপদে পড়ল। এ পাড়াতে সে নিজের মত থাকে। নিজের দোকানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে সারাদিন। দুপুরবেলায় রোজ একবার সরমার কাছে যখন আসে দোকান বন্ধ থাকে। খাঁ খাঁ দুপুরে এপাড়ার বাড়ীগুলো নিশুতি হতে চায়। যে মেয়েদের ভাগ্য ভাল যে আগের রাতে সারারাতের খদ্দের পেয়েছে দুপুর বেলাটা ঘুমোয়। গ্রীষ্মের দুপুর হলে মাত্র একটা সেমিজ কিংবা কেবল একটা কাঁচুলি পরেই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে থাকে শরীর ঠাণ্ডা ক'রতে, নইলে কেউ বড়জোর একটা মাদুর বিছিয়ে নেয় ড্যাম্প ওঠা মেঝের

ওপর। ঘরের দরজা বন্ধ করবার রেওয়াজ বিশেষ নেই কারণ সবই তো বারোয়ারী, বারোয়ারী জায়গায় আবার কপাট থাকে কবে? কপাট লাগে রাতে যখন ঘরগুলো আর সার্বজনীন না থেকে 'পেরাইভেট' হয়।

যাকে তাকে দেহদান ক'রে যাদের অভ্যেস সেই উপযাচিকারা কেনই বা দেহ সম্পর্কে অহেতুক লজ্জাবোধ রাখবে? তাদের গোপন কিছু নেই বলে কে এল আর কে গেল তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না। আর দিলু তো তাদের আপন লোক। এমন নিরুপদ্রব মানুষ তো বড চোখে পড়েই না, তাই ওর আসা যাওয়া নিয়ে কোনই কথা ওঠে না। এর মধ্যে অনেকেই তো আবার মনের মানুষ নিয়ে ঘরকন্নাও করে। পাশের বাড়ী জয়ন্তীদি যেমন, গোপালবাবু তো এখানেই থাকে খায়, জয়ন্তীদির সঙ্গে রান্নাতে সাহায্য করে সহযোগিতাও করে। গোপালবাবুই বাজার করে, মাছ কাটে, কুটনো কোটে, উনোনে আগুন দেয় সকালবেলা রাস্তার দোকান থেকে ভাঁড়ের চা এনে জয়ন্তীদিকে দিয়ে নিজেও বসে বসে বিস্কুট ডুবিয়ে খেয়ে নেয়। গৃহস্থালীর কাজের বাইরেও কি যেন করে লোকটা, দিনের অনেকটা সময়ই বাড়ী থাকে না, বাড়ীর বাইরে কোথায় থাকে মেয়েরা কেউ তার হদিশ রাখে না। কি দরকারেই বা রাখবে? পাশের বাড়ীতে না হয় ঐ গোপালবাবু একা, নীলমণি মিত্তিরের গলিতে আগে থাকত সুরবালা, সেই ছেলেবেলাতে তখন দেখত সকলেরই অমন একজন ক'রে বাঁধা মানুষ থাকত। তার মা নীহারবালারও ছিল। সুরবালা বড় হয়ে শুনেছে নীহারবালা নাকি সেই বাবুটার সঙ্গে এসেই নীলমণি মিত্তিরের গলির চার নম্বর বাড়ীতে ঘর ভাড়া নেয়, প্রথমটা গরাণহাটায় ছিল কাজ কর্মের অসুবিধে হওয়াতে বাড়ী পালটায়। সুরবালা যখন বেশ বড় হ'ল দেখত তার মায়ের সেই বাবুটার সঙ্গেই রোজ একজন করে নতুন নতুন লোক আসত সন্ধেবেলায়। মা সন্ধে হলেই পাশের ঘরে পড়তে বসাতো মহাদেব মাস্টারের হেফাজতে। মহাদেব মাস্টার আর কতক্ষণই বা থাকবে, সে বেচারী উঠে গেলেই যে সুরবালা উঠে পড়বে সে হুকুম ছিল না। অনেকটা রাতে মা এলে ডাকতো তবেই তার ছুটি। মুক্তি। মাঝে-মাঝে খোলা বইয়ের ওপরই ঘুমিয়ে পড়ত, নীহার এসে ডেকে তুলত। মায়ের প্রতি অভিমান এবং দুঃখও হ'ত তখন, বড় হয়ে কার্যকারণ সম্পর্কবোধ যখন হয়েছে তখন সব বুঝেছে।

মহাদেব মাস্টার পড়াতে আসত, সুরবালা পড়তে বসত কিন্তু না ছিল পড়ানোয় আগ্রহ, না ওর পড়ায়। ফলে গোচারণ ভূমির পাঠ পর্যন্ত হেঁটে বিদ্যাভ্যাস থেমে গেল। পুরসুন্দরী পাঠশালায় পর পর তিনবার ক্লাস পেরোতে না পেরে বিদ্যার্চনা ঐ যে থমকে রইল সে থামা চিরন্তন হয়ে গেল। মহাদেব মাস্টারের উৎসাহের তবু অন্ত ছিল না, সে যেমন আসবার তেমনই আসতে লাগলে নীহারবালাই একদিন বলে দিল, খুব তো হ'ল মাস্টার। মেয়ে আমার তিন কেলাসের পড়াতেই তিনবার ঠোক্কর খেলে। আমার তো বাপু গতর খাটানো পয়সা অমন ক'রে নষ্ট ক'রতে কষ্ট হয়।

মেয়ের আর আমার পড়ে কাজ নেই—বলে আঁচলের খুঁট থেকে সতেরআনা পয়সা বের ক'রে মহাদেব মাস্টারের হাতে দিয়ে বলল, আমরা বাবু মুখ্খু সুখ্খু মানুষ, ধম্মো ভয় আছে ফাঁকি দিতে পারব না ; আজ পঞ্জম্ভ এয়েচ তার পয়সা মিটালুম।

সুরবালা তখন বারো পেরিয়ে তেরোয় পা। নীহাররালা সুরূপা ছিল না বলে সুরবালাও রূপ পায়নি শরীরে, কিন্তু যাকে গতর বলে তার প্রকাশ তখন তার মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারছে। ব্যাপারটা সাধারণ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক না হ'লেও নীহারবালা লক্ষ ক'রল তার মেয়ের বেলায় তা ঘটছে। শরীর নিয়ে সওদা করা মানুষেরা জানে অমন হয়েই থাকে, তাই তাদের কাছে এটা কোন ঘটনাও নয় দুর্ঘটনাও নয়। নীহার জানে এই রূপযৌবনের বাজারে যারা বসে আছে দুটোই যাদের থাকে তারা দামে বিকোয় দ্বিতীয়টা থাকলেও ক'রে খাওয়া চলে, নিশ্চিন্ত হ'ল তার মেয়ের ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। তবে এখানকার হাটুরেদের তো সে চেনে তাই চিন্তা হ'ল অল্প বয়সের মেয়েকে তার আগলে রাখতে হবে। নইলে চোদ্দ পনের বছরে যদি লোকে ধরে বাজারে নামিয়ে নেয় তো বয়সের যৌবন পার হ'তে হবে না, অল্প বয়েসেই ওকে ফুরিয়ে যেতে হবে। বাকি জীবন চলতে পারবে না। কিন্তু করে বা কি ? কেমন ক'রে মেয়েটিকে আগলে রাখে আড়ালে ? বাইরের মানুষ যেখানে ঘরের মধ্যে শুঁড়িখানা বসায় সেখানে কি আর আড়াল বলে কিছু থাকে ?

তবু নীহারবালা রেখে ছিল। খুব চোখে চোখে আগলে রেখেছিল মেয়েকে। কতদিন কত মাস কত বছর সুরবালার মনে পড়ে না তবে মার মনে বোধহয় কোন লুকোনো স্বপ্ন ছিল আর সেই ফাঁক দিয়েই একদিন সাপ এসে দংশন করল সুর-বালাকে। তখন বেশ বড় হয়ে গেছে সুরবালা চট করে এতটা বড় যে একবুক উপচীয়মান যৌবনকে সামান্য একটুকরো কাপড়ের বাঁধনে আর আটকে রাখা যাচ্ছে না। চোখে মুখে সারা শরীরে বন্যার জলের মত উপচে পড়ছে আগলভাঙ্গা যৌবন। পবনবাবুর প্রশ্রয় পেয়ে অবিরাম সে ঢেউ ভাঙ্গছে, কুল ছাপাতে চাইছে। ঠিক এমন সময়েই মায়ের বাবুটি একদিন বলল, এতদিনে পেয়েছি নীহার। অল্প-বয়স্ক একটি লোক পেয়েচি, তবে দোজবরে।

রাজি আছে ? মা জিজ্ঞাসা ক'রল।

তবেই না বলচি। আমি তাকে সব বলেচি। মেয়ে দেখতে ডাগর হলে কি হবে কচি বয়েস, হাত পড়া তো দুরস্থান কোনদিন কারও চোখ পর্যন্ত পড়েনি তাও বলেচি। সব শুনে সে রাজি।

কি নেবে ?

টাকা পয়সার কথা কিছু হয়নি, আগে দেখাশোনা তো হোক।

কি করে ছেলেটি ?

দোকান আছে।

নিজের দোকান ?

হ্যাঁ গো। শাঁকারীপাড়ায় সিগারেট বিড়ির বেশ বড় দোকান। বাপের দোকান ছেলেতে পেয়েছে। চালাচ্চে। আমি সে দোকান গিয়ে দেখেচি।

তবু মা বাজিয়ে দেখবার জন্যে জানতে চাইল, তোমার সঙ্গে নাইনে আলাপ হ'ল ?

না গো। ভাল ছেলে। এ লাইনে আসে না।

বাবুটিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নীহার। ও-ও তো কম কিছু ছিল না, নীহার বিশ্বাস করে, দোকান, নিজের বাড়ী সবই তো একদিন ছিল মানুষটার। শুধু ভালবাসার টানে সব ছেড়ে এখানে পড়ে আছে। তখন কত কত টাকা আনত। কোথায় না নিয়ে গেছে নীহারকে সিনেমা থিয়েটার, একবার তো সার্কাসেও নিয়ে গিয়েছিল মানুষটা। জীবনে সেই প্রথম এবং একবারই সার্কাস দেখা। এখনও প্রসঙ্গ উঠলে সে স্মৃতি মনে পড়ে নীহারের। বাবাঃ কি ভয়ই লেগেছিল চোখের সামনে দু দুটো বাঘকে দেখে। ছবির বাঘ নয় সেজে থাকা বাঘও নয় জলজ্যান্ত আস্ত বাঘ—কি তাদের চলন ! একবার তো হঠাৎ ঘাঁত ক'রে উঠতেই নীহার চমকে উঠে শীর্ণ হাতই চেপে ধরেছিল রোগা চেহারার লালচাঁদ বাবুটির।

লালচাঁদকে রোগে ধরেছিল, প্রণয় রোগ। নীহারবালার শরীরে সে যে কি পেল তা আর ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার নয়, অপরের পক্ষে বোঝবার মতও নয়। বাবা ফটিকচাঁদ কলকাতার শহরে দু'খানা দোকান আর একখানা বসত বাড়ী ছেলের হাতে রেখে দেহান্তরের সময় গিন্নীকে ডেকে সজ্ঞানে বলে গিয়েছিল, আমি যা রেখে গেলুম তোমাদের সারাজীবনেও অভাব হবে না। দেখে নিতে পারলে লালচাঁদ আরও একখানা বাড়ী ক'রতে পারবে।

মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সেই যে গঙ্গালাভ করতে হবে একথা কে জানত ! ভাই নদের চাঁদও দাদার দোকানে জীবনপাত ক'রছিল ছেলেবেলা থেকেই। সকলের ধারণা ছিল দুটো দোকান দুভায়ের হবে কিন্তু ফটিকচাঁদ সবই যেহেতু নিজের নামে করেছিল তাই দাদা আচমকা মারা যাওয়ায় ভাইপো লালচাঁদ দুটোরই মালিক হয়ে বসল। তখন লালচাঁদ ছাব্বিশ বছরের যুবক কিন্তু বাপের দোকানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। প্রয়োজনীয় টাকার যোগান মার কাছে পেয়ে যেত বলে গিলে করা পাঞ্জাবী আর ফিনলে মিলের ফিনফিনে ধুতি পরে ফুর ফুর ক'রে উড়ে বেড়ানোটা বেশ ভালই রপ্ত করে ফেলেছিল। কলুটোলার লোচন মল্লিক, বউ বাজারের নব দত্ত, আহিরীটোলার শ্যাম দত্ত—বন্ধুরা সব বিত্তবান পরিবার থেকেই একসঙ্গে জুটেছিল। মরবার দুবছর আগে থেকেই বাপ ছেলের বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল কিন্তু লালচাঁদের পছন্দ মত মেয়ে জোগাড় আর কিছুতেই হচ্ছিল না। লালচাঁদের চোখে ধরবার মত মেয়ে ফটিকচাঁদের জানাশোনার মধ্যে ছিলই না। রঙ যদিবা মেলে তো তার শরীর রোগা, নয়তো মুখে তেমন শ্রী নেই

ইত্যাদি। বর্ণ, শ্রী, ছাঁদ, একসঙ্গে হচ্ছিল না কিছুতেই। ফলে ছেলের বিয়েটা দিতে না পেরেই বাপ লোকান্তরিত হল। নদেরচাঁদ অকূল পাথারে পড়ল। ভাইপোর বন্ধুদের সম্পর্কে তার কিছু খবরাখবর ছিল। দাদা যে তার জন্যে কিছুই দিয়ে যাবে না এমনটা সে ভাবেনি। তাই শংকিত হয়ে বৌদিকে বলল, বৌঠান, দাদার কাছে কাজ ক'রছিলুম তার একটা মর্যাদা ছিল। এখন আর আমার দোকানে থাকা চলে না। শ্রাদ্ধশান্তি তো মিটে গেছে লালু এখন সব বুঝে নিক আমি বরং অন্য চেষ্টা করি।

লালচাঁদের স্বল্পবুদ্ধি মায়ের তাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না বা অরাজী হবার কোন কারণই ছিল না বরং ছেলে এমন সহজে সব পেয়ে যাবে এতে আনন্দই হল। আর কাকা তাকে দোকান ছেড়ে দিয়েছে এখবরে বন্ধুমহল উৎসাহিত হ'য়ে বলল, চল লেলো এমন একটা শুভ খবর চুপচাপ হজম ক'রবি! সেলিব্রেট ক'রে আসি।

কিভাবে হবে গবেষণা ক'রতে গিয়ে ছেনো মিত্তির প্রস্তাব ক'রল, চল আজ সোনাগাছি যাই।

অনেক রকম স্ফুর্তির অভিজ্ঞতা লালচাঁদের ছিল তার মধ্যে ভাঙ খাওয়াটাই প্রধান. এবার নতুন আনন্দে অভিষেক হ'ল। নারী বলতে মা মাসি, পিসি-দের ছাড়াও, কাকার মেয়ে লাবু তার বন্ধু জুলি—মেয়ে বলতে জানার দৌড় তার ঐ পর্যন্তই এবং দূরত্ব থেকে, এই প্রথম একজন নারী সম্পর্কে তার বোধ হল। হোক না গায়ের রঙ চাপা মুখশ্রীতে এমনই তীক্ষ্ণতা যে বুদ্ধির দৌড়ে সরলা পরিচিতারা কেউ কাছে আসে না. ফলে প্রথম চোখ পড়াতেই প্রায় চুম্বকের মত টেনে নিল নীহারবালা।

বন্ধুমহলে বাকচাতুরিতে যতই পটুতা থাক এখানে এসে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল লালচাঁদ। সেই অবস্থাতেই হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ঘরের মধ্যে ওকে ঢুকিয়ে নিল নীহার। ওর তখন হেমন্তেও ঘাম ঝরবার অবস্থা। ঐ বিপন্নতা দেখে নীহার ওকে নিজের সুঠাম দেহের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রমনীয় ভঙ্গীতে প্রশ্ন ক'রল, আমাকে তোমার ভয় ক'রছে নাগর।

নীহারের মাংসল শরীরের স্বাদ লালচাঁদের সমস্ত লোমকূপ দিয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত ভেতরে ঢুকে তার স্নায়ু তন্ত্রীতে নবচেতনার উন্মেষ ঘটাল নিমেষের মধ্যে। এমন অভিজ্ঞতা থাকতে পারে তা জানা ছিল না লালচাঁদের। বন্ধ ঘরের মধ্যে একা সে সম্পূর্ণ অচেনা এই মহিলার সঙ্গে যাকে আধঘন্টা আগে সে চোখে দেখেনি তারই শরীরের স্পর্শে সমস্ত স্নায়ু কেমন সজাগ হয়ে উঠেছে অন্য এক অচেনা অনুভূতির স্বাদে। কিন্তু এর ব্যবহারে একটুও মনে হচ্ছে না যে এর আগে কেউ কাউকে দেখেনি। বরং মনে হচ্ছে কত আপনার জন, কত কালের একান্ত ঘনিষ্ট পরিচয়। নীহার আবার বলল, ভয় কি নাগর? তুমি আসবে বলেই না আমি বসে আছি! চল খাটে বসো।

খাটে বসিয়ে ছোট শিশুকে মানুষ যেমন আদর করে তেমনই ক'রে পাঞ্জাবীর বোতাম খুলে দিতে দিতে বলল, এটা খুলে ফেল। নইলে মিছিমিছি কুঁচকে নষ্ট হয়ে যাবে।

লালচাঁদ বাধ্য ছেলের মত নিজেকে নীহারবালার হাতে ছেড়ে দিল। সে দেখল তার ইচ্ছা অনিচ্ছা সব কেমন হারিয়ে গেছে। এই মেয়েটির প্রভাবে তার নিজস্ব সত্তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। আলিঙ্গন থেকে মেয়েটি তাকে মুক্ত করে দিলেও ওর স্পর্শের স্বাদ সমস্ত শরীর জুড়ে প্রলিপ্ত হয়ে আছে লালচাঁদের। এবং এক লহমার স্পর্শ যেন অসীম বাসনার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল তাকে। সে সেই স্বাদটিকে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল মনে মনে।

নীহারবালা বোতামগুলো খুলে দিতে লালচাঁদ ধপধপে কাচা গিলে করা পাঞ্জাবীটা খুলে ফেলতেই নীহার নিয়ে আলনায় ঝুলিয়ে দিল। ফিরে এসেই দুহাতের পাঞ্জার মধ্যে লালচাঁদের মুখখানা ধরে এমন ক'রে নিজের গালের সঙ্গে ঘষে দিল যে প্রকৃতপক্ষে চুম্বন না ক'রলেও লালচাঁদ তারই স্বাদ পেল।

লালচাঁদকে দেখামাত্রই নীহারবালা বুঝে নিয়েছিল ছোকরাটি এ পাড়ায় প্রথম। দ্বিতীয়ত বুঝেছিল ঘরে পয়সা আছে, ট্যাঁকেও আছে, প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। এখন বুঝল যে কাজে এসেছে তাতে ছোকরাটি আনাড়ী। নীহারের ভাল লাগল। এখানে বেশির ভাগ সেয়ানাদেরই ভীড়। এরকম কাঁচা যুবক বেশি আসে না, এলেও তার কপালে বড় একটা জোটে নি, বেশ কিছুদিন আগে একটা বছর আঠারোর ছোকরা কলেজ পালিয়ে কৌতূহল মেটাতে এসেছিল তাকে নীহার বকে ঝকে ফেরৎ পাঠিয়েছে। আজকের খদ্দের তা নয়, এর আসবার যুক্তি আছে। তাই আপন কামকলা যতটুকু যা জানা আছে প্রয়োগ ক'রে আনন্দ পাচ্ছে নীহার। নীহার আগন্তুকের পক্ষে যুক্তি খুঁজতে চাইল, পূর্ণ যুবক বয়স এখন যদি এদিক সেদিক আসে তো দোষের কি আছে? কত বুড়ো মড়া যে আসে? অন্য সব পোড়ার-মুখীরা তো ছেলে ছোকরা পেলেও কাপড় খুলে দেয় আমার কাছে বাপু ওসব নেই। খদ্দেরের এত অভাব হয়নি যে ছেলে দেখলেই তার কাছে শুতে যাব— কান মুলে পাঠিয়ে দেব আর এ মুখো হবে না—নীহার নিজের মনে মনে আউড়ে নিল কথাগুলো। লালচাঁদকে জিজ্ঞাসা ক'রল, কি খাবে বল? হুইস্কি র‍্যাম না ব্রান্ডি? যেটা পছন্দ কর দিতে পারব। অল্প স্বল্প হলে আমার ঘরে পাবে।

লালচাঁদ এতক্ষণ একটিও কথা বলে নি কেমন এক ভয় তাকে ভেতরে ভেতরে কাঁপাচ্ছিল। খুব সামান্য একটু কাঁপুনি হচ্ছিল শরীরের ভেতরটায়। এতই মৃদু যে বাইরে তার কোন প্রকাশই সম্ভব নয়। নীহার তার বহুদর্শী চোখে লালুর কোন একটা অস্বস্তির খবর পড়ে নিল, চট ক'রে এগিয়ে এসে পা ঝুলিয়ে খাটের উপর বসে থাকা লালুর পা দুটো ধরে উল্টে দিল বিছানার ওপর। মুখে বলল, তখন থেকে বলছি ভয় পাবে না কিছুতে কি শুনছে? আচমকা এমনটা

হওয়াতে খাটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ামাত্র লালুর কোঁচাটা ধরে টেনে সম্পূর্ণ খুলে দিল নীহার। লালু তাড়াতাড়ি উঠে বসবার আগেই তাকে নাস্তানাবুদ ক'রে দিল। উঠে বসবার কোন সুযোগই দিল না। লালু প্রথম কথা বলল, তোমার গায়ে বেশ জোর আছে।

নীহার রসিকতা ক'রে উত্তর দিল, পারবে তো ?

লালু রহস্য বুঝল না। নীহার তার গালে একটা ঠোনা মেরে বলল, সত্যিই ছেলেমানুষ। যাক কি খাবে বল ? লজ্জা ক'রো না। লজ্জার কোন কারণ নেই।

যা খুশি দাও—

হুইস্কিই দুটো গ্লাসে ঢেলে নিল নীহারবালা। তারপরই বলল, দূর শুধু শুধু কি হুইস্কি খায় কেউ ? দাও টাকা, দেখি চিংড়ির কাটলেট আনাই।

শোনামাত্র লালুর রসনা লাফিয়ে উঠল এ্যালেনের চিংড়ি কাটলেট সত্যি খুব চমৎকার। অনেকদিন আগে একবার খেয়েছিল সে, শ্যাম দত্ত খাইয়েছিল। সেই থেকে মনে আছে, যেন মুখে লেগে আছে নাম শুনেই স্বাদ মনে পড়ে গেল। উঠে বসে পকেট থেকে নোট বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল, কে আনবে ?

দেখ না কে আনে। বলেই দরজা খুলে মাসি মাসি বলে ডাকতেই একজন বয়স্কা মহিলা এসে টাকা আর হুকুম নিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক ধরে চিংড়ি চিবিয়ে আর হুইস্কি খেয়ে লালুর লজ্জা সরম আড়াল আবরণ আর কিছু রইল না। পরণের ধুতি মাটিতে গড়াতে লাগল, তার খেয়াল রইল না। নীহার নিজে সামান্য একটু পান ক'রেছিল বলে চেতনা পূর্ণ মাত্রায় বজায় আছে, সে ইচ্ছে করেই লালুকে অসংযমী হতে দিল। পানাভ্যাস লালচাঁদের আছে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পড়ে মাঝে মাঝেই স্ফুর্তির নামে মদ্য সহযোগে মাংস ভক্ষণ হোটেলে রেস্টুরেন্টে চলে। তা বলে মুক্ত আনন্দে মাতাল হবার সুযোগও জীবনে প্রথমবার পেল লালচাঁদ বাবু। বাপ থাকতে সংযম ছিল বাপের টাকার ভয়ে, এখন টাকা তো তার কাছেই, ভয়ের কোনই প্রয়োজন নেই। অতএব স্ফুর্তিটা লাগাম ছাড়া হোক। আজ যখন নতুন আনন্দের পথ খুলেছে তখন আর হাঁটা কেন দৌড়ে দেখা যাক কতটা যাওয়া যায়।

নীহারবালাও শরীরের বোঝা হাল্‌কা করবার জন্যে শাড়ীর বাহুল্য ত্যাগ ক'রে ফেলল ফলে কেবল ব্লাউজ আর অধোবাস তার শরীরকে এমনভাবেই বিকশিত ক'রল যে অদেখা আগুনে জ্বলে উঠল লালচাঁদের যুবক শরীর। সে যখন ধৈর্য হারিয়ে দিশাহারা নীহারবালা আদরে সোহাগে তাকে শীতলতা দিতে সচেষ্ট হ'ল।

এই হ'ল বাবু লালচাঁদের সর্বনাশের আদি ইতিহাস। লালচাঁদ এমনই প্রমত্ত হয়ে পড়ল যে নীহারবালাকে নিয়েই তার জীবন, তাকে ছাড়া মৃত্যু মনে ক'রে নীহারেই আবিষ্ট হয়ে রইল। ফলে নীহারের ব্যবসাও গেল। অবশ্য এটাও ঠিক

খদ্দের অবিরাম এলেও মনে ধরবার মত খদ্দের কমই আসে, লালচাঁদকে মনে ধরল বলেই নিজের লাভক্ষতির হিসেব ভুলে প্রশ্রয় দিয়ে বসল নীহারবালা। সে যখন তখন আসে, এলে আর যেতে চায় না থেকেই যায়, ফলে তার যে ক'জন ধরা খদ্দের ছিল তারা বন্ধ দরজায় মিছে করাঘাত না ক'রে কেউ নবীনাবালা, কেউ পটুরানীর ঘরে ঢুকে পড়ল। লালচাঁদ বলল, কুছ পরোয়া নেহি। আমি থাকতে তোমার কিসের ভাবনা?—তার মনে বিরাট জোর বাপের দু দুখানা দোকান আছে।

নগদ টাকা যা ছিল তা ফুরোতে সময় খুব সামান্যই লাগল।

এদিকে ছেলের দোকান যাওয়া আসা বন্ধ বলে শংকিত মা অনুসন্ধানে জানল ছেলে বেবুশ্যেদের পাড়ায় ঢুকেছে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই সে বিধবার মনে হ'ল কর্তা ছেলের বে দিয়ে যেতে পারেনি বলে সোমত্থ বয়েসের ছেলে বেলাইন হতেই পারে। তাই আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সবাইকে খবর দিল মেয়ে দেখে দিতে। ফটিকচাঁদ তেমন বড় মানুষ না হ'লেও নিজের পৈত্রিক বসতের ওপর দু দুখানা দোকান ক'রে চেনা মহলে কিছু খ্যাতির মূলধন জমিয়েছিল। কাজেই তার একমাত্র পুত্র—পাত্রী আসতে লাগল নানা মহল থেকে। মাসীর বাড়ী, পিসির বাড়ী, খুড় শ্বাশুড়ীর দিদির বাড়ী কম লেখাপড়া করা সাদা, কালো, রোগা, মোটা সব মেয়েরই খবর যখন আসতে লাগল মায়ের কাছে শুনল লালচাঁদ, তোর বে-র জন্যে বউবাজারের নবগোপাল বাবুর মেয়ের কতা এসেচে, মেয়েটি নাকি দুদে আলতা রঙ।

আমার বে নিয়ে তোমাকে কে ভাবতে বলল মা?

বাঃ আমি ভাববো না তো কে ভাববে? কার দরকার?

সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

দিন কয়েক ধরে এমনি ধারা নানা কথার চাপান উতোর চলার পরে একদিন লালচাঁদ ভাঙল, বে করতে হ'লে নীহারবালাকেই ক'রব।

যে কোন মেয়ের নাম নীহারবালা তো বটেই। কাজেই ঘরে থাকা বিধবাকে জানতে চাইতেই হ'ল, তুই যদি দেকেচিস তবে তার বাপের কাচে ঘটক পাটাই।

মার সামনে চুপ ক'রে থাকলেও বন্ধু মহলে বেশ বড় ক'রে সে প্রকাশ ক'রল ঘর সংসার ক'রলে নীহারবালার সঙ্গেই ক'রবে। এবং কথাটা চলতে চলতে মধ্যবিত্ত বিধবার কানে এসে পেঁছাতেই সে মহিলা বেঁকে বসল, আমার জীবন থাকতে তা হবে না। বেবুশ্যে এনে ঘরে তুলতে দেব না কিছুতেই। আমি আত্মঘাতী হবো।

মা আত্মঘাতী হবে ঘোষণা শুনে লালচাঁদ আর সাহস ক'রল না নীহারবালাকে ঘরে আনতে, নিজেই গিয়ে তার ঘরে ঘর বাঁধল। পরিণয়হীন প্রণয়ের বেগ সামলাতে একটা একটা ক'রে দুটো দোকানই লাটে উঠল বছর তিনেক ধুঁকেই। লালচাঁদ দেখল দোকান গুলো বাজে। কোনও লাভ হচ্ছে না অতএব একটা একটা করে বেচে দেওয়াই ভাল। দোকান বিক্রির টাকায় কিছুদিন বেশ ভালই চলল।

একা বাড়িতে মাকে ফেলে রেখে দিনরাত নীহারবালার কাছে পড়ে থাকার জন্যে

মায়ের নিরন্তর মনোবেদনা এবং কান্না তার চোখে পড়ত না। সে রইল নিজের আরামে। একটা করে দোকান শেষ হয় আর তার টাকায় চলে দেদার স্ফূর্তি। নারীসুলভ সাবধানতার বশে নীহারবালা জানতে চায়, এতটাকা কোথা পেলে ?

লালচাঁদ মত্ত স্বরে জবাব দেয়, তা দিয়ে তোমার কি হবে ? বাপ দিলে তাই পেলাম।

বাপ দিলে ! অবাক হয় নীহার, বাপ তো শুনেচি মারা গেছে।

মারা গেলে দিতে পারে না ?

নীহার অত ভাবতে চায় না। মরুক গে! যেখান থেকে পায় পাক, তার খরচা যখন চালাচ্ছে অযথা ভেবে কি হবে। তবু মাঝে মাঝে ভাবনা হয় খদ্দের তুলতে পারে না বলে। এ মানুষটা খরচাপাতি করে তা ঠিক তা বলে তার হাতে কিছু পড়ে না, তারও তো একটা ভবিষ্যৎ বলে কিছু আছে! মেয়েটা আছে, সেই সুরবালারও ভবিষ্যৎ আছে, সে ব্যবস্থা তাকেই ক'রতে হবে। এ সব মানুষকে তো বিশ্বাস নেই, কখন যে কি মতি হবে কে জানে ? তাই বলে, তুমি দোকান যাওয়া কি ছেড়ে দিলে ? পুরুষ মানুষ সব সময় ঘরে বসে থাকলে চলে?—আসলে তার আশা দিনের মধ্যে কিছুটা অংশ ছুট পেলে নিজের পুরানো খদ্দের না হোক নতুন খদ্দের জোগাড় করে নিতে অন্তত পারবে যাতে নিজের কিছু রোজগার থাকে। এমনিতে মানুষটা ভাল বটে তবে অকর্মন্য। দোকানের টাকায় চলে, নিজের কোন এলেম নেই। কাজ করবার ইচ্ছাও নেই। এরকম লোক কারও দায় বইতে অসমর্থ।

কিন্তু বুঝলেও কিছু করবার নেই নীহারের। লোকটা এমন ন্যাওটার মত লেগে থাকে যে কিছু বলাও যায় না। ব্যবহারে তো কোনই ত্রুটি নেই বলবে কি ? পুরানো অভ্যাসে একটু নেশাটেশা করে বটে তবে তার জন্যে কোন খারাপ ব্যবহার নেই। একটা দিনও একটা চড়া কথা বলেনি যে মানুষ তাকে কি বলবে নীহার! চলছে চলুক। মেয়েকে পাশের গলির পুরসুন্দরী পাঠশালাতে ভর্তি ক'রে দিয়েছে বাপ না হ'লেও বাপের নাম লালচাঁদ দে লিখিয়ে, তাতেও মনুষটা কোন আপত্তি করেনি। নিজের কোন চাহিদাও নেই যে এটা ওটা চাই, চাহিদা একটাই নীহারকে চায়, সর্বক্ষণের জন্যে চায়। তবে সে জন্যে যে কোন জ্বালাতন করে তেমনও নয়। টাকা পয়সা কখনই নীহারের হাতে তুলে দেয় না, নিজের একটা ট্রাঙ্ক এনে রেখেছে জামাকাপড় রাখে তারই মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখে। যখন যা দরকার নিজেই বের করে, খরচও নিজেই করে। কিছু বলবার নেই।

নীহার ভাবে চলছে চলুক না চললে তখন বোঝা যাবে। মানদা মাঝে সাঝে বলে, হ্যাঁ লা তুই ঐ নিষ্কর্মা মিনসেটার ওপর নির্ভর করে সব খোয়ালি শেষ কালটায় চলবে কি ক'রে ? কোতায় কি আচেটাচে জানিস ?

ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

কি জানি বাপু আমার তো মানুষটাকে দেকে ভরসা হয়নে।

নীহারবালার ধারণা মানদা হিংসে করেই বলে। নইলে মানদার বয়ে গেছে নীহারের জন্যে ভাবতে। মানদা সুন্দরী যে কি চীজ সে কথা কে না জানে? আশালতার একজন ভাল খদ্দেরকে ভাঙ্গিয়ে নিয়েছিল না একবার! লালচাঁদকেও হয়ত চেষ্টা ক'রেছিল পারেনি বলেই এখন এইসব কথা? মানদার কথার গুরুত্ব দেয়নি নীহার, আজও দিল না। এখানে কে যে কেমন সব নীহারবালার জানা আছে। সবাই হিংসে করে, একটা দিন ভাল রাঁধবার পর্যন্ত উপায় নেই, কারও ঘরে দুপুর বেলা মাংস রান্নার গন্ধ বেরোলে কেউ না কেউ শুনিয়ে বলে উঠবে, কার যেন মাংস কেটে রান্না হচ্ছে! —কাজেই যে যখন সুযোগ পায় চিৎপুরের ট্রামলাইনের এ্যালেন হোটেলে বা শায়েস্তা সিং-এর হোটেল থেকে নিয়ে আসে। এ্যালেন থেকে চিংড়ি কাটলেট বা খাসির মাংসের দো পিঁয়াজী মালদার খদ্দের ছাড়া আনাতে পারে না, দাম চড়া। শায়েস্তা সিং-এর হোটেলের খাবার সস্তা, সকলেই আনতে খেতে পারে। হারান মন্ডলের শুঁড়িখানার খদ্দেররাই বেশি যায় সেখানে, মদের চাট হিসেবে যে মাংস তার জোগান ঐ একা শায়েস্তা সিং-ই অর্দ্ধেক দেয়। অনেকে বলে বাজে মাংস বেচে। খাসির মাংস না দিয়ে পাঁঠার মাংস দেয়। তা দিক। যারা বলে তারা বলুক তাতে খদ্দের কমে না।

সব যেন স্বপ্নের মত শেষ হয়ে গেল। দু দুটো দোকান বিক্রির টাকাও উড়ে গেল নিঃশব্দে। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সব শেষ ক'রে দিলি! সে লোকটা এতটাকা দু দুখানা দোকান দিয়ে গেল পাঁচটা বছর রাখতে পারলি নি? রেখে খেলে যে সাত জীবনেও ফুরোতো না রে! হায় হতভাগা, কি সব্বোনাশ পেটে ধরেছিলুম!

মায়ের অনুতাপ বিরক্তি উৎপাদন ক'রল লালচাঁদের, সে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, মেলা বকো না তো! আমি মরছি নিজের জ্বালায় উনি এখন ঘ্যান ঘ্যান ক'রতে লাগলেন।

আমি ঘ্যান ঘ্যান ক'রছি! এখন কি ক'রে খাবি বল দেখি?

সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

মায়ের ধারণা হ'ল ছেলে যখন দুদিন ধরে বাড়ীতেই থাকছে তখন নিশ্চয় ওর মতি ফিরল, মোহ কেটেছে। এবার ছেলে ঘরেই থাকবে। কিন্তু কি আর খাবে? দোকান দুটো নষ্ট হয়ে গেল—! দ্বিতীয় দিন রাত্রেই লালচাঁদের গর্ভধারিনী দেখল তার নিজস্ব সামগ্রী রাখবার আলমারীটা খোলা। আতঙ্কিত হয়ে খুঁজে দেখল নিজের বিয়েতে পাওয়া রতনচুড় উধাও। আরও মিলিয়ে দেখতে গিয়ে টের পাওয়া গেল শ্বশুর যে পাঁচখানা গিনি প্রথম দেখাতেই বউমাকে দিয়েছিলেন সেও বেপাত্তা। একই সঙ্গে বাড়ী ছেড়েছে তার সবেধন নীলমনি লালচাঁদ গুণধরও। প্রৌঢ়া বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল।

মহিলাকে স্বামীর শোক ভুলিয়েছে সময়, পুত্রশোক ভুলিয়েছে তীব্র হতাশা

কিন্তু জীবনের শেষ সম্বল এই গয়না গুলোর শোক তাকে নূতন করে ব্যকুল করে তুলল। তার সমস্ত অন্তর কেবলই হায় হায় ক'রতে লাগল। এবং সেই অন্তরের স্বর শব্দ হয়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল আক্ষেপের রূপে। কিন্তু সে আক্ষেপ শুনছে কে? যার উদ্দেশে শব্দ সে তখন সেই শব্দসীমার বাইরে, বহু দূরে। যে শব্দ তাকে বিব্রত বিদ্ধস্ত ক'রতে প্রয়াসী সেই স্বরধ্বনি তার কাছে কোনভাবেই পৌঁছাল না, প্রৌঢ়া মা কেবল ব্যর্থ আক্ষেপে নিজেই নিজের মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

যে কোন কারণেই হোক টাকা পয়সার টানাটানিটা বেশ বুঝতে পারছিল নীহারবালা। তার কাছে দোকান বিক্রি ক'রে খাবার কথা তো বলেনি লালচাঁদ তাই দোকানের রোজগারে চলবার কথাই তো সে জানত। মাঝে মাঝেই জিজ্ঞাসা করত, কি গো, তুমি আর আজকাল দোকনে যাওনা নাকি? কোতায় যাও?

লালচাঁদ মুখ করে ওঠে, অত খপরে তোমায় কি দরকার? বেটাছেলের ওপর খপরদারী চলে না।

নীহার নিজেও তা করে না তাই বলে, বেশ গো তোমার ব্যাপারে মাথা দিতে আমার কোনই দরকার নেই আমার আয় রোজগার বন্ধ ক'রছ কেন বাপু? আমি আমার কাজ করি খাই, তোমার টাকার পানে চাইতেও যাব না।

একথাটা আগুনে জল ঢেলে দেয়। নিমেষে নীহারের উরুর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে লালচাঁদ, এমন দিক্ ক'রচ কেন? আমি কি তোমার কোন সাধ অপূন্ন রেকেচি বল?

এমন আন্তরিক আবদারে বিগলিত হয়ে পড়ে নীহারবালা, বলে সে কথা নয়। তোমারও তো সুবিধে অসুবিধে থাকতে পারে। দোকানে আয় রোজগার কম বেশি হ'তে পারে।

একথায় মর্যাদায় আঘাত লাগে বলেই মায়ের গয়না চুরি ক'রে এনে অভাব মেটানো। নীহারের এমন টইটম্বুর নদীর মত শরীর তার একার। এখানে আর কাউকে ভাগ দিতে চায় না লালচাঁদ। অন্য কেউ ভোগ করুক তা কখনই নয়। চিৎপুরের রাস্তার ওপর কোম্পানী বাগানের ধার ধরে সারি সারি দোকান বন্ধকী কাজ আর পুরানো সোনা কেনবার জন্যে বসে আছে। লালচাঁদের মত ফোতোবাবু গিয়ে 'মেজাজের মাথায়' দশটাকার মাল একটাকায় দিয়ে পান্না শার দোকানে এক পাঁইট টেনে এসে নীহারকে বলল, কি টাকা টাকা ক'রছিলে? কত টাকা চাই? এখনও তো শালা জেলেটোলার বাড়ীতে হাত দিইনি। —নিজের মনেই বকতে লাগল লালু।

নীহার ওসব কথায় কান করে না, শান্তভাবেই বলল, দশটা টাকা দাও তো। মেয়ের ইস্কুলে মাইনে বাকি পড়েছে।

দশ টাকা! ফোঃ।

চাল ডাল আনো। ভাত খেতে হবে তো, না ওইসব মদ গিলেই পেট ভরবে?

আনচ্চি আনচ্চি পেয়ারী। অমন অর্ডার ক'রো না, একটু পেয়ার সে বলো মাইরি!

নীহার এতদিনে লালচাঁদের ধাতটা ভালই বুঝে গেছে পকেট ভারী থাকলে আর পেটে কিছুটা সুরারস পড়লে রসের কথার সঙ্গে দুচারটে হিন্দি শব্দ বলতে ওর ভাল লাগে। এরকম লোক কিছু কিছু থাকে, আগে আর একজন খদ্দের আসত নেশা জমে উঠলে সে ইংরিজি বলত। আ ম'লো যা! এক বর্ণও বুঝতো না নীহারবালা, তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, তার কেবল বলেই সুখ। সে কত ইংরিজি আদর! সোহাগের চোটে অস্থির হ'তে হ'ত ভাড়ার বউ নীহারবালাকে, মনে মনে বলত, দূর হোক যত আপদ বালাই। অত আদর ঘরের বউ এরই সইবে না ভাড়ার বউ-এর পোষায়! সেদিক থেকে মিনষেটার ব্যাপারটা আলাদা, এ তো আধঘন্টা একঘন্টার জন্যে ভাড়ার বউ করেনি নীহারকে, এ মানুষটা ছেড়ে যাবার কথা ভাবেই না। বেচারি করবে কি? ওর তো আর দ্বিতীয় সোহাগের জায়গাটি নেই যা করবার এখানেই করতে হবে বলে নীহারও কিছুটা প্রশ্রয় দেয়, সুরসিকা রমনী সে কখনও বা লালচাঁদের চিবুক নেড়ে দিয়ে বলে, রান্নার কাজ বাদ দিয়ে পেয়ার ক'রতে বসলে ক্ষিদের সময় পেয়ার উঠে যাবে নবাবজান!

প্রশ্রয় পেয়ে লালচাঁদ নীহারবালার ভারী কোমরটাকে জড়িয়ে ধরে শরীরে মুখ গুঁজে দিলে নীহার ঝামটা দেয় না বলেই লালচাঁদ এমন ভাবে মরেছে। দু দুখানা দোকান বিক্রির টাকাই যেখানে বসে খেয়ে শেষ হয়ে গেল সামান্য দুটো গয়নার দামে আর ক'টা দিন চলতে পারে। তার পরমায়ু অচিরে ফুরোতে বসত বাড়ীতে হাত পড়ল লালচাঁদের। এবার আর বাড়ী গিয়ে বাড়ী বিক্রি নয় বাইরে থেকে দুনি দালালকে দিয়েই খদ্দের পাঠাতে লাগল বাড়ী দেখবার জন্যে।

হতভাগ্য বিধবা মার মাথায় বাজ পড়ল ছেলের কাজে। এমনিতে এটা সেটা বিক্রি ক'রে একবেলা নুনভাত খেয়ে কোনক্রমে চলছিল, মাথার ওপর থেকে ছাদ সরে গেলে কি হবে সেই আতঙ্কে শিউরে উঠে পাগল হয়ে পড়ল। দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘরের এক কোণে রাখা রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী আরও দেবদেবীর ফটোর সামনে গিয়ে ধর্ণা দিতে লাগল অসহায় বিশ্বাসে। সেই ফটোগুলো নাকি তার পুত্রের বিবেক ফিরিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া সে বেচারী যাবেই বা কোথায়? কল্পনার কাছে গিয়েই তার মনের মুক্তি চাওয়া ছাড়া এই অসহায়তায় আর কি করণীয় খুঁজে পাবে সে?

দালালের মাধ্যমে ভদ্রলোক খদ্দের অনেকেই এসে বৃদ্ধার চোখের জলের ধারা দেখে কেউ তার অবিশ্রাম অভিশাপ শুনে পেছিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে

আশেপাশেই থাকে পুরাণো লোহা আর চোরাই মালপত্র বেচে পয়সা করা এক কালোয়ার নটবরলাল জয়সোয়াল লালুচাঁদের টাকার চাহিদা তুঙ্গে উঠেছে দেখে যেন অনেকটা অনুকম্পা ক'রেই বাড়ীটা জলের দামে কিনে নিল। সে এমন অভিনয় ক'রল যে অকাল বৃদ্ধা রমনী বুঝল নটবর বাংলা কটূক্তি বা কথাবার্তার কিছুই বোঝে না আর সোনাগাছি গিয়ে লালু বাবুকে বলল, এ মোসায় আপনাকে মা এতো গালি দেয় যে জহান্নামমে লিয়ে যাবে। ও বাড়ী জিন্দেগী মে বিক্রি হোবে না।

ব্যাকুল এবং বিব্রত লালচাঁদ দালালদের মুখে শুনে শুনে আগে থেকে সব জানে, তাই বলল, ও মাগীর গালাগালির কি দাম আছে? আমার বাপের বাড়ী আমি বেচবো। আপনি নিয়ে নিন। আমি লিকে দেব, আপ ঘাড় ধাক্কা দেকে নিকাল নিজিয়ে গা।

এপাড়ারই গোবরা দালাল জুটিয়ে এনেছিল কালোয়ারকে সে বলল, লে লিজিয়ে বাবুজী। ইধার উধার করকে দাম কুচ্ছু কম করকে লে লিজিয়ে।

নটবরের যেন একান্তই অনিচ্ছা নেহাৎ উপরোধে পড়েছে এমনি ক'রেই দাম বলল। সে দাম ন্যায্য শব্দটার ধারকাছ দিয়েও গেল না। বোধাবোধ জ্ঞানশূন্য হলেও লালচাঁদ তা বুঝল তবু তার টাকার এমনই প্রয়োজন যে কিছুক্ষণ টানাটানি অবশেষে কিছুটা কাকুতি মিনতি ক'রেও ফল না পেয়ে ধূর্ত কালোয়ারের কথাতেই রাজি হয়ে গেল। গোবরা দালাল সাফল্যের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, কথা যখন পাকা হ'ল বাবুজী কিছু বায়না করুন।

লিখাপড়ি তো হবে। কাগজ বানবে তব না বায়না।

সে কাল ক'রে নেবেন—। কাগজ আনলেই আমি সই করে দেব—উদগ্রীব লালু বলল।

যে ভি কুছ দিজিয়ে—গোবরা উপরোধ করাতে পকেট থেকে একশ টাকা বের করে দিল নটবর কালোয়ার।

মাত্র একশ।

অবশেষে তিনবারে পাঁচশো টাকা বের ক'রে নটবর বলল, একটা সাদা কাগজ নিয়ে লিখিয়ে দিন।

মনোহারী দোকান থেকে কাগজ নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোচারণ অক্ষরে লালচাঁদ লিখে দিল, বায়না পাঁচশত টাকা পাইলাম।

গোবরা ছোঁ মেরে দুশো টাকা নিয়ে নিল দালালীর বায়না হিসেবে। কৃতার্থ লালচাঁদ বলল, তবে ঐ কথাই রইল। কাল টাকা আর বায়না পত্তর আনবেন, সই ক'রে দেব। অন্তত পাঁচ হাজার আনবেন।

এক হাজার বায়না দিবো কাল।

শিশু বাপমায়ের কাছে যেমন আবদার ক'রে তেমনই কাতর ভাবে বলল, মাত্র এক হাজার? কিছু বেশী দিলে হ'ত না?

ওর ভাব দেখে মনে মনে বিরক্ত নটবর কালোয়ার বলল, হোতো কেনো না ? সব একঠী রোজ মে খা লেব ? দু রোজ রাখকে খাও না ? —স্বভাষায় বলা শেষ কথাগুলোর মর্মার্থ যা গাধাটা বুঝল না তা হচ্ছে, সব টাকা একদিনেই খেয়ে ফেলবে ? দুদিন রেখে খাও।

নির্বোধ লালচাঁদ সাধের খদ্দেরটিকে আর ঘাঁটানো ঠিক মনে ক'রল না যদি শেষে বিগড়ে যায়! যা হোক বিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বাড়ীটা, সে টাকার আশাও যাবে। যা রাক্ষসী মাগী একজন বাড়ীতে বসে আছে সে ও বাড়ী বিক্রি ক'রতেই দেবে না। তাই বলল, ঠিক আছে বাবুজী কাগজ পত্তরগুলো একটু জলদি ক'রবেন।

কালোয়ার কোন উত্তর ক'রল না।

টাকা হাতে থাকলে লালচাঁদ মানুষটাই অন্যরকম। বাবু লালচাঁদ। তার তখন চালচলনই বদলে যায়। এমনিতেই তার আদবকায়দা কিছু কম নয়। এই এলাকার বাইরে যাওয়া তার কোন প্রয়োজন পড়ে না তবু সে সব সময় কাচা পোষাক পরে গ্লেজড কীড চামড়ার পামসু পরে পুরো বাবুটি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা গুণ আরও আছে এলাকার ছেলে ছোকরারা যে কোন কাজে অর্থাৎ শেতলা পুজোয়, কেলাবের কোন দরকার থাকলে হাত বাড়ালেই দুদশ টাকা লালচাঁদের কাছে পেয়ে যায়। এলাকায় যাত্রাপালার আসর বসবে বা নিছক গানবাজনার আসর হবে বাবু লালচাঁদ তাতে দরাজ হাত। তার সেখানে কোনই ভূমিকা নেই কেবল পাড়ার সবাই লালুদা বলে বললেই হ'ল। সঙ্গে শুঁড়িখানা তো আছেই। আর এই ক'রেই তার বাড়ীর বিক্রির টাকা বছরখানেক তাকে সঙ্গ দিল মাত্র। তারপরই উধাও। ব্যাস রেস্ত শেষ, তার রাস্তাও শেষ। আব তো কিছুই নেই কি বেচে খাবে এবার ? লালচাঁদ অন্ধকার দেখল। তাই আবার শরীর বেচতে নামতে হ'ল নীহারবালাকে। বেঁচে থাকবার পথ তো তার জানাই ছিল সেই পুরানো পথ ধরে হাঁটতে লাগল ক'টা বছর বিরাম পাবার পর। আগে তার ভার ছিল শুধু মেয়ের এবার ভার বাড়ল লালচাঁদকেও ফেলতে পারল না আহা মানুষটা যাবে কোথায় ?

সেই চলেছে। যা হোক দেখা শোনাটা তো করে! ঘরোয়া কাজ করা লোকটার হয়না বটে তবে বাইরের কাজে না নেই। বাইরের কাজ কি বা আর থাকে ? মেয়েটা এই ঘেরাটোপের বাইরে বেরোতে চাইলে লালচাঁদের সঙ্গেই ছাড়ে নীহারবালা, যাও না ওকে একটু সিনেমা দেকিয়ে আনো না!

সেটা লালু যত্ন ক'রেই করে। মেয়েকে নিয়ে গিয়ে হলে টিকিট কেটে ঢুকিয়ে সারাক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করে, ছবি শেষ হ'লে ফিরবে বলে। অতক্ষণ সময়, প্রায় তিনঘন্টা রাস্তায় ঘোরে, কখনও বাদাম ওয়ালার সঙ্গে কখনও বা হলের গেটকিপারের সঙ্গে খাতির জমিয়ে গল্প ক'রতে থাকে।

সুরবালা বেরিয়ে এলে জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলি রে বায়স্কোপটা ?

খুব ভাল।—অল্প শব্দে কথা শেষ ক'রে দেয় সুরবালা, তার মনের মধ্যে তখন স্বপ্নলোকের ছবি। নায়ক নায়িকার সুন্দর মুখচ্ছবি, অনুপম কায়দা কানুন, আর তেমনই সর্বতোমুখী কুশলতা—সবে মিলিয়ে এক আশ্চর্য মায়ার জগত, আর তারই মধ্যে এতক্ষণ ঢুকে ছিল সুরবালা, সে-ও ঐ জীবনের শরিক হয়ে গিয়েছিল। জীবনের সঙ্গে মিল নেই বলেই তার মধ্যে মগ্ন হ'তে পেরে যে সাময়িক সুখ সুরবালা তার স্মৃতি এখনও মেখে আছে। সেই সুখের অনুভব ধরে রাখতে চায়। তাই কথা বলে মনের বন্ধ-দ্বার মুক্ত করায় তার আপত্তি। যৌবন তার শরীরের দরজায় অনেকদিন আগে থেকেই কড়া নাড়ছে, প্রতিহারী বয়স কিছুটা বেইমানী ক'রেই আগেভাগে দ্বার খুলে দিয়েছে ; মন তখন রাজি হয়নি, এখন মেনে নিয়েছে বলে জীবন এখন প্রজাপতি—বর্ণময়। বাস্তব না হ'লেও মন ঐ ছায়াছবির নায়িকাদের সঙ্গে লাস্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে মেতে ওঠে। কখন কখন নিজেকে নায়িকাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত ক'রে অনুপম তৃপ্তি পায়।

সেই তৃপ্তি থেকে আবার অতৃপ্তিরও জন্ম হয়। জীবনের কাছাকাছি অমনই নায়কের জন্যে ইচ্ছা এসে মাঝে মাঝে কাঠঠোকরা হয়। পাখির চঞ্চুঘাতে গাছের শরীরে কি প্রতিক্রিয়া করে সেই জানে সুরবালার মন মাঝে মাঝে আহত হয়, সেখানে সামান্য ব্যথার উদ্ভব হয়। মায়ের স্বপ্ন ছিল মেয়ে লেখাপড়া শিখবে, ভদ্দর-নোকেদের মেয়েদের মত ইস্কুলে যাবে, সেই স্বপ্ন শেষ হয়ে মেয়ের স্বাভাবিক স্বপ্ন শুরু হয়।

নীহারবালা অনুভব করে এই সাত আট বছরে সে অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে। আবার সে কাজে নেমেছে বটে তবে কাজ তাকে আর ফিরিয়ে নিচ্ছে না। একদিন সে কাজ ত্যাগ ক'রেছিল এখন কাজ তাকে বর্জন ক'রেছে। বয়সে তরুণ যে সব খদ্দের সন্ধে হলেই এ পাড়ায় এসে ভিড় করে তারা আর তার কাছে প্রণয় প্রার্থী হচ্ছে না। প্রথম প্রথম সে বেশ ধন্দে পড়ল কি করে ? কোনও রাতে দৈবাৎ কোন মাঝ বয়সী জীবন রসিক এসে জুটল তো জুটল, তাকে সাধ্যমত খাতিরে আপ্যায়নে তুষ্ট ক'রে নীহার আশা ক'রল ঘুরে ফিরে যেন তার কাছেই আসে। সে হয়ত দুচারবার এল তাতে তো আর তেমনভাবে চলে না। লালচাঁদের সন্ধান আনা পাত্তর যা হেঁকে বসেছে সে টাকাও এভাবে জোগাড় হবে না। শাকভাত খেয়ে তিনটে প্রাণীর দিন কাটতে পারে মাত্র। তাও যে কতদিন চলবে বলা যায় না। তাই সে লালুকেই বলল, কি গো বাবু, অত টাকা চাইলে কেত্থেকে দেব ?

তা ভাল পাত্তর পেতে গেলে ট্যাকা দিতে তো হবেই। কেউ তো মাঙনা বে ক'রবে না।

বাঃ এ আবার কি কতা ? বে ক'রবে বউ পাবে, টাকা লাগবে কিসের ? মেয়ে

দেকে কি তার পছন্দ হ'ল না ?

হল বলেই তো রাজি হ'ল।

তবে ?

বিয়ে কি কেবল রাজির ব্যাপার ? দেনা পাওনা আচে না ? আমার বাবার বে দিয়ে ঠাকুর্দা সে বাজারে নগদ বত্রিশ শো ট্যাকা পণ নিয়েছেলো।

নীহার অসহায় বোধ ক'রল। ও রকম চাইলে তো হ'ত জমানো যা আছে তাতে ত্রিশ বত্রিশ শো দিয়ে নিজের গয়না ক'টা বেচে দশজন লোক খাইয়ে কাজ সমাধা ক'রতে পারতো। কিন্তু এ যে একেবারে রাক্ষসের হাঁ। সে নিজে সেঁধিয়ে গেলেও গর্ত পূরবে না ! —তুমি একটু বলে কয়ে দেখ না গো !

সে কি আমি কম করেচি ? ছেলে বড় টনকো, কিছুতে গোঁ ছাড়ে না। তাকে রাজি করায় কার সাধ্যি। বলে, বে আমি ক'রব কিন্তু আমার ঐ এক কতা।

বিয়ের আলোচনার মধ্যে কোন রাখা ঢাকা কিছু ছিল না, মেয়ের সামনেই সে সব হ'ত। মার মাথায় চিন্তাটা নড়েচড়ে উঠলেই বলে ফেলা তার স্বভাব, কে রইল না রইল সে হিসেব অভ্যেস-এ নেই। ফলে সুরবালার মনের মধ্যে বিয়ে ব্যাপারটা একটা আশু কর্তব্য হয়ে ফুটে উঠল। সে বুঝল তাকে বিয়ে ক'রতে হবে, টাকার জন্যে তার বিয়ে হচ্ছে না, মা দিতে পারছে না। অথচ মা যে রকম বলে তাতে দরকার। সে বেশ লক্ষ্য ক'রেছে রাস্তায় বেরোলে 'ছেলেরা' তার দিকে কেমন ক'রে যেন তাকায়। শুধু ছেলেরা কেন বড় বড় 'লোকরা'ও তাকে দেখতে থাকে। সে দেখার অর্থ সে সম্পূর্ণ বোঝে না কিন্তু অসম্পূর্ণ যেটুকু আভাস থাকে তাতে সে বিশেষ ইঙ্গিত পায়। সে ইঙ্গিতের তাৎপর্য তার কাছে কিছুটা তো ধরা দেয়। তাতেই সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এবং সে চঞ্চলতা তাকে অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত ক'রলেও নীহারবালার চোখে ধরা পড়ে। সে নিজের মনে আক্ষেপ করে এটা পাড়ার গুণ। এই পাড়ায় থাকে বলে চারপাশের পরিবেশ দেখে মেয়েটা এমন হয়ে যাচ্ছে। আপন ভাগ্যকে দোষারোপ করে মেয়েকে যদি আগেই সরিয়ে দিতে পারত তাহ'লে মাত্র ষোল সতের বছর বয়েসেই এমন খাই খাই ক'রত না মেয়েটা। রাগ মাঝে-মাঝে লালচাঁদের ওপরও হয় না এমন নয়, প্রকাশই করে ফেলে, সেই কবে থেকে পই পই ক'রে বলছি একটু কি কানে যাচ্ছে। আর তো কিছু কাজ কখনও বলি না মেয়েটার একটা বে দিতে বললুম তাই পারলে না।

লালচাঁদের একটা বড় গুণ সে রাগ করে না, নীহারের অভিযোগ শুনে শান্ত-ভাবেই বলে, কি ক'রব বল, পাত্তর কি আর হট করে পাওয়া যায়। একটা যদি বা জুটল তো পয়সা দিতে পারলে না, আমি কি করব বল ? তুমি বরং এক কাজ কর সুমতি দাসীর ছেলেটা তো বড় হয়েচে, বল তো কথা বলে দেখি।

আ মলো যা ! খানকি পাড়ায় আবার বে হয় নাকি ? এতদিনে এই জানলে ? বলিহারি বুদ্ধি তোমার নইলে কি আর সব খোয়ালে !

লালু চুপ করে যায়। 'সব খোয়ানোর' ব্যাপারটা অস্বীকার ক'রতে পারে না কিন্তু জোর ক'রে যে প্রতিবাদ ক'রবে সে অভ্যেসও তার নেই তাই নীরবে থাকার স্বাভাবিক শান্তিতে সে মগ্ন থাকে। সুরবালার বিয়ে নিয়ে তার কোন ভাবনা হলে মনে চঞ্চলতা আসত, তা হয় না বলে শান্তি ব্যাহত হয় না। অব্যাহত শান্তির নিরুদ্বেগ জীবন তার সমতলভূমির নদীর মত স্রোত ও বেগ হীন। একদা যে সমুদ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্ত নদীর মত জোয়ারের উন্দামতা ছিল এখন তা আর মনেই হয় না, নিবে'গ, স্তিমিত, নিস্তেজ। যৌবন ফুরোতে না ফুরোতেই যেন তার বার্ধক্য এসে গেল প্রৌঢ়ত্বের বদলে। এখন তাই শুধু দিনযাপনের বিষন্ন বাসনা ছাড়া লালচাঁদ আর কিছুই হাতড়ে পায় না তার মনের মধ্যে। এখন চাহিদা কেবল দুবেলা দুমঠো ভাত আর রাত্রে ঘুমোনোর এক টুকরো জায়গা। ও যে হঠাৎ কেন এমন হয়ে গেল নীহারবালা নিজেও তা বুঝতে পারে না বলে মাঝে মধ্যে কখনও তার মনে প্রণয় উথলে উঠলে বলে, হ্যাঁ গা তোমার এমন সাড় মরে গেল কেন?

একদিন যে প্রণয় প্রার্থনায় লালচাঁদ সব খোয়ালো সেই বাসনায় অনাসক্তি যে তার হঠাৎ কেন এসে পড়ল সে নিজে তা বোঝে না বলেই নীহারবালার কথার কোন উত্তর দিতে পারেনা। কিন্তু নীহারবালা তো ছাড়বার পাত্রী নয় সে খোঁচাতে থাকে, কি গো একেবারেই কি বুড়ো হয়ে গেলে? ঘরে জামাই এলেও না হয় একটা কথা ছিল!

কোন কথাতেই আর উত্তেজিত হয় না লালু, কেমন ঝিমিয়ে থাকে। শুধু শরীরের আকর্ষণই নয় কোন ব্যাপারেই লালচাঁদ আর কোন উৎসাহ পায় না, কোন কিছুতেই নয়। সকালবেলা উঠে কেবল নিচে পচার দোকান থেকে একগ্লাস চা কিনে আসে, নীহারকে ডেকে হাতল ভাঙ্গা কাপে ঢেলে দেয় সুরবালাকে দেয় আস্ত একটা কাপে আর গ্লাসেই চুমুক দেয় অবশিষ্ট চায়ে। তারই মধ্যে নীহার কোন কোনদিন ঘুম চোখে আড়ামোড়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, কি যে এক চামচে চা দাও মাইরি গলা পর্যন্ত পে'ছোয় না।

বেশ তবে গেলাসটা নাও—বলে এগিয়ে ধরলে নীহার তা ফিরিয়ে দেয় জানে ওতে চা কমই আছে। তা ছাড়া সে যা বলে ঠাট্টা করেই বলে, যে মানুষটা সব খুইয়ে তার চরণে দাস হয়েছে তার ভাল মন্দ না দেখবার মত নির্মম সে নয়। আহা বেচারী কি বা খায়! তবে পুরুষ মানুষ আয় রোজগার না ক'রে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে বসে সময় কাটালে দেখতেও তো ভাল লাগে না। কত লোক তো কতকিছু করে, রোজগার না ক'রলে পুরুষ মানুষের নিজেরই মনে বল থাকে না। মাঝে মাঝে সে কথা বুঝিয়ে বলেছে নীহার কিন্তু শুনছে কে? দেয়ালের সঙ্গে কথা বলার মত সে বলে গেছে লালচাঁদ নির্বিকার বসে থেকেছে শুনেছে কি শুনতে পায় নি তাও বোঝায় নি। কি গো, বলি কথাগুলো যে বললাম কিছু শুনতে পেলে?—এ প্রশ্নেরও উত্তর করেনি লালচাঁদ।

কেন যে এমনটা হয়ে গেল নীহারবালা ভেবে পায় না। তবে এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে না সে। আদৌ মাথা ঘামাতো না ঘামাতে হচ্ছে নিজেরও রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে বলে। নতুন খদ্দেররা আর কেউই তার দিকে ভেড়ে না, ভিড়বেই বা কেন, তারা সব উঠতি বয়সের মেয়ে খোঁজে, ছুকরি চায়। পুরানো বয়স্ক খদ্দের এলেও তাই চায়, কম বয়সী মেয়ে খোঁজে বলে ডবকা মাল চাই। সেদিন যে লোকটা এল বয়স তো ষাট বছরের কম হবে না চুলে যতই কলপ লাগাক ঢিলে চামড়ার কোঁচকানো লুকোবে কোথায়? বলে, মাসি কচি মাংস খাওয়াও দেখি?

নীহার ছাড়ে নি, জানতে চেয়েছে, কচি মাল খেতে পারবে? ক্ষমতা আছে? তা কি শুনবে লোকটা? যা সয় তাই নাও তা নয়! শেষে কোন ছুকরির লাথি খাবে তবে গে ঠাণ্ডা হবে। নীহার বলল, আগে আমাকেই নাও না। যদি পারো।

তা সে কথা লোকটার মনে লাগে নি, অন্য ঘরের দিকে চলে গেল। ইদানীং এমনটা প্রায়ই হচ্ছে, ভাতে টান পড়ে যাচ্ছে দেখে বাধ্য হয়েই সুরবালাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। তাকে ছাড়বার আরও একটা কারণ মেয়েটা বড় ছটফট ক'রছিল, একদিন রাম সিং এর সঙ্গে বেরিয়ে যায় আর কি! তখনই নীহার ঠিক ক'রল শুধু শুধু রাম সিংএর ভোগে দিয়ে কি লাভ? তাতে পেটও ভরবে না মেয়েও খারাপ হবে। রাম সিং দুচারদিন ভোগ ক'রে ছেড়ে দেবে। তার চেয়ে মেয়ে লাইনে এসে পড়ুক সব দিক রক্ষা পাবে।

মদনকে বলতেই সে বলল, কোন চিন্তা করো না নীহারদি। আজই তোমাকে মালদার পার্টি জোগাড় ক'রে দেব।

দেখো কোন কমবয়সী ছেলে জুটিয়ো যাতে ওর মনে ধরে, প্রথম নামবে কি না!

ঠিক আছে। ছোকরা খদ্দের দেব। আমার হাতে খদ্দের কি কম আছে? আমাকে কিন্তু একটা পাঁইটের দাম দিতে হবে এটা বলে রাখছি, বিলিতি পাঁইট।

অত কোত্থেকে দেব?

তুমি কি ঘর থেকে ট্যাকা দেবে? খদ্দের তেমনই দেব। তুমি তার কাছ থেকে ঝেড়ে নাও না! আমিও তো বলেই আনব আনকোরা মাল পাবে--

কথা মতই কাজ করেছিল মদন দালাল। একেবারে ছোকরা না হলেও গলায় সোনার চেন ঝোলানো যাকে এনেছিল বয়েস তার ত্রিশ পেরোয় নি। নেশা টেশা না ক'রেই এসেছিল লোকটা ঝাড়া তিন ঘণ্টা ঘর বন্ধ ক'রে সুরবালাকে সঙ্গে নিয়ে ছিল, বেরোবার সময় একশো টাকার নোট ধরিয়ে গেল নীহারবালার হাতে। একটু পরেই নীহার বুঝল মেয়েও খুশিই হয়েছে।

বাড়ীর আর মেয়েরা তালেই ছিল তাদের মধ্যে বিন্দুবালাই এগিয়ে এল, এ তো বড় আজব কথা হ'ল মাসি! মেয়ের নথ ভাঙা হ'ল আর আমরা কেউ জানতে পারলাম না! ও সব হবে না, আমাদের আজ ভোজ দিতে হবে।

ভোজ কোত্থেকে দেব লা?

কোত্থেকে দেব বললে হবে? আমাদের আগে বললে না কেন, আমরাই ব্যবস্থা ক'রে নিতুম। জামাই বাবাজীকে বলেই আদায় ক'রে নিতুম তোমার গায়ে লাগতো নি! যোগমায়া বিন্দুর সঙ্গে যোগ দিল।

নিভাননী মেয়েটা কথা কম বলে, সেও বলল, নথ খোলা জামাই যে হবে সে তো নিজে থেকেই সব দেবে!

দলের মধ্যে পুরানো মেয়ে লতিকা এবার দায়িত্ব নিল, তোমারই ঘাট হয়েছে নীহারদি মেয়েরা সবাই আনন্দ করে তাতে তুমি দিক ক'রলে। নিভা ঠিক কথাই বলেছে নথ খোলা জামাই কত খরচা করে, মজা করে সকলে—

নীহারবালা বুঝল তার ভুল হয়েছে তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে মেনে নিল, বেশ তাই হবে। ভুল যখন আমারই হয়েচে তখন আমাকেই ব্যবস্তা ক'রতে হবে। মণ্ডা খাইয়ে দেব সবাইকে

শুধু মণ্ডাতে হবে না মাসি। মণ্ডার সঙ্গে খাসির মাংস ভাত খাওয়াতে হবে, বিন্দুবালা যেমন মুখপাত্র হয়ে এগিয়ে এসেছিল সে-ই আগবাড়িয়ে বলল।

মোক্ষদা এতক্ষণ চুপ ক'রে অপেক্ষা ক'রছিল, এবার তার সুযোগ এসেছে মনে ক'রে বলল, মণ্ডা বাদ দে বিন্দু, তার বদলে বিলিতি রাম আনাও। ভোজ হচ্ছে কবে সেটা বল?

আজই হবে, লতিকা বলল, এসব খাওয়া কি আর বাসি হলে ভাল লাগে? তবে ঐ ড্যাকরা মদনকেও ডাকতে হবে। বেইমানটাকে খাইয়ে দেখাতে হবে কাজটা ও ভাল করেনি। নথ খোলা জানে না? সব জেনেও ব্যবস্থা করেনি কেন? চেপে গেল কেন?

নিভাননী আর একবার মুখ খুলল, মদন সিং নিজে মোটা রকম টাকা মেরেছে তার হয়ে গেছে। ও কি কম ঘুঘু মাল! এক নম্বরের শেয়ানা, গাছেরও খাবে তলারও কুড়োবে। তুমিই বড় বোকা মেয়েমানুষ নীহারদি, আগে থেকে দরদাম ক'রে নেবে তো! না পারলে আমাদেরই না হয় বলতে আমরা করে দিতুম।

নীহার স্বীকার ক'রল যে তার বুদ্ধি তেমন কাজ করে নি, আসলে সে মদনের ওপর নির্ভর করেছিল। তাই বেশ ম্লান ভাবেই বলল, ঠিক আছে আমার বাপু ঘাট হয়েছে তা তোরা যা বলচিস তাই হবে আমি কাল তোদের মাংস ভাত খাওয়াবো।

শুধু মাংসভাতে হবে না মাসী মোক্ষদার কথা শুনেছ তো জগুয়াকে বলে দাও গেরে ইসটিটের দোকান থেকে ভাল দুবোতল মাল নিয়ে আসুক।

যোগমায়ার শরীরে মায়া বেশি সে নীহারবালার বর্তমান অবস্থাটা বোঝে। এই বয়েসে বাঁধাবাবুটি যে বেহাল হয়ে ঘাড়ে পড়ে আছে তা বোঝে বলেই বলল, থাক না। মাংসভাতই হোক আমরা চাঁদা ক'রে বাকি সব ব্যবস্থা ক'রে নেব।

জগুয়াকে দিয়ে মাল আনলে এখনই বোতলে পাঁচটা ক'রে টাকা বেশি দিতে হবে বার টাকার বোতল নেবে সতের টাকা। তার চেয়ে সুন্দরী মাসিকে বললেই লুকিয়ে এনে দেবে। ওকে আমাদের সঙ্গে খেতে নিলেই হবে।

যোগীন্দর দালাল সাহায্য ক'রেছিল বলেই সরমার পক্ষে এত বড় মাপের একটা উন্নতি সম্ভব হ'ল। পিয়ারা সিং-এর কাছে নিয়মিতই আসত লোকটা, বিশেষ ক'রে পান খেতে আসত মিছরিলালের পানের দোকানে। এই একটা মাত্র সখ যোগীন্দরের বাছাই করা পান চাই পাগলাবাবা জর্দা দিয়ে; তা বললে হয়ত সে পান ওদিকের দোকানগুলোতেও ক'রতে পারে যোগীন্দরের বদ্ধমূল ধারণা মিছরিলাল নিজে পান সাজলে স্বাদ যেমন হয় আর কেউ এমনটি পারে না। তাছাড়া এদিকে পান খেতে এলে এলাকাটা ঘোরাফেরাও তো হয়, সবরকম খবরাখবরও পাওয়া যায় কারণ খবরই তো রোজগার। এই ঘুরতে ঘুরতেই তো সে মোতি সিং-এর বাড়ীতে একদিন হীরের টুকরোটা পেয়েছিল যে হীরে তাকে এই অর্থ সাফল্য দিয়েছে; বলতে গেছে দেশের বাইশ বিঘে জমি অমন বাড়ী সবই সেই হীরের টুকরোটা থেকেই।

জানবাবু বাড়ীতে বত্রিশ টাকায় ভাড়া থাকত মোতি সিং গোটা বাড়ীই তার। জানবাবুর গোমস্তা কোন কোনদিন ভাড়া নিতে আসত প্রায় দিনই আসত না মোতি সিং ইচ্ছে হ'লে ভাড়া পেঁছে দিত, না হ'লে দিত না। জানবাবুর কোন আগ্রহ ছিল না। জানবাবুর বাবার অর্থাজনের দায় ছিল না বলে অজস্র অর্থের সঙ্গে অনেকগুলো বাতিক ছিল। তার একটা বাতিক হ'ল গান শোনা। কোন গানই যে খুব বুঝত এমন নয় কারণ বোঝাবুঝির জন্যে গান নয় শোনার চেয়ে বড়মানুষী দেখানোর জন্যেই আগ্রাওয়ালী জানেমন বাঈজীকে নিয়ে রাখতে এই বাড়ীটি ক'রে দেওয়া। যদুনন্দন মিত্তিরের কাছে পৌনে তিনকাটা জমিটা কিনে ঝটপট বাড়ীটা করিয়ে ফেলে জানেমনকে প্রতিষ্ঠা ক'রল জানবাবুর বাবা—ইতিহাস জানে মোতি সিং, মার কাছে শুনেছে, সে বাবুর নাম জানে না। শুধু বাপের নয় ছেলে জানবাবুরও আসল নাম জানে না মোতি, জানবার দরকারও হয়না জানবাবু বলে জেনে রেখেছে তাই জানে। সেই জানাতেই কাজ চলে যায়।

জানেমন বাঈ এর খিদমতে এখানে আমরতিয়ার আগমন। সেটাও জানবাবুর বাবার সুবাদে। জানবাবুর বাবার কাছে ঘিনাউ কুর্মি বহুদিন ধরে সেবকের কাজ ক'রে আসছে সেই ঘিনাউ কুর্মিই বাবুর কথামত বাবুর বাঈজীকে দেখাশোনা করবার করবার জন্যে এনে দিয়েছিল আপন গাঁও-এর মেয়ে আমরতিয়াকে। আর

ওর স্বামীও বহাল হয়েছিল বাঈবাড়ীর চৌকিতে। এখানেই জন্ম মোতি সিং এর। কুর্মি'র ছেলে পাড়ার গুণে চৌকশ হয়ে সিং এ প্রমোশন নিয়েছিল স্বেচ্ছাতেই। এখন বর্তমান প্রজন্মের কাছে কুর্মি'র কোন অস্তিত্বই নেই, সে সিংজী। তবে প্রকৃত সিং বা পাণ্ডেদের মত দক্ষতা অর্জন তার হয়নি বলে বিশুদ্ধ কুর্মিত্বের স্বাভাবিক দুর্বলতার সীমবদ্ধতায় সে অনেকটাই সহজ এবং সরল। জানেমন বাঈ যখন জানবাবুর বার্ধক্যের সময় কলকাতা ত্যাগ করে তখন এই বাড়ী অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে কলকাতাতেই পড়ে থাকে। তার জন্যে বাড়ী হলেও তার নামে নয় বলে কর্তার মৃত্যুতে যখন জানবাবুতে মালিকানা বর্তায় তখন বাড়ীর অন্য বাসিন্দা যুবক মোতিকে ডেকে জানবাবু প্রস্তাব করে, আমাদের সম্পত্তি তো দুভায়ে ভাগে হয়ে গেছে এখন কিছু ভাড়া তোলার দরকার। তুমি তো ও বাড়ীতে জন্মেছ আমি বাড়ী চোখে দেখিনি তুমি একটা ব্যবস্থা দেখ কি ভাড়া পাওয়া যায়।

এবং অবশেষে এটা সেটা বলে মোতি সিংই ভাড়া নিল মাসিক বত্রিশ টাকার চুক্তিতে। তার মনে ছিল আঠারো ঘরের বাড়ী 'রেণ্ডী লোকদের' ভাড়া দিলে রোজ বেশ ভাল টাকা পাওয়া যাবে। বৃদ্ধা আমরতিয়া আর চোখে দেখে না বলে একতলার নিজস্ব ঘরখানাকে আঁকড়ে রইল, বত্রিশ টাকার বাড়ী থেকে সাড়ে তিনশো টাকা আমদানী হ'তে লাগল মাস মাস। ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটে গেল লীলাবতী নামের একটি পেশাদার মেয়ে ঐ বাড়ীতে ভাড়াটে হিসেবে এসে মোতিকে পছন্দ ক'রে তাকে বিয়ে ক'রে বসল। ব্যাপারটা একান্তভাবেই আমরতিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটল কারণ তার ইচ্ছা ছিল একমাত্র পুত্রের বিয়ে দেশজ কোন কুর্মী কন্যার সঙ্গে দিয়ে রক্তের 'শুদ্ধতা' বজায় রাখে; কিন্তু তার 'ভোলেভালা' লেড়কাকে ফুসলে নিয়ে রেণ্ডিটা কব্জা ক'রে নিল দেখে মর্মাহত হলেও সে বেচারীর আর কিছু করবার ছিল না। অপরপক্ষে লীলাবতীর অনেক জানাশোনা নানা পথ ধরে মেয়েরা আসতে লাগল বাড়ীতে। একটি সুশ্রী বালিকা একদিন এসে জুটল তারই এক হতভাগা দরিদ্র আত্মীয়ের সঙ্গে। লীলাবতী তাকে প্রতিপালন ক'রতে লাগল মুরগী হিসেবেই।

বেশ ক'বছর বাদে মোতির বাড়ীতে যোগীন্দরের চোখে পড়ল ততদিনে অপরূপা হয়ে ওঠা যুবতীটিকে। তার পরিণত চোখ উজ্জ্বল ব্যবসার সম্ভাবনা দেখে মোতির কাছে প্রস্তাব করে, তোমার এই বাড়ীতে এই মেয়েকে কাজে লাগালে সুবিধে হবে না। বরং আমাকে দিয়ে দাও আমি ওকে গোলাপসুন্দরীর কাছে দিয়ে দিই। তোমার তো বলছিলে এখনই কিছু টাকার দরকার আমি তা পাইয়ে দেব।

তখন মোতির টাকার বড়ই অভাব। জানাবাবু প্রস্তাব দিয়েছে বাড়ী বিক্রি ক'রে দেবে। ভাড়াতে তার পোষাচ্ছে না তা ছাড়া স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য টাকার দরকার। লীলাবতী পরামর্শ দিয়েছে এ বাড়ী কিনে নিতে তাই একদিন হাত জোড় ক'রে গিয়ে মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে মোতি সিং, বাবু, আমার মা

বাবা তো এ বাড়ীতেই বড়বাবুর সেবাতে সারা জীবন দিয়ে ঘর গিরস্থি সব ছেড়ে দিল। মারা ভি গেল এই বাড়ীতে। আমিও জন্মেছি দয়া ক'রে বাড়ীটা আমাকেই দিন। বিক্রি তো বলতে পারি না দয়া ক'রে দাম নিন যা হুকুম করেন দেব।

ভদ্রপাড়ার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় বাস করা বাবুর মানসিক অবস্থানগত দূরত্ব অনেক বেশি বলে কোন খবরই না রাখা বাবু বেশ অবাক হয়, মামুলী এক ঝি-এর ছেলে বলে কি বাড়ী কিনবে! এ কি দুচার টাকার কাজ বলে মনে ক'রেছে? ও কি এমনি চাইছে, দান হিসেবে? ঠিক মত বুঝতে না পেরে বাবু চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থেকে মোতিই বলল, হুকুম করুন বাবুজী।

কি হুকুম ক'রব?

কত টাকা দিতে বলবেন গরীবকে?

এবার বাবু আশ্বস্ত হল যা হোক তাহ'লে দাম দিয়েই কিনতে চাইছে মোতি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলেই কিছুটা উপেক্ষার ভাবে বলল, ঠিক আছে নেব ত্রিশ-হাজার টাকা। অত টাকা কোথায় পাবি?

হাত জোড় ক'রল মোতি, দয়া করেন হুজুর বিশ হাজার করেন। দান দিন আপনা নোকরকে।

বিশ হাজার। বড্ড কম হচ্ছে। —

অবশেষে বাইশে রফা হ'ল। যে বাড়ী চোখেই দেখেনি বাবু, বাপের রাঁঢ়ের বাড়ী, লোকটা বলছে ভাঙ্গা বাড়ী—যা আসে আসুক।

সেই টাকা জোটাবার জন্যে পাগল মোতি সিং। লীলাবতীর লোভ সহজ সরল উত্তরাধিকারে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অশান্তিতে ভরে তুলেছে। সেই সময়ে মেয়েটিকে পাবার প্রস্তাব দিল যোগীন্দর দালাল। লীলাবতীকে জানাতে সে বলল, ব্যবসার জন্যেই তো রেখেছি মেয়েটিকে, এতদিন খাওয়ানো পরানো কম খরচ তো হয়নি। তা যোগীন্দর ভাইয়াকে বল কি দেবে?

অবশেষে পাঁচ হাজার টাকায় মেয়েটিকে কিনে এলাকার সবচেয়ে অভিজাত বাড়ী কমলমনির কাছে তাকে জমা ক'রল যোগীন্দর। কমলমনি বড় ডাকসাইটে মেয়ে মানুষ তার কাছে দেশের তাবৎ সব বড় লোকের আমদানী। তাই তাকে সেরা সুন্দরীর জোগাড় রাখতে হয়, আবার কেবল সুন্দরী হলেই চলবে না কারণ সমাজের সেই সব সেরা লোকেদের অনেকের বাড়ীতেই তেমন বউ আছে তা সত্ত্বেও এখানে সব আসবে কেন? কাজেই রসকেলি, রসভঙ্গিমা নন্দন কলা শিখে রাখতে হয় এ বাড়ীর মেয়েদের, কমলমনিই তা শিখিয়ে নেয়, ওস্তাদ রেখে নাচের ঠাট ঠমকও শিখিয়ে নেয় যাতে মনোরঞ্জন কর্মটি সুচারু ভাবে ক'রতে পারে আকর্ষণ ক'রতে পারে নামীদামী মানুষগুলোকে।

যোগীন্দর যে ওকে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছে একথা জানতে

না দিয়ে বলল, হামি তোমাকে এমোন বাড়ীতে এনে দিলম এমোন খানদানী বাড়ী জিন্দেগীতে মিলতো না।

সত্যিই অবাক হচ্ছিল মেয়েটি ঘর বাড়ির ভেতরের চেহারা দেখে। কি চমৎকার সাজানো!

ভাল ক'রে থাকবি, হুঁ! এই মাসি জো বলবে বাত মানবি হামি তো রোজ আসবে না!

কমলমনিকে জনান্তিকে জানাল, মেয়েটি তার খরিদা কাজেই এর রোজগারের 'আধা' যোগীন্দরকে দিতে হবে।

অর্দ্ধেক দিলে কি ক'রে হবে? ওর খরচ আছে না?

হুঁ হুঁ। আপনা খরচ কাটিয়ে লিবে! বাকি পয়সা তো কুছু লাগবে নাই।

ওকে দিতে হবে না?

কেনো দিবে? হামি তো ওকে কিনে দিলাম। পরক্ষণেই মোক্ষম চাল দিল যোগীন্দর, গোলাপসুন্দরী মেয়েটাকে মাঙলো হামি দিলাম না।

গোলাপ সুন্দরী প্রবলতম প্রতিদ্বন্দী। কমলমনির যাবৎ দুশ্চিন্তার উৎস। সেখানে এমন একটা টাটকা সুন্দরী পেলে সে যে অনেক এগিয়ে যাবে এই দুর্ভাবনা হবে জেনেই যোগীন্দর দালাল কথাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। নামী দামী খদ্দেররা বেশির ভাগই বাঁধা বাড়ীতে আসে, তাদের মানের ভয় তীব্র তাই রেয়োভাটদের মত বাড়ী বাড়ী রাস্তার রাঁঢ়েদের মুখ দেখে ঘুরে বেড়ায় না। তবু এই দালালরা তো আছে এই যোগীন্দর দালালই নিয়ে গিয়ে গোলাপ সুন্দরীর বাড়ীতে ঢুকিয়ে দেবে কোন বাবুকে। এদের অনেক ক্ষমতা, ওজন বুঝে সেলাম করে করে বাবুদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে রাখতে এদের জুড়ি নেই, দরকার মত সেই খাতির কাজে লাগিয়ে নেয়। এই তো হরিদাসীর বাড়ীটা যখন জ্ঞানদা কিনল রামনরেশ দালালই তো সেনবাবু ব্যারিষ্টারের অফিসে দৌড়ে কাগজপত্র সব ঠিক করিয়ে দিল। টাকা অবশ্য রামনরেশ দুজনেরই খেল কিন্তু হরিদাসী বা জ্ঞানদা কারোই তো আর পথ চেনা নেই যে গিয়ে সব করাবে! কাজেই বাড়ীর বাইরে এই দালালের দলই ভরসা। বাড়ীর বাইরে কেন ভেতরেই কি নয়? ভাল খদ্দের তো কেউ এসব বাড়ী চেনে না। তারা তো সব দালালের পথ ধরেই আসে। কার ট্যাঁকে কেমন কড়ি তা বুঝে নিয়ে এরাই তেমন ঘরে নিয়ে তোলে খদ্দেরকে। যে যেমন তাকে তেমন মেয়ে খুঁজে দেয় আবার যে যেমন মেয়ে তার তেমন বাবু ধরে আনে। চুক্তির সিকি টাকা নেয় বটে খদ্দের দিয়েই না টাকা নেয়! কাজেই কেবল বাইরে নয় ঘরের ভেতরেও ভরসা এই দালালরা, ওদের ঠাণ্ডা না রাখলে চলে না।

তাই যোগীন্দরের সব শর্তে রাজি হয়েই মেয়েটিকে তুলে নিল কমলমনি। টাকার ভাগ না হয় যোগীন্দর নিয়ে নেবে, না হয় ভাগে কম পড়বে তা পড়ুক।

মেয়েটাকে নিয়ে লাভ বৈ লোকসান তো হবে না ? হিসেব বুঝতে কমলমনির সময় লাগে না।

মেয়েটার নতুন নামকরণ হল চাঁপাসুন্দরী। আগের সব ধুয়ে মুছে নতুন ক'রে সাজিয়ে নেওয়া হ'ল মেয়েটিকে। কমলমনির একবার ইচ্ছে হল ওর নাম রাখে দুধে আলতা, এমন ধারা নাম হয় না দেখে তা আর রাখা গেল না—চাঁপাই বা কম কিসে ?

প্রাপ্য মজুরীর সিংহ ভাগ যেহেতু তারই প্রাপ্য তাই যোগীন্দরই প্রথম খদ্দের নিয়ে এল বিশাল চেহারার ওপর বীরোচিত গোঁফ চকচকে এক দশাসই পুরুষকে —কমলমনির কাছে পরিচয় দিল বিহারের চৌমুনিয়ার রাজা সাহেব বলে। বিহার কে না জানে, চৌমুনিয়া চেনা না চেনার দরকার নেই জায়গা একটা বটে এবং সেখানকার রাজা এই লোকটি যে হতেই পারে চেহারা এবং পোষাকে প্রমাণ হাজির করে। অতএব খাতিরটা তেমন ক'রেই ক'রতে হয়। রাজার সঙ্গে রাজার একজন পার্ষদেরও খাতির জোটে এক পর্যায়েরই কারণ রাজার পার্ষদ তো আর যে সে হতে পারে না। পরিচয় পাওয়া মাত্র সামনে ঝুঁকে দু হাত দুদিকে প্রসারিত করে অতি বিনয়ে কমলমনি আহ্বান জানাল, আইয়ে রাজাসাহাব আজ মেরা ক্যা সৌভাগ্য কি তারোঁ কি মেলেমে সুরজ কো দেখাই পড়া। আইয়ে, বইঠিয়ে। সবচেয়ে বড় ঘরটায় রাজকীয় পালঙ্কের ওপর বসালো রাজা আর তার পরিষদকে।

ক্যা লাঁউ রাজা সাহাব ? খানেকে ক্যা পসন্দ ?

খানা তো হো চুকা হ্যায়—

কথার মাঝখানেই চাকর চাঁদরাম একটা মুখবন্ধ বোতল আর দুটো গ্লাস এনে বসিয়ে দিল। রাজা সাহেব বিশাল হাতের থাবায় বোতলটার পেট ধরে তুলে পর্যবেক্ষণ ক'রতে লাগল। ইতিমধ্যে সাদা রঙের সোডার জলের বোতলও এসে বসে পড়তে রাজপরিষদ সেটি তুলে নিয়ে স্বভাষায় বলল, কলকাতার এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে।—বলে বোতলের মুখের ভেতর আটকে থাকা কাঁচের গুলিটাকে দেখতে লাগল যেন একটা আজব বস্তু দেখছে। রাজা নামের ব্যক্তিটি হাতের বোতল নামিয়ে দেওয়া মাত্র সেটা তুলে নিয়ে খুলে দুটো গ্লাসে ঢালতে গেল সে, কমলমনি বড় সোহাগ সহকারে সেটি কেড়ে নিয়ে বলল, লিজিয়ে। আমি আছি কেন ?

সে নিজে দুটো গ্লাসে পরিমাপমত সুরা ঢেলে দিতেই সঙ্গীটি সোডার বোতলের মুখে নিজের বাঁহাতের তর্জনী ঢুকিয়ে ডান হাতের পাঞ্জা দিয়ে আলগা আঘাত ক'রতেই তার আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ফট ক'রে ফুটে ওঠা একটা ছোট্ট শব্দের সঙ্গে উপচীয়মান সোডার জলের উচ্ছ্বাসে।

বাবুদের পেঁাছিয়ে দিয়েই যোগীন্দর দালাল চলে গিয়েছিল, তার ভাগের টাকা সময়মত এসে বুঝে নেবে। কারণ এ রাজ্যে সবই নির্দ্ধারিত নিয়মমত চলে, আর

নির্দ্ধারণ মতই চাঁপা সুন্দরীকে ঘরে আনল পান্নাদাসী। যে কাজের জন্য তাকে নিয়মিত তালিম দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে সেই কাজে প্রথম প্রবৃত্ত হবার সমাগত সময়ে দ্বিধা দ্বন্দ ভয় তিন মিলে তার তখন জড়সড় অবস্থা। তাকে আসতে দেখেই কমলমনি বলল, কি লা তোর রাজা সাহেবকে আমি আপ্যায়ণ ক'রছি বলে রাগ করিস না তো! নে বাপু এখন তুই বোস আমি যাই—বলে লাস্যময়ী ভঙ্গীমা সহযোগে উঠে পড়ল কমলমনি। খদ্দেরকে উদ্দেশ্য ক'রে বলল, রাজা সাহেব আপনার এই সাথীর জন্যে মেয়ে পাঠাচ্ছি। সে এসে বাবুকে ঘরে নিয়ে যাবে।

চৌমুনিয়া তখন সুরার স্বাদে আর টাটকা চাঁপার নেশায় বিভোর হয়ে পড়েছে, বলল, আরে তুম হি লে যাও, ইয়ার!

কমলমনিও কিছু কম সুন্দরী নয় কামোন্মত যে কোন পুরুষের পক্ষে তার আকর্ষণ যথেষ্ট। তাই পার্ষদটি রাজাজ্ঞা পাওয়ামাত্র কমলমনির আঁচল চেপে ধরে তাকে আকর্ষণ ক'রতে সে লাস্যময়ী ভঙ্গীতে বলল, ছোড় মেরে পেয়ারে।

তার চটুল বাক্‌ভঙ্গী এবং শরীর হিল্লোলে লোকটি এমনই উন্মত্ত হয়ে পড়ল যে অমন স্বাদু সুরার পাত্র ফেলেও সে উঠে দাঁড়াল কমলমনির সঙ্গ পাবার জন্যে।

কমলমনিকে এতবড় বাড়ীটা চালাতে হয়, সজাগ ও সচেতন থাকতে হয়, ব্যবসা বজায় রাখতে হয়। আসল মালিক হলে তার দরের মত টাকা দিতে পারবে, তার অনুচর কোত্থেকে দেবে, অনুচরের জন্যে মালিকই বা তা দেবে কেন? তাই এই গাঁইয়ার হাত থেকে পার পাবার জন্যে কমল তাকে শান্ত ক'রল, তুম পিয়ো হম অভি আয়ী।

কিছুক্ষণ বাদে যখন কমল ফিরে এল ততক্ষণে সুরাপানে বিভোর হয়ে গেছে পরের টাকায় স্ফূর্তি করা রাজপরিষদ নির্বোধটি। কমলমনি আহবান জানায়, আও মেরে পেয়ারে।

লোকটি ক্লেশে উঠে শিথিল পদবিক্ষেপে কমলমনির অনুগমন ক'রল তার পোষা প্রাণীর মত আনুগত্যে।

কমলমনি তাকে নিয়ে গিয়ে পাশের একটা ঘরেই ঢুকিয়ে দিল সেখানে এক-উজ্জ্বল যুবতী প্রায় নগ্ন হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েটির শুভ্র পিঠ পাছা সমেত সমস্ত শরীরের যে আভাস দেখা যাচ্ছিল সুরারসের দাহ্য গুণ তাতেই দপ ক'রে জ্বলে উঠল। লোকটির পেছনের কথা আর মনে রইল না, খাটের দিকেই পৃথিবী মনে হ'ল। জীবনে যাকে কোনদিন চোখে দেখেনি, এখনও দেখল না যার মুখ, সেই শুধুমাত্র দেহটির ওপর সে লাফ দিয়ে পড়ল প্রেমহীন যৌনতার টানে, কেবলই প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রেরণায়, পাশবিক আগ্রহে।

চৌমুনিয়ার রূপ চাই, যৌবন চাই সঙ্গে কামকলার রতিভঙ্গীও চাই। ঘরে

তার নির্দিষ্ট রমণী তো মজুদই আছে যে তার আইনসিদ্ধ যৌনসঙ্গী, তার দ্বারা যার বার বার গর্ভাধান হয়েছে, যে জন্ম দিয়েছে তার তিনটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু সে নারী রূপবতীও নয় রসবতী তো নয়ই। সে কেবলই তার দেশজ সংস্কৃতির সমতা রক্ষক, তার ধর্মপত্নী। তাকে দিয়ে সংসার রক্ষা নিশ্চয়ই চলে মনের বাসনা পূরণ চলে না। এত মাইল দূরে এই বিশাল শহরে নানা প্রকার গাড়ীঘোড়ার ঘোরতর ঝকমারি পেরিয়ে আসা তো কেবল এই কারণেই যে এখানে রঙ আছে, জীবনভোগের উপকরণ আছে, যৌনকলার রস-শৃঙ্গার আছে যার দৌলতে জীবনটা তাৎক্ষণিক সুখে ভরে ওঠে।

চাঁপা তার জীবনে আসা প্রথম পুরুষকে দেখে বেশ থতমত খেয়ে গেল ইয়া বড় গোঁফের পটভূমিকায় বিশাল গম্ভীর মুখ আর তেমনই দশাসই দেহ—এই লোকটাকে আর যাই হোক রসসঙ্গী মনে হয় না। বরং বিপরীত মনে হয়, ভীতি সঞ্চারক। লোকটাকে দেখলে রসকসহীন দানব বলেই তার মনে হল। কি ভীষণ চেহারা বাবা! চাঁপা যে কি ক'রবে ভেবে পেল না।

তার জড়সড় ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল চৌমুনিয়া। কোন রসালাপ নয়, কামকেলির ইঙ্গিত নয় খাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে! এমনিতে চমৎকার বিলাইতি হুইস্কির নেশাটা চড়েই ছিল মাথাটা আর একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ল, দেশীয় স্বভাব বশে বলে উঠল, এ শালী রেণ্ডি কাপড়া উত্‌র।

রতিক্রিয়ার এহেন ভাষা আশা করেনি চাঁপা ; সে ভাষা কত নরম হবে, রমনীয় হবে, কোমল হবে তা নয় রুক্ষ কর্কশ খিস্তিসহ আদেশ! এ কেমন কথা! প্রচণ্ড হতাশায় ভরে গেল চাঁপার তরুণ অন্তর্লোক। তার পরমুহূর্তেই এক প্রবল আঘাত এসে পড়ল ওর গালে। লোকটা তার বিপুল শক্তিকে বিক্রমে পরিণত ক'রে চড় কষিয়েছে। কি যে আঘাতের জ্বালা! চাঁপার চোখ ফেটে জল ঝরতে লাগল। অচিরে উপলব্ধি ক'রল গালটা টনটন করছে।

লোকটার ওসব দেখবার ছিল না। সে নিজের সুখ কিনতে এসেছে কারও মনস্তত্ত্ব বিচার ক'রতে নয় তাই চাঁপার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ন্যাকড়ার পুতুলের মত ক'রে টেনে নিল নিজের কাছে। নিজের বাঁ হাতে তাকে ধরে ডান হাত দিয়ে শাড়ীটা খুলে নিল আর এক অমনি টানে। চাঁপা চোখের দেখায় লোকটির শক্তি সম্পর্কে সামান্যই বুঝেছিল এখন অনুভব ক'রল তার পরিমাপ। বুঝল তার কিছু করবার নেই, এখন তার বেঁচে থাকাটাই পরিপূর্ণ ভাবে ওর দয়া নির্ভর। বাড়ীউলির নির্দেশ আছে খদ্দেরকে চটানো চলবে না, খদ্দের এর ইচ্ছাই মেনে চলতে হবে। আগের বাড়ীতেও চাঁপা দেখে এসেছে সে বাড়ীতেও কোন মেয়ের বিদ্রোহ সহ্য করা হ'ত না। সে তখন ছোট, দেখেছিল এবং এখনও মনে আছে, একটা মেয়েকে সে বাড়ীর মাসি কি মারটাই না মেরেছিল। নিজে এবং বিন্দেশ্বর বলে দারোয়ানটা দুজনে মিলে মেরে রাস্তায় ফেলে রেখেছিল সারাটা রাত,

একজন লোকও তাকে সাহায্য করেনি। পরদিন সকালে ফোলা মুখ কাটা ছেঁড়া শরীর নিয়ে নিজেই এসে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল মাসির পায়ে পড়ে; কি কারণ চাঁপা জানতে পারেনি, এখনও জানে না।

কাজেই এই হুমদো লোকটার কোন কাজেই বাধা দেবারও ভয় আছে, কমলমনির ভয়। কমলমনি ছেড়ে কথা বলবে না। খদ্দের তার কাছে মেয়েদের চেয়ে দামী। খদ্দের এলেই মেয়েদের দাম নইলে সব পচামাংসের সামিল। মেয়েদের জীবনের কোন মূল্য আছে বলে মনে করে না সে। সে-কথা প্রথম দিকেই শুনিয়ে দিয়েছে। ট্রেনিং দেবার মত ক'রে নানা পরামর্শ যখন দেয় তখনই বিশেষ ক'রে বলে। এ বাড়ীতে এসে চাঁপা দেখেছে কোন মেয়েই তার আসল নামে এখানে পরিচিত নয়, সবার একটা ক'রে পোষাকী নাম আছে, আর সেই সব নকল নামেই তাদের আসল পরিচয়। সে যেমন চাঁপাসুন্দরী তেমনই আছে রূপকুমারী, জ্যোৎস্নাময়ী, মানদা-সুন্দরী, লীলাবতী, গোলাপ রাণী, শোভা, আরও অনেক। কমলমনিই বেশির ভাগ নাম দিয়েছে, কেউ কেউ নিজেও ক'রে নিয়েছে যেমন লীলাবতী—সে নিজেই এবাড়ীতে এসেছিল আগে অন্য জায়গায় কাজ ক'রত এ বাড়ী আসবার সময় এই নাম নেয় পুরানো নাম পরিচয় গোপনের জন্যে মুছে ফেলে। বৌবাজার এলাকার লোক যাতে তার হদিস না পায় তাই এই ব্যবস্থা বলে সে নিজেই গল্প ক'রেছে চাঁপার কাছে। অনভিজ্ঞ চাঁপা জানতে চেয়েছে, ওখানে তোমার কি নাম ছিল?

দূর বোকা সে কি আর মনে আছে?

অবাক চাঁপা বলেছে, সে কি গো? নিজের নাম তোমার মনে নেই?

অত সুন্দরী মহিলা কুৎসিত ভাষায় বলেছে, দূর শালা বাপের নাম ভুলে গেছি তা নিজের নাম। কি হবে ওসব মনে রেখে যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

চুপ ক'রে গেছে চাঁপা। জেনে গেছে যেখানে যেমন সেখানে তেমন। এখনও তাই চুপ ক'রে সহ্য ক'রল হোঁৎকা খদ্দেরের উপদ্রব। কিন্তু তার জানা ছিল না সে উপদ্রব কতদূর যেতে পারে। নেশাটা বেশ ভালভাবে জমে ওঠা মাত্র নিজের উরুপ্রদেশ থেকে পরিধেয় ধুতি সরিয়ে নিয়ে প্রায় বিবস্ত্র চাঁপাকে টেনে বসালো সেই উন্মুক্ত উরুপ্রদেশের বিশাল মাংসপিণ্ডের ওপর। তাতে চাঁপার ভয় কাটল না বলে কোনই অনুভূতি হল না। অতঃপর চৌমুনিয়াচন্দ্র ঘোষণা করল, আজ তোহার জান নিকাল দেব। জান লে লেব হম।

এসব কথার যে কি রকম জবাব দিতে হয় কি বললে খদ্দের তুষ্ট হয় রসে মজে, সে শিক্ষা অনেকবার পেয়েছে সে কমলমনি এবং আগের বাড়ীর লীলা মাসির কাছে। লীলা মাসি বলত, খদ্দের যত যাই বলুক তাকে রসে বশ ক'রতে হবে। মারব বললে সোহাগ দেখিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলতে হবে, তুমি মারলে কোন ক্ষতি নেই নাগর, তুমি মারলে মরেও সুখ। গালাগালি দিলে হেসে গায়ের ওপর ঢলে পড়তে হবে—তবেই তো ওসব খদ্দের নরম হবে তাদের মন গলবে হাতও গলবে।

আজ প্রথম পরীক্ষার রাতে ওসব শিক্ষার কিছুমাত্র মনে পড়ল না চাঁপার। ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

চৌমুনিয়া সামনে দুচুমুক দিয়ে রাখা মদের গ্লাস ওর মুখে ধরল, লে পী। পী লে রাণ্ডিকা বাচ্চি।

চাঁপা দু একবার এক আধ ঢোক পান করেনি এমন নয় কিন্তু সে সামান্য। মন্দ লাগেনি। কিন্তু কমলমনি কি ভাববে ভয়ে মুখ খুলছে না দেখে চৌমুনিয়া জোর ক'রেই ওর মুখে ঢেলে দিল। কিঞ্চিৎ ইচ্ছা আর আসুরিক শক্তির পেষণ দুয়ে মিলে সে উচ্ছিষ্ট পানীয়টুকু কণ্ঠে পান করে নিল। তার অল্পক্ষণ পরেই সে চাঙ্গা হয়ে উঠল, সমস্ত আড়ষ্টতা জড়তা ছুটে গেল। বোতলটা বড় এখনও অনেক পানীয় বাকি তাই দুটো গ্লাসেই ঢেলে নিল চাঁপা, অনভ্যাসের জন্যে অল্প পানেই সে ভেতরে ভেতরে মত্ত হয়ে উঠেছিল এবার পানের পর তার অস্থিরতা প্রমত্ত হয়ে পড়ল। বিশাল লোকটার আগ্রহ তাকে প্রলুব্ধ ক'রল স্বশরীরের বাস সে নিজেই মুক্ত ক'রে ফেলল তাপ মোচনের আকাঙ্ক্ষায়, বিপুলকায় বপুটিও আপন আবরণ উন্মোচন ক'রে লক্ষ বছর পেছিয়ে মানুষের এই পৃথিবীতে আবির্ভাবের কালে প্রত্যাবর্তন ক'রল। তখন তাকে, হয়ত কোন গেরিলা বা গুহামানব বলে ভ্রম হ'তে পারত কিন্তু শিক্ষার স্পর্শ বর্জিত চাঁপা সুন্দরীর ইতিহাস জ্ঞান না থাকায় সে সব কথা চিন্তা ক'রতে না পেরে প্রাকৃতিক আনন্দের সর্বপ্রাণীসুলভ সুখেই মেতে উঠল। বিপুল দেহের মাংসল বেষ্টনীর মধ্যে সে শিহরিত হল, আনন্দিত হল আবার সেই আসুরিক শক্তির পেষণে ধর্ষণে যন্ত্রণায় কুঁকড়েও গেল।

লোকটাকে নেশার ঘোরে ও রাজাবাবু বলেই সম্বোধন ক'রেছিল এবং এই সম্বোধন স্বাভাবিক প্রাপ্তির মতই ধরে নিয়ে সে নিজের মতই ব্যবহার করতে লাগল। চাঁপার ছোট্ট দেহটিকে নিয়ে কি করবে স্থির করতে পারছিল না সে, যত রকম ভাবে পারল তাকে ভোগ করল তার মধ্যে অত্যাচারও কম ছিল না আর অতসব করেও তৃপ্তি না পেয়ে খালি বোতলের মুখটা চাঁপার যোনির মধ্যে চেপে ধরে অত্যাচারের চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করাতে ও কেঁদে কঁকিয়ে উঠল।

লোকটা দরজা খুলে যখন বেরিয়ে গেল তখন চাঁপা বিছানার ওপর যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কমলমনি চুক্তিমত হিসেব বুঝে নিয়ে ঘরে এসে সরাসরি বলল, আ লা! শুয়ে আছিস কেন রে? একজনকে নিতেই কেতরে গেলি কেমন মেয়ে-মানুষ রে তুই! ওঠ ওঠ।

চাঁপার তখন চলবারও শক্তি নেই সে তাই বিছানায় ছটফট করতে লাগল। কমলমনি সেদিকে গ্রাহ্য না করে বলল, অমন ন্যাকামী করিস নি তো? উঠে পড়। ওঠ, মধু মাসিকে বলি চাদরটা কেচে দিক, একটু রক্ত পড়েছে তা কি হয়েছে? মেয়েদের অমন তো কত রক্তই পড়ে। রাজাবাবু তোকে কত বকশিস দিল দেখি?

বিছানার ওপর ক'টা দশটাকার নোট পড়েছিল, চাঁপা দেখেও নি কমলমনি খপ ক'রে তা তুলে নিল। তার আশুচিন্তা যোগীন্দ্র দালাল এল বলে। তাই স্থির ক'রে নিল এ মেয়েটা আপাততঃ শুয়ে থাকে থাক যোগীন্দ্র চলে গেলে উঠলেই হবে নইলে এই বকশিসের টাকারও অর্দ্ধেক চাইবে ব্যাটা। খদ্দের এনে দিলে চুক্তি টাকার সিকি ভাগ দালালী পাবার কথা, তার বাইরেও বকশিস বলে টাকা পায় খদ্দেরদের কাছে, হাতের খদ্দের হ'লে তো অনেকই পায় তবু যেন লোকগুলোর লোভের সীমা নেই। মেয়েদের শরীর খাটানো টাকা সবটা তুলে নিতে পারলে ওরা তুষ্ট হয়। যতই পাক ভয় দেখায় খদ্দের অন্য জায়গায় তুলবে। বাঁধা খদ্দের গুলোও যেন কেমন, এতদিন আসে যায় অথচ দালালদের কথাতেই চলাচল করে।

যন্ত্রণায় কাতর চাঁপা বিছানায় তখনকার মত পড়ে রইল, কমলমনি মগ্ন রইল যোগীন্দ্র দালালের দুশ্চিন্তায়।

পুতুলরানী দুপুরবেলার নিটোল অবসরে নিজের ঘরে বসে জমিয়ে গল্প বলছিল। নন্দিতা, মঞ্জু, জয়া বেশ মনযোগ দিয়ে শুনছে আর মায়া ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে শরীরের জ্বালা মেটাচ্ছিল। বেশ কিছুদিন হ'ল তার কেমন আঁশড়া বেরোচ্ছে গায়ে, সারা গা চুলকোচ্ছে। ট্রামলাইনের ওপারে আধা ধন্বন্তরী খগেন ডাক্তারকে দেখিয়ে ওষুধ খেয়েও কিছুতে কমছে না। মাসি বলেছিল মৌরী ভেজানো জল খেতে তাও বার কয়েক খেয়ে কোন কাজ হয়নি। কাজ কর্ম সব বন্ধ হবার জোগাড়। বাড়ীউলি মানুষ ভাল বলেই যা রক্ষে অন্য অনেক বাড়ীউলি হ'লে অনর্থ বাধাতো। এ বাড়ীটা সাবেক হিসেবে চলে বলে বাঁচোয়া, কিছুটা স্বাধীন ভাবে জীবন কাটানো যায় নইলে মনিরুদ্দিন লেন থেকে চলে আসা সন্ধ্যারানীর কাছে যা গল্প শোনা যায় সে তো ভয়াবহ। সে যেন শেকল দিয়ে মানুষকে বেঁধে রাখা। শুনতে শুনতে বার বার শিউরে উঠেছে মায়া, বাবাঃ বাড়ী থেকে বেরোতে দেয় না?

না। জানালা দিয়ে উঁকি মারতে দেয় না দিনের বেলা—সন্ধ্যা জানাল। অতঃপর বলল, জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছ এ যদি কারও নজরে পড়ে তো আর রক্ষা থাকবে না এমন মারবে যে সাতদিন বিছানা। ওখানে পান থেকে চুণ খসলে বিপদ। যে মেয়ে একবার সে বাড়ীতে ঢুকবে শরীরে মাংস থাকা পর্যন্ত আর তার নিস্তার নেই। যদি অত্যাচারের চোটে অকালে মরেছে তো বেঁচে গেছে আর নয়ত হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে ওরা ছেড়ে দেবে। ওখানে ত্রিশ বছরের বেশি বয়েসের কোন মেয়ে নেই এক মাত্র ঐ বাড়ীউলি ছাড়া।

তুমি ওখান থেকে বেরোলে কি ক'রে? মায়া জানতে চাইলে সন্ধ্যা বলল, সম্পূর্ণ ভাগ্যের জোরে। একদিন কি হ'ল জানি না একদল লোক এল আশরাফকে

মারবে বলে, তাদের হাতে ইয়া বড়া সব তরোয়াল রাম দা। আমরা তো সব ভয়ে কাঁটা। সব মেয়ে এক সঙ্গে কান্নাকাটি ক'রছে দেখে ওদেরই একজন ধমকে উঠল, তোমরা কেন চেঁচাচ্ছ? চুপচাপ আমরা তোমাদের কাউকে কিছু বলব না, আশরাফকে চাই।

আশরাফ তো তখন বোরখা পড়ে বাড়ীউলির ঘরে লুকিয়েছে। বাড়ীউলি যদি কোনদিন রাস্তায় বেরোতো তবে ঐ কালো বোরখাটা পরেই বেরোতো। লোক-গুলো এত বোকা যে এত মেয়ের মধ্যে মাত্র একজনকে বোরখা পরা দেখেও কিছু বলল না।

তারা যখন বাড়ীর ভেতর ঘুরছে আমি আমার কয়েকটা জামাকাপড় আর সামান্য যা টাকা পয়সা ছিল গুছিয়ে একটা ছোট পোঁটলা বেঁধে নিয়ে দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ওরা কিছু বলল না?

কেউ কি তখন ঠাণ্ডা মাথায় আছে যে ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখবে? ওদের সঙ্গে মিশে মনিরুদ্দি লেন থেকে বেরিয়ে এসে কোথায় যাব দিশা না পেয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এ বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম।

পথে কেউ কিছু বলেনি?

কে কি বলছে ভাববার সময় ছিল না। চোখ কান বন্ধ ক'রে তখন পালাচ্ছি। ঐ গলি থেকে দূরে পালাতে না পারলে আশরাফ পরে ধরে আমাকে চিরে ফেলবে এও তো জানি। তাই তখন কোনক্রমে পালাচ্ছি।

তোমার ভাগ্য ভাল তাই এবাড়ীতে এলে।

ভাগ্য ভাল না হ'লে কেউ ও বাড়ী থেকে পালাতে পারে?

তুমি ওখানে এলে কি ক'রে?

এ কথার জবাব দিতে গিয়ে সন্ধ্যা কিছুক্ষণ থমকে রইল। হয় তার জবাব জোগাচ্ছে না নয়ত সত্যি মিথ্যে কোনটা বলবে সেই ভাবনা শেষ হচ্ছিল না। মায়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, আমার হারামী বাপ আমাকে বেচে দিয়েছিল। আমাদের গাঁয়ের জয়নাল মৌলবীর ভাই সৈফুদ্দিন আমাকে কিনে আনে। আমরা যখন আট বোন পাঁচভাই তখনই আমাকে কেনে সৈফুদ্দিন। আমার আসল নাম ছিল সালমা। তখন আমার এগার বছর বয়েস অতগুলো বোনের মধ্যে আমাকে পছন্দ হয় সৈফুদ্দিনের, দেখতে ভাল ছিলাম তো! সে কলকাতা আনে আমাকে—সঙ্গে অন্যান্য গ্রামের আমি চিনি না, আরও দুটো মেয়ে ছিল।

তুমি কাঁদ নি?

আমাদের খুব ভাল খাবার দিত। প্রথম আমাদের অন্য কোথায় একটা বাড়ীতে রাখে সেখানে মুটকি এক নানী ছিল। যে কদিন ছিলাম যা খেতে পেয়েছি জীবনে

তার নাম জানতাম না। মাংস ভাত তো ছিলই মাঝে মাঝে নানারকম মেঠাই-ও দিত। বাড়ীতে দুবেলা দুমুঠো ভাতও জুটতো না। একটা থালায় সবাই খেতে বসতাম যারা তাড়াতাড়ি খেতে পারত বেশি খেয়ে নিত আমরা আধপেট খেয়ে বড় হয়েছি। এখানে এত খেতে পেয়ে তাই বাড়ীর কথা আর মনেই হত না।

কিছু দিন সেখানে থাকার পর সৈফুদ্দিন চলে যায়। আমরা সেই নানীর কাছে থেকে যাই। হঠাৎ একদিন আসরাফ সেখানে গিয়ে নানীর সঙ্গে ঠিকঠাক ক'রে আমাকে নিয়ে আসে। নানীর সঙ্গে কি যে কথাবার্তা হ'ল আমরা জানিনা কেবল নানী আমাকে বলল, তুমি এর সঙ্গে চলে যাও। ওদের বাড়ীতেই থাকবে।

ছেলেমানুষ বলেই আমি জানতে চাইলাম, কেন ?

নানী বেশি সময় হিন্দিতে কথা বলত, আমাদের সঙ্গেই কেবল বাংলা বলত, বলল, আমি এখান থেকে চলে যাব তো। এই মেয়েরাও অন্য জায়গায় যাবে। তুমি কোথায় থাকবে ?

আমার আর কিছু করবার ছিল না। নিজের ঘর বাড়ী তো নয় কার ওপর জোর ক'রব ? বাধ্য হয়েই আসরাফ-এর সঙ্গে ঐ বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। আমি যাবার তিনদিন পরই একজন পুলিশ ও বাড়ীতে হাজির। আমরা কিছু বোঝবার আগেই বাড়ীউলি তাকে ডেকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বেশ কিছুক্ষণ পর সে চুপচাপ বেরিয়ে চলে গেল। মেয়েরা বলাবলি ক'রল টাকা নিয়ে গেল। দেখলি মাইরি ঐ যে নতুন মেয়েটা এসেছে খোচরগুলো খবর পেয়েই এসেছিল।

আমি কেবল ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলাম, কিছুই বুঝলাম না। পরে দেখতাম প্রায়ই পুলিশ এসে টাকা নিয়ে যেত।

মায়া কথার পিঠে বলল, ও তো সব বাড়ী থেকেই নেয়। না দিলে ব্যবসা ক'রতে দেবে ?

দুপুরে গল্পের আসর জমানো এ বাড়ীর মেয়েদের রেওয়াজ। সকলেই আসে, অনেকের এ সময়টা ঘুম আসে বলে, অনেকে ভাত ঘুম কাটিয়েও আসে। ওদেরই কেউ কেউ বলে, গল্প না ক'রলে ভাত হজম হয় না।—যে যা মনে আসে বলে তবে পুতুলমাসির গল্পই জমে বেশি, সবাই নির্বাক হয়ে শোনে। কেউ কেউ কোনদিন যে চুপচাপ থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ে না এমন নয় তবু শোনবার আগ্রহে এসে বসে। পুতুলমাসি পুরানো দিনের গল্প বলে সবই প্রায় এবাড়ীর গল্প, তার মধ্যে অতীতের মানুষেরা অনেকে এসে পড়ে।

তোরা তো জানিস না এ বাড়ীটা ছিল তরঙ্গিনী দাসীর ! বেনেটোলার মুকুন্দজবাবু এ বাড়ী তরঙ্গিনীকে দেয়। দেখবি বাড়ীটাতে একটা পাথর বসানো আছে তরঙ্গিনী লেখা। আমার অবিশ্যি শোনা কতা তরঙ্গিনী মাসির মা

নাকি বাবুদের বাড়ী কাজ ক'রত, মাসি ছেলেবেলা থেকেই খুব সুন্দরী ছিল তাই কর্তাবাবুর ছেলের চোখে লেগে যায় কিছু সম্পর্কো নিশ্চয় হয়েছেল নইলে ছেলে-বাবু কত্তা হয়ে মাসিকে পাবেই বা কোতায় বাড়ী কোরে এখেনে আনবেই বা কি কোরে ? তা যাই বল তরঙ্গিনীও তাঁকে আপন পতির মত ভক্তি ক'রত আর সত্যিই সতী ছেল মাসি। মুকুন্দেবাবু মারা গেলে মাসি প্রথম আমার মাকে আর জ্ঞানদা মাসিকে নিয়ে আসে। তারপর আসে ভব সুন্দরী, নন্দরানী, আরও দুতিনজন। এখানে ছসাতজনের বেশি কোনদিনই থাকে নি। বাবু মারা যাবায় পর তরঙ্গিনী চেষ্টা ক'রলেন বাবুর ছেলেকে বাড়ীটা ফেরৎ দিতে। তিনি নিলেন না। বাবুর ছেলে রণদা বাবু ছিলেন কংগ্রেসী, দেশ স্বাধীন করবার জন্যে সব সময় এখানে সেখানে কিসব ক'রে বেড়াতেন কখনও বাড়ীতে থাকতেন না। তাঁর দেখা পেতে হ'লে দিনের পর দিন খোঁজ ক'রতে হত। একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে দুটো অল্প বয়স্ক ছেলে এসে হাজির। ছেলে দুটো কোন কথা না বলে সোজা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভেতরে আমার মাকে সামনে পেয়েই জিজ্ঞাসা ক'রল, তরঙ্গিনী মাসি কে ? আমি তখন খুবই ছোট সন্ধের একটু আগেই আমার বই শেলেট নিয়ে চিলেকোঠার ঘরে উঠে যাই, সেখানে নিচের কোন শব্দ পৌঁছোয় না। তরঙ্গিনী নিজে লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু আমার সামনে বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে নিচে নামতেন আমি বলতাম, দিদিমা তুমি এত নামা ওঠা কর কেন ?

উনি আমায় আদর ক'রে বলতেন, তোকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে রে খুনসি ? উনি আমাকে ঐ নামেই ডাকতেন। এ নামের কি মানে বা কেন এ নাম দিয়েছিলেন জানিনা। হঠাৎ শুনলাম মা দিদিমাকে ডাকছে। পরে জেনেছিলাম ছেলে দুটো দিদিমাকে দুম ক'রে প্রণাম ক'রে ফেলতেই দিদিমা চমকে উঠলেন। দুপা পেছিয়েও তাদের পা ছোঁয়া এড়াতে পারলেন না। এমন ঘটনা তো কখনও ঘটেনা, খদ্দের এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রবে এ কি ক'রে সম্ভব ! দিদিমা দেখলেন ছেলে দুটি কুড়ি পার হয়েছে কিনা সন্দেহ মুখে অনাহার আর কষ্টের ছাপ; তারাই জানাল, রণদাবাবু আমাদের পাঠিয়েছেন মাসীমা। রণদা মুখোপাধ্যায়।

রণদাবাবু ! দিদিমা যেন চমকে উঠলেন।

হ্যাঁ।

দিদিমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মা-ও কম অবাক হন নি। দিদিমা স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়লেন, কি ব্যাপার বাবা ?

আমাদের আজ রাত্তিরটা থাকতে দিন।

কি ব্যাপার বল তো ?—দিদিমার সন্দেহ হ'ল এখানে আসবার মত ছেলে তো এরা নয় ! তবে কি জন্যে এসেছে ? হঠাৎ এখানে থাকতে পাঠাল কেন ? অত বড় বাড়ী থাকতে এখানে পাঠায় কেউ কোন অতিথিকে ?

ছেলে দুজন মায়ের দিকে চেয়ে সন্তর্পণে বলল, আমরা কালকেই চলে যাব আজ

রাতে কেবল থাকতে দিন নইলে পুলিশে আমাদের ধরবে।

ও মা! তোমরা বুঝি স্বদেশী ডাকাত?

না মা। ডাকাত নই। আমরা সব স্বাধীনতার জন্যে লড়াই ক'রছি।

স্বাধীনতা কি আর তার জন্যে লড়াই যে কি কিছুই ভাল ক'রে বোঝে না এখানে কেউ তবে মাঝে মাঝে শোনা যায় কি যেন সব হচ্ছে, দেশের রাজা নাকি ইংরেজরা আর আমাদের লোকেরা তার বিরুদ্ধে। ব্যস, এই টুকুই। এর বেশি তরঙ্গভঙ্গ এখানকার বদ্ধজলে হয় না। তরঙ্গিনীর কাছে ও সবের বিশেষ তাৎপর্য নেই কিন্তু ছেলে দুটো তার মত একজন অপকৃষ্ট মানবীকে মা বলে ডেকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে এর বেশি আর কিছু নেই। এমন আন্তরিক সম্ভাষণের জন্যে সবই সে ক'রতে পারে। তার সঙ্গে আবার রণদাপ্রসন্ন পাঠিয়েছে। রণদা মুখার্জী'ও কি যে সে মানুষ! সেও নাকি স্বদেশী ক'রে বেড়ায়, কংগ্রেসের লোক। তাই তরঙ্গিনী বললেন, তোমরা যে হও বাবুমশায়ের ছেলে যখন পাঠিয়েছেন চল, আমার ঘরে চল।

একটি ছেলে বলে ফেলল, কিন্তু আমরা এসেছি এ যেন কেউ না জানে।

তরঙ্গিনী মাকে বললেন, শুনলি তো? বুঝে চলবি।

আমার মা খুব বুদ্ধিমতী ছিল। সব জিনিষ চট ক'রে বুঝত, মা বলল, তুমি ওদের রাখ গে আমি কেউ কিছু বললে সব বুঝিয়ে দেব।

মা সকলকে কি বোঝাল তারাই জানে সবাই মিলে ছেলেদুটোকে যেন রাজার আদরে রাখল। এরা বাড়ীউলির ঘরে থাকে কিন্তু যেন সবার অতিথি। এরই মধ্যে একদিন পুলিশ এল, এ পাড়ায় নিত্য আসে, ঘুরে বেড়ায় ইচ্ছে হ'লে কোন বাড়ীতেও ঢোকে তবে এ আসা সে আসা নয়। লাল পাগড়ীতে রাস্তা ছেয়ে গেল, অফিসার বাবুরা সোজা আমাদের বাড়ী এসে হাজির। আমি তখনও চিলে কোঠায় আছি। মা দৌড়ে এসে একটা ভারী মত ছোট কি যেন আমার কাছে দিয়ে বলল, নে তোর ফ্রকের তলায় প্যাণ্টের মধ্যে গুঁজে রাখ। চুপ ক'রে বসে বই পড়, পুলিশ এলেও উঠবি না আপন মনে পড়তে থাকবি। তোকে যদি জিজ্ঞাসা করে এ বাড়ীতে কোন ছেলে থাকে কিনা বলবি থাকে না।

মা নেমে যেতে না যেতে কজন পুলিশ হুড়মুড় ক'রে এসে হাজির। সোজা ঢুকে পড়ল ঘরে, সামান্য যা জিনিষপত্র ছিল তছনছ ক'রে কি যেন খুঁজল, আমি তখনও সুর ক'রে নামতা পড়ছি দেখে কিছু না বলে ঘর ছেড়ে ছাদে গিয়ে চারদিক দেখে বলল, এত ভুল হবে? নিশ্চয় পালিয়েছে। ঠিক আছে মেয়েদের সব ধরে নিয়ে চল।

মা যে আমার পেটের কাছে কি একটা ভারি লোহা গুঁজে দিয়েছে—খুব অস্বস্তি হচ্ছে, ঠাণ্ডা ঠান্ডা লাগছে আমি উঠছি না, আবার যদি ওরা আসে! ওদের দেখে ভয়ও কম লাগছিল না। হঠাৎ দেখলাম সব নিচে চলে গেল, সিঁড়িতে ওদের

পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে আমি যেন বাঁচলাম, কিন্তু কিছু না বুঝেও একটা ভয় আমার বুকের মধ্যে বসেই রইল।

তারপর ক'দিন ধরে কি হেনস্তাই ক'রল দিদিমাকে। রোজ একবার ক'রে থানায় যেতে হয় ঘণ্টা দুয়েক বাদে ফিরে আসে। কত জিজ্ঞাসা তত্ত্ব-তালাশ। একই কথা রোজ জিজ্ঞাসা করে, একই কথা কত রকম ক'রে বলে—দিদিমার এমনিতে বয়েস হয়েছিল, পুলিশি হাঙ্গামায় দিদিমার শরীর খারাপ হয়ে গেল। পুলিশ দিদিমাকে মারেনি বটে তবে জিজ্ঞাসাবাদ যা ক'রেছে তাতেই হয়রানির এক শেষ।

পুতুলরানীর গল্পের মধ্যেই মঞ্জু কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, তোমার কাছে কি ছিল মাসি ?

পিস্তল রে। আমি কি ছাই অত কিছু জানি না বুঝি ? জানলে তো ভয় পেয়ে যেতাম। মা দিয়েছে রাখা রয়েছে। তখন আমার কোন বোধই হয়নি, পুলিশ লালপাগড়ী ওসব সাঙ্ঘাতিক কিছু একটুই কেবল জানি এর বেশি কোনই ধারণা তখন নেই। ছেলেদুটো যে কি ভাবে পার হয়ে গেল সেও আমি জানি না।

সেই পিস্তল কি হ'ল ?

সে তো পুলিশ চলে যাবার পরই মা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিল কি হ'ল তা জানি না। এসব ঘটনা পরে মার কাছে শুনেছিলাম। এ-ও শুনেছিলাম, যে মানুষকে কেউ কোন দিন চোখে দেখেনি সেই রণদাবাবু না কি দিদিমাকে পরে একখানা চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি দিদিমা যত্ন ক'রে বাকি জীবন নিজের সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলেন। তাতেই নাকি এক জায়গায় লেখা ছিল, বাবা যে বাড়ী আপনাকে দিয়েছেন সে একান্তই আপনার। ফেরৎ নেবার পাপ আমাকে দিয়ে করাবেন না।—দিদিমা বেশ ভাল লেখাপড়া জানতেন, খুব বই পড়তেন বিডন স্ট্রীটে যে চৈতন্য লাইব্রেরী আছে সেখান থেকে রোজ বই আসত তাঁর। দিদিমা এরপর লিখলেন, বাড়ীটা তিনি রণদাবাবুকে দিয়ে মরতে চান।—তারও উত্তর এল, আমি কি ক'রব ? আমি তো বাস ক'রতে যাব না যারা বাস ক'রবে ও বাড়ী তাদেরই থাক। যাদের জীবনে কিছুই নেই তাদেরও তো একটা বাসস্থান দরকার।

ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, রণদাবাবু দেশের একজন নেতা হয়েছেন। তাঁর ভাগ্নে শুনি ভোটে দাঁড়িয়েছে, জিতেছে। কত কি যে হয়ে গেল। আমি ততদিনে বড় হয়েছি, দিদিমা একদিন হঠাৎ মারা গেলেন—সেই জীবনে প্রথম আমি নিমতলার শ্মশান ঘাট চোখে দেখলাম। আমার মা-ই মুখাগ্নি ক'রলেন, শ্রাদ্ধ ক'রলেন। দিদিমার মৃত্যুর খবর মা রণদাবাবুর বাড়ী পাঠালেন কোন উত্তর এল না।

সেই ছেলেদুটোর খবর পেয়েছিলে মাসি ? সবিতা কৌতূহলী প্রকাশ ক'রল।

না। তাদের কোনই খবর পাওয়া যায়নি। তারা ধরা পড়ল, না কি হ'ল কেউ জানে না। তাদের নামও তো আমরা জানতাম না। তারা যদি মন্ত্রীও হয়ে থাকে তাও জানি না। তবে যে ক'দিন তারা এখানে ছিল শুধু মা দিদিমা কেন

সবাই মিলে খুব যত্ন ক'রেছিল তাদের। সময়ের সঙ্গে তারা হয়ত সব ভুলে গেছেন আমরা মনে রেখেছি। অবশ্য সে সময়ের এই আমিই একমাত্র বেঁচে আছি।

সবিতাই মন্তব্য ক'রল, তুমি যত যা-ই বল মাসি ভদ্দরলোকগুলো স… বেইমান হয়।

পুতুলরানী দ্বিমত হ'ল, ভাল মন্দ সব মানুষের মধ্যেই আছে। তা ছাড়া আমাদের কে মনে রাখবে বল? আমরা কি মনে রাখবার কোন কাজ করি?

এই যে ওদের জন্যে তোমরা এত ক'রেছিলে, কোন স্বার্থ ছিল কি? ওরা স… নেতা হ'ল মন্ত্রী হ'ল কিন্তু তোমাদের কথা কি মনে রাখল?

পুতুল ছেলেমানুষদের কথা শুনে অনেকটা অনুকম্পার মত ক'রেই বলল, আমাদের কথা মনে থাকলেও মুখে বলতে মানুষের লজ্জা করে। যারা আসে তারা তো সব লুকিয়েই আসে, বাজনা বাজিয়ে তো কেউ আসে না? অথচ দেখ লোকে একই কাজে যায়, বিয়ে ক'রতে যখন যায় কত সেজেগুজে বাদ্যি বাজনা বাজিয়ে লোক ডেকে জানান দিয়ে যায়।

গল্প শুনতে শুনতে বেলা বয়ে গেলে মেয়েরাই কেউ তাড়া দেয়, তো নে ওঠ সূর্য কি আর আছে? সন্ধে হয়ে এল।

সূর্য আকাশে আছে কি নেই এই পুরানো বাড়ীটার ছাদে না উঠলে তা জানাই যায় না এখানকার অনেক বাড়ী থেকেই নয়। ঘিঞ্জি স্যাঁতসেঁতে বাড়ী সব। বয়সে যত না ততোধিক জীর্ণ অযত্নে। কোনদিন কেউ এক খাবলা সিমেণ্ট কি এক পোঁচড়া রঙ পর্যন্ত লাগায় না। কে লাগাবে? বেশির ভাগ বাড়ীর মালিকরা নিরুৎসাহ তাদের সামান্য ভাড়ার জন্যে আর যাদের নিজের বাড়ী তারা মেরামত ক'রতে পেরে ওঠে না সামর্থের সীমাবদ্ধতায়। তবে এরই মধ্যে পুব দিকের বড় রাস্তার কাছাকাছি অবিনাশ কবিরাজের রাস্তায় কিছু বাড়ী আছে যার দশা এমন দীন নয়, সেগুলো সব চকচক করে ভেতরের ঘরে ঝকঝক করে কমলমণি চাঁপা সুন্দরী কিংবা আগ্রাওয়ালী—ফুলকুমারী, দিলওয়ারা বেগম, মধুবালা সিং, শ্যাম পিয়ারীরা। পথের ওপর কখনই পা পড়ে না তাদের, পথ চলতেও নয়। তারা বাড়ীর সিঁড়ি থেকেই পা রাখে গাড়ীতে, গাড়ীও যেন সেই পায়ের অবর্ণনীয় বর্ণ সুষমায় সৌষ্ঠবে ধন্য হয়।

সন্ধের আগে পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটা একরকম থাকে পথের বাতি জ্বলতে না জ্বলতেই বদলে যায়। সারাদিন যে ছোকরাগুলো এদিক সেদিক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় প্রায় সকলেই শিকারী বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ ও সচেতন হয়ে ওঠে কারও কারও চোখে ফোটে বাজপাখির ধারালো ক্রুর দৃষ্টি।

সোহাগবালার বাড়ীটা বিক্রি হয়ে গেল। ইমামবক্স লেন-এর ভেতরে ছোট দরজার বাড়ীটা ভেতরে যে এত লম্বা সে খবর প্রদীপ সিং কেমন ক'রে জানল কে

জানে। সে-ই যোগাযোগ ক'রে বিক্রি করালো, প্রত্যক্ষ লাভ দালালী। এগার হাজার টাকা রফা ক'রে নিয়ে বিন্দাওয়ালীর সঙ্গে একাত্তর হাজারে চুক্তি করিয়ে দিল। সব মিটে যেতে লোকে শুনে বলতে লাগল, জলের দামে বিক্রি হয়ে গেল বাড়ী খানা।—বাড়ী-ভরা ভাড়াটেরা হায় হায় ক'রল কিন্তু সোহাগবালা অনেকদিন ধরেই মন ক'রেছে বাঁকুড়া জেলার কোন গ্রামে যেন তার দেশ সেখানে সেই ভাইপোদের কাছেই যাবে। সেখানে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটাবে।

যদিও ভাইপোরা কেউ তার খবর জানে না তবু তার বাস্তববোধ বলে যে সঙ্গে এতটাকা আর গয়নাগাঁটি নিয়ে গিয়ে উঠলে সবাই চিনবে, বৌরা খাতিরও ক'রবে। তাদের গিয়ে বলবে, তোদের পিসে মারা যাবার পর তার জমা টাকা নিয়ে চলে এলাম। ছেলেপিলে নেই তা কি ক'রব, তোরাই আমার ছেলে বৌ। এই তো আমার নাতিনাতনী।

সিন্ধুদাসী সোহাগবালার অসাক্ষাতে বলল, এতদিন যাদের সঙ্গে একসঙ্গে জীবন কাটালো তারা কেউ হলো না, কোনদিন চোখে না দেখা ভাইপো তাদের বৌরাই সব হ'ল? বলি সুখে দুঃখে তো এতকাল এখেনেই কাটলো? রোগ বালাই যখন যা হয়েছে এখেনের মেয়েরাই সব ক'রেচে! ক'রবে সেখেনে তারা? মরবে মাগী। মরণ পাখা ধরেছে।

অপর একজন মন্তব্য ক'রল, বয়েস হলে অনেকের ভীমরতি ধরে সোহাগবালারও ধরেছে। কালে কালে কত দেখলুম—ভাই ভাদ্দর বৌ কেউ আপন নয়, টাকা পয়সা হাতিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে তখন বুঝবে কত কদর।

যাই হোক কারও মন্তব্যই কোন কাজে লাগল না বাড়ী বেচে দিয়ে সোহাগবালা সত্যিই একদিন চলে গেল, বাড়ীটা যে কে কিনল কেউ তা দেখল না। কেবল দালালী করবার সুবাদে প্রদীপ সিংই একমাত্র দেখল নতুন মালকিন বিন্দাওয়ালীকে কিন্তু সংশয়ী হ'ল সত্যিই সে নিজে কিনল কি না। বিন্দাওয়ালীর পক্ষে এই কদিনে বাড়ী কেনা সম্ভব তা মনে করা ওর পক্ষে অসম্ভব হচ্ছিল—নিশ্চয় পেছনে কেউ আছে। সেটা যে কে প্রদীপ নিজেও জানে না।

ভাড়াটেরা কেউ সে নিয়ে মাথাও ঘামাল না। তারা ভাবল যেমন চলছিল তেমনই বুঝি চলবে। কেবল সোহাগবালার ঘরে অন্য কেউ আসবে, যে কিনেছে সে এসে ব্যবসা ক'রবে আর মাসে মাসে ভাড়া তুলবে আগের বাড়ীউলি যেমন তুলত।

তার বদলে সোহাগবালার তিনতলার ঘরখানাতে তালা পড়ে গেল। বেশ বড় একটা তালা লাগিয়ে দিল প্রদীপ সিং নিজে আর সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক এল তার ইয়া বড়া কানে পৌঁছানো গোঁফ। তারা এসে গম্ভীর ভাবে চলে গেল কারও সঙ্গে ভালমন্দ কোন কথা বলল না। এরপর মাস তিনেকের মধ্যে আর কারও কোন দেখা নেই। ধন্দে পড়ে গেল সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না, মধুমতী, সুখদা, শীলা—প্রভৃতি যারা নিয়মিত ভাড়া দিয়ে অভ্যেস ক'রেছে আর যারা ধীরে সুস্থে দেয়, সোহাগবালার

তাড়া গায়ে না মেখে অভ্যস্থ তারা ভাবল কেউ চাইছে না তো কি হয়েছে, ভালই তো। বাড়ীউলি ভাল, বিরক্ত করে না। তারা বলাবলি ক'রতে লাগল সবাই তো আর একরকম হয় না, ভাল লোকও তো থাকে। আগের বাড়ীউলি যেমন সকলকে শুষে টাকার কাঁড়ি নিয়ে ভূত খাওয়াতে গেল সবাই তো তেমন নাও হ'তে পারে।

সোনামনির দেনা মিটিয়ে সরমা ক'বছর হ'ল সোহাগবালার বাড়ীতে একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। ঘরটা পাবার ব্যাপারে যোগীন্দর দালালের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছিল। যোগীন্দরই ঘরখানা খুঁজে দিয়ে বাঁচিয়েছিল তা কেবল নয় সরমার স্বাধীনতার পেছনে তার আরও অবদান আছে। সোনামনির দেনা কোনদিনই শোধ করা যেত না যোগীন্দর সুদে টাকা না দিলে। সরমার ছেলে হবার সময় সে যা খরচ ক'রেছিল গত ক' বছরেও তা নাকি শোধ হয়নি। আসল টাকার সঙ্গে সুদ জুড়ে জুড়ে সে এতই লম্বা হয়েছে যে সরমা সারাজীবনেও তা শোধ ক'রে উঠতে পারত না। যে দেনা সুদে বাড়ে এবং সুদেরও সুদে তার কলেবর যদি পুষ্টি লাভ করে তবে তা আর শোধ কি ভাবে হয়? ফলে আধিয়া নয় বস্তুত সরমা ক্রীতদাসীই ছিল। সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। নিজের কাছে লুকানো টাকা যা জমা ছিল তাতে কিছুটা সাহায্য হ'ল বটে বাকিটা সুদে দিয়ে যোগীন্দর দয়া পরবশ হয়ে উদার ভাষায় বলেছিল, উসকে লিয়ে চিন্তা মত্ করো। হম খুন্দর ভি দে দেঙ্গে, কামাই হো জায়গা তো মেরা রুপেয়া সাতা দে না।

সরমা জানত দালালের নেকনজরে থাকলে রোজগার ভালই হবে। তা এই বেশ ভালই হয়েছে। যোগীন্দরের দেনা মিটিয়ে যা জমেছে তা তার সাহস বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিছুই যার না থাকে সামান্যও তার অনেক। ছেলেটাকে মানুষ ক'রতে হবে তো! ঐ তো জয়ন্তীর মেয়ে পড়ে শীলেদের ইস্কুলে। গিরিবালা মাসির ছেলে নাকি কোথায় চাকরী করে বিয়ে থা ক'রে কালীঘাট না কোথায় সংসার করে। মাঝে মাঝে অফিস থেকে ফেরৎ আসে। মাকে যেতে বলে, যায় না, এই রাজত্ব ছেড়ে কোথায় যাবে গিরিবালা, এখানে কি কম আয়? প্রায় ষোলজন মেয়ে খাটে তার—সব রোজগার জমা হচ্ছে, ঐ ছেলেই পাবে। ছেলের হাত দিয়ে মাঝে মাঝে টাকা পার ক'রে দেয় গিরিবালা। সরমাও অমনি ভাবে মানুষ ক'রতে চায় ছেলেকে। সে ছেলেকে কোথাও পাঠিয়ে দিতে চায়, কিন্তু কোথায় পাঠাবে? বাইরে তো কিছু জানে না। শুনেছে অনেক স্কুল নাকি আছে ছেলেদের রেখে দেওয়া যায় মাসে মাসে কেবল খরচের টাকা পাঠিয়ে দিতে হয়। সে কোথায়? কে করে সে সব ব্যবস্থা? আছে তো একমাত্র দিলুদা। —যা হোক একটা ব্যবস্থা কর না?

দিলু সেই যে এ পাড়াতে এসে ঢুকেছে দেশের আত্মীয়স্বজন বা চেনা মানুষ

কেউ তাকে দেখে ফেলবে বলে আর পাড়ার বাইরে পা দেয়নি। কোনদিন সিনেমা থিয়েটারেও নয়। তার ওসব সখ ছিল না, হয়নি। এখানকার মেয়েরা প্রায়ই দুপুরে চিত্রলেখা হাউসে সিনেমা দেখতে যায় দল বেঁধে, দিলু বহুবার যেতে দেখেছে, তার কখনও ইচ্ছে করেনি। এখানেও কোন মানুষের সঙ্গে তার সংযোগ নেই; সৌদামিনী জোর করে নিজের উদ্যোগে সংযোগ ক'রেছিল বলে তার সঙ্গেই একমাত্র ছিল, অমন হৃদ্যতা আর কারও সঙ্গে হয়নি তার। সে একা। তার দোকানের মধ্যে সমাহিত মানুষ। আর একমাত্র আছে সরমা! ওরই সঙ্গে যা কিছু সম্পর্ক। ওঠা বসা খাওয়া দাওয়া যা কিছু সব ওর সঙ্গে।

সোহাগবালার বাড়ীটা একটু দূরে বলে বেশ একটু অসুবিধে হয়েছে দিলুর, কিন্তু উপায় কি? এতগুলো বছর সোনামনির বাড়ীতে মিথ্যে খাটা হ'ল। অর্দ্ধেক রোজগার পাবার কথা থাকলেও বইতে হল কেবল দেনার বোঝা। দুনিয়ার খরচা দেখিয়ে দিল তার নামে। ছেলে হবার সময় যত দেনা হয়েছিল তার ওপর চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ জমে বেড়ে যে টাকা হয়েছে বলল—দিলুর শরীরে রাগ বলে কোন জিনিস থাকলে অথবা দিলুর জায়গায় অন্য কেউ হ'লে সোনামনি খুন হয়ে যেত, পিয়ারা সিং বাঁচাতে পারত না। সৌদামিনীকে কেউ বাঁচাতে পারল? যে খুন করবার ঠিক ক'রে গেল। সরমার জন্যে বড়ই দুশ্চিন্তা হয় দিলুর, দুর্ভাবনা তাকে ছাড়ে না। এখানকার যা বাজার সত্যিই এখানে মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি। কোনক্রমে টেনেটুনে ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত যদি বা টানতে পারে পেশা। সরমা তো ত্রিশও পার ক'রে এসেছে এই সময় আবার বাসা বদল ক'রতে হ'ল, কি ক'রে চলবে দিলু ভাবতে পারে না। পুরানো বাড়ীতে কিছু বাঁধা খদ্দের যাতায়াত ক'রত—

মাঝে মাঝে মনে হয় সরমার চলুক না চলুক কিছু আসে যায় না তার দোকান তো চলে, কোনক্রমে ডালভাত দুটো এই দোকান থেকেই জুটে যাবে, কিসের এত চিন্তা?

দিলু সংশয়ী থাকলেও এ বাড়ী এসে কোন অসুবিধে হয়নি সরমার। ব্যবস্থা ভালই চলেছে। ক বছর টাকা কিছু জমেছেও। তাছাড়া সোনামনির বাড়ীতে থাকাকালীন সোনার গয়না কিছু করিয়েছিল সরমা, উপরি যা রোজগার সব গয়নাতেই বদলে নিয়েছিল। অবশ্যই সে সব গয়না বেশি দাম দিয়েই পেতে হয়েছিল তাকে। বাড়ীতে এসে বায়না নিয়ে যেত তুষ্ট মালাকরের ভায়রা তাতে দাম বেশি পড়ত, নইলে বেশি খাদ ভরা থাকত। তা মালাকারের মন মত দামের চুক্তিতে আসল গিনির গয়না গড়ানো রয়েছে সেই যা সম্বল। সরমার ইচ্ছে সব বেচে হলেও ছেলেকে ভাল স্কুলে দিয়ে লেখাপড়া শেখাবে।

সে ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে না দেখে দিলু বলল, আমি তো জানিনে বলি কি ওরে ওরিয়েন্টাল ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দাও।

আমি করবো? যা করবার তোমারেই ক'রতি হবে।

দিলু ফ্যাসাদে পড়ল, কি নাম দেব ?

ক্যানো হরিশঙ্কর মিত্তির দিয়ে দেবা !

মিত্তির ক্যামবায় হবে ?

কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থাকল সরমা. তারপর বলল, আমারে দিয়ে তো জীবনের কোন আশাই তোমার মেটলো না। তুমি আমার জন্যি সর্বস্বো ত্যাগ কোয়রে গেলে আমিও তোমারে কিছুই দিতি পারলাম না, হরিরে আমি তোমারেই দেলাম।

এরকম শব্দ কোনদিন সরমার মুখে শোনেনি দিলু। কোনদিন সে কোন সম্পর্কের কথা উচ্চারণ করেনি, দিলুও নয়। এত বছর ধরে সে নিঃশব্দে আগলে আছে সরমাকে, কোনদিন নিজের কোন ইচ্ছার কথা বলেনি। তার যে কোন কামনা বাসনা থাকতে পারে সরমা তা উপেক্ষা করে গেছে। দিলুও যে রক্তমাংসে গড়া একটা দেহ তারও যে প্রয়োজন থাকতে পারে এ ভাবনা সরমার মনে আসেই নি। এত লোক যেখানে দেহ সুখের সন্ধানে উন্মাদ হয়ে আসে সেই দেহের বাজারের সর্বোত্তম স্বর্গে দিলু তার মনোবেদনা আর বঞ্চনা নিয়ে নীরব থেকেছে সারাটা জীবন। তার আশা আকাঙ্খা, সাধ আহ্লাদ, সব সমাধিস্থ থেকেছে দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের দ্বার প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত সোনাগাজীর কবরের মত। দিনের পর দিন এক সঙ্গে থেকেছে, খেয়েছে, সুখ দুঃখের কথা বলেছে সরমা, কখন কখন আলোচনাও ক'রেছে নিজের প্রয়োজনের বিষয়, কিন্তু একবারও দিলুকে কিছু দেবার কথা ভাবে নি। দিলু নিঃশব্দে কেবল দেখে গেছে মানুষ আসে মানুষ যায় সরমার দেহ তারা পায়, সরমার দরজা তাদের জন্যে খোলা থাকে। তারা আসে ভোগ করে চলে যায়। বিনিময়ে শুধু দেয় টাকা। যে কোন বাজারেই যেমন টাকার বদলে বস্তু মেলে এখানেও তার ব্যতিক্রম নয়, টাকা দিলে দেহ দেবে সরমারা, জীবন দিলেও নয়। কাজেই দিলু নিজের জীবন দিয়ে কিছুই পেতে পারে না, টাকা থাকলে, টাকার জোগান দিতে পারলে সবই দিত সরমা। দিলু ভেবে দেখেছে তার যদি টাকা থাকত তাহ'লে কি সে সরমাকে এনে অন্যের কাছে জমা ক'রত ? সে তো নিজেই ওকে নিয়ে সংসার পাততে পারত আরও কোটি কোটি মানুষের মত। পারেনি বলেই না অসহায় হয়ে হারাণদাকে ধরে আশ্রয় ক'রে দিতে চেয়েছে মেয়েটাকে। তার অক্ষমতার জন্যেই তো আজ সরমা এখানে।

এই ভাবনা থেকেই এক অপরাধ বোধ তাকে পীড়া দেয়, পীড়িত করে। সে সর্বদা অপরাধী হয়ে থাকে। সেই অপরাধ বোধ তার চিত্তবিক্ষোভও দমন ক'রে রাখে। অক্ষমের অসন্তুষ্টি নিজের শান্তি নষ্ট করে। দিলুর অসন্তুষ্টি নেই বলে শান্তি অব্যাহত। কিন্তু আজ সরমার করুণ স্বীকারোক্তি তাকে বিচলিত ক'রল। মনে মনে সে চঞ্চল হয়ে পড়ল। তবে তা প্রকাশ না ক'রে শান্ত চিত্তে অপেক্ষা ক'রল। অবশেষে স্থির ক'রল সরমার ছেলের পিতৃত্বের পরিচয় দেবার

অধিকার দিয়ে সরমা তাকে যে অনুকম্পা ক'রতে চাইছে তা সে গ্রহণ ক'রবে না। সে কোনদিন নিজের মনের কথা স্পষ্ট ক'রে সরমাকে না বললেও এবার নিজেকে উন্মোচন ক'রল, তোমার ছেলের পদবী তার বাপের নামেই হবে। ওর নাম হবে হরিশঙ্কর সেন। স্কুলে বাপের নাম লেখাবো হরেন সেন।

সরমা দিলুর দিকে সরাসরি তাকাল। স্পষ্ট ক'রেই বলল, তুমি জানো?

দিলু আমতা আমতা ক'রে জানাল, তোমার মতো ক্যামন কোয়রে জানবো?

তা হ'লি অত নিশ্চিত হচ্ছো ক্যানো?

তুমিই তা হ'লি বলো?

তোমারে যা কচ্ছি তুমি তাই করো। দৃঢ়স্বরে বলল সরমা।

দিলু বাদপ্রতিবাদে না গিয়ে চুপ ক'রে রইল। তবে তার মুখের ভাবে মনোভাবের অনঢ়তা ফুটে উঠেছিল বলে সরমা একটু পরেই ভেঙ্গে পড়ল।—তোমারে আমি কি দিতি পারি? আমার তো কিছুই নাই।

বহুকাল পরে হঠাৎই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সরমা, আমার তো কিছু নাই। ঐ শয়তান যখন আমার সব্বস্বো খালো তখনই জানলাম আমি শেষ। আমার আর কিছু র'ইলো না। তুমি আমারে বাচাতে চা'লে—যারে বিশ্বাস কোয়ল্লে সে-ই আমারে মারলো। এমন টাকই মারলো যে আমি বাচার জন্যি যে তোমার হাত ধরবো সে-ও পথ থাকলো না। এই হাত দে তোমার হাত ছুতি পারলাম না। তুমি এহেনে আয়সে নিজের জীবনডারে শেষ কোয়ল্লে। আমি দ্যাখলাম। তোমারে চোয়লে যাতি কলাম তুমি মায়নলে না। তুমি সামনে না থাকলি একদিন ভুলে যাতাম, তা তুমি হতি দেলে না। পরে অবিশ্যি মনে হলো তুমি আছো তো একজন নিজির মানুষ আছে এই সুখ তো অন্তত আছে। এত দুঃখের মদ্দি তুমি আমার জন্যি জীবন শেষ কোয়রে আমার কাছে আছো এই জন্যিই হয়তো বায়চে আছি।

সরমা কোনদিন এত কথা বলে না, অতীতে কখনই বলেনি। দিলুও স্বল্পবাক্। এই কথার ভার সহ্য ক'রতে পারছিল না বলে সে বলল, থামো। যা হবার তা হয়ে গেছে। আমার জন্যি তোমারে ভাবতি হবে না।

সরমা থামল না, পুনরায় আপন বেগেই বলল, তোমার কথা আর ভাবলাম কই! নিজেরে নিয়েই তো ব্যাস্ত হয়ে থাকলাম। এ্যাটটা জীবনের জন্যি যে কি ঝামেলা পোয়াতি হয় তাও দেখতিছি। মানুষ যা করে সবই নিজের জন্যিই করে।

তা তো করবেই

তুমি নিজের জন্যি কি করলে?

দিলু সমস্ত ব্যাপারটাকে হালকা ক'রে দেবার জন্যে বলল, দোকান করলাম।

বাঃ। বেশ কথাডা ক'লে যাহোক।

এর মদ্দি মিথ্যে এক বর্ণও নেই।

সত্যি মিথ্যের কথা হচ্চে না—বলে সরমা বলবার মত কথা না পেয়ে থেমে

গেল। অনেকক্ষণ থেমে থাকবার পর নেহাৎ নিঃশব্দতা কাটাবার জন্যেই বলল, ওসব কথা বাদ দে এ্যাহোন আমি যা বলি তাই শোন। হরিরে মানুষ করো।

মানুষ কেউ কাউরে করতি পারে? সবাই নিজিই হয়। মানুষ কে নয় তাই কও। যে যার নিজির মতো মানুষ। সবাই মানুষ।

এহেনে যারা আসে একজনও মানুষ নয়, জন্তু।

কখনও না।—দিলু দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করল, বলো দেখি কোন জন্তু এত খারাপ হতি পারে? এ্যাট্‌টার নাম করো।

সরমাকে নির্বাক দেখে দিলুই বলল, এ্যাট্‌টা নাম বলতি পারবা না। অথচ নামে সব্‌বাই মানুষ। এহানে থাকলিও সব্বাই মানুষ হয়, যেমন হয় তেমনই হবে।

এই কথাটা সত্য কিন্তু রমণীয় নয়। প্রিয়ালাপের উপযুক্তও নয়। দিলু এমন রূঢ় কথা বলাতে সরমা থমকে গেল। এরপর তার মনে কথা জোগাল না। বলা কথার সুর কেটে গেল। একে তো দিলুর জন্যে সে বিষণ্ণ থাকে, নিজের অশুচি স্পর্শে মানুষটাকে মলিন ক'রতে চায়নি বলেই চিরদিন বঞ্চিত ক'রে এসেছে; তাছাড়া কোনদিনই সে দিলুর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিরূপণের কথা ভাবেনি। দিলু তার আপনজন, কিন্তু কে? এই কথাটাও কখনও তার ভাবনায় আসেনি। আছে তাই আছে—অস্তিত্ব মাত্র। কেন আছে, কি আশায় আছে, কি ও চায় কোনদিনই তা প্রকাশ করেনি দিলু মিত্তির। সুনীল যেমন জোর ক'রেছে, কৌশল করেছে, হরেন যেমন অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছে দিলু সে সবের চৌহদ্দি দিয়ে যায় নি। সে নীরবে কেবল পাশে পাশে থেকেছে, কাছে এসে কাছে থেকেছে—এর বেশী কিছু নয়। তা বলে কি সরমার নারী হৃদয় বোঝেনি চিরন্তন পুরুষের প্রার্থনা? বুঝতে চাওয়া তার সম্ভব ছিল না কারণ সরমা নারী নয়, সে বেশ্যা। গনিকা। তবে বেশ্যাও কখন কখন নারী হয়, সরমা নয়। জীবন তার প্রতি চিরদিনই নির্মম বলে সমস্ত কমনীয়তা সে বহুদিনই খুইয়েছে। দুর্বিপাক তাকে জীবন দিয়ে জীবন কিনতে শিখিয়েছে। এর মধ্যেও সে ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিহত, ব্যাহত তার জীবন প্রয়াস। তাই অবসন্ন মনে প্রতিদানের ভাবনা অবসৃত।

সোহাগবালার বাড়ীর খুব নাম। এখানে ত্রিশ হলে আর কোন মেয়েই থাকতে পারে না। পনের থেকে পঁচিশের মধ্যেই যারা তাদের নিয়ে সোহাগবালার কারবার। একটু বয়েস পর্যন্ত যারা শরীরের বাঁধুনি ধরে রাখতে পারে তারা হয়ত ত্রিশ পর্যন্ত টিকে গেল। তার পরই বলবে, এবার বাপু পথ দেখ। যা টাকা পয়সা আছে হাতে নাও, অন্য কোথাও যাও। সরমাকে যেভাবে মাস কাবারী চুক্তিতে ভাড়া দিল তেমন ক'রে আগে কখনও দেয়নি সোহাগ। তার বাড়ীতে আধিয়া নেই বটে, রোজভাড়ার মেয়ে মানুষ। ছান্নু সিং ভাড়া আদায় করে, বাড়ীর তদারকি করে, এমন ভাব করে বাড়ী যেন তারই। দেশ বিভাগ আর স্বাধীনতার আগে

আরসাদ আলি এই কাজে বহাল ছিল, মুসলিম লীগ-এর ডাইরেক্ট একশন দিবসের ধাক্কায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক যখন তছনছ হ'ল মুস্তাকিন আরসাদরা বাধ্য হ'ল এই মৌরসী পাটা ছেড়ে যেতে কারণ এইসব দিলদার সিং, ছান্নু সিং, দুখন পাণ্ডেরা দেশময় দাঙ্গার সুযোগে ওদের হটিয়ে জায়গা আর জায়গীরদারী দখল ক'রে নিল অতি সহজে। সালাউদ্দিনের দুখানা বাড়ী ছিল, বেচে দিল সামনে যাদের পেল তাদেরই কাছে, একখানা কিনেছিল নাগিনা বাঈ অন্যটি সুরেশ মাস্টার সামান্য দামে। নাগিনাবাঈ আগ্রাওয়ালী কলকাতায় এসেছিল মুজরো করতে। জেনেছিল নাচ শেখবার কোন দরকার নেই পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বুকে কাঁচুলি এঁটে শরীর দোলানো আর বোঁ বোঁ করে ঘুরতে পারলেই তার ঘাগরা ওড়া দেখলে মাত হয়ে যাবে মাতাল বাবুরা। আসলে চাই শরীর; মা করোলী দেবীর দয়াতে টকটকে রঙের আঁটোসাঁটো শরীর নাগিনার। বুকে মাংস সমুদ্রের টাইফুনের মত, সে নাচলে বুকে তার যে নাচন জাগে সে বড় ভয়ানক। দাহ্য তরলে ভরপুর বাবুদের মনে বারুদের ছোঁয়া লাগে তাতে। দপ ক'রে সব জ্বলে ওঠে, আসরে হাজির বাবু দীননাথ সিং-ই হোক আর দয়াময় দত্তই হোক পকেটে যা থাকে অর্ঘ দেয় নাগিনার যৌবনের পায়ে, একঝলক ঘুরে নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কুর্নিশ করেই বাবুকে চোখ মটকায় নাগিনা। খুব মালদার বলে চেনা বাবুর কোলে গিয়েও হয়ত ঝুপ করে বসে পড়ে লাস্য ভরে। বাবুর কোল ভরে পৃথুল নিতম্বের ভারে আর নাগিনার কোঁচড় ভরে রূপচাঁদ মৌলিকে। নাগিনাকে দেবার জন্যে দীননাথের মত হুঁসিয়ার মানুষও দিনের সমস্ত রোজগার এক জায়গায় করে কদিনের সঞ্চয়ে নাগিনার ঘরে ঢোকা যায় তার জন্যে। মন তার আঁকুপাঁকু ক'রতে থাকে, টাকা জমলে গিয়ে হাজির হয়, তৃপ্তি হয় না, উত্তেজিত হয় মাত্র। কিন্তু এর বেশি পেতে যত টাকা লাগে সে দিতে পারে না, যে পারে সে বাবু দয়াময় দত্ত। নিঃশব্দে তার পৈতৃক বাড়ীগুলো একে একে অন্যের হয়ে যায় নাগিনার অঙ্কশায়ী হ'তে। নাগিনার সুখ অর্থে। দয়াময় বা সন্তোষজী নয় ওর তৃপ্তি তাদের অর্থে তাই সে খাতির করে, আইয়ে বাবুজী আইয়ে। তসরিফ রাখিয়ে। অর্থবান বেহিসেবী প্রত্যেককেই বলে, আপকে ইন্তেজার মে মেরে আঁখোঁকে নজর কম হো গয়ে। আর দীননাথের মতো হিসেবী দর্শক এলে অভ্যর্থনা করে লালতা সিং, সৌদাগররা।

তাই অল্পদিনের মধ্যেই অনেক টাকা রোজগার ক'রে সালাউদ্দিনের বাড়ী কিনতে নাগিনার কোন অসুবিধে হয়নি। নাগিনার নিজের ব্যবসা জমে যেতে ভাই সওদাগরকে দেশে পাঠিয়ে মেরোয়ার মেলা থেকে একসঙ্গে দুটো মেয়ে আনিয়ে নিল। ওখানে দেখে শুনে পছন্দ ক'রে কিনে এনে নাগিনা কিশোরী দুটির নতুন নাম বসাল মধুবালা আর চম্পাকলি। কদিন সঙ্গে রেখে অল্প কিছু তালিম দিয়ে কাজে নামিয়ে দিল না হ'লে আর চলছিল না। খদ্দের জমে উঠেছে একা তার পক্ষে সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। আর যেসব খদ্দের এখানে আসছে সবাই চায় তারই মত উদ্ভিন্ন

যৌবনা নাচনে ওয়ালী। অমনি টকটকে ফর্সা রং। সুঠাম শরীর অমনই লাস্যময়ী— উর্বশী। সে এখানে এই নরম চেহারার ভ্যাদভেদে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে কোথায় পাওয়া যাবে? এখানকার মেয়েদের বউ বউ চেহারা, বেশীর ভাগই শ্যামলা গায়ের রঙ, কালোর দিকেই ঢল বেশী। এ বাড়ীর খদ্দেররা ওসব পছন্দ করে না। ঘরে বউ তো সকলেরই আছে অমন নরম ম্যাড়মেড়ে কথা তো তাদের কাছেই সর্বদা শোনা যায় তবে আর এখানে আসা কেন? এখানে আসা মানে একঘেয়েমী কাটানোর জন্যে আসা, উত্তেজিত হতে পারবার জন্যে আসা। নাগিনার কাছে অনেক বেশি টাকা কবুল ক'রেই সকলকে আসতে হয়। আসে কারা? হোসিয়ার পুরের জমিদার ঠাকুর সুরিন্দার সিং, সামনাগড়ের রাজা দরবারা সিং অজনবী, তিলজলা ট্যাংরার জবরদস্ত চামড়ার ব্যবসায়ী আলাউদ্দিন খান্, হাওড়া পিলখানার আশি খানা ট্রাক আর তিনটে-বস্তির মালিক ফুলচাঁদ পাণ্ডে, পেশা জানা যায় না অগাধ পয়সার বন্যা বইয়ে দিতে পাবে মস্ত জওয়ান গজাধর ঝা। এই রকম লোকেদের ভিড় দিন দিন বেড়েই চলছে।

স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ীর মর্যাদা বাড়াবার জন্যে বাড়ীতে দ্বাররক্ষী বসাতে হ'ল। পাড়ারই সন্তান রামবালক। ভোলা, চিক্কুরা টাকার গন্ধে বেশ কিছুদিন ঘুর ঘুর ক'রছিল, তাছাড়া অমন চমকে দেওয়া যৌবনবতী অপসরীরও তো আকর্ষণ আছে—ডাকতেই এসে কাজে লেগে গেল রামবালক। লালতা সিং-এর তত্ত্বাবধানে রামবালক ধীরে প্রতিহত ক'রতে লাগল বাজে আদমীদের। সালাউদ্দিনের পুরানো ভাড়াটেদের মধ্যে ত্রাহিরব উঠল। সৌদাগর হুঁসিয়ার লোক। আগে থেকেই এলাকাব থানায় গিয়ে ভেট, উপঢৌকন, দিয়ে নিয়মিত টাকা জোগানোর ব্যবস্থা ক'রে সব ঠিক ক'রে রেখেছিল। থানার জমাদাররা সবাই বিহার উত্তর প্রদেশবাসী—ভাষাগত আকর্ষণে তাদের অনেকেই সাহায্য ক'রতে আগ্রহী, বাড়তিটা টাকার আগ্রহে। তাদের সাহায্যে আরক্ষী মহল সামলানোর কাজটা জলের মত সরল হল বলেই নিঝঞ্ঝাট। পুরানো ভাড়াটেরা পুলিশের কাছে সুবিধে পেল না, বরং সালাউদ্দিন না থাকায় অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছিল কারণ বাড়ীওয়ালাই তো সব সামলাতো, পুলিশের ঝামেলা, গুণ্ডাদের হুজ্জোত, যাবতীয় কিছু। বাড়ীতে খদ্দের ঢুকতে পারছে না ব্যবসা চলবে কি ক'রে? প্রথমে বাধল সংঘাত। নতুন ব্যবস্থায় প্রতিরোধ ক'রতে চাইল তারা। কিন্তু যে রামবহাল তাদের দেখাশোনা করে সে-ই বিরোধী হয়ে গেছে এখন দেখে কে? সবাই মিলে ঠিক ক'রল এলাকার কংগ্রেস নেতা জ্ঞানবাবুর কাছে যাবে। তিনি ছাড়া আর সাহায্য করবার কেউ নেই। জ্ঞানবাবু থাকেন সেই যদুপণ্ডিত রোডে। হঠাৎ তাঁর কাছে যাবেই বা কি ক'রে? ভোলা, চিক্কুরা সবাই কংগ্রেস-এর হয়ে ভোটের কাজ করে। চিক্কুকেই ধরল তরুলতা, চিক্কু ভাই তুই একবার আমাদের জ্ঞানবাবুর কাছে নিয়ে চল।

আমরাই তো আছি জ্ঞানবাবুর কাছে কি দরকার বল না?

তুই তো দেখছিস আমাদের রোজগার বন্ধ করে দিয়েছে এই আগ্রাওয়ালী। কাজকর্ম ক'রতে দিচ্ছে না। খদ্দের ঢুকতে দিচ্ছে না।

ঠিক আছে আমরাই ওদের সঙ্গে কথা বলছি। এখানে এসে মস্তানী ক'রবে তা তো চলবে না আমাদের কথা শুনতেই হবে, পাড়ার ছেলেদের কথা শুনবে না তা হবে?

না কোন ঝামেলা চাইনা, কেবল দরজা খুলে দিক যাতে খদ্দের আসতে পারে।

চিক্কুরা আগ্রাওয়ালীর সঙ্গে যোগাযোগের পথ খুঁজছিল, রামবালক ওস্তাদকে ডেকে কাজে বহাল ক'রে দিল, ভোলা চিক্কুদের কোন গুরুত্বই দিল না—মনে মনে অনেকদিনই ক্ষোভ ছিল। কিন্তু রামবালকের সঙ্গে ঝামেলাতে তো সুবিধা হবে না! তাই তরুলতাকে বলল, ঠিক আছে আমরাই দেখছি জ্ঞানবাবুকে বলে কি ফয়সালা করা যায়।

জ্ঞানবাবু বয়স্ক মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলনে জড়িয়ে লেখাপড়া বিসর্জন দিয়েছিলেন আরও বহু ছাত্রের মত। ফলে দেশ স্বাধীন হ'লেও অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি পরাধীন হয়ে পড়েছেন, পরাধীন অর্থে ছোট ভাই-এর রোজগারে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন। অবশ্য একা বলেই তাঁর অসুবিধে অনেক কম। একবেলা খান অপরবেলা কোন ঠিক থাকে না। কোন রাত্রে কিছু খান কোন রাত্রে উপবাস। বয়স মাত্র চল্লিশ হলেও নানা অনিয়ম আর স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ের অত্যাচারে এখন শরীর বহু ব্যাধির আধার। আপন অনুজের কাছেও তাঁর সঙ্কোচের সীমা নেই। তিনি যে কিছু করেন না, ভাইকে আর্থিক সাহায্য ক'রতে পারেন না সেজন্যেই তিনি যেন দীন হয়ে থাকেন। অথচ এলাকার সর্বত্র তাঁর যশ, আপন স্বভাবের জন্যই সর্বত্র তিনি শ্রদ্ধেয়।

চিক্কুর কাছে সংক্ষেপে সব শুনে জ্ঞানবাবু বললেন, ব্যাপারটা তো ঠিক হচ্ছে না। ওরা সব গরীব মানুষ, কোথায় যাবে? এতদিন ধরে আছে বাড়ী ছেড়ে কোথায় গিয়ে থাকবে? তোরা গিয়ে বলে দে কোন ভাড়াটেকে তাড়ানো চলবে না। দরকার হলে আমি বিধান বাবুর কাছে যাব। পুলিশকে দিয়ে হলেও এসব বন্ধ ক'রতে হবে। বড়তলা থানা যদি কথা না শোনে লালবাজার তবে শোনাবে। যারা বাড়ী কিনছে তারা তাদের মত থাক কিন্তু ভাড়াটেরাও থাকবে।

চিক্কুরা ঠিক এতটা চায়নি তবু যখন হয়েই গেল ফিরে গিয়ে রামবালককেই প্রথম জানাল, দেখ ভাইয়া কংগ্রেস অফিস থেকে বলে দিয়েছে ভাড়াটেরা যেমন আছে থাকবে, কোন অসুবিধে ক'রলে বা জবরদস্তি ক'রলে লালবাজার ফোর্স আসবে।

কিসসে খবরি ভেজা ভাইয়া? নরম হয়ে রামবালক জানতে চাইল।

হামকো বোলায়া থা।

কিসনে?

জ্ঞানবাবু।

শুনেই রামবালকের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অচল হয়ে গেল। রাজশক্তিকে তার বড় ভয়। সেই শক্তির বিরুদ্ধে যাওয়া চলে না। জ্ঞানবাবুর মত মানী নেতার কথা এখন অগ্রাহ্য করে ক্ষমতা কার? স্বয়ং এম. এল. এ সাহেব পর্যন্ত পারে না। দরকার নেই এমন দারোয়ানীর। আজই কাজ ছেড়ে দেবে সে, নিজের কাজ ক'রবে তাতে ভালই কামাই আছে অযথা পুলিশের রোষে পড়ে সব দিক যাবে। মাসে একটা কাজ ক'রতে পারলেই খরচ উঠে যায়, সে কাজ অনেক ভাল।

খবরটা শুনেই সওদাগর দৌড়ে গেল জ্ঞানবাবুর বাড়ী, বিনম্র নমস্কারে নিবেদন করল, হুজৌর, কি এমন অপরাধ ক'রলাম যে নারাজ হলেন?

জ্ঞানবাবু সওদাগরকে না চেনবার জন্যে স্বভাবতই অবাক হলেন। জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার?

হুঁসিয়ার সওদাগর হাত জোড় ক'রে জানাল, আমার বোন নাগিনা পনের নম্বর বাড়ী কিনেছে। পুরানো ভাড়াটেরা সব ঘর দখল করে আছে। বহুৎ তখলিফ হোতা হ্যায় হুজৌর।

জ্ঞানবাবু শান্তভাবে সব কথা শুনে সওদাগরের ভাষাতেই বললেন, অসুবিধে কিসের? ভাড়াটেরা সবাই ভাড়া তো দিচ্ছে!

ও ভাড়াতে কি হয় হুজুর, বড় কম ভাড়া। আমাদের নিজেদের লোক দেশ থেকে আসছে থাকবার জায়গা হচ্ছে না।

হ্যাঁ আমি সব জানি, ভোলা চিক্কুরা এসেছিল, সরলভাবে বললেন জ্ঞানবাবু। সংযোজন ক'রলেন, ও বাড়ীতে সাতাশ ঘর মেয়ে আছে। তিনটে ঘর তো খালি পাওয়া গেছে। বাকি যে সব ঘরে পুরানো মেয়েরা আছে তারা কোথায় যাবে? ওদের তো যাবার কোন জায়গা নেই!

লেকিন বহুৎ টাকা দিয়ে বাড়ীটা কিনেছি হুজুর।

কে কিনতে বলেছিল? একজন ভাড়াটেও উঠবে না, কারও ওপর জবরদস্তি ক'রলে তার ফল ভাল হবে না।

হমলোগ ভি কাংগ্রেসী হ্যায় সাহাব, শেষ অস্ত্র প্রয়োগ ক'রল সওদাগর।

বাঃ। তবে তো খুবই ভাল। তা হ'লে তো আমাকে আর কিছু বলতেই হবে না ওখানে আমাদের মাস্টারজী আছে, নাম সুরেশ ঝা ওই তো ওদিকটা দেখে। চিক্কুরা চেনে।

চেনে সকলেই, মাস্টারজী ঐ গলিটুকুর বাইরে সম্মানিত লোক। যে বাড়ীটায় থাকে গলির সেই বাড়ীটার বাইরের দিকের ঘরখানা ছাড়া আর সব ঘরে মেয়েরা ভাড়া থাকে ব্যবসা করে। অবশ্যই নিজের শরীর বিক্রির ব্যবসা। রাস্তা থেকেই সরাসরি ঘরটিতে ওঠানামা বলে মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবার দরকার হয় না, কথাবার্তা বলবারও নয়। তবু দু একটা হালকা স্বভাবের মেয়ে মাঝে মধ্যে বলে ওঠে, মাস্টারজী নমস্কার। বা মাস্টারজী রাম রাম।

সুরেশ জবাব দেয়। জবাব মাত্রই, ফিরে তাকিয়ে হয়ত বলে, আজাদ রহো।—মনে মনে প্রচণ্ডই ঘৃণা করে মেয়েগুলোকে তবু ঘর ছেড়ে অন্য পাড়ায় যায় না। দেশের আর একজন মানুষ রামখেলান পাণ্ডে দারোয়ানগিরির সুবাদে এই ঘরটিতে বাসের অধিকার পেয়ে নিজে আজীবন থেকেছে, সঙ্গী হিসেবে বছর দশেক আগে কিশোর সুরেশকে এনে রেখেছিল এক সঙ্গেই খানা পাকানো ইত্যাদি করবার জন্যে। গ্রামের স্কুল থেকে আট ক্লাস পড়ে এখানেই দেশতুতো চাচার সঙ্গে থেকে জোড়াসাঁকোর মহেশ্বরী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে নিয়ে সে পথে আর এগোয়নি। সরস্বতী শরণ নিতে দেশের লোকেরা কেউ কলকাতা আসে না লক্ষ্য ক'রে সে-ও শশব্যস্ত হয়ে সরস্বতীকে ত্যাগ ক'রে দেবী লক্ষ্মীর শরণ নিয়েছে। চাচাজী যে 'জমিনদারের' কাজে এখানে বহাল ছিল এ এলাকায় সেই পাইন বাবুদের খান দশেক বাড়ী। চিৎপুর রোডের ওপরও বেশ কয়েকখানা। রামখেলান এ্যালেন বাজারের সামনে একটা ছোট বাড়ী মালিককে বলে নামমাত্র ভাড়ায় করিয়ে দিয়েছে সুরেশকে, সেখানে সে এলাকার নিম্নবর্গের হিন্দিভাষী শিশুদের পড়ায়। একতলার ঘরদুটো সুরেশই দেয় ভাড়ার চারগুণ টাকায় ভাড়া দিয়েছে দুই ছাপাখানাওয়ালাকে—স্টার প্রেস আর অন্যজন একটা ভাঙ্গা ট্রেডল মেশিন জুটিয়ে নিয়ে জবরদস্ত সাইন বোর্ড লাগিয়েছে এ্যারিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস। দোতলায় তিনখানা ঘর জুড়ে সুরেশের ছাত্র পড়ানো শুরু ক'রে এখন দাঁড়িয়েছে বৈশালী বাল বিদ্যালয়। কেন বৈশালী নামকরণ জানে কেবল সুরেশ ঝা। দুজন শিক্ষক একজন শিক্ষিকার সাক্ষর থাকে খাতায় সমস্ত ছাত্রকে পড়ায় একা সুরেশই। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তার প্রাথমিক বোধও না থাকার সুযোগে সে স্কুল সম্পর্কে নির্বিকার। পাঁচজনই হোক বা পনের জন—ছাত্র সংখ্যায় তার বিদ্যালয় ব্যাহত হয় না। সুরেশ বুদ্ধিমান। সে যথার্থ বোঝে যে সব ছাত্র তার বিদ্যালয়ে আসে তাদের পটভূমিতে শিক্ষা শব্দটি অনুপস্থিত। এদের পূর্বসূরীদের পেশা একান্তভাবেই শারীরিক শ্রম নির্ভর, সেখানে মেধার স্থান শূন্য। উত্তরাধিকার সূত্রে এই শিশুগুলোর ভবিষ্যৎও সেই একই সূত্রে বাঁধা, কাজেই কোনক্রমে নিজের নাম লিখে নিজেকে সাক্ষর জাহির ক'রে সমাজের উপকার ক'রতে পারলেই অনেক হবে, তাই শ্রেণী নির্বিশেষে সব কজন ছাত্রছাত্রীকে এক সঙ্গে বসিয়ে কাউকে নির্দেশ দেয় 'কিতাব সে ইতনা লিখ' বাকি ছোটগুলোর সামনে একটি বেত ধরে বলে, বোল অ। তারা পাঁচসাতটি কণ্ঠ তারস্বরে চেঁচিয়ে চলে 'অ'।

দোতলার বারান্দায় একটা পেটা ঘড়ি আছে স্কুল বসবার সময় সেটা নিজেই সজোরে বার দশেক পিটিয়ে পাড়াকে সুরেশ অকারণ জানায় স্কুল বসছে। বিকালে বন্দিত্ব থেকে শিশুদের মুক্তি দেবার পর আর একবার হাতুড়িপেটা ক'রে বোঝাতে চায় স্কুলে কোন বেনিয়ম নেই। মাঝে মাঝে দেশের লোকেরা তেমন কেউ দেখা ক'রতে এলে ছাত্রদের কাউকে দিয়ে ফুটপাথের দোকান থেকে ভাঁড়ের চা গ্লাসে ক'রে এনে

ভাঁড়ে ঢেলে খাইয়ে দিয়ে এক চিমটে খৈনি ডলে দিয়ে বলে, তু জরা বৈঠ হম ঘণ্টা ভরমে আওয়াতানি। অথবা কোন সময় অমনি কারও সঙ্গে চুক্তি ক'রে তারই ওপর ছাত্র আগলানোর দায়িত্ব দিয়ে স্কুল বোর্ড, শিক্ষা দপ্তর, বিধানসভা—প্রভৃতি সব জায়গায় ঘুরে আসে স্কুলের জন্যে সরকারী সাহায্য জোগাড় করবার তদবিরে। পরিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যে যত রকম সরকারী সহায়তা পাওয়া যায় সব কিছুর খবর তার জানা। এছাড়া অনাথ শিশুদের জন্যে যত প্রকল্প আছে তাদের অনুদানও ঠিক সময়ে তক্কে তক্কে থেকে জোগাড় ক'রে নেয় সুরেশ। সেই জন্যে স্কুলে নিয়মিত আসুক না আসুক এই এলাকার কিছু পিতৃপরিচয়হীন শিশুর নামও তার স্কুলের খাতায় ঢোকানো থাকে।

ফলে সে এখানে প্রতিষ্ঠিত মাস্টারজী।

সর্বত্র কিন্তু তার ব্যবহার একরকম নয়। যে 'রাণ্ডী লোকেদের' মধ্যে সে থাকে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে সর্বদা ছাড়া ছাড়া ভাব থাকলেও মোটা ভাগলপুরী ধুতি পরণে আর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে সে যখন বাড়ীওয়ালা পাইন বাবুদের বাড়ী যায় বোঝায় সে সত্যিই একজন গরিব মানুষ অনাথ শিশুদের সাহায্য ক'রে জনসেবায় জীবন কাটাচ্ছে। স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে তার পরিচয় সে একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী মানুষ। চরকায় কাটা সুতোর পোষাক ছাড়া সে পরে না। অনাথ শিশুদের জন্যে স্কুল চালায়—। সর্বোপরি পদবীটা ঝা হবার ফলে এলাকার মধ্যেকার বিপুল সংখ্যক হিন্দিভাষী বিহার উত্তর প্রদেশীয় বাসিন্দার কাছে সে প্রণম্য, দেখা হ'লেই তারা জানায়, পরণাম পণ্ডিতজী।—সে দালাল হোক বা গুণ্ডা হোক অথবা কোন রাণ্ডীখানার দ্বাররক্ষীই হোক সকলের কাছেই তার সমান সমাদর। তার উত্তরে সকলকেই সে সমান ভাবে বলে, ক্যা সমাচার বাতাও।

ব্যস ঠিক।

এটুকু শোনবার জন্যে মুহূর্তমাত্র দাঁড়িয়ে আবার চলতে সুরু করে সুরেশ। সারাদিনে সামান্যই কাজ বলে বাকি সময়টা এলাকা চষে বেড়ায়। দিনের বেলায় ঝিমানো রাতে জমাট এই এলাকার পথগুলো যখন প্রায় অগম্য হয়ে পড়ে তখনও একজনই মাত্র প্রয়োজনহীন লোক স্বচ্ছন্দে বিচরণ ক'রে বেড়াতে পারে সে ঐ মাস্টারজী। সর্বত্র তার অবাধ গতি। বড়তলা থানার যে সব জমাদার রাতে এলাকা পাহারা দিতে আসে, যাকে তাকে ধরে নিয়ে থানার খাতায় কেস লিখে দেয় বা টাকা আদায় করে, তারাও চেনে মাস্টারজীকে, সামনে পড়লেই বলে, জয়রামজী।

সুরেশ সহাস্য সম্বোধনে প্রতিউত্তর দিয়ে আপন পথ চলে।

এ হেন মাস্টারজীকে চিনে নিতে সওদাগরের মত লোকের কতটুকু সময় লাগতে পারে? পরদিনই স্কুলে গিয়ে ধরল, আপহী তো মাস্টারজী হ্যাঁয়।

হাঁ। ক্যা বাত হ্যায়?

ছাত্ররা সব হাঁ করে তাকিয়ে রইল, কেউ মেতে গেল সতীর্থর সঙ্গে গল্পে।

সওদাগর বাণিজ্য ক'রতে এসেছে, জানাল, থোড়ি সি বাত করনা হ্যায়।

হাঁ ভাই বোলো।

মেরা নাম সোদাগর সিং হ্যায়।

হাঁ হাঁ।

আধঘণ্টা ধরে বিস্তারিত ভাবে সব কথা শুনে সুরেশ জানতে চাইল, জ্ঞানবাবুনে মেরে পাস ভেজা ?

হুঁ্যা জী। উনহোনে আপহীকো সোঁপ দিয়া। ইসকো সালটা দিজিয়ে।

ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করবার দায়িত্ব পেয়ে সুরেশ মনে মনে খুশিই হ'ল। জানাল, সব তো শুনলাম। জ্ঞানবাবুর সঙ্গে কথা বলে বলব।

সওদাগর সিং ধরে বসল, আপনাকেই এটা নিষ্পত্তি ক'রে দিতে হবে মাস্টারজী। যেখানে যা ক'রতে হবে বলবেন সব ঠিক ঠিক হয়ে যাবে। জ্ঞানবাবু-উনবাবুকে যদি কিছু দিতে হয় ওভি হয়ে যাবে—।

কথাটা শুনেই চমকে উঠল সুরেশ ঝা তবে মনেই চেপে রাখল। জ্ঞানবাবু সম্পর্কে কিছু জানেনা লোকটা। না জানুক তাতে লাভই হবে। জ্ঞানবাবুর নাম ক'রেই টাকা আদায় ক'রে নেওয়া যাবে, এখন গরজ আছে। সত্যিই তো এতগুলো টাকা দিয়ে বাড়ী যে কিনেছে রোজগারের জন্যেই তো কিনেছে, ঘর খালি না পেলে তার চলবে কি ক'রে ? খালি পেতেই পারে। যথার্থই তার খালি পাবার অধিকার আছে—আপন ভাবনার কথাগুলো সওদাগরকে বলে নিজের পথ ক'রে নিল সুরেশ ঝা।

সওদাগরও প্রীত হ'ল। এই তো হ'ল ন্যায্য কথা। আর এই স্বভাষী সহমর্মিতার আশাতেই সুরেশ ঝা-র নামটি শুনেই মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছিল, কাজ হবে। তাই সার্থকতার ভাবনায় জানতে চাইল, আপ কাঁহাকে রহনে বালে হুঁ্যায় ?

মুঙ্গের কে।

হামলোগ ভি আগ্রাকে হুঁ।

ও তো মুঝে খুব মালুম হ্যায়।

ঠিক হ্যায় ভাই সাব এ কাম আপ সালটা দিজিয়ে, ইঁহাকে লোক তো নেহি হোনে দেঙ্গে।

হো গা কাহে নেই ? দেখিয়ে পয়সে কে আগে কুছ নেহি চল সখতা হ্যায়। আপকো কুছ তো খরচা করনে পড়ে গা।

সওদাগর তাতে রাজি। সে নিজেও বুঝেছে জ্ঞানবাবু যে ভাবে এক কথায় না বলে দিয়েছে তারপরই সুরেশ ঝার নাম ক'রেছে তাতে এই লোকের মাধ্যমেই কাজ হবে। এই সব ভেবে সওদাগর বলল, এখন কি দিতে হবে ? ওনার জন্যেই বা কত চাই ?—সওদাগর টাকা পয়সার ব্যাপারটা প্রথমেই পরিষ্কার ক'রে নিতে চায়।

নইলে পরে সব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুরেশ টাকার গন্ধ পেয়েছে বলেই ব্যাপারটা হাত থেকে ছাড়তে চায় না। তবে মনে মনে আতঙ্কিত যা জ্ঞানবাবু যে মানুষ তাতে একচুলও নড়বেন না। তাঁর কাছে কোন সুযোগ নেওয়া অসম্ভব। এসব কথা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। তা বলে এতগুলো টাকা কি ছাড়া যায়? তাই সে গান জুড়ল, দেখ ভাই আমি চেষ্টা ক'রতে পারি তবে কি হলে হবে সে এখনই কি ক'রে বলব? এ তো কোন গাধা কেনাবেচা নয় যে দর দাম পাকা ক'রব। শুধু জ্ঞানবাবুর ওপর নির্ভর ক'রে থাকলে তো হবে না, তারও ওপরে যেতে হবে।

এ কথাটাও মনে ধরল সওদাগরের। ঐ লোকটার ওপর কাউকে ধরে যদি কাজটা হয়ে যায় তো ভাল। ওপর থেকে চাপ দিলে আর অরাজি হতে পারবে না। ও যদি একবার ডেকে বলে দেয় তাহলেই এলাকার চিঙ্কু ভোলারা এক পাঁইট মদ পেলে সব কাজ ক'রে দেবে, রামবালকও ক'রে ফেলতে পারবে। একা রামবালকই প্রায় কাজ হাসিল ক'রে এনেছিল ঝামেলা ক'রল তো ঐ জ্ঞানবাবু। লোকটা কখনও এ পাড়ায় আসেও না অথচ ওখানে বসেই মাতব্বরী করে। আর রামবালক কিনা কাজ পর্যন্ত ছেড়ে দিল লোকটার ভয়ে! এর মধ্যে পুলিশ অফিসার বর্দ্ধনও বলেছে, ওরে বাবা! জ্ঞানবাবু না চাইলে কিছু করা যাবে না। কমিশনারও পারবে না থানা তো কোন কথা। উনি নারাজ হলেন কেন? ওনার কাছে কে গেল?

ভাড়াটেরাই কেউ খবর দিয়েছে হবে—।

বর্দ্ধন মাঝে মাঝেই আসে এ পাড়াতে। পয়সা নেয় না কেবল সম্ভোগ করে। নাগিনা নিজেও একদিন সঙ্গ দিয়েছে বর্দ্ধনকে। আর সেই মূল্যবান সঙ্গ পেয়ে লোকটা এমন বশ হয়েছে যে প্রায় কেনা হয়ে গেছে, বিনা দ্বিধায় যে কোন কাজ করে দেয়। কিছু দরকার হোক আর না হোক নাগিনার যে কোন প্রয়োজন সাধনের জন্যে তৎপর থাকে। একবার বললেই হ'ল। সেই লোকও যার নামে ভয় পেয়ে যায় তাকে বশে আনা কি সহজ কথা! এসব মনে পড়ে সওদাগর সংশয়ী হয়ে পড়ে। সাবধানতা অবলম্বন ক'রে বলে, আপনি কথাবার্তা বলে নিন তারপর যা লাগবে বলবেন।

সুরেশ দেখল ধরা মাছ প্রায় ফস্কে যায়। এ সুযোগ গেলে আর ফিরে আসা মুস্কিল তাই মরিয়া হয়ে বলল, মুখে কথা বললে সব জায়গায় চলে না। জবরদস্তি ধরিয়ে দিতে হয়। সব লোককে কি সরাসরি টাকা তুলে দেওয়া যায়। বাড়ীতে কোন জিনিষ কিনে দিয়ে মেয়েদের দিয়ে বলিয়ে নিতে হয়। কত কায়দা আছে।

হতে পারে, এসব সূক্ষ্ম কায়দা সওদাগর বোঝে না। সে তাই মনে মেনে নিলেও টাকা দেবার ব্যাপারে শব্দ উচ্চারণ ক'রল না। কাজ ক'রে দিয়ে যত দরকার নিয়ে নাও, তাতে সওদাগর দরাদরি ক'রবে না বা একটা পয়সা কম দেবে না। কিন্তু আগাম টাকা দিতে তার একান্তই অনিচ্ছা। এই মনোভাব বুঝেই সুরেশ তার

কায়দা বদলালো, ঠিক আছে এখন তবে যাও। যদি মনে হয় কাজটা জরুরী তবে এসো আর যদি অন্য কেউ আশ্বাস দিয়ে থাকে তবে তার কাছে যাও।—কথা বলেই সে মনে মনে কর্তব্য স্থির ক'রে নিল, আজই থানার বাবুদের জ্ঞানবাবুকে দিয়ে অথবা তাঁর নাম ক'রে সাবধান ক'রে দিতে হবে যেন ভাড়াটে তোলবার ব্যাপারে কাউকে কোন সাহায্য ক'রতে না যায়। জ্ঞানবাবু হয়ত বলতে রাজি হবেন না। তিনি ওসবে যেতে চান না তবে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার ছলে মত নিয়ে সেই মত ধরেই থানাকে বলতে হবে উনি বলে দিয়েছেন। থানার সাহায্য না পেলে সওদাগরকে আসতেই হবে, আপনি টাকা দিতে হবে।

সালাউদ্দিনের কাছে বাড়ীটা নিতে গিয়ে দেনা হয়ে গেছে সুরেশের, এখনও সব শোধ হয়নি। কিস্তি দিতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে এভাবে যে কলকাতা মহানগরীতে একটা বাড়ী তার হয়ে যাবে এমন কথা কি কখনও ভাবতে পেরেছিল! স্বপ্নেরও অতীত। চাল নেই চুলো নেই সেই লোক হয়ে গেল বাড়ীর মালিক। মজাঃফরপুর জেলার সুলতানপুর গ্রামের বাসিন্দা বলে সালাউদ্দিনের সঙ্গে আলাপটা ছিল। তবে বিত্তবান লোক সালাউদ্দিনকে সুরেশ কিছুটা সমীহ করেই চলত। তবু দেখা হলেই খবরবার্তা বিনিময়টা হ'ত। স্বাধীনতার আগেই যে দাঙ্গা তখনই সালাউদ্দিন কেমন ভীত হয়ে গেল। হবার কারণও ছিল। মুসলীম লীগের ডাইরেক্ট এ্যাকশান ডে-র তিনদিন পর যখন হঠাৎ আক্রান্ত হবার বিভ্রান্তি কাটিয়ে হিন্দুরা প্রতিরোধে আর প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল প্রাণের ভয়ে সালাউদ্দিন ইঁদুরের মত হয়ে পড়েছিল। যে ষোড়শীবালাকে একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল তারই দয়াতে প্রাণে বাঁচল সালাউদ্দিন। ষোড়শী বৃদ্ধমানুষ, ঘর ছেড়ে সিঁড়ির নিচে নিজের সারাজীবনের সঞ্চয় খুইয়ে সামান্য কিছু কাপড়চোপড় পোঁটলা ক'রে নিয়ে থাকত। সেই সব পোঁটলার মধ্যে মালিককে বসিয়ে রেখে নিজে সামনে বসে আগলে ছিল ষোড়শী। প্রতিদিনের পরিচিত মানুষগুলো তখন উন্মাদ হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। চোখের সামনে জব্বরকে ধরে কেটে ফেলল দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যার উপক্রম হলেও আড়াল ছাড়ল না ষোড়শী। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওরা চেঁচাচ্ছিল সালাউদ্দিন তো ভাগে নি। ও শালা আছে—। কিন্তু কারও মনে হয়নি যে সিঁড়ির তলায় ষোড়শীবালার পেছনে সে লুকিয়ে থাকতে পারে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে পুলিশ এসে যারা যারা বেঁচে লুকিয়ে ছিল তাদের উদ্ধার ক'রে নিয়ে যায়। পুলিশের গাড়ী এসেছে খবর পেয়ে পুলিশকে ডেকে সালাউদ্দিনকে তুলে দেয় ষোড়শী নিজে।

সব মিটে গেলে, তিনরঙের পতাকা নিয়ে সবাই যখন বিভোর, মাটি থেকে রক্তের দাগ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার, সালাউদ্দিন একদিন সুরেশ ঝাকে খবর পাঠাল, কলুটোলায় আছে সে তার নিজেরই বাড়ীতে দুনম্বর বিবির কাছে। সেখানেই প্রস্তাব ক'রল। বড় বাড়ীটার খদ্দের জুটে গেছে, ছোট্ট বাড়ীখানা বাকি। সুরেশ কোন

একজন খদ্দের জুটিয়ে দিলেই বিক্রি ক'রে সে পাকিস্তান চলে যাবে। ইমামবক্স লেনে সুরেশ যে বাড়ীতে থাকে তার কাছেই ছোট্ট বাড়ীটা তার চেনা তাই তাকে বলছে সালাউদ্দিন।

প্রস্তাব শুনে সুরেশের হঠাৎ কেমন লোভ হ'ল ছোট্ট বাড়ী, তিন চারখানা ঘর আছে, তাও ওই ঘরই কেবল তার সঙ্গে এক পা জমিও উঠোন বলে নেই। সুরেশ দেখেছে। লোভের বশবর্তী হয়ে সে বলল, ইয়ার তোমার ঐ টুকু দেশলাই-বাক্স কে নেবে ?

দেখ না কে নেয় ? আমি ওখানে গেলে তো খোঁজ খবর ক'রে ঠিকই বেচে দিতে পারতাম।

না না। তুমি এখন ও দিকে যেয়ো না। তোমার ওপর সব খুব ক্ষেপে আছে। তোমাকে দেখতে পেলে কি হবে কে জানে ?

সালাউদ্দিন মনে মনে ভীত থাকলেও মুখে বলল, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। মিটে গেছে সব ঝামেলা, এখন আর কোন ভয় নেই।

ও শালা লাথখোরের জায়গা, ওখানে কাউকে কোন বিশ্বাস আছে ?

একথা মনে মনে ভালই জানে সালাউদ্দিন তাই প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলল, আমার অবশ্য সময়ও নেই, আমাকে এখন যাবার জন্যে ব্যবস্থা ক'রতে হচ্ছে। সেই নিয়ে ব্যস্ত আছি।

সালাউদ্দিন নিজেও জানে ইমামবক্স লেন-এ বাড়ী কেনবার মত কেউ নেই। ওই-গলির মেয়েরা সবই দরিদ্র এবং হতশ্রী। তার ঐ বাড়ীতে রোকেয়ারা আর সালমা বলে দুটো মেয়ে থাকত তারা তো দাঙ্গার মধ্যেই পুলিশের সাহায্যে পালিয়েছে আর এখন যে যে আছে পাঁচ টাকা ক'রে ভাড়া দেয় হিন্দু মেয়ে দুজন, তারা এই গোলমালে নিজেরাই খেতে পায় না। ঘরে নিজের বলতে যা ছিল বেচে খেয়ে বেঁচে আছে মাত্র।

সুরেশ ভাল ক'রে খবর নিল। তারপর নিজেই সালাউদ্দিনের কাছে গিয়ে বলল, খদ্দের তো হচ্ছে না। তবে একজনকে জুটিয়েছি, পাঁচহাজার দিতে চাইছে।

পাঁচহাজার কখনও দাম হয় ? পনের হাজার হলেও না হয় কথা ছিল।

অনেক টানাটানি ক'রে ছ হাজার দুশোটাকায় রাজি করাল সালাউদ্দিনকে। সঙ্গে দুটো একশ টাকা ছিল তারই দুশো দিয়ে সাদা কাগজে বায়না বলে লিখিয়ে নিয়ে সুরেশ একরাশ দুর্ভাবনা কিনল মাত্র। সম্বল বলতে তো তার কিছুই নেই, পৃথিবী কুড়োলে হাজার টাকা হবে কি না সন্দেহ। সালাউদ্দিনের বাসা থেকে নেমে এসে সে ভেবেই পেলনা এখন টাকা কোথা থেকে জোটাবে। ঝোঁকের মাথায় নিজের পুঁজিটুকুও সালাউদ্দিনকে তুলে দিয়ে এল, টাকা না জোটাতে পারলে ওটাও তো যাবে। কে তাকে এতগুলো টাকা দেবে ? মনে মনে সারা দেশ খুঁজে এমন একটা নাম পাওয়া গেলনা যে লোক পাঁচ হাজারটা টাকা দিতে পারে।

কলুটোলা থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠে বসে তার মাথার মধ্যে দুনিয়ার দুর্ভাবনা এসে ঢুকে বসল। বুক পকেটের কাগজটায় কি সব হিজিবিজি কাটা, উর্দুভাষায় সালাউদ্দিন কি যে লিখে দিয়েছে কে জানে? সুরেশ ও ভাষা জানে না। তবে ঠিকই লিখে দেবে সালাউদ্দিন। ও এখন বেচতে পারলেই পালাবে। যাক। ও শালা এমনিতেই তো দিয়ে যেতে পারত। এখন যদি বাকি টাকা জোগাড় না হয় তো বলেছে শীঘ্র মিটিয়ে দিতে—। ও যদি আর কাউকে বেচে দিয়ে পাকিস্থান পালায় তো সুরেশ তাকে ধরবে কি ক'রে?

দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে ঢোকবার সময়ও ওর মাথা থেকে চিন্তার বোঝা নামে নি। কার কাছে যাবে, কাকে টাকার জন্যে ধরবে এই ভাবনা তার আর সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল। পীরের দরগা পার হয়ে ভাটিখানার কাছে আসতেই কে যেন বলে উঠল, মাস্টারজী নমস্তে। —চেয়ে দেখল পিলুয়া। আট নম্বর বাড়ীর ছেলে পিলুয়া, শিশু বয়সে দিনকতক তার স্কুলে পড়েছিল মন ছিল না বলে ওপথ পরিত্যাগ ক'রে পাড়ার মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ মনে হ'ল ওর মার তো অনেক টাকা। ভাড়া বাড়ীতে থাকলেও মল্লিকবাবুদের বাড়ী ভাড়া লাগে না। ঘরে ঘরে অনেকগুলো মেয়ে রেখে রোজগার করে মোতি, পিলুয়ার মা। পিলুয়া তো এখন বড় হয়ে গেছে সতের আঠারো হবে, নিশ্চয় ওর কথা শুনবে ওর মা, ওকে একবার বলবে নাকি টাকার কথা! ওর নমস্কারের বদলে আশীর্বাদ ক'রল, খুশ রহো বেটা, আজাদ রহো।

কদিনের শিক্ষকের আশীর্বাদে উৎফুল্ল পিলুয়া এগিয়ে আসতে বোঝা গেল সে নেশায় চুর হয়ে আছে। কাজেই আর কথা না বলে সুরেশ এগিয়ে চলল। ইমাম বক্স লেন-এ না ঢুকে ভাবল মিশির-এর দোকানে দাঁড়িয়ে একটা পান খেতে খেতে ভাববে এবার কোথায় যাবে। নীলমনি মিত্র ষ্ট্রীটের ন নম্বর বস্তিতে গিরিধারী থাকে জৌনপুর জেলায় বাড়ী, সুদে টাকা খাটায়। এ পাড়ায় বহু মেয়েও তার খাতক। একশো দুশো ক'রে ক'রে টাকা ধারে দেয় বলে জানে সে কি এতটাকা দিতে পারবে? পারলেও দিতে রাজি হবে? কেমন ক'রে সুরেশ শোধ ক'রবে তা তো অবশ্যই ভাববে। তা ভাবলে তো আর দেবেই না? তাহ'লে? তেমনটা হ'লে তখন কি ক'রবে সুরেশ?

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে মিশিরের দোকানের সামনে এসে পড়ল সুরেশ। সব সময়ই পান বেচে মিশির প্রয়োজনেই অন্যকিছু বিক্রি করে। আশেপাশের বাড়ী থেকে ঝি বা চাকর এলে তলা থেকে আড়াল সরিয়ে বের ক'রে দেয় বোতল। দিশি তো আছেই বিলিতিও কিছু কিছু থাকে। তবে সেই বিক্রি পর্যন্তই, সামনে কাউকে বোতল খুলে খেতে দেয় না, তাই ছোকরাদের কাছে কখনই বেচে না।

শিক্ষকতা যতটুকু করে তার চেয়ে সম্মান বেশি পায় সুরেশ। মৌখিক খাতির অন্তত সকলেই করে, পানওয়ালাও সম্ভাষণ ক'রল, আইয়ে মাস্টারজী—।

যে মানুষেরা বিচার বিবেচনা করবার শক্তি না রাখে তারা ভেক দেখলেই বড় মনে করে। তাই অর্বাচীনের সমাজে ভেক-ধরা ধূর্তেরা খাতির আদায় ক'রে নেয় সহজেই। সন্ন্যাসীর পোষাক পরে তাই অনেক শয়তান ব্যবসা ক'রে বেড়াতে পারে, রাজনীতির মুখোশ পরে ধান্দাবাজেরা ঠকিয়ে চলে জনসাধারণকে, অন্য-কাজের সুযোগ না পেয়ে একদল শিক্ষক সেজে সমাজকে ধ্বংস করে চলে প্রতিদিন একটু একটু ক'রে। সমাজের শিশুরা এই সব পেশাদার শিক্ষকের হাতে নিঃসংশয়ে সমর্পিত হয় অথচ দশ বছর পর একদিন দেখা যায় ছেলেটির জীবনের এই সময়টুকু বৃথা নষ্ট হয়ে গেছে, শিক্ষা সে কিছুই পায়নি। তবু সামাজিক দৃষ্টিতে এই বদমাস লোকগুলো থাকে শিক্ষক, মূর্খ মানুষদের কাছে পরম আদরণীয় মাস্টারজী। সম্ভাষণের উত্তরে সুরেশ বলল, কা বাত হ্ মিশিরজী? আমি শুনলাম সত্যনারায়ণ হঠাৎ দেশে চলে গেল ?

পাণ্ডের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ।

আরে ওর হঠাৎ শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। রোজ জ্বর হচ্ছে।

এখানে চিকিৎসা করালে পারত ?

দেশের জলহাওয়াতে ঠিক হয়ে যাবে।

ওর কারবার কে দেখবে ?

কেন, ভাই আছে না ? লছমী প্রসাদকে চেনেন না ?—কথায় কথায় পান সাজা হয়ে গিয়েছিল, সুরেশ-এর হাতে তুলে দিতে সে মুখে পুরে ফেলতে কথা বন্ধ হ'ল। এ এমন প্রয়োজনীয় কথাও ছিল না নেহাৎ আলাপচারিতার জন্যে বলা। সত্যনারায়ণ পাণ্ডের সঙ্গে সুরেশ ঝার তেমন ঘনিষ্ঠতাও ছিল না, কেবল আলাপ ছিল মাত্র। বড়বাজারে কোন গদিতে না কি লোকটা একদা কাজ ক'রত তারপর কি সুবাদে এখানে এসে পড়ে, কুলোকে বলে সেই গদির অনেকটাকা নাকি মেরে এনেছিল সত্যনারায়ণ—। সে বহুবছর আগেকার কথা সুরেশ তখন নিতান্তই বালক তাই সব জানে না। লোকেও সেই অতীত ভুলে গেছে ; এখন এখানে নানা রকম কাজে নিয়োজিত সত্যনারায়ণ—এখানে তার অনেক ব্যবসা সব ব্যবসার খবর কম লোকই জানে, সুরেশ তো নয়ই। বর্তমান জানে সত্যনারায়ণ ব্যবসায়ী—। এখানকার সবচেয়ে বড় দোকানটা তারই সেখানে পাইকারী দরে ডাল, আটা, ময়দা, চিনি—হরেক দৈনন্দিন দরকারী দ্রব্য বিক্রি হয়। এলাকার ছোট দোকানীরা সেখানেই জিনিস কেনে। তবে ঐ দোকানই যে সব নয় এমন কথা প্রায় সকলেই জানে। মোটামুটি ভাবে সত্যনারায়ণ পাণ্ডে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে টাকার জোরে মানী মানুষ।

কবছর আগে স্বাধীনতার দিন নিজের দোকানকে দারুণ ভাবে সাজিয়েছিল সত্যনারায়ণ পাণ্ডে। সেখানেই সব নয় পাড়ার আনন্দ উৎসবে অনেক টাকা চাঁদা

দিয়েছিল। হারাধন দত্তের মিষ্টির দোকানে এক মন বোঁদে করিয়ে সব ছেলেদের মধ্যে বিলি ক'রেছিল। কংগ্রেসের হয়ে চাঁদা তুলতে এসে পাণ্ডেদের সঙ্গে সুরেশের আলাপ। তারপর মাঝে মাঝে এসে চেনাটা জিইয়ে রেখেছে সুরেশ নিজেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলেই নয় আপন স্বভাবে সে সারাদিন প্রচুর সময় ধরে ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকাও তার ঐরকমই সংযোগ রক্ষার জন্যে। নইলে কংগ্রেস নামক দলটির সম্পর্কে তার জ্ঞান ও ধারণা অত্যন্তই সীমাবদ্ধ। কংগ্রেস রাজার দল অর্থাৎ গদীনসীন দল, রাজশক্তির কেন্দ্র তাই তার সঙ্গে থাকা। তাছাড়া আর আছেই বা কে? আর তো কেউ চোখে পড়ে না। কংগ্রেসের ক'জন ভাল লোক ভেঙ্গে গিয়ে প্রজা সোসালিষ্ট পার্টি ক'রেছে এপাড়াতে পাশের যদুপণ্ডিত রোডে আছেন এক শ্যামসুন্দর দাস—তাঁদের তো চোখেই পড়ে না। আর এক লালঝাণ্ডার দল আছে আনাচে কানাচে কারা যে তাতে আছে চেনা যায় না, মাঝে মাঝে কেবল মিছিল ক'রে ঘোরে যেমন কবছর আগে চেঁচিয়ে বেড়াতো 'এ আজাদী ঝুঠা হ্যায়—'। সবই প্রায় অচেনা অজানা মানুষের দল সেটা, মিছিলে জনকয়েক ভাঙ্গচোরা চেহারার লোক দেখা যায় কেবল, তবে তাদের ঐ 'স্বাধীনতা মিথ্যে' স্লোগানটা অপছন্দ ছিল সকলেরই। মনে আছে দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে মিছিলটা যাবার সময় কারা যেন দু-চারটে ঢিলও মেরেছিল। সকলের মত সুরেশও বড়ই অপছন্দ করে ঐ দলটাকে, কাজেই কংগ্রেস ছাড়া আছে কি? একমাত্র ঐ ফকির চক্রবর্তী লেন-এর ধরবাড়ীর একটি যুবক ওদের দলে গান গেয়ে বেড়ায় অমন ভদ্রলোক যে কি ক'রে ও দলে গেল সুরেশ ভেবে পায় না। খুবই ফর্সা ছোটখাট শান্ত চেহারার মানুষ তিনি পরেশবাবু বলেই সবাই চেনে। খুব যে কেউ চেনে এমন নয় তবে নামটা জানে সবাই।

নানা উদ্দেশ্যে যারা নিজেকে সামনে মেলে ধরতে চায় তারা সাধারণত ক্ষমতাকেই আশ্রয় করে। যেখানে ক্ষমতা সেখানেই তারা নিজেদের সংযোগ তৈরী করে। সুরেশও তাই। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেমন তার সম্পর্ক কংগ্রেসের সঙ্গে, এলাকায়ও তেমনই যাদের কিছু ক্ষমতা বা বল আছে তাদের সঙ্গেই তার সংযোগ। দরিদ্র ও দীন মানুষদের দিকে সে দৃক্‌পাতও করে না। যে বাড়ীর সে বাসিন্দা সে বাড়ীর মেয়েরা কেউ সাহস ক'রে কথা বললে মামুলী উত্তর হয়ত একটা দেয় তাতে উপেক্ষাই স্পষ্ট হয় বেশি।

পানটা মুখে দিয়ে দু-চারটে শব্দে কথা শেষ ক'রে সুরেশ আস্তে আস্তে গৌরী শঙ্কর লেন-এ এসে পৌঁছাল। এখানে গলির প্রান্তের শেষ বাড়ীটার বিশাল পাঁচিল। দেখে তার কেমন ঈর্ষা হয়—কি বিশাল বাড়ী। কৌতূহল বসে খবর নিয়েছে কোন এক গৌরীশঙ্কর দে-র বাড়ী এটা। গলির দিক থেকে কেবল দোতলা সমান উঁচু পাঁচিলটাই দেখা যায় বাড়ী নয়। কে যে সেই গৌরীশঙ্কর দে বা কি তাঁর পরিচয় সে সবে তার জিজ্ঞাসা নেই, 'কোই বড়া আদমী থা, বহুৎ, পৈসা থা'—ভেবেই সে নিশ্চিন্ত।

সুরেশ জানত যাদব দালালকে সে এখানেই পাবে। তার গ্রাম থেকে দশ ক্রোশ দূরে বাড়ী যাদবের, যাদব কুর্মী। এখানে ন নম্বর বাড়ীতে চাকরের কাজে যোগ দিয়েছিল বছর দশেক বয়সে পিসতুতো দাদা দুখন কুর্মীর মাধ্যমে। দুখন অনেক দেশজ লোকের অন্নসংস্থান ক'রে দিয়েছে এই কলকাতায় মামাতো ভাই যাদব তাদেরই একজন। তাদের প্রায় সকলেই ভাল রকম টাকা রোজগার ক'রে দেশে অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছে। যাদব রাণ্ডীবাড়ীর চাকরগিরির কাজ ক'রতে ক'রতেই খদ্দের ধরবার কাজটা রপ্ত ক'রে ফেলেছে। যে সব খদ্দের যাতায়াত করে তাদের মানসিকতাটা বুঝে নিয়ে প্রথম প্রথম তাদের তুষ্ট করাটা রপ্ত ক'রেছে তারপর দালালীতে নাম লিখিয়েছে। তাতে আয় রোজগার এতই ভাল যে দেশে তার চার বিঘা জমি, নিজের বাড়ী সবই ক'রে নিয়েছে এই দশ বছরেই। অথচ ওদেরই দু-একজন বরবাদও হয়ে গেছে নেশা ক'রতে ধরে। যাদবরা জানে নেশা করাতে হয় ক'রতে নেই, তাই তারা সফলতা পেয়েছে।

গলিটা দেখতে দেখতে সুরেশ ন নম্বর বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। গলিতে যখন নেই বাড়ীর মধ্যে নিশ্চয় থাকবে। দরজা দিয়ে ঢুকে ডানদিকে ঘুরতেই দেখল তিন-চারজন বসে আছে তার মধ্যে যাদবও। তাকে দেখেই যাদব উঠে দাঁড়াল, গোড় লাগতানি মাস্টারজী। বাত কা হ?

রাণ্ডীবাড়ীর দালালী ক'রে অর্থার্জন করা যাদব এটা ভালই বুঝেছে কোন কাজ ছাড়া সুরেশ মাস্টার তাকে খুঁজছে না, তাকে না খুঁজলে এ বাড়ীতে মাস্টার কখনই ঢুকবে না।

তোমার সঙ্গে অনেক কাজ আছে বলে এলাম, অনেক কথা আছে, সুরেশ জানাল। তারপর বলল, এখানে বলা যাবে না। সময়ও লাগবে।

তবে চলুন—।

কোথায়?

রাস্তায়।

রাস্তায় হবে না, কোন ঘরে বসতে হবে।

ভেতরের দিকে একটা ঘরে মেয়েটা বসে পায়ের নখ কাটছিল যাদব তাকে বলল, তুমি একটু লক্ষীর ঘরে যাও মাস্টারজীর সঙ্গে আমি কিছু কথা বলব।

সেই একান্ত ঘরে বসে টাকার প্রয়োজনের কথা জানাল সুরেশ যাদব কুর্মীর কাছে; জানাল সে একটা বাড়ী কিনতে চায় এক মুসলমানের কাছে যে লোক পাকিস্থান চলে যাচ্ছে। কেবল কোন বাড়ী কোথায় বাড়ী তা বলল না খোলসা করে। যাদব ধূর্ত লোক অত কথা জানতেও চাইল না সামান্য ভেবে বলল, অত টাকা দিতে পারে আমার চেনা জানার মধ্যে একমাত্র কনকমাসী। সে নিজে কোনদিন ব্যবসা করেনি লীজ নেওয়া বাড়ীতে আট দশজন মেয়ে খাটিয়ে তার রোজগার। বাচ্চা তেওয়ারীর জানানা কনকমাসী বাঙ্গালী কিন্তু মানুষ ভাল।

আমি আলাপ করিয়ে দিতে পারি কথা আপনাকে বলে নিতে হবে।

সে আমাকে চেনে না বিশ্বাস ক'রবে কেন?

আমাকে তো চেনে! আমার কথাতে বিশ্বাস ক'রবে। এই বাড়ীতে তার মেয়েরা থাকে, দোতলার ঘরগুলো সব তার—নিজে থাকে নতুন রাস্তার ওপারে। যদি বলেন তো এখনই নিয়ে যাই।

সুরেশ তখন খড়কুটো ধরতে পারলেও ছাড়ে না এমনই অবস্থা, বলল, চল।

বহু বাড়ী ও বস্তি ভেঙ্গে সদ্য তৈরী হওয়া রাস্তাটায় পা দিতেও যেন কত ভাল লাগে সুরেশের। রাস্তাটার রূপই আলাদা। এটা হয়ে দর্জিপাড়া পার্কটাও যেন জনসমক্ষে এসে পড়েছে। পার্ক ডানদিকে রেখে বাঁ দিকে পাঁচ ছ'টা বাড়ীর পরই একটা একতলা বাড়ীতে ঢুকল যাদব, পেছনে সুরেশ ঝা।

মাঝবয়সী মহিলা পরণে বিধবার পোষাক, থানধুতি। সামনে হওয়ামাত্র সসম্ভ্রমে যাদব বলল, মৌসীজী নমস্তে।

কনকলতাও শান্তভাবে বাংলায় বলল, এস বাবা। হঠাৎ কি মনে ক'রে?

যাদব আপন ভাষাতে পরিচয় করিয়ে দিল, মাস্টারজীকে নিয়ে এলাম। এঁর নাম সুরেশ-ঝা, চিৎপুরে স্কুল আছে, নিজের স্কুল ছাত্রদের পড়ান। কংগ্রেস নেতা।

শুনেই সুরেশ-এর চেয়ে বয়সে অনেক বড়, প্রায় দুগুণ হওয়া সত্ত্বেও কনক হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রল।

সুরেশ অন্যদিন যা না ক'রত আজ টাকার প্রয়োজনে তাই ক'রে বসল, জোড়া হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, নমস্তে মা জী।

ঐ সামান্য শব্দটুকুতেই কনকলতার বাঙ্গালী হৃদয় গলে গেল। বলল, বসুন।

সামনে ফরাসের ওপর দুজন বসতেই কনক বলল, একটু বসুন আমি আসছি। চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে সামনে দরজার কাছে ঝকঝকে পরিষ্কার লালমেঝের ওপরই ওদের মুখোমুখি বসে পড়ল কনকলতা। অর্থাৎ কি ব্যাপার বল?

যাদব ভূমিকা না ক'রেই বলল, মাস্টারজীকে নিয়ে এলাম। আমাদের দেশেই বাড়ী।

ভালই ক'রেছ।

মাস্টারজীর কিছু টাকা খুব দরকার। একটা বাড়ী কিনবে টাকা কম পড়ছে।

কথাটা শুনে কনকলতা আদৌ উৎসাহিত হ'ল না। বলল, তা আমি মেয়েমানুষ কি ক'রব?

আপনি দিলে বড় উপকার হবে। গরীব ব্রাহ্মণ।

এবার সুরেশ বলল, বাড়ীটা একজন লোকের যে পাকিস্থান চলে যাবে। আমাকে খুব ধরেছে···কিনে নেবার জন্যে—। না হ'লে যদি আপনি কিনে নেন তো কাজ মিটে যায়।

আমি কিনব টাকা কোথায় ?

সামান্য দাম। আমি বলে কয়ে মাত্র আট হাজারে ঠিক ক'রেছি।

যদিও টাকা হিসেবে আট হাজার বড় কম কথা নয় তবু একটা বাড়ী কেনার পক্ষে কমই বটে। তাই কনকলতা জানতে চাইল, কতটুকু বাড়ী ? কোনখানে ?

এবার সুরেশ ভাঙ্গল, ইমাম বক্স লেন-এ। জমিটা এককাঠার কিছু বেশি।

তবে তো দাম তেমন কম হচ্ছে না, কনক মন্তব্য ক'রল।

পনের হাজার চেয়েছিল।

তা চাইতে পারে। যার জিনিস সে যা খুশি চাইতে পারে।

আমি দুহাজার টাকা বায়না দিয়েছি। পাঁচ হাজার টাকা কম পড়ছে।— সুরেশ এর মধ্যেই হিসেব কষে নিয়েছিল যদি বাড়ী এই মহিলাকেই দিতে হয় তো তার যেন দেড় দুহাজার টাকা লাভ হয়ে যায়।

কনক বাস্তববাদী মানুষ সে বলল, তা তো হ'ল দাম তো তাতে কমছে না।

এখন ওর যাবার গরজ দেবার সময় দুচারশো কম দিলেও চলবে বলে মনে হয়।

কিন্তু আমি বাড়ী নিয়ে কি ক'রব, আমার কে দেখবে ? ছেলে তো নেই যে তার জন্যে কিনব ?

যাদব বলল, মেয়েটার জন্যে কিনে নিন। জামাইকে দেবেন।

কোথায় আর তেমন ছেলে পাচ্ছি ? কে জামাই হবে সে কোথায় থাকবে বাড়ী রাখতে চাইবে কি না সে হবে আর এক জ্বালা।

যাদব ব্যাপারটা জানে। মেয়েটাকে কোনদিন সোনাগাছি পাড়ার মধ্যে রাখেনি কনকলতা। এলাকার আঁচ লাগতে দেয়নি, ঐ মেয়ের জন্যেই এই বাড়ীতে বসবাস ক'রছে কনক। এমন দূরত্বে আছে যে ব্যবসা সামলানোও চলবে অথচ মেয়ে ব্যবসার বিষয় জানবে না। অন্যসব গৃহস্থ মেয়ের মত স্কুলে পাঠিয়ে মেয়ে যতটা পেরেছে পড়িয়েছে তাকে, কিন্তু মায়ের স্বপ্ন মেয়ে পুরো ক'রতে পারে নি, স্কুলের পড়া শেষ ক'রতে পারেনি। ফলে মায়ের দুঃস্বপ্ন দেখা দিয়েছে কি ক'রে একমাত্র মেয়েকে ভদ্র পরিবারে পাত্রস্থ করা যায়। দেখতে দেখতে কেতকী বড় হয়ে গেছে, অবশেষে আরও বড় তবু এমন কোন যুবক জোটেনি যার হাতে কন্যা সহ যথাসর্বস্ব সমর্পন করা যায়। অনেকবার অনেককে বলেও ফল হয়নি। বাচ্চা তেওয়ারী এখানেই অকস্মাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত না হ'লে কি হ'ত বলা যায় না তবে সে মরার পর তার দেশ থেকে একটা বড়সড় ছেলে এসে এখানকার সম্পত্তির দাবীতে ঝামেলা কিছুদিন কম করেনি। বাচ্চা তেওয়ারীর সম্পত্তি বলতে খান কয়েক ধুতি ,কামিজ আর গামছা মাত্র দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে বিরস বদনে ফিরে গেছে সেই ছেলে যে নাকি তেওয়ারীর 'আসলী' সন্তান।

যাই হোক মেয়ের বিয়ে নিয়ে কনকের সংকটের কথা যাদব বোঝে। এই রাজত্বে সহানুভূতি শব্দটা অনুপস্থিত বলেই কেউ কারও সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না বরং

সুযোগমত সেই সমস্যাকে কাজে লাগিয়ে নিজের সুবিধে ক'রে নেয়। সেই সাধারণ সূত্র অনুসারেই যাদব বলল, তো ঠিকই হ্যায় মাস্টারজী কো হি আপনা দামাদ বানা লিজিয়ে না! ক্যা মাস্টাররী, ক্যেয়া কহতেঁহেঁ?

কনকলতার কথার পরিপ্রেক্ষিতে যাদবের কথাটা এমনই আচমকা হয়ে গেল যে কনকলতা নিজে এবং সুরেশও কেমন হকচকিয়ে গেল। সেই ছেলেবেলায় দেশ ছেড়ে আত্মীয়ের সঙ্গে চলে এসেছে সুরেশ তারপর একবারই মাত্র গেছে সেখানে আর কোনই সংযোগ নেই। এখানে টাকার নেশায় পড়ে ঘুরপাক খেতে খেতে আর কিছুই তার মনে নেই, এমন কি প্রতিমুহূর্তের বিয়ের রাজ্যে থেকেও তার এই কাজটার কথা মনে পড়ে নি, যাদবের তড়িঘড়ি প্রস্তাব এক বিচিত্র সমাধানের পথ দেখাল তার সমস্যায়। এই একেবারে মূর্খ, অসাক্ষর লোকটির বুদ্ধির কাছে সে যেন নতজানু হয়ে পড়ল। মেয়ে দেখার ব্যাপারটা নেহাৎই গৌণ কারণ তার দেশের কোন গ্রাম্য মেয়ের তুলনায় কলকাতার বাঙ্গালী মেয়ে, তাতে আবার বিশেষ যত্নে মানুষ, যে অনেক রমণীয় হবে সে জ্ঞান তার আছে। তাই সে একবাক্যে যাদবের প্রস্তাব যে নাকচ ক'রবে তা পারল না।

কনক নিজের সমাজে পাত্র খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেছে বলেই যাদবের আকস্মিক প্রস্তাব ঝেড়ে ফেলল না। দালাল হিসেবে যাদব নির্ভরযোগ্য তা কনক জানে কিন্তু ঘটকালিটা তার কেমন হচ্ছে এটা তো বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এতদিন কি বিয়ে থা হয়নি লোকটার? তেওয়ারীর যেমন দেশে একটা বউ ছিল বলে মরার পর জানা গেল তেমন আবার দেশে একটা বউ নেই তো যে হয়ত ইতিমধ্যেই বাচ্চাকাচ্চা সামলাচ্ছে সেখানে? এ প্রশ্ন সরাসরি না ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রল, কত বয়েস হ'ল।

এবারও যাদবই জানাল ছাব্বিশ সাতাইস হোগা। ক্যা মাস্টার জী?

উনত্রিশকে ঢাকা দেবার প্রয়াসে সায় দিয়ে সুরেশ রায় দিল, হোগা উতনাহি।

বাড়ীতে কে আছে?

চাচা লোগ, ভাই লোগ। মা বাবা বহুকাল মারা গেছে তারপরই কলকাতা চলে আসা—ইতিহাস জানাল সুরেশ নিজেই। এখানে একটা ঘরে সে একাই থাকে।

অন্যলোকের হ'লে এই ঘটকালিতে অনেক টাকাই নিত যাদব দালাল, মাস্টারজী কাছে তা নিল না। কনক তার নিজস্ব মাধ্যমে যতটুকু পারল খোঁজ খবর নিয়ে পাত্র সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে বিয়ের বায়না হিসেবে চার হাজার টাকা দিতে দেড় হাজার টাকা চাঁদরাম কিস্তিওয়ালার কাছে ধার ক'রে সুরেশ বাড়ীওয়ালা হ'ল। সুরেশ একদিন খুব খাতির ক'রে যাদবকে মগাই পান খাইয়ে দিল একসঙ্গে এক জোড়া। হাজার হ'লেও যাদব আসলে কুর্মী, দেশের হিসেবে তাই সে সঙ্কোচ ক'রছিল পণ্ডিতের কাছে উপঢৌকন হিসেবে পান খেতে, বরং সেই খাওয়াতে চাইছিল মাস্টারজীকে।

এই হ'ল সুরেশ-ঝার বাড়ী কেনবার ইতিহাস। বিয়েটা হয়ে গেলেও কুড়ি বছর

বয়সী বৌকে সে এই রাজ্যে আনে নি, কেতকী তার মায়ের কাছেই থাকে সুরেশ নিয়মিত যায়, দিনের বেলাটা কাটে তার ইমাম বক্স লেনের পড়ে পাওয়া ঘরটিতে আর স্কুলে। কিছুটা সময় নিয়মিত ব্যায় করে জনসংযোগের কাজে। তার টাকার প্রয়োজন বাড়ী কেনবার ঋণ মাসে মাসে মেটাতে হয় তাকে, সে টাকা সুদ সমেত নিত্য বাড়ে বলে শোধ আর হতেই চায় না। তাছাড়া সংসার হয়েছে বলে খরচও কিছু বেড়েছে যদিও মূল ব্যায় শাশুড়ীই করে। তবু ছেলের জন্যে, বউ এর জন্যে কিছু খরচ তাকে ক'রতেই হয়। তার অভিজ্ঞতা হয়েছে বাঙ্গালী বউ বড় ব্যায়সাধ্য ব্যাপার। তেওয়ারীর মেয়ে হলেও কেতকী মানসিকতায় বাঙ্গালী কারণ মায়ের কাছে সেইধারাতেই বড় হয়েছে

টাকা যে কেবল খরচের জন্যে বা দেনা শোধ করবার জন্যেই প্রয়োজন এমন নয়, টাকার জন্যেই টাকার প্রয়োজন। টাকা এক এমনই বস্তু যার প্রয়োজন কখনও মেটে না। কিন্তু জ্ঞানবাবু মাথার ওপরে থাকাতে টাকার প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব, অনেক পথ খোলা থাকতেও নয়, চিক্কু-ভোলারা ছ্যাঁচড়ামী ক'রে কিছু কিছু রোজ-গার ক'রে নেয়, সেভাবে তো আর সুরেশের সম্ভব নয়। ওরা তেমন বোকা সোকা লোক পেলে ভয়টয় দেখিয়ে কিছু হাতড়ে নেয়,কালীপুজো শীতলাপুজোর আয়োজন ক'রে বাড়ী-বাড়ী মেয়েদের কাছে গিয়ে ক্ষমতা অক্ষমতা বিচার না ক'রে চাঁদা আদায় করে, পুজোর কদিন খাওয়া দাওয়া স্ফূর্তি হাত খরচ সব ঐ চাঁদা থেকেই চলে। তাছাড়াও কোন মেয়ের ভাল খদ্দের হলে তাকে ধরে দুদশ টাকা নেওয়া তো আছেই। ইদানীং ভোলাটা খুবই বেড়ে উঠেছে, ওর নামে নানা অভিযোগ। টাকা আদায় ছাড়াও কথা উঠছে। ফুলকুমারী বলে একটা মেয়ে সেদিন সুরেশকে পেয়ে বলল, নমস্তে মাস্টারজী।

সুরেশ তাকে চেনে না। তবু পাড়ার মেয়ে বলে দাঁড়াল, জানতে চাইল, কা বাত হ্যায় ?

আমার ঘরে একবার আসুন।

নেতা হিসেবে জনতার কথা রাখতেই হয়। বড় নেতারা এ এলাকায় পা দেন বলে সুরেশই এখানে মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের কথা ভেবে চলতে হয়, ঢুকতেই হ'ল। স্যাঁতসেঁতে ঘরটার মধ্যে ঢুকে বিছানার ওপরে বসল। ফুলকুমারীর সঙ্গে তখন আরও দু একটি মেয়ে জমে গেছে। তাদের সামনেই সে বলল, এই দেখুন ভোলা কি অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে। আমাকে জোর ক'রে ঘরে ধরে এনে যখন ওর খেয়াল হবে শোয়াবে। পরশু বললাম আমার খদ্দের চলে যাবে তা আমাকে এমন মারল যে দেখুন আর একটু হলে চোখটা নষ্ট হয়ে যেত।

সুরেশ দেখল সত্যিই মেয়েটার ভ্রূর ওপর কালশিরে পড়ে আছে। আর একটি মেয়ে বলে উঠল, আমাদের কাছে রোজ টাকা চাইবে। পাঁচটাকা দশটাকা দিতেই হবে।

দু-চারজন মেয়ে সে কথায় সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল এবং একই অভিযোগে সোচ্চার হয়ে উঠল। অন্য বাড়ীর আরও একজন মেয়ে কদিন আগে একই অভিযোগ ক'রেছিল সুরেশের মনে আছে। সুরেশ সেদিনও শুনেছে তবে কোনই প্রতিকার ক'রতে পারেনি। নিজের অসহায়তাকে ভাল ভাবে উপলব্ধি ক'রেছে সে। কি ক'রতে পারে? এই সব দুর্জন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে কি করা তার পক্ষে সম্ভব? এই সব লোক তার কথা ততটুকুই শুনবে যা তাদের অনুকূল হবে। আর রাজশক্তির আওতায় থাকবার জন্যেই যা ওদের কংগ্রেসভক্তি। নীতি বা আদর্শ বোঝবার ক্ষমতা কোথায় ওদের? কাজেই কখনই ওরা কিছু বুঝে চলে না, সর্বদাই সব না বুঝে চলে। ওদের জন্যে পুলিশই একমাত্র ওষুধ। কিন্তু পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা তো তার নেই, সে একমাত্র পারে স্থানীয় বিধান সভা সদস্য। তাঁর কাছে গিয়ে বললে যদি কিছু একটা হয়। মেয়েদেরকে সেই পরামর্শ দেওয়া মাত্র তারা সমস্বরে বলে উঠল, কে এম. এল. এ কোথায় থাকে আমরা কিছু চিনি না।

ঠিকই তো। এরা কখনও এই দেশের বাইরে যায় না। কেউ কেউ বড় জোর রিক্সায় ক'রে কোনদিন যায় গঙ্গা পর্যন্ত, স্নান ক'রে সেই রিক্সাতেই ফিরে আসে। এরা কি ক'রে এম. এল. এ চিনবে?

হেমন্ত বসুকে চেন না তোমরা? সুরেশ জানতে চাইল।

না।

সুরেশ সমস্যায় পড়ল। যতই অমায়িক মানুষ হেমন্ত বসু হোন বামপন্থী এম. এল. এ তো তিনি বটেন, এলাকার কংগ্রেসী নেতা হয়ে সে যায় কি ক'রে তাঁর কাছে? তাও যে সে যাওয়া নয় এলাকার মানুষের জন্যে সাহায্য চাইতে যাওয়া। সেটা কি ক'রে সম্ভব? দলের মর্যাদা নষ্ট হবে এলাকার বামপন্থীদের কাছে। ভোটের সুযোগে দিনে দিনে ভেতরে ভেতরে বামপন্থী দলগুলো অনেকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ভোটে বিধানসভায় আসনটা জিতে নেবার সুবাদে এলাকার ভেতরে কতগুলো অফিস খুলেছে ওদের। তবে হেমন্তবাবুর দল ফরওয়ার্ড ব্লকের বাঘ মার্কা পতাকা যতই উড়ুক তলায় তলায় বেড়ে চলেছে কম্যুনিষ্ট পার্টি। তারা মাঝে মাঝেই সভা ডাকে দর্জিপাড়ার পার্কে, জয় মিত্রের গলির মোড়ের পার্কটায়, পাড়ার ভেতরে একটু চওড়া মোড়গুলোতে। সেখানে আবার কত গান হয় কংগ্রেসের নামে, সেই গানে ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ নিন্দা—কত কি! কাজেই তাদের শরণে কি যাওয়া যায় নিজের দলের হয়ে কাজ করা ছেলেদের নামে পুলিশকে নালিশ করবার জন্যে?

কিন্তু মেয়েগুলো ধরে বসল, একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। দিনে দিনে বড্ড অত্যাচার বাড়িয়ে চলেছে। আর সহ্য হচ্ছে না। ওরই মধ্যে একটি মেয়ে এসে সুরেশের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল। ভোলা

কাল এমন মেরেছে যে ডান হাতটা যন্ত্রণা ক'রছে। কাল থেকে কাজ ক'রতে পারেনি, খদ্দের না তুললে খাবে কি? নাঃ ভোলাটা সত্যিই বড় অত্যাচার ক'রছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। সুরেশ স্থির ক'রল সে নিজেই বলবে সাব ইনেস্‌পেকটর ঘটকবাবুকে। ঘটকবাবুই তো এলাকায় রাউণ্ডে আসে, সবাইকে চেনে, সব জানে। তাই সে আশ্বাস দিল, ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা ক'রছি।

ঘটকবাবু কথা রাখল। ভোলাকে থানায় ডাকিয়ে নিয়ে ধমকাল, কি রে শালা কত টাকা তোলা আদায় করিস মেয়েদের কাছে?

শিণ্ডের কাছে ভয়াল ভোলা চুপসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, না হুজুর তোলা তুলি না।

শালা এমন মারব যে রক্ত হাগতে থাকবি।

না হুজুর আমি কিছু করিনি।

করিস নি শালা—

এতক্ষণও পুলিশি স্বর বেরোচ্ছিল এবার আকস্মিক ভাবেই গলা আরও চড়ে গেল, লালবিহারী সিং, ডাণ্ডা লাও।

হুঙ্কারটা মুখ থেকে বেরোনো মাত্র ভোলা হুমড়ি খেয়ে পায়ের ওপর পড়ল, আর করব না হুজুর।

করবি না কিরে শালা? এই না বললি কিছু করিস নি? কি ক'রেছিস বল? কত টাকা তুলিস?

দু পাঁচটাকা নিই হুজুর। খাব কি?

খাব কি মানে? শালা তোর মা তো রোজগার করে! তুই তো মার পয়সায় খাস।

ভোলা চুপ ক'রে রইল।

জমাদার মনোজ সিং কাছেই ছিল, শুনছিল। এবার এগিয়ে এসে বলল, লাল বিহারী বাইরে ডিউটিতে আছে সাব। আমার কাছে দিন শালাকে চার ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দিই।

এইসব জমাদার তাদের বিপুল চেহারার জন্যে সমস্ত গুণ্ডা বদমাসের ত্রাস। পুলিশের হাতে মার খাবার অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাদের মুখের খবরে অন্য সকলে সন্ত্রস্ত থাকে। এদের হাতের মারে নানা সব কায়দা আছে যা এইসব অমিতাচারী দুর্বল শরীর ছোকরাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় তার ওপরে যদি এরা লাঠি পেটা করে তো শরীরের হাড়ে ফাটল ধরে যাবে।

ভয়েই ককিয়ে উঠল ভোলা, ছেড়ে দিন হুজুর আর কোনদিন ক'রব না।

তোর নামে শালা হাজার কেস আছে, সবগুলোর সাজা হ'লে একশ বছর জেল হয়ে যাবে। কোনদিন তুই এখানে আসিস নি, আজ এসেছিস থেকে যা।

আর কোনদিন ক'রব না হুজুর।

ক'রবি না ? তুই ক'রবি না তো কে ক'রবে ? এসব না ক'রবি তো জন্মেছিস কেন ? কান ধর শালা। ওঠ বোস কর।

কানধরে ভোলা ওঠাবসা ক'রছে—ঘটক মনোজ জমাদারকে ইসারা ক'রল একে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতে। কারণ কংগ্রেস নেতা একে ডেকে শাসিয়ে দিতে বলেছে, এমন কোন নির্দিস্ট মামলা দেয়নি যাতে ধরে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা যায়। এরকম ছোকরাতে সোনাগাছি ভর্তি। ও পাড়ায় জন্মানো ছোঁড়াগুলো আর ক'রবে কি ?

বেশ কবার ওঠবোস করবার পর ঘটক বলল, থাম।

ভোলা থামতেই মনোজ সিং ওকে ধরে নিয়ে বাইরে এসে বলল, তোকে ছাড়িয়ে দিলাম কি টাকা আছে দে। না হ'লে শালা বন্ধ ক'রে দেব।

টাকা তো কাছে নেই জমাদার সাহেব।

চল তোর বাড়ীতে তো আছে ?

এখন নেই।

তবে চল তোকে ফাটকে ঢুকিয়ে দিই, মিথ্যে ভয় দেখাল মনোজ সিং।

ফাটকের ভয়ে চুপসে গেল ভোলা, বলল, আমি তোমাকে দিয়ে দেব।

কখন দিবি ?

কাল দেব।

না হ'লে শালা ধরে এনে 'ছ মাহিনাকা জেল বন্দ' ক'রে দেব।

থানা থেকে ছাড়া পাবার সময়ই ভোলা বুঝে গেল মনোজ জমাদার থাকতে তার কোন ভয় নেই। জমাদারদের অনেক ক্ষমতা, ওরা ধরতেও পারে ছাড়তেও পারে। অমন একটা মুরুব্বী পাওয়া গেছে আর কিসের ভয় ? মুরুব্বীকে খুশি রাখলেই চলবে। তার যখন পুলিশের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে এখন চিকু, গজু, রামবালক সবাই তার কথা শুনবে।

ফুলটুসির ঘর থেকে ওর বাঁধা খদ্দের বেরোচ্ছিল ভোলা তাকে ধরল, আপনি তো এ পাড়ায় রোজই আসেন আমাদের জন্যে কিছু মাল ছাড়ুন তো ?

লোকটা হঠাৎ ভোলাকে দেখে হতচকিত হয়ে গেল। অনেকদিন ধরেই এ বাড়ী আসছে এমন তো কখনও হয়নি। তাছাড়া এ এলাকা সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল সে এই ছোকরাকেও কখনও দেখেছে বলে মনে ক'রতে পারল না, তাই বলল, তুমি কে ?

ভোলা বলল, বাংলায় বলব না ইংরিজিতে ?

এলাকার পুরানো খদ্দেরের আঁতে ঘা লেগে গেল বলে ক্রুদ্ধ চোখে ভোলার দিকে কেবল নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। সেই দৃষ্টি দেখে ভোলা নিমেষে যেন জ্বলে উঠল, মাগী বাড়ি ফুর্তি ক'রবে আর আমরা শালা দেখব ?

লোকটির হেনস্থা দেখে বাড়ীরই একটা মেয়ে গিয়ে ফুলটুসিকে খবর দিতে সে ছুটে বেরিয়ে এল তার বাঁধা বাবুকে বাঁচাতে। ভোলাকে সে ভাল চেনে না বলেই জানতে চাইল, কি চাই ?

মাল খাবার টাকা।

মালখাবার টাকা ও দেবে কেন ?

তবে কে দেবে, তুমি দেবে ?

ছোকরাটির স্পর্দ্ধা দেখে ফুলটুসি যেন ক্ষেপে আগুন হয়ে গেল, গজে কে ডাক তো ?

শব্দটা ফুটে ওঠা মাত্র ভোলা ফুলটুসির গালে সশব্দে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, ডাক তোর কোন বাপ আছে।

ঘটনাটা এতই আকস্মিক যে কেউ কিছু ভাববার আগেই ঘটে গেল ; ফুলটুসির ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে টসটস ক'রে জল গড়িয়ে পড়ল আঘাতের ব্যথায়।

লোকটি বলে উঠল, এসব কি হচ্ছে ?

তুমিতে নেমে এসে ভোলা বলল, কিছুই তো হ'ত না। তুমিই তো হওয়ালে বাপ। শালা লায়েক হয়ে মাগী বাড়ী আসছ আর তোমার বাপ দুটো টাকা চাইলে দিতে পারছ না ?

লোকটা বুঝল যে সে না চিনলেও পাত্রটি বেশ কঠিন। তাই পকেট থেকে একটা নোট বের ক'রে দিয়ে ভাব জমাতে চাইল। নোট দেখে ভোলা বলল, আগে হলে হ'ত এখন আর একটা বের ক'রতে হবে। ইতিমধ্যেই কোথা থেকে খবর পেয়ে গজে ছুটে এসেছে, ভোলাকে দেখেই সে বলল, আরে ওস্তাদ কি ঝামেলা লাগালে ?

ভোলা তাকে দেখে স্বাভাবিক স্বরে বলল, দেখ না লোকটাকে বললাম আমাদের দিকেও একটু দেখ, তা কথাই শোনে না। ফুলটুসির কি দরকার আমাদের মধ্যে কথা বলবার ?

তা বলে তুমি ওর গায়ে হাত দেবে ? একটি সহবাসী মেয়ে বলে উঠতেই গজে বলল, তুমি থাম। যাও ওস্তাদ, যা হয়েছে ছেড়ে দাও। ফুলটুসিকে সামান্য ঠেলে বাড়ীর সদরের দিকে যেতে বলল।

গজের মত দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির ছেলেকে অমন ম্রিয়মান হয়ে যেতে দেখে ফুলটুসিও বুঝল এ বড় কঠিন জায়গা। তাই সে কথা বাড়াল না। ফিরে যেতে যেতে কেবল গজেকে বলল, এ রকম ক'রে অত্যাচার ক'রলে আমাদের ব্যবসা থাকবে ?

সে আমি কথা বলে নিচ্ছি, তোমরা ঘরে যাও।

ঝামেলা না করার চুক্তিতে প্রতি বাড়ীর মেয়েদের কাছ থেকে মাসিক নিয়মিত টাকা পাবার ব্যাপারটা হয়ে যেতে ভোলাও মনোজ সিং এর সঙ্গে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট টাকা দেবার রফা ক'রে নিল। ফলে থানার আশীর্বাদ তার ওপর রইল যার বলে

ক'টা গলির নিয়ন্ত্রণ তার হাতে থাকল সঙ্গী হ'ল চিক্কু, রামবহাল, নন্দু, কেলে মান্না।

মাস তিনেক যেতে না যেতেই কেলে মান্নার সঙ্গে ঝামেলা লেগে গেল ভোলার। একচল্লিশ নম্বর বাড়ীর দুর্গা বলে মেয়েটা কেলের নিজস্ব সম্পত্তি। ছোটখাট গোলগাল ফর্সা মেয়েটা কেলেকে কেমন ক'রে পছন্দ ক'রে ফেলেছিল সে নিজেও জানে না। নিজের রোজগারের টাকায় মেয়েটা কেলের যাবতীয় খরচা চালায়। কেলে তার কোনও উপকারে লাগে না তবু ওকে ছাড়া তার চলে না। ওর সব চাহিদা সে যত ক্লেশই হোক পূরণ করে। অনায়াসে সেবা পেয়ে কেলের অবাধ্য মানসিকতা এমনই বোধহীন ধারায় বয় যে পান থেকে চুণ খসলে ও ধরে দুর্গাকে দু চার ঘা লাগাতে দ্বিধা করে না, তবু সম্পর্ক ভেঙ্গে যায় না।

ভোলার এমন কোন নির্দিষ্ট মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সে যাকে পারে ধরে তার শারীরিক চাহিদা মিটিয়ে নেয়, তার জন্যে মজুরী দেওয়া দরকার মনে করে না। মজুরী পেলে যে শরীর এখনকার মেয়েরা সহজেই দেয় বিনা মজুরীতে ইচ্ছামত ভোগ দখল ক'রতে গিয়ে সেখানেই জোর জুলুম ক'রতে হয় ভোলাকে, ভয় দেখাতে হয় যে ভয় তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। তাই অধিকাংশেরই বিরূপতা ভোলার প্রতি অভিশাপ হয়। তাতে ওর কিছুই যায় আসে না, সে নির্ভর করে তার অপক্ষমতার উপরেই। আর সেই ভাবেই সে একদিন দুর্গাকেও ধর্ষণ করে।

সেদিন পুলিশ ভোলাকে বলে জয়নাল বলে একটা লোক ডাকাতি ক'রে অনেক মালপত্তর নিয়ে তোদের পাড়ায় এসে ঢুকেছে বলে খবর আছে। খুঁজে বের কর। চুপচাপ আমাকে খবর দিবি।

খবরটা পেয়ে গোপনে ভোলা লেগে পড়ে নিজের কাজে। খুঁজতে খুঁজতে খবর পায় একত্রিশ নম্বর বাড়ীর চম্পাবাই বলে একটি মেয়ের ঘরে জয়নাল বলে একজন আছে। ভোলা, কেলে, চিক্কু তিনজনে গিয়ে তাকে ধরে, দেখ ওস্তাদ আমরা এখানে তোমাকে সামলাতে পারি, মাল ছাড়। নইলে এখনই কিচাইন হয়ে যাবে শালা।

চব্বিশ পরগণার কোন অজগ্রামে বাড়ী জয়নালের। এখানে এসে লুকানো আর স্ফূর্তি করা একই সঙ্গে সম্ভব বলে সে এসেছে, যা হোক স্থানীয় ঝামেলা তো মেটাতে হবে—তাই সে কিছু টাকা দিয়ে রফা ক'রে নিতে চাইল।

ঘটনাটা আগে কাউকে কিছুই বলেনি ভোলা, বলেছে, চল যাই কিছু কামিয়ে আসি।

টাকা পেয়ে তাই অবাক চিক্কু জানতে চাইল, তুমি ওস্তাদ জানলে কি ক'রে যে লোকটার কাছে মাল আছে?

খবর রাখতে হয় রে! রহস্য ভাঙ্গল না ভোলা, বলল, কি খাবি বল?

চল ওস্তাদ আজ ধর্মতলায় ভাল হোটেলে মাল খাব। খাওয়া দাওয়া হবে।

ভোলা বলল, এলাকার বাইরে যাব না। তার চেয়ে চল বিডন স্ট্রীটের পাঞ্জাবী

দোকানে মাংস বিরিয়ানি মেরে আসি, মাল কিনে আনলেই হবে। কারও ঘরে বসে খেয়ে নেব।

এলাকার বাইরে যেতে কেলেরও খুব ভয় তাই ঠিক হ'ল দুর্গার ঘরে বসেই বিলিতি রাম খাওয়া যাবে। চিকু বলল, হুইস্কি।

ভোলা উদার স্বরে বলল, যার যা খুশি খা।

রেস্টুরেণ্টে গিয়ে খেতে বসে বড় বিস্বাদ লাগতে লাগল। যা-ই নিল কোনটাই তেমন জমছে না। না বিরিয়ানি, না চিকেন দোপেঁয়াজি, না মটন চাঁপ, কিছু না।

কেলে অবশেষে বলেই ফেলল, দূর শালা মাল না হ'লে মাংস জমে!

কথাটা মনের মত হয়েছে বলে সকলেই মেনে নিল। ঠিক ক'রল এখান থেকে খাবার আর দাসের দোকানে দুবোতল র‍্যাম এক বোতল হুইস্কি কিনে দুর্গার ঘরে বসবে সবাই। রামবহাল যেন টের না পায় সেটাও দেখতে হবে। কারণ ও ব্যাটা টাকার গন্ধ পেলেই সঙ্গী হয়ে যায় কিন্তু নিজের অংশ বুঝে নিয়েই গুটিয়ে পড়ে, খরচের বেলায় আর সঙ্গে থাকে না। নেশাটেশা করে তবে তারও মাত্রা বড় কম। খুবই হিসেব ক'রে বুঝে শুনে চলে। অত হিসেবী হ'লে ভাল লাগে না, তাই স্ফূর্তির সময় ওকে সঙ্গে রাখলে মৌজ হয় না, জমে না। ও শালা কেবল টাকা বানাবার তালে থাকে।

সকলকে একসঙ্গে জুটতে দেখেই দুর্গা বুঝল আজ তার ব্যবসা শেষ। এখন এই ঘরে যদি জেঁকে বসে তো রাত শেষ করে তবে উঠবে। এদের তেমন কিছু বলাও যাবে না, তাই কিছুটা আবদার ক'রেই বলল, তোমরা অন্য কোথাও বসলে তো পারতে।

কেলেই আগ বাড়িয়ে বলল, তোমার কিছু অসুবিধে হবে না।

অসুবিধে যে হবে না সে কথা দুর্গার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। তার লোকসানটা আজ সম্পূর্ণ হবে। ওসব দেখবার মত মানুষ এরা একজনও নয়। এরা কেবল নিজের সুখ ষোল আনা বোঝে। তার বেশি কিছু বোঝে না। এখানে যারা জন্মায় স্বার্থপরতার মধ্যে জন্মায়, যারা বেড়ে ওঠে নীচতার মধ্যেই বেড়ে ওঠে। আত্মসর্বস্বতাই তাদের একমাত্র মানসিকতা। নিজের সুখের বাইরে তারা কিছু বোঝেই না।

ভোলা কোন কথাবার্তার মধ্যে ছিল না, সে চুপচাপ হাতের কাজ সারছিল, এবার বলল, তিনটে গ্লাস দে। থালা দে।

বিরস মুখে দুর্গা সব এগিয়ে দিল।

এবার ভোলা কেলেকে বলল, যা সোডা নিয়ে আয়। দুবোতল আনবি।

প্যাকেটের খাবারের গন্ধ দুর্গার আসক্তি জাগালেও সে জানে এরা ওকে ভাগ দেবে না। নিজেরাই সব চেটে পুঁছে খাবে। এমন দামী হুইস্কি এনেছে বড় লোভ হচ্ছিল দুর্গার অথচ এরা তো একবারও বলবে না, নে দুর্গা তুই একটু খা।

এত খাবার মদ সব শেষ করে নয়ত ঘরে বমি ক'রে তার কষ্ট কেবল বাড়াবে। কিন্তু এদের হাত থেকে নিস্তারও তো নেই। যা খুশি ক'রে বেড়ানোই এদের কাজ।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সঙ্গে আনা খাবার শেষ আর একটা বোতল শূন্য হয়ে গেল। ততক্ষণে নেশা জমে উঠেছে, মনও ভরে গেছে সুখাদ্যের দৌলতে। দুর্গা প্রথম থেকে ভেবেছিল বাইরে রাস্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প ক'রবে যদি তেমন কোন চেনা খদ্দের জুটে যায় তো কোন কুটনি মাসির ঘরে তুলে কাজ ক'রবে। একদম রোজগার না হ'লে খাবে কি ?

তার ইচ্ছায় বাদ সাধল কেলে। দুর্গা যে তার নিজের মেয়েমানুষ এটা বোঝানোর জন্যে সে প্রথম থেকেই নানারকম হুকুম ক'রতে লাগল, পেলেট দে। গেলাসে মাল ঢেলে দে। দুর্গা গাছাড়া ভাবে হুকুম তামিল ক'রছে দেখে একবার সে বলল, দিক ক'রছিস কেন মাইরি ? আমার ইয়ার দোস্তরা সব তোর কাছে এল আর তুই তাদের ফেলে কেটে যাচ্ছিস ?

তোমাদের মধ্যে আমি কি ক'রব ?

মেরী জান তুই সামনে না থাকলে খেয়ে পিয়ে সুখ থাকে ?

আ মলো যা তোমার সুখের জন্যে আমি এখানে বসে থাকলে আমার চলবে ?

চলবে চলবে, সব চলবে মেরে দিল কি রানী।

অত ক'রে আটকাচ্ছে দুর্গার আশা ছিল নিশ্চয় তাকেও কিছু খাবার দেবে। কিছুটা ভাল খাবারের আশাতেই সে ওদের সব কাজ ক'রে দিতে লাগল। কিন্তু অত খাবার তিনজনেই যখন শেষ ক'রল দুর্গার পেটে তখন খিদে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। অমন মূল্যবান পানীয় সমানে নিঃশেষ যাচ্ছে দেখে তার লোভ প্রবল হলেও তিনজনের একজনও তাকে বলল না, যা আর একটা গ্লাস আন। ওদের গ্লাসগুলোতে ঢেলে দিতে দিতে প্রতিবার তার রসনা উদগ্রীব হয়ে উঠছিল একচুমুক পান করবার জন্যে।

প্রথম বোতল শেষ হয়ে যাবার পর নতুন বোতল খোলবার সময় দুর্গা আর থাকতে পারল না নিজেই একটা গ্লাস এনে বলল, আমাকেও মাইরি একটু দাও।

পেটে সুপার থ্রি এক্স র‍্যাম পেঁছে গিয়ে তখন অনেকেরই মনে উদারতা এসে গেছে নেতাগিরি করবার স্বাভাবিক অভ্যেস বশে ভোলাই বলল, তুমি খাবে ? কত খাবে খাও। দিলভর পিয়ো।

দুর্গা আর কিছু বিবেচনা না ক'রে ওদের গ্লাসে ঢেলে দিয়ে নিজের শূন্য গ্লাসেও কিছুটা ঢেলে নিল। চিকু নিজের গ্লাস হাতে নিয়ে স্বগতোক্তির মত স্বরে বলল, যাঃ শালা সোডা শেষ।

ভোলা তাকে দুয়ো দেবার মত ক'রে বলল, দূর শালা সোডা কি হবে ? মালে সোডা মেলায় শালা মাগীরা—মেয়েমানুষেরা। তুই শালা সোডা খাবি ? যাঃ শালা বাড়ী গিয়ে দুধ খা।

বাড়ী কোথায় রে ভোলা, চিক্কুর তখন পুরো নেশা হয়ে গেছে, বলে উঠল ; মাগী বাড়ী দুধ পাওয়া যায় না—অতি অশ্লীল শব্দ দিয়ে দুধের সঙ্গে মিলিয়ে বলল সেই-টা পাওয়া যায়।

নেশার ঘোরে ভোলা বলল, তোর বাপ খেয়েছে।

চিক্কুও অল্পে থামল না, কোন শালা বাপ? কত শালা খেয়েছে। নারান শালা মায়ের নাঙ ঐ শালা বেশি খেয়েছে।

ওরা দুজন নেশার ঘোরে যেমন বকবক ক'রতে লাগল কেলে তেমনই চুপ চাপ হয়ে গেল। গভীর নেশায় ক্রমশই সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। এতক্ষণ যদিও বা দু একটা কথা বলছিল এখন একবারেই থমকে গেল। চুপচাপ নিজের গ্লাস শেষ ক'রে চলল।

দুর্গা নিজের গ্লাসে মদের মধ্যে অল্প কিছুটা জল ঢেলে নিল কুঁজো থেকে। জল মিশিয়ে সে চুমুক দিতে লাগল খিদে চনমনে খালি পেটেই। ওদের কারও ঘরেই কোন রকম খাবার মজুদ থাকে না, যখন যা দরকার দোকান আছে। কিন্তু এখন কে টাকা দেবে আর আনবেই বা কে? এদের বদলে যদি খদ্দের হ'ত তো পয়সা পাবার লোভে দৌড়ে আসত বাড়ীর ঝি অথবা চাকর লাড্ডু। যা দরকার এনে দিত। এদের দেখেই সব সরে গেছে। কাউকে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া টাকা কে দেবে? এরা তো দেবে না।

খালি পেটেই তাই সুরাপান ক'রে চলল পদবীহীন, উৎস পরিচয়হীন দুর্গা রানী—যে কেবল পৃথিবীর কোন এক ভূমিখণ্ডে জন্মে গেছে বলেই জীবনের বোঝা টেনে চলেছে অনন্যোপায় সমুদ্রযাত্রীর মত।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে দ্বিতীয় বোতলের পানীয় যখন তলানিতে, কেলে বেহুঁশ হয়ে বিছানায় চিৎপাত ভোলার খেয়াল হ'ল সঙ্গে একজন নারী আছে। সে দুর্গার দিকে হাত বাড়াল।

কোন ব্যাপারীই তার বেচার সামগ্রী কখনও দান করে না। সেখানে বিনিময়ে টাকা তার অবশ্যই চাই। দুর্গারও চাই, তাই সে সামান্য কিছুটা নেশাগ্রস্থ হয়ে হয়ে পড়লেও আপত্তি ক'রল ঝটকা দিয়ে নিজেকে ভোলার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল।

কিন্তু ভোলার তখন নারী সঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। সামনের নারী তো ভোগ্যা, সে পাবে না কেন? তাছাড়া স্বভাবে যার লুণ্ঠকতা লুঠ ক'রে ভোগ করাই তার সর্বকালের অভ্যাস। তার হাত থেকে বেরোবে এমন শক্তি দুর্গা নামের ক্ষুদ্র মানবীর আসবে কোথা থেকে? তাছাড়া চিক্কুরও পুরুষোচিত মর্যাদায় বাধল, সে জড়ানো স্বরে দুর্গাকেই বলে উঠল, ওস্তাদ চাইছে তুই দিবি না কেন দুগ্‌গা?—বলে সে নিজেই এক হাতে দুর্গার শাড়ী টেনে শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিল।

খালি পেটে সুরা পান করবার জন্যে দুর্গার শরীরে তার দ্রুত বিক্রিয়া ঘটেছিল। তার রাশ আলগা হয়ে পড়েছিল বলে এবং এদের সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব বলে সে ঢলে

পড়ল। তবু কেলেকে ডেকে একবার বলল, তুমি দেখছ না কি হচ্ছে ?

কেলে তখন একেবারে অচেতন, তার শরীরে শ্বাস ছাড়া জীবনের কোন লক্ষণ নেই। কথা তার কানে নেহাৎ একটি শব্দের আকারে ঢুকল, কথা হয়ে নয়। সে যে সাড়া দেবে তেমন উপায় ছিল না।

ভোলা অল্পেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে, দুর্গার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে আনল শাড়ীর যেটুকু কোমরে জড়িয়ে ছিল তাও খুলে ফেলে দিল আর এক হাতের টানে। তারপর বলল, তুই নিজে সব খুলবি, না আমি খুলব ?

কি যে কর মাইরি, ছাড় আমাকে, দুর্গা আপন কথা বললে ভোলা উত্তর দিল, তবে রে মাগী, ভাল কথার কেউ নোস।

বিছানার ওপর ফেলে দুর্গার ওপর যথেচ্ছ বলাৎকার এবং যতরকমে পারল তাকে মর্ষণ ক'রে বিধ্বস্ত অবস্থায় ফেলে অবশিষ্ট বোতলটা বগলদাবা ক'রে চিক্কুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চিক্কুর ইচ্ছে ছিল দুর্গাকে সেও একবার ভোগ করে। মেয়েটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে দেখে সে স্থির ক'রল বাকি বোতলটা শেষ ক'রে মনিমালার কাছে যাবে, পকেটে টাকা যখন আছে কিছু দিলেই মনিমালা খুশি হয়ে তাকে আগল খুলে দেবে। বাজে ঝামেলা তার এখন ভাল লাগছে না।

বাইরে বেরিয়ে চিক্কু প্রশ্ন করল, কোথায় যাবি রে ভোলা ?

জাহান্নামে।

ও তো আছি। এখান থেকে কোথায় যাবি ?

ভোলা ক্ষোভ প্রকাশ ক'রল, দেখলি কেলে শালা আমাদের সঙ্গে এল না !

ও শালা আউট হয়ে গেছে।

এইটুকু মাল খেয়ে কেউ আউট হয় ?

তুই তো শালা হুইস্কি খেলি, ও শালা রাম খেয়েছে। কিন্তু যাবি কোথায় ?

ভোলা উত্তর ক'রল না। কোথায় যাবে সে নিজেও জানে না। তার নিজের যে ডেরা আছে সেখানেও যেতে পারে তবে যাবে না। পকেটে টাকা আছে এখন সে যে কোন ভাল মেয়েমানুষের কাছে যেতে পারে, সেখানেই রাত কাটাতে পারে। তাতে যা টাকা আছে ফুরিয়ে যাবে তা যাক। কোন রকম ভবিষ্যৎ ভাবনা ভোলার নেই, আগামীকাল কি হবে এ সে কখনই ভাবে না তাই মন ক'রল বাকি টাকা রাতেই শেষ ক'রবে রূপকুমারীর ফ্ল্যাটে গিয়ে।

চিক্কু স্থির ক'রল মনিমালার কাছেই যাবে, ভোলা র‍্যামের বোতল নিয়ে যেখানে খুশি যাক। নাঃ র‍্যাম সে খাবে না। এখন আর কিছুই খাবে না, পেটে আর একটুও জায়গা নেই।

ভোলাকে ছেড়ে মোড়টা ঘুরেছে হঠাৎ মনসার সঙ্গে দেখা, মনসাই ওকে দেখে

এল, ব্যস্ত হয়ে বলল, তোমাকেই খুঁজছি ওস্তাদ। সেই পার্ক থেকে সুরু ক'রে সব দেখে আসছি।

নেশার ঘোরে তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না চিক্কু, এ অবস্থায় যতক্ষণ চলছে হয়ত টলছে কিন্তু বসলেই শুয়ে পড়বে তাই কোনক্রমে এখন মনিমালার ঘর পর্যন্ত পেঁৗছে যেতে চায়, মনসার আগ্রহ দেখে বলল, একটা পান নিয়ে আয় সাদা পান।

মনসা বলল, চল পানের দোকান পর্যন্ত, পান খাওয়াচ্ছি। তার মধ্যেই বলি একটা ভাল কেস আছে। দুই ভাই এ গোলমাল। ভাল খরচা ক'রবে এক ভাইকে খতম ক'রে দিতে হবে।

কত দেবে?

কথা বলতে হবে বলেই তো তোমাকে খুঁজছি ওস্তাদ?

কোথায়?

পার্টি কোথায় জানি না, সব জেনে নেব, তুমি রাজি হ'লেই আমি কথা বলে নিতে পারি।

আগাম চাই।

পুরো? তা দেবে কেন বল?

কাজ হয়ে গেলে কোন শালা আবার টাকা দেয় রে?

সে আমি বলছি।

চিক্কুকে বলা চলে জাতে মাতাল তালে ঠিক। সে বলল, কার কেস বল? হড়কানো পার্টি হলে নিবি না। ধুর হলেও বুঝে নিবি, চেনা দিবি না।

সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না ওস্তাদ। ফাঁসবার মত কাজ কখনও করি?

মাল কড়ি কি দেবে কাজ বুঝে বলে নিবি।

চিক্কুর সম্মতি পেয়ে হৃষ্ট চিত্তে মনসা বলল, সে সব ঠিক হবে ওস্তাদ। কাজ বুঝে কথা বলে নেব। আগে সব দেখেও আসব। তুমি রাজি হলে আর চিন্তা কি?

ঠিক আছে শালা এখন কেটে পড়।

চল ওস্তাদ তোমাকে পেঁৗছে দিয়ে আসি।

না বে না, আমি ঠিক যাব।

দাঁড়াও তোমার পানটা কিনে দিই।

সামনের গ্যাস বাতির খুঁটিতে হেলান দিয়ে নিজেকে আটকে রাখল চিক্কু। মনসা মিশিরের দোকানে পান কিনতে গেল।

চিক্কুর আসল নাম যে কি ছিল সবাই তা ভুলে গেছে, চিক্কু নিজেও। চাকু চালাবার কেরামতির জন্যে কবে যে আস্তে আস্তে চিক্কু হয়ে গেছে কেউ তার খবর রাখে না। তবে এলাকার পুরানো কেউ ওর এই ওস্তাদীর দাম দেয় না, তাদের স্মৃতিতে আছে ওসমান, সিদ্দিক; ওদের মত ছুরি চালাবার হাত কারও হওয়া সম্ভব বলে পুরাতনেরা মনে করে না। লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার পেট

চিরে ফাঁক ক'রে দিতে পারত তারা। তাতে বোধহয় দশ সেকেণ্ডও সময় লাগত না। ইংরেজ আমলের লালপাগড়ী পুলিশেও সমীহ ক'রত তাদের, ভয়ে দূরে থাকত। কখনও তাদের ধরতে হ'লে বন্দুক উঁচিয়ে থেকে হাতে হাতকড়া পরাতো, চট ক'রে কাছে যেতো না। তাদের কাছে আজকের চ্যাংড়ারা? কিচ্ছু না।

তা বলে বর্তমান প্রজন্মের ছোকরা এই হ্যাংলা, বিশে, মনসা যারা সেই প্রতিভাবানদের দেখেনি, দেশভাগের সময় যারা এলাকা ছেড়ে গেছে সুরাবর্দি'র দাঙ্গার ফলশ্রুতি হিসেবে, তাদের কাছে চিক্কু-টিক্কুই সব বিরাট ওস্তাদ। চিক্কু যে কথায় কথায় ছুরি চালাতে পারে এই তার বড় কৃতিত্ব। সে ছুরি পেটের ঠিক নিশানায় লাগল কিনা সে হিসেব গৌণ। চিক্কুর ছুরিতে যে পেট ফাঁসবেই এমনটা সর্বদা মেলে না এই তো গত বছর কালীপুজোর রাতে হাঁড়ি পাড়ার হোদলাকে মেরেছিল এই চিক্কুই, হোদলা বেঁচে গেছে যদিও তিনমাস হাসপাতালে ছিল তবু তার প্রাণটা রয়ে গেছে। ওসমান বা সিদ্দিকের এমন বদনাম ছিল না কখনও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে।

সে যাক তবু এখন চিক্কু শিয়ালরাজা হয়েই বেনাবনে ক'রে খাচ্ছে। আছে অবশ্য আরও, হীরা আছে গোল্লু আছে গালকাটা গোপলা আছে, তবে যে কারণেই হোক তাদের এত পসার নেই, তাদের আরও পেশা আছে, প্রায় সব কজনই ছিনতাই বাজ; বাইরে কাজ কর্ম করে এলাকায় এসে বাস করে কেবল, এলাকার মধ্যে কোন কাজ করে না। ময়দানের বা কালীঘাটের অথবা হয়ত গিরিশপার্কের মামলায় লালবাজারের পুলিশ এসে তাদের খোঁজাখুঁজি করে। পেলে ধরেও নিয়ে যায়, তবে সোনাগাছির মধ্যে ওদের কোন কাজের খবর নেই। এখানে তারা শান্ত ভালমানুষ। নেহাৎ কারও সঙ্গে ঝামেলা লেগে গেলে ব্যক্তিগত আকছা আকছিতে তাদের ছুরি বেরোয়, নইলে নয়। গোপালটাকে তো একবারেই বোঝা যায় না ওর মা সবিতাবালা একবার এক উটকো খদ্দেরের হাতে হেনস্তা হয়েছিল, সবিতাবালার আধিয়া লালীর ছবি দেখিয়ে এক দালাল জোগাড় ক'রেছিল খদ্দেরটাকে লালা তখন খগেন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল বলে সবিতা অন্য মেয়েকে ঘরে দেওয়াতেই সেই খদ্দের চটে লাল। তার দাবী দালাল যে টাকা নিয়ে গেছে তাও সবিতাকে ফেরৎ দিতে হবে।—এই নিয়ে ঝঞ্ঝাট। গোপলাই সে ঝামেলা মিটিয়েছিল, তবে শান্ত ভাবে। রাস্তায় দৌড়ে গিয়ে যারা গোপলাকে তার মায়ের হেনস্তার খবর দিয়েছিল তারা মনে মনে বেশ উত্তেজনা অনুভব ক'রেছিল এবার একটা মজা দেখা যাবে, খদ্দের লোকটায় লাশ পড়বে। তাদের আশা পূরণ হয়নি; গোপলা ঝামেলা বাড়ায় নি, বাড়তেও দেয় নি।

গোপ্‌লার ওপর তখন অনেক ক'টা কেস; পুলিশ খুঁজছে। আরও ঝামেলা হয়েছে যে বেনেপুকুরের পার্টি এসে কোথাও কিছু ক'রে গেলেও শালা পুলিশ সেই হীরা গোপ্‌লাকেই খোঁজে। অথচ বেনেপুকুরের গ্যাঙ বড়, আসগর, দিলদার, রিয়াজ আরও কত আছে। থানার লকআপে একবার আলাপ হয়েছিল ওদের ক'জনের

সঙ্গে। সেবার বেনেপুকুরের ওরাই কাজটা ক'রেছিল বলে লালবাজার থেকেই ছাড়া পেয়ে যায় গোপ্‌লা। তাকে কেবল সন্দেহ ক'রে ধরেছিল পুলিশ। বিনা দোষে আরও একবার ধরা সে পড়েছিল, সেবার সবাই হীরা, গোল্লু, সম্রাট কেউ বাদ যায়নি। ভোর বেলাতেই চিত্রলেখা সিনেমা হলের সামনে বেশ বড় রকম টাকা ছিনতাই হয়েছিল যেন কার। নতুন রাস্তা ধরে যাচ্ছিল কাছাকাছিই কোথাও টাকাটা পেঁৗছে দিতে, ভোর পাঁচটা হবে কি আরও আগে কেউ জানে না; অত ভোরে যে নতুন রাস্তার ওপর এমন একটা কাজ হ'তে পারে কারও ধারণা ছিল না, কারণ ভোরবেলাটা সবাই প্রায় ঘুমায়। রাতে হলেও না হয় কথা ছিল। তাও পুলিশে ধরল, পরদিন ভোরবেলাতেই বিছানা থেকে তুলেই ধরল সকলকে। কিন্তু সত্যি কেউ কিছু জানে না তা কি বিশ্বাস করে পুলিশ! ওদের কেউ না কি কখনই সত্যি কথা বলে না। অযথা দু-চার ঘা ডাণ্ডাও খেল সবাই অবশেষে এই চুক্তিতে ছাড়া পেল যে এই কাজটা কে ক'রেছে পুলিশকে জানাতে হবে। না জানালে আবার সব ক'টাকে গারদে পুরবো শালা—বলে পুলিশ ছেড়ে দিলেও গোপ্‌লাদের মনে ধন্দ জাগল এত ভোরে কে ক'রল এত বড় একটা কাজ! তাও সোনাগাছির কাছে অথচ তারা জানল না! কিন্তু কে খবর নেবে? রাতের নেশা ভোরবেলাতে কেটে যায় ঠিকই শরীরের আড় ভাঙ্গে না। বেশ একটু বেলা পর্যন্তই ঘুমোয় সবাই। তিন-চার দিনের মধ্যেও যখন খবর পাওয়া গেল না বাধ্য হয়েই গোপলা গিয়ে হাজিরা দিল লালবাজারে গণেশবাবুর সামনে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াল, না স্যার এখনও জানতে পারিনি। কোন নতুন পার্টির কাজ স্যার, লাইনের কেউ না।

গণেশ গোয়েন্দাই বলল, ল্যাংড়া জগুকে চিনিস?

না স্যার।

সে কি রে? ও তো সোনাগাছিতেই কোন মাগীর কাছে যায়। মাঝে মাঝে রামবাগানেও থাকে। রামবাগানের মাগীটার খোঁজ পেয়েছি সোনাগাছির মাগীর খোঁজ পাইনি। শালা চিত্রলেখার পাশে বসে ভিক্ষে করে, কদিন ক'রছে না।

গোপলা বুঝে নিল ডালমে কুছ কালা হ্যায়। শোনাই যাক, যা বলবার গণেশবাবুই বলবে।—খবর নিবি তো কোথায় যায়। জানতে পারলে খবর দিবি।

আচ্ছা স্যার।

কাল খবর দিবি।

একদিনে যদি না পাই?

ঠিক আছে পরশুর মধ্যে জানাবি।—গণেশবাবুর মধ্যে থেকে পুলিশ কথা বলে উঠল এক ভয়ঙ্কর স্বরে, সে স্বরে স্পষ্ট হুকুম, না মেনে চলে না।

এতদিন ধরে লুকিয়েছিল সরমা, শরীরে কি হচ্ছে প্রথম দিকে গ্রাহ্য করেনি পরে কষ্ট বেশি হলেও বলেনি কাউকে। কি হবে বলে? কে কি ক'রবে? মাঝ থেকে খদ্দের নষ্ট ক'রবে। বাজে কথা রটাবে, বলবে, ওর তো শরীর খারাপ—ওর ঘরে গিয়ে কি হবে? এই বয়সে একেই খদ্দের কম থাকে তাও যদি সামান্য ক'জন খদ্দের যে আসে তাও না এলে চলবে কি ক'রে? কিরণবালা, সোনামনি, নাচি বিবিরা সব কপালের জোরে যা টাকা পেয়েছে তারই বলে এখন পায়ের ওপর পা দিয়ে চলবে। তার ভাগ্যে তো তা হয়নি! তাকে বোকা পেয়ে রোজগার অন্যে খেয়েছে। আধিয়া খেটেই জীবনের ভাল সময়টা কেটে গেছে, সে আবার এমনই লোকের কাছে যে লোক প্রাপ্য মজুরীর অর্দ্ধেক অংশও এটা সেটা ক'রে খেয়ে নিয়েছে। ফলে হাত তো শূন্য। দু-চারগাছা চুড়ি আর গলার একটা হারই যা সম্বল। জীবনে সাধ আহলাদ এখন আর কিছু নেই একমাত্র বাসনা কোনভাবে ছেলেটাকে মানুষ করা, তাও তার নিজের দ্বারা অসম্ভব বলে দিলুদার ওপর ভরসা ক'রে আছে। দিলুদা ওকে যেভাবেই হোক ওরিয়েণ্টাল স্কুলে ভর্তি তো ক'রেছে এখন যা হয় সেই দেখবে। ছেলের ভালমন্দ তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে সরমা, নিশ্চিন্ত আছে। ছেলেটা বাপ চেনে না, মামাকেই চেনে। সরমা একবার ভেবেছিল তার ছেলে দিলু মিত্তিরকেই বাবা বলে জানুক। সে ভাবনা কাজে লাগাতে পারেনি, ভাবতে ভাবতেই ভাবনার মৃত্যু হয়েছে মনেরই মধ্যে। সে ভাবনা ইচ্ছা হয়ে পৃথিবীর মুখ দেখেনি। যে দিলুদা চিরজীবন বঞ্চিত হয়েই রইল যার নির্বাক বাসনা মনের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে তার কাছে প্রস্তাবটা অপমান কর শোনাতে পারে বলে বুঝেছিল।

তবু সমস্ত কিছু উপেক্ষা ক'রে ছেলের স্কুল ভর্তির প্রসঙ্গে দিলুকে বলেছিল সরমা, সে রাজি হয়নি। এর বেশি আর কি বা সে বলত দিলুকে, কি বলবার ছিল? কি বলতে পারত? মাঝে মাঝে মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়ায় সরমা, যেন একটা গোলক ধাঁধায় ঘুরছে এমনিভাবে অন্ধের মত মনের দেয়ালে দেয়ালে হাত ঠেকায় কেবল, কিছু মেলে না। গভীর অন্ধকারের মধ্যে এমন একটা কিছু কথা খুঁজে পায় না যেটা দিলুকে বলা যায়।

কিন্তু ইদানীং কেমন একটা অপরাধবোধ তার মধ্যে কাজ করে। তাই সে একদিন হঠাৎই দিলুকে বলে বসে, এ জীবনটা তো তোমার কাছে কেবল নিয়েই গেলাম দিলুদা। পরের জন্মে তোমারে যেন সব শোধ ক'রতি পারি। এই দেনা শোধ করবার জন্যিই আবার জন্মাতি হবে।

দিলুর পরজন্ম সম্পর্কে কোনই ভাবনা নেই, এই জীবনটাকেই তার ঠিকমত জানা হয়নি পরের জীবন কোথায় কি হবে কে জানে? আগের জন্ম সম্পর্কে যেমন কোন জ্ঞান নেই তেমনই পরজন্ম সম্পর্কে কেমন ক'রে ভাববে? তবু সরমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলল, তাহ'লে তো এমনও হতে পারে যে আমিই গতজীবনের

ঋণ শোধ ক'রছি।—বলেই হাসল সে। সেই ম্লান হাসির প্রেক্ষাপটে বলল, ওসব কিছু নয় আমার যা ক'রতে পারা উচিত ছিল তা তো সম্ভব হয় নি। আমিই তো তোমারে এই দেশে আনিছি তোমারে একা থুয়ে যাই কোয়ানে? তুমি অবথা চিন্তা কোরবে না। আমাগে দুডো খাবার ঠিকই জোটপে। দুকানডা তো চলতিছে।

সরমার দুশ্চিন্তার কারণ তো কেবল এই পেট নয়, চিকিৎসা। ক'দিন আগে সে পরীবালার সঙ্গে খগেন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। চিৎপুর ট্রাম লাইন পার হলেই ছোট ডাক্তারখানায় বিপুল ডাক্তার খগেন ব্যানার্জী। বিশাল শরীর। মনটাও বড়, এ পাড়ার মেয়েরা বলে দেবতা। কালী শীতলা লক্ষ্মী গণেশ প্রভৃতি অনেক মাটির দেবতা দেখেছে সরমা কোন দেবতা কথা বলেনি খগেন ডাক্তার বলেছে, ক'রেছিস কি রে? আগে বাঁচতে পারলি না? একবারে মরবার রোগটাই বাধিয়ে বসলি? আগে কোন কষ্ট হয়নি?

সরমা সভয়ে কেবল মাথা নাড়ল।

হয়েছে, বুঝতে পারিস নি। গ্রাহ্য ক'রিস নি। প্রথমেই যদি আসতিস তো বেঁচে যেতিস।

বাঁচব না ডাক্তারবাবু? আতঙ্কিত শব্দ ফুটল সরমার কণ্ঠে।

তোরা কি বেঁচে আছিস?

প্রশ্নটিই বুঝতে পারে না সরমা উত্তর কি দেবে? তাই সে অবাক হয়ে ডাক্তারবাবুর চোখের দিকে চেয়ে থাকে। সোনাগাছি এলকার বহু দুঃস্থ মেয়েই খগেন ডাক্তারকে বাবা বলে ডাকে তাই তিনি প্রয়োজনে ওখানকার মেয়েদের ভৎর্সনাও করেন। কে যে বাবা বলে ডাকে আর কে ডাকে না, আজই প্রথম এল—ওসব তফাৎ মনে থাকে না তাঁর। তেমনই সরমাকেও বকে উঠলেন, কি রে, উত্তর দিচ্ছিস না কেন? কি বা বুঝিস? কিছু বুঝিস না বলে মনে করিস বেঁচে আছিস। তা যে ক'দিন পৃথিবীর হাওয়া বাতাস বরাতে আছে শুয়ে বসেই থাক। টাকা কামানোর চেষ্টা করিস না যেন।

সরমা প্রশ্ন ক'রে বসল, খাব কি ডাক্তারবাবু?

যা পাবি খাবি। ডাল ভাত তরকারি মাছের ঝোল যা পাস খা।

কাজ না ক'রলে খাবার পাব কোথায়?

এই রকম অবস্থা? তবে তো ভালই। না খেয়ে থাকলে কদিন আগে মরতে পারবি। কষ্ট ক'টা দিন কম হবে। যে কটা দিন কমে তাই লাভ।

সরমা অনেকটাই বুঝে চুপ ক'রে বসে রইল। এই প্রথম খগেন ডাক্তার রোগিনীর মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকালেন। একটু যেন অবাক হ'লেন এ এলাকায় আর দশটা মেয়ের মত মুখ তো নয়! ক্লিষ্ট কিন্তু পরিচ্ছন্ন একখানি ঘরোয়া মুখ যে মুখ চারপাশের বাড়ীগুলোতে সর্বদাই দেখা যায়। তাঁর ভাবান্তর ঘটল, স্নেহ সিক্ত স্বরে বললেন, দেখ মা তোমার চিকিৎসায় অনেক খরচ তার চেয়ে বড় কথা তোমাকে

কাজ কর্ম একদম ছেড়ে দিতে হবে। আমাকে টাকা না দিলেও চলবে ওষুধ তো কিনতে হবে। তোমার কে আছে?

ছেলে।

কত বড়?

দশ বছর।

সর্বনাশ। তাকে কে দেখে তারই ঠিক নেই।

সে তার মামার কাছে থাকে।

তোমার ভাই আছে?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল সরমা।

তবে তাকেই বল। চিকিৎসার ব্যবস্থা করুক। যদি চিকিৎসা শেষ পর্যন্ত করাতে পার তবে আজ এসেছ একটা ইংজেকশন নিয়ে যাও। কাল কিন্তু আবার নিতে হবে, রোজ একটা ক'রে পনের দিন। তারপর একদিন বাদ একদিন।

সরমা হিসেব ক'রল অসম্ভব। তবু প্রাণের মায়ায় স্থির ক'রল যা হোক হবে গলার হারটা আর চুড়ি ক'গাছা না হয় বিক্রি ক'রে দেবে।

আত্মার কাছে যে থাকে সে-ই আত্মীয়। এ বাড়ীতে এসে করালীকে তার হৃদয়ের কাছাকাছি পেয়েছে। কারণ ছাড়া কার্য হয় না, করালীর সঙ্গে সরমার হৃদ্যতা হবারও একটা কারণ ওর অসহায়তা। এ বাজারে নারী বিক্রি হয় না তার যৌবন বিক্রি হয়। যার যতদিন যৌবন তার ততদিনই দর ও কদর। ওটি ফুরোলেই ব্যাস, সব শেষ। ফক্কা। যাদের নতুন মেয়ে ধরে আধিয়া রাখবার সামর্থ বা সংযোগ থাকে তারা পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকে; পরশ্রমে বেঁচে থাকবার উপায় যাদের না থাকে তারা হয় নিমতলার ঘাটে বসে ভিক্ষে করে নইলে যতদিন পারে করালী হয়, যে কোন বাড়ীর মেয়েদের ফাইফরমাস খেটে পেট চলে। করালী পেট চুক্তিতেই কাজ করে সোহাগবালার কাছে, অন্যান্য মেয়েদের কাজ কর্ম ক'রে দিয়ে নগদ যা হাতে পায় হাত খরচ বা ভবিষৎ ভরসা তা থেকেই।

সরমাকে অন্যরকম মনে হওয়াতে করালী প্রথম থেকেই ওকে পছন্দ ক'রে বসেছিল। এপাড়ার অনেকের মতই নয় মেয়েটা। তাই একটু অবাক হয়েই জানতে চেয়েছিল, এ লাইনে কতদিন?

যত সত্যই হোক রূঢ় এই 'লাইনে' শব্দটা ভাল লাগে না সরমার অথচ এখানকার অনেকেই বলে। অপছন্দটা চাপা দিয়ে রেখে সে বলেছিল, তা প্রায় দশ বছর।

তোমার ভাগ্যি যে এতদিন টিকে আছ। অনেকেই তো থাকে না।

কোথায় যায়?

যাবে আর কোথায়? ভাগাড়ের গরু কি আর সগেগ যাবে? এই সোহাগবালার বাড়ীতে তোমার মত বয়স্ক মেয়েদের তো জায়গা দেয় না, কাউকে ঘর কখনও ভাড়াও

যে মানুষ দেয় না তোমাকে দেখছি দিল! এ বয়েসে নতুন খদ্দের কি আর পাবে?

এ ভাবনা সরমারও ছিল তাই সে তার পুরানো খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলেই ঘর ছেড়েছে। যারা ও বাড়ীতে আসত তারাও বাড়ী বদলাতে রাজি হয়েছে বলেই তার ভরসা। অত কথা আর করালীকে বলল না এবং পুরাতন খদ্দের যে এখানে আসছে তাও জানাল না, তবে তার জন্যে এই মহিলার দুশ্চিন্তা আপনজনের মত লাগল। সে বলল, দেখি, ভাগ্যে যা থাকে হবে।

সে তো বটেই।—

প্রথম আলাপ গভীরই হয়েছে দিনে দিনে। কদিনেই সুখে দুঃখে জড়িয়ে গেছে করালী। খগেন ডাক্তার-এর কাছে সেও এনেছে। তার আগে অবশ্য বলেছিল, দ্যাখো বাছা নাড়ী মরে গেলে অমন হয়। খিদিরপুরে ডাক্তার আছে নাড়ী বসাতে পারে। অনেকে যায় শুনেছি।

খিদিরপুর অনেক দূর বলেই সরমা কাছের ডাক্তারকে পছন্দ ক'রল। কিছু হাতের টাকা হাত থেকে বেরিয়ে গেল রোগ ওষুধকে গ্রাহ্য ক'রল না। অসহায় স্বরে ডাক্তারকে বলল, ছেলেটার জন্যে ডাক্তারবাবু, নইলে এ জীবন না থাকলেই ভাল। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এ যন্ত্রণা অপরে ভুগলেও খগেন এর তীব্রতা বোঝেন। এবং এও জানেন এখনই এর শেষ নয়, এ হয়ত আরও তীব্র হবে, আরও দুঃসহ হবে একদিন। এত ওষুধেও যদি কাজ না হয় তো তিনিও সমান অসহায়। এই অক্ষমতা তাঁরও কষ্টের কারণ কিন্তু ক'রবেন কি? এর ওপর তো তাঁর আর কিছু জানা নেই। তাঁর অধীত বিদ্যার পূর্ণ প্রয়োগ তিনি ক'রেছেন, আর কোন পথ নেই। বড় দেরী ক'রে ফেলেছে মেয়েটা, রোগ চাপা দিয়ে রাখলে তা বেড়ে যাবার সুযোগ পায় অবশেষে এমন জায়গায় এসে দাঁড়ায় যেখান থেকে তাকে আর তাড়ানো যায় না। এরও সেই অবস্থা।

দিলুর দোকান চলে, কিন্তু এমন চলে না যা থেকে এই চিকিৎসার খরচা চলতে পারে। সে এ রোগের সামান্যই বোঝে শুধু বোঝে যে রোগ হয়েছে সারাতে হবে। তাই নিজেই একদিন খগেন ডাক্তারের দরজায় এসে হাজির হ'ল। ম্লান মুখে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল রোগীর ভিড় কমে যাবার অপেক্ষায়। ওকে ওভাবে দেখে খগেনবাবু নিজেই জানতে চাইলেন, আপনার কি আছে? এ দিকে আসুন।

পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল দিলু, ডাক্তার জানতে চাইলেন, কি হয়েছে?

আমার কিছু হয়নি ডাক্তারবাবু। আপনি যে সরমার চিকিৎসা করেন সে আমার গেরাম সম্পর্কে বোন হয়।

অনেক রোগিনীর নামের ভিড় থেকে সরমাকে খুঁজে নিতে সামান্য একটু সময় লাগল, পেয়ে বললেন, মেয়েটা বড় দেরিতে এসেছে। এসব রোগ প্রথমে চিকিৎসা না ক'রলে সারে না। এত দেরিতে সারা অসম্ভব বলেই ধরে নিতে হয়। ওকে

যতগুলো ইনজেকশন দিয়েছি তাতে কমে যাওয়া উচিত ছিল।

না সারলে যে কি হবে দিলুর জানা নেই। এ রোগ—যার প্রকাশ দৃশ্যমান নয় তা না সারলে যে কি হয় সে ভেবে পেল না বলে অবোধ স্বরে ব্যক্ত ক'রল, তাহ'লে কি হবে ডাক্তারবাবু?

সে জানেন ভগবান। আমি জানি না।

একথা তো উত্তর হ'ল না বরং আরও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ল তার কাছে। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। রাত হয়েছে ডিসপেনসারী বন্ধ হবার সময় হয়েছে বলে ডাক্তার বললেন, আমার বোধহয় আর কিছু করবার নেই তবে ওষুধ যেমন চলছে চলুক। বন্ধ ক'রে তো লাভ নেই।

জন্মের প্রস্তুতি চোখের অগোচরে হলেও তার ক্রমপর্যায় বোঝা যায়। সে প্রক্রিয়াকে মানুষ অনুকরণ ক'রতে পারে। তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে মানুষের। ভূমিষ্ঠ হবার আগে বেগ থাকে উদ্বেগ থাকে নানারকম আশার আনন্দ থাকে—মোট কথা জন্ম ব্যাপারটা বেশ জানান দিয়ে ঘটতে থাকে। মৃত্যুর কোন বিজ্ঞপ্তি থাকে না। কোন রোগ বা অসুস্থতাকেই মানুষ মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসেবে ধরতে চায় না কারণ তা চূড়ান্ত নিরাশার মধ্যে মানুষকে নিক্ষেপ করে। তাই মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেও মানুষ তার নিশ্চিত আগমনকে মনে ধরে না বলে সে যখনই আসে তাকে আকস্মিক মনে হয়।

এমনটাই ঘটল দিলুর সামনে। ক'দিন ধরেই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে থাকছিল সরমা সেই সঙ্গে তার যৌনাঙ্গ দিয়ে যে সাদা স্রাব নির্গত হচ্ছিল তার পরিচয় পুঁজ। সরমা উত্থান শক্তি রহিত হয়েগিয়েছিল বলেই দিলুর পক্ষে সব জানা সম্ভব হ'ল। দিলু অসহায় ভাবে খগেন ডাক্তারের কাছে দৌড়াল, বলল, একবার চলুন ডাক্তারবাবু। কিছু একটা করুন।

খগেন ব্যানার্জী দেহে বিপুল, হৃদয়েও। সকল রোগীর প্রতিই তাঁর সহানুভূতি থাকে পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু তিনি তো শরীরবিদ্, সব বোঝেন, বললেন, আমার আর কিছু করবার নেই। সাধ্যে যা ছিল ক'রেছি। ভাল ক'রতে পারলে এতদিনেই পারতাম।

তবে?

এখন আর কিছু হবে না।

খুব কষ্ট পাচ্ছে যে—

এ কষ্ট রদ হবার নয়। আমি গেলে কোন উপকার হ'লে নিশ্চয় যেতাম।

খগেন ডাক্তারের প্রতি অভিমান নিয়েই দিলু ঘোরতর অসহায়তার মধ্যে ফিরে এল। সরমার কষ্ট তার আর সহ্য হচ্ছে না, চোখে দেখাও অসম্ভব। এও কি প্রাপ্য কি ছিল মেয়েটার! এই ভোগান্তির জন্যে নিজেকেই তার দায়ী মনে হচ্ছিল। যা কিছু ঘটছে বা ঘটে চলেছে সব কিছুর জন্যেই দায়ী দিলু। তার জন্যেই

মেয়েটার এই দুর্দশা।

এই দুঃখের সময় করালীই একমাত্র খোঁজ খবর নিয়ে চলেছে। নিজের কাজ কর্ম সামাল দিয়ে এসে সরমার কাছে বসে সাধ্যমত সেবা যত্ন ক'রছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণা কমানোর জন্যে বোতলে গরম জল ভর্তি ক'রে এনে দিচ্ছে, দেখ যদি একটু অন্তত কমে।—সহব্যাথী দিলুকে এক সময় বলল, আমার আগেই মনে হয়েছিল এসব ইংরিজি চিকিৎসা না করিয়ে খিদিরপুরে নাড়ী বসানোর ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে এত কষ্ট হ'ত না। হয়ত সেরে যেত।

এ বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে কলাবতীর আয় রোজগার ভাল, তার পসারও বেশ ভাল। পশ্চিমের কোন দেশের যেন মেয়ে এসে মিশে গেছে বলে আদবকায়দাতে পশ্চিমা ভাব থাকলেও কথাবার্তা দরকার মতই বাংলা বলে। তার সুন্দর স্বাস্থ্য, লম্বা গঠন যে খদ্দেরকে ধরে সে আর কলাবতীর মোহ থেকে ছাড়া পায় না। ফলে তার প্রভুত্ব সর্বত্রই প্রভাব ফেলে। কলাবতীও সরমার বিপদে এগিয়ে এল, দিলুকে বলল, এ ভাইয়া আওর কোনো ডাক্তারকে বোলাওনা। কোই বড়া ডাক্তারকে বোলাও। পৈসা কে কোনও ফিকির নাই, দরকার হোবে তো হামলোগ দিবে। ভালো সুই দিলে সব ঠিক হোয়ে যাবে।

দিলু শুনল। বহুদিন পর হঠাৎ সে যেন সৌদামিনীর স্বর শুনতে পেল কলাবতীর কণ্ঠে। এক লহমার জন্যে তার সৌদামিনীকে মনে পড়ল, মানুষ স্বার্থপর সত্য মানুষ আবার সহযোগীও বটে। এই পৃথিবীতে হাজার হাজার সোনামনিদের মধ্যে দুএকজন সৌদামিনী অন্তত থাকে। কলাবতীর উৎকণ্ঠার উত্তরে দিলু জানাল, কোন ডাক্তারকে যে বলা যায় তা তো সে জানে না, খগেন ডাক্তার তো জবাব দিয়েই বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে বলবে?

কলাবতীই পরামর্শ দিল, দর্জিপাড়ামে এক বড়া ডাক্তার আছে কি জানি নাম, তুমি সেখানে খবর কর। —নতুন যে বিশাল চওড়া রাস্তা হয়েছে লোকের ঘর বাড়ী বস্তি ভেঙ্গে তার ওপারেই দর্জিপাড়া এখান থেকে খাড়া পুব। তা সে পাড়াও তো একটুখানি নয়, অনেক সরু সরু গলিপথের নক্সায় জমজমাট ভদ্দরলোকেদের পাড়া সেটা; কোন গলিতে কোন ডাক্তারকে খুঁজবে? নাম জানলেও না হয় হ'ত—। অথবা সেখানে তেমন চেনাশোনা থাকলে জিজ্ঞাসা করা যেত অমুক ডাক্তারের বাড়ীটা কোথায়। এ এক দুরূহ সমস্যায় পড়ল দিলু। একদিকে সরমার জীবন বাঁচানোর দায়, কলাবতী সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এসেছে—দিলুকে কেবল চেষ্টা ক'রতে হবে মাত্র। দিলুর দায়িত্ব কেবল দৌড়োদৌড়ির।

অন্ধকারেই ঝাঁপিয়ে পড়ল দিলু মিত্তির। খগেন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা যায় না আপনার চেয়ে বড় কাজ ডাক্তারের নাম বলে দিন, তবু মরিয়া হয়ে বলল, ডাক্তারবাবু যদি মনে করেন আরও কাউকে দেখালে বেচারী একটু আরাম পায় তাহ'লে বলে দিন দেখি—

খগেন ডাক্তার স্পষ্টবক্তা মানুষ দিলুর ব্যাকুলতা দেখে বললেন, তোমরা টাকা নষ্ট ক'রতে চাও তো নিশ্চয়ই ক'রতে পার যত ডাক্তারই আসুক ওষুধ তো ঐ এক, পেনিসিলিন। তার বাইরে তো আর কোন ওষুধ নেই—। তা তোমরা যদি একান্তই চাও তো শ্রী বিলাসবাবুকে একবার দেখাতে পার। শুনেছি তিনি এসব রোগের চিকিৎসা করেন। ডাক্তার শ্রী বিলাস সেন হরি ঘোষ স্ট্রীটে থাকেন। কোন ডাক্তার না বলে দিলে তিনি দেখবেন না, তা আমি তাঁকে লিখে দিচ্ছি দেখ যদি তিনি আসতে রাজি হন।

তাও হ'ল। কাজ হ'ল না। ডাক্তার সেন দেখেই বললেন, বড় দেরি হয়ে গেছে। খগেনবাবুকে আরও আগে দেখালে না কেন? রোগ তো বোধ হচ্ছে বছর তিনেকের পুরানো। হয়ত কিছু বেশিও হতে পারে। আমি আর নতুন ওষুধ কি দেব, তবু একটা লিখে দিচ্ছি তোমাদের ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে খাবে। তিনি যেমন যা দিচ্ছেন তার সঙ্গে এটি চলবে। দেখ যে ক'দিন চলে।—অর্থাৎ জবাব দিয়ে চিকিৎসা সাধনের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রলেন শ্রী বিলাস।

তবে তাঁর এই সংযোজিত ওষুধটা সাময়িক ভাবে শারীরিক ক্লেশ কিছুটা কমালো বটে আরোগ্যের ব্যবস্থা ক'রতে পারল না। ভেতরে ভেতরে শেষ ক'রে এনেছিল যে ব্যাধি তা হঠাৎ একদিন উগ্র রূপ ধারণ ক'রল। দিলু দৌড়োল তাদের দেবতার দরবারে তিনি তখন আর একটি মেয়েকে বলছিলেন, এ তো তোদের নিয়তি রে! বাধালি তো এমন একটা রাজ রোগ? চিকিৎসা না হয় করাবি খাবি কি? কে তোকে এখন দুবছর বিছানায় শুইয়ে খাওয়াবে? কাজ কর্ম বন্ধ, চলাচলও কম ক'রবি। পারবি?

গভীর দুশ্চিন্তা মেয়েটির মুখের ওপর বর্ষার মেঘের মত জমে উঠেছিল। তারই মধ্যে দিলু বলল, ডাক্তার বাবু, দয়া ক'রে একবার চলুন।

কি হ'ল?

সরমা কেমন ক'রছে।

খগেন ডাক্তার সব বুঝে-ও বললেন, চল যাচ্ছি।—চিকিৎসকের পেশার সঙ্গে নির্লিপ্ততা জড়ানো থাকে। নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গেও ব্যর্থ সংগ্রাম তাঁকে সব জেনে বুঝেও ক'রতে হয় স্বেচ্ছা ব্যর্থতা বরণ ক'রতে। তাতে হতাশাও জাগে না, শোকও স্পর্শ করে না। নিয়তির মতই নির্মম হতে হয় চিকিৎসককে। সেই নির্লিপ্ততা সঙ্গী ক'রেই খগেন যখন সরমাকে দেখতে গেলেন তখন কেবল চোখে দেখা ছাড়া কারও কিছু করবার থাকতে পারে না, তবু যেহেতু তিনি চিকিৎসক নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না। মারীর সঙ্গে সংগ্রামের শপথ তাঁর; আরোগ্যের ব্রত তাঁর অস্তিত্ব জুড়ে। তাই ক্ষিপ্র হাতে নিজের ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ বের করে যন্ত্রণা নাশক ওষুধ প্রয়োগ ক'রলেন আরোগ্যের চিকিৎসা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে। মন মানল না বলে আবার একটা ওষুধ দিলেন শেষের পরের চেষ্টা হিসেবে।

ডাক্তার বেরিয়ে যাবার পর কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে থেকে চোখ মেলে তাকাল সরমা ঘরে দুচারজন মহিলা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরে দিলুর ওপর পড়তে শ্রান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রল, হরিশঙ্কর ?

বাইরে আছে। ডাকি।—দিলু শশব্যস্ত হয়ে সরমার ছেলেকে ডাকতে ছুটল। কোথায় যে তাকে পাওয়া যাবে জানা নেই। পথে নেমে মাথা ঘুলিয়ে গেল কোথায় থাকতে পারে ? দুপায়ে হাঁটতে পারবার পর থেকেই যাকে পথে থাকতে হয় তার জন্যে কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না। পথে প্রান্তরে যে কোন একটা থাকার জায়গা তার গড়ে ওঠে, অনেক সময় একাধিকও।

লক্ষ্মীই খেয়াল ক'রল সরমা যেন ক্রমাগত ঝিমিয়ে পড়ছে। একটু একটু ক'রে যেমন বিকেলের পরে দিনের আলো কমে যায় তেমনি ক'রে ঝিমিয়ে যাচ্ছে সরমা। এতদিন শরীরে যে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা ছিল তার কোন প্রকাশ এখন আর বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু নিভে আসা বাতির মত ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে। চারপাশের খোলার চালার ওপর সূর্যের চলাচল মাঝে মাঝে চোখে পড়ে যায় তাই দু একবার সূর্যাস্ত দেখেছিল লক্ষ্মী সেই প্রবল তাপ শীতের বিকালে ধীরে ধীরে কেমন নিষ্প্রভ হতে হতে নিভে যায়, সরমার অবস্থা দেখে তাই সে ভয় পেল। এমনভাবে এত কাছাকাছি মৃত্যুকে কোনদিন দেখেনি তবু আজ মনে হ'ল সে যেন একটা জীবনের নিভে যাওয়া দেখছে। সরমা তার কেউ নয় সাময়িক সহবাসী মাত্র তবু তার মনে শোক এল, কি এক ব্যথা বুকের মধ্যে থেকে গলা বেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল বলে আপনার অজান্তেই শাড়ীর আঁচল নিয়ে চাপা দিল নিজের মুখে, উদ্‌গত বেদনার বহির্প্রকাশ বন্ধ করবার অন্য কোন প্রয়াস তার মাথায় এল না।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল চপলা, কামিনী, আরও সব মেয়েরা। তার মধ্যে একজন চোখে আঁচল চাপা দিয়ে হু হু শব্দে কেঁদে উঠল, অন্য একজন তাকে ঠেলে ঘরের বাইরে ক'রে দিল কান্নার সংক্রমণ রোধ করবার জন্যে। যে বেদনা সকলের তার প্রকাশ সবার মধ্যেই সংক্রমিত হয়। কেউ কেউ তার পথরোধ ক'রতে পারে, অনেকে পারে না। যে পারে সে হয়ত অভিবেদনায় দগ্ধ হয় অথবা প্রবল প্রতিরোধ দিয়ে বন্ধ ক'রে দিতে পারে তার প্রবাহ। যারা না পারে তারা উচ্চকিত শব্দে সে বেদনাকে সার্বজনীন ক'রে তোলে।

দিলু প্রায় দৌড়েই ফিরে এসে দেখল সব শেষ। সমস্ত বেদনা শরীর থেকে মুছে নিয়ে গেছে নিজের অস্তিত্ব। সরমা নিথর। তার মাথাটা একপাশে একটু হেলে গেছে। যারা আছে মূর্তির মত স্থানু; হতভম্ব হয়ে আছে যেন। তাকে দেখেই এক একজন ঘর ছেড়ে গেল।

সরমা নেই। তার স্পন্দনহীন নিথর দেহটা জড়ে পরিণত। তার মনের মধ্যে মরানদীর শুকনো বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে বয়ে চলা বৈশাখের দুপুরের রুক্ষ

বাতাস বইতে লাগল। তারই আঘাতে বাঁশবনের ঝরা পাতায় যে হাহাকার জাগে সেই মহাশূন্যতার শূন্যতা জেগে উঠল। অসহায়তার তীব্র অভিঘাতে তার দুটো হাত অযথা একবার আন্দোলিত হয়ে নিজেরই মাথায় চুল ছিঁড়তে লাগল। অযথা চঞ্চল পদবিক্ষেপে ঘর ময় অস্থিরভাবে পদচারণা ক'রে বেড়াল বার কয়েক অতঃপর সরমার ছেলে এলে তাকে জড়িয়ে ধরে হু হু ক'রে কাঁদতে লাগল।

দিলুর অধীর শোকের মধ্যে পড়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল সরমার কিশোর পুত্র যার কাছে মা একটা শব্দমাত্র। এই ছোট্ট শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য ছিল না তার কাছে। ছিল কেবল এক নির্ভরতা প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোষাক, তবে আশ্রয়ের প্রয়েজন ধীরে ধীরে কমছিল কারণ যে সময়টায় মায়ের আশ্রয় প্রত্যেক শিশুর অবশ্য প্রয়োজনীয় হয় সে সময়টা অতিক্রান্ত। এখন সহজ লভ্য আশ্রয় তার সর্বত্র। রাতের আশ্রয় তার বহুদিন ধরেই দিলু মামার দোকান, সেটা তো আছে, তবে কি গেছে? কি যে হয়েছে হরিশঙ্কর বুঝতেই পারল না কেবল দিলুর আচরণ তার অস্বস্তিরও কারণ হ'ল।

একটি মেয়ে বলে উঠল, দিলুদা যা হবার তা তো হয়েছেই আপনি শান্ত হোন, আপনার এখন অনেক কাজ। আপনি অধৈর্য হলে চলবে না।

দিলুর মনের মধ্যে তুফান তখন সবকিছু ওলটপালট ক'রে দিতে চাইছে। কি ক'রে সে শান্ত হবে? সরমার চলে যাওয়া এমন একটা বৃক্ষের উৎপাটনের মত যা ভূমির বিশাল পরিধি জুড়ে ছত্রাকার ক'রে যায়। সরমা তেমনি ক'রেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার জীবন থেকে। অথচ তার জীবনের মধ্যে সরমার শিকড় প্রোথিত ছিল কি? তা তো ছিল না! বাল্যচাপল্যের ছুটোছুটি খোলার দিনগুলো পেরোনোর পরই তো সে আলাদা, সম্পূর্ণ পৃথক, সম্পর্কহীন। শুধু একটি দিন একসঙ্গে কলকাতায় আসা, পালিয়ে আসাও নয় প্রতিষ্ঠা পেতে আসা। জীবনের সন্ধানে আসা, সরমা হয়ত আসতে চায়নি, কলকাতা সে চিনতই না দিলুই তাকে এনেছিল কিন্তু এ কোন কলকাতায় এনেছিল তাকে? এ তো এক ভাগাড়। কলকাতা যে এতবড় ভাগাড় তা কে জানত?

মনটা হায় হায় ক'রছে। দিলু অসহায় অক্ষমতায় একবার কপাল চাপড়ে নিল। কোন কিছুতেই স্বস্তি না পেয়ে অধৈর্য ভাবে ছটফট ক'রতে লাগল। একা থাকলে হয়ত নিজের চুল ছিঁড়ত মনোবেদনার চাপে, ঘরে সহবাসী মেয়ে কয়েকজন থাকার ফলে সেটা হ'চ্ছে না তাই মাথাটা বেঁচে গেল। ইতিমধ্যে মঙ্গলামাসী কোথা থেকে খবর পেয়ে এসে হাজির হ'ল। মঙ্গলার বয়স হয়েছে তবু ভরাট স্বাস্থ্যের মজবুত শরীর। দিলু মাঝে মধ্যে পথে দেখে মহিলাকে, কোন বাড়ীতে থাকে জানে না। মঙ্গলা এসে কনুইয়ের গোঁত্তা দিয়ে দু একটি মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে মৃতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কম বয়েসেই মারা গেল গো মেয়েটা— বেঁচে গেল। নইলে তো শেষ বয়েসে ঝি-গিরি ক'রে মরতে হ'ত। ভাগ্য ভাল;

বলতে হবে। তা তোরা সব হাঁ ক'রে দাঁইড়ে দেকচিস কি? খানকি মাগীর মড়া কেউ দেকিস নি? চল চল সব ব্যবস্থা কর। কই গো বাউউলি মাল ছাড়, খাটিয়া দড়ি আনাই।

সোহাগবালাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেও করালী এগিয়ে এল, তার মুখটা বর্ষার আকাশের মত গম্ভীর, ভারাক্রান্ত। সে শান্তস্বরে বলল, চিৎকার চেঁচামেচি না ক'রে যা ব্যবস্থা করবার কর। ট্যাকা যা লাগে আমরাই দেব। বাড়ীউলি মাসী যদি কিছু দেয় দিক আমি নলিনীদি, শান্তা সবাই মিলে দিয়ে দিচ্ছি, বাঁচাতে তো পারলাম না মেয়েটাকে, পোড়াবার ব্যবস্থা করি—বলেই মুখে আঁচল চাপা দিল নিজের উদগত বেদনার পথ বন্ধ ক'রতে।

মঙ্গলার মনে অকারণ শোকসন্তাপ হয় না। সে রুক্ষ। চরম নির্লিপ্ত। এলাকার যত অকাজে তার আগ্রহ যে কাজ অন্যে সহজে করে না তাতেই আনন্দ পায় মঙ্গলা। তাই সারাটা সোনাগাছি অঞ্চলে কে কখন মরছে কার কোন বিপদ হচ্ছে সব সংবাদ তার হেপাজতে থাকে। মঙ্গলা অমনি দৌড়ে সেখানে পেঁীছে যায়। কোথাও তার কাছে চেনা অচেনার ব্যবধান নেই, যেন সমস্ত এলাকার আপনজন সে, সকলেরই আত্মজন।

সরমার মৃতদেহ দেখিয়ে সে করালীকেই বলল, এর ঘরে কি বোতল আছে দেখ।

করালী মঙ্গলার নিয়ম কিছুটা জানে বলেই বলল, সরমাদির ঘরে বোতল নেই।

সে কি লা। আকাশ থেকে পড়ল মঙ্গলা, সোনাগাছির মাগীর ঘরে বোতল নেই! তাতে আবার এমন খানদানী বাড়ী! বাড়ীর বদনাম হবে না?

করালী ওকে থামানোর জন্যে বলল, নাম বদনাম তোমাকে ভাবতে হবে না মোনার ঘরে ভাল জিনিস আছে তোমাকে এনে দিচ্ছি। তবে খেয়ে আবার বেহেড হয়ে যেয়ো না যেন।

ক বোতল দিবি যে বেহেড হবো? সবাই তো খুঁজে খুঁজে তলানীটুকু এনে দেয় গলাও ভেজে না ঠিক মত। দে দে যা দিবি দে, আর টাকা পয়সা ছাড় খাট ফাট আনা।

মঙ্গলা আগেই জলপান করবার মত ক'রে বোতলের আরেকটুকু পান ক'রে নিল হাতে পাওয়া মাত্র। করালী অবাক হয়ে দেখল মানুষের একগ্লাস জলপান ক'রতেও এর চেয়ে বেশি সময় লাগত অথচ মেয়েটা ঐ কড়া মদ এমন অনায়াসে গলায় ঢেলে দিল! অন্য মেয়েরাও কম বিস্মিত হ'ল না। মঙ্গলাকে এর আগে কোনদিন কেউ দেখেনি, দু-একজন প্রসঙ্গ ক্রমে কখনও বা ওর নাম শুনেছিল মাত্র। আজ বড় অদ্ভুত এক মহিলাকে দেখল যে কিনা একদা ওদেরই একজন ছিল, সবার সংশয় হ'ল ছিল কি? মঙ্গলা নারী নয় অদ্ভুত কিছু। ও যে একজন মানুষ তাও যেন সংশয়ের ব্যাপার।

দিলুই খাট বিছানা সঙ্গে কিছু ফুলও কিনে আনল হরিকে সঙ্গে ক'রে। মঙ্গলার মধ্যে তখন কারণ সুধা কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। এমনিতেই সে বলশালী এই

আধঘণ্টার মধ্যে যেন সেই বল বিপুল বেড়ে গেল। ক্ষিপ্র হাতে একাই সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিল। সকলের উদ্দেশ্যেই বলল, তোরা কে কে যাবি চল।

এ বাড়ীর মেয়েরা কোনদিন প্রয়োজন হয়নি বলে কেউ কখনও শ্মশানে যায়নি। কেউ কথা বলছে না দেখে ক্ষুব্ধ মঙ্গলা বলে উঠল, আমি কি একাই খাট মাথায় ক'রে নিয়ে যাব? তোরা সব পটেশ্বরী হয়ে থাকবি কোনদিন কি শরীর পড়বে না? একদিন তো সবাইকেই যেতে হবে রে!

মঙ্গলা যেন সমস্যায় পড়ল, নিজেই বলল, অন্য বাড়ীর মড়া তো কেউ বইবে না। সবাই কি মঙ্গলা যে সব মড়া ঘাড়ে নেবে, যার যেখানে মরবে মঙ্গলা পার ক'রবে! দিলুর দিকে দৃষ্টি পড়তেই বলল, এই মিনষে, এতদিন ওকে শুয়েচ এখন ঘাড় দেবে না চলবে? চল তোমাকেও যেতে হবে।

দিলুর মনের অবস্থা ভাল নয় বলে মঙ্গলার কথায় কান ক'রল না। কেবল শ্মশান যাবার প্রস্তাবটাই ধরল। মঙ্গলা ততক্ষণে একজন সুস্বাস্থ্য মেয়েকে বলল, এই মেয়ে একটুন তো রাস্তা, চল না? নিমতলা শ্মশান কতটুকু? আমি তো আছি, পেরে যাবি চল। চল চল, যে কোন দুজন চল। দশ মিনিটেই পৌঁছে যাব।

অন্য কিছু হ'লে এত দ্বিধা হ'ত না মৃতদেহ বহন বলেই সকলের শংকা। কেমন যেন ভয়। কেন ভয়, কিসের ভয় কেউ তার কোন উৎস জানে না, কারণও নয়। তবু অহেতুক শংকায় কেউ রাজি হতে পারছে না দেখে মঙ্গলা বলল, ডাক বাড়ী-উলিকে।

বাড়ী সম্পর্কে সোহাগবালার আগ্রহ ছিল না, তবু সে বাড়ীউলি বটে তাই ডাকা মাত্রই তার ঘর থেকে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই মঙ্গলা বলে উঠল, বল এখন কে এই মড়া ফেলবে? তোমার বাড়ীর কেউ তো রাজি নয়।

সোহাগবালা মঙ্গলার কথার কোন উত্তর ক'রল না নিঃশব্দে শুনতে লাগল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। তার স্থির দৃষ্টির সামনে মঙ্গলার তীব্র বাক্যও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ল, সোহাগবালার শব্দহীনতায় তার ব্যক্তিত্বের এমন প্রকাশ ছিল যা মঙ্গলাকেও ম্লান ক'রে দিল। সে থামলে সোহাগবালা বলল, কেউ না গেলে আমার কি করবার থাকতে পারে? সরমার নিজের লোক আছে সে যা পারে করুক।

এবার আপন তেজ ফিরে পেল মঙ্গলা, স্ববিক্রম প্রকাশ ক'রল, এসব মেনিমুখো মিনসে কি ক'রবে? ওরা কেবল মাগের ওপর চড়বে। তুমি ক'টা টাকার ব্যবস্থা কর আমি লোক জোটাচ্ছি।

সোহাগবালা মুখে কিছু বলল না, তাতে তার অসম্মতিও প্রকাশ পেল না। সে কেবল বলল, যা ক'রতে হয় কর। করালী তো যেতে পারে, যাচ্ছে না কেন?

আসলে করালীর ভয় ক'রছিল, মালকিনির হুকুমকে তার অধিকতর ভয়। সেই অভয় শ্মশানের ভয়কে জয় ক'রে নিল তাই সে বলল, আমার তো যেতে কোন বাধা নেই। আমি তো পা বাড়িয়েই আচি, এটটু আগে গিয়ে চিনে আসব যা—।

তাই এস—মঙ্গলা জবাব দিল। তারপর ঠাট্টা ক'রে সংযোজন ক'রল, ইচ্ছে হ'লে থেকেই যেয়ো।

মঙ্গলাই তার দুজন সঙ্গিনী জুটিয়ে আনলে মড়া খাটে তুলে তৎপর হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে বহনের উপযোগী করে নিল সকলে। দিলুর ইচ্ছে হ'ল ট্রাম লাইনের ওপার গিয়ে বসাক গলি থেকে হরিনামের দল ডেকে আনে যারা মৃতদেহের সঙ্গে খোলকরতাল বাজিয়ে শ্মশান পর্যন্ত গিয়ে থাকে। এ প্রথা সে নিমতলা ঘাট স্ট্রীট দিয়ে শববহনের সঙ্গে বহুবার দেখেছে। নিশ্চয় এটার তাৎপর্য আছে, তাই যেতে হয় বলে দিলুর ধারণা। সে বাঁধা ছাঁদার সময় কাউকে কিছু না বলে চট করে পেঁাছে গেল নিমু গোস্বামী লেন-এর মুখে। রঘুয়াকে দেখে জিজ্ঞাসা ক'রল, কীর্তনের দল কোথায় থাকে রে ?

কোন কীর্তন ? রঘুয়া আকস্মিক প্রশ্নে আকাশ থেকে পড়ল।

ঐ যে মড়াঘাটে যায়—।

ও। আরে ও তো রতনার দল। কি হবে ওদের ?

আমার নিজের লোক মারা গেছে তাই ডেকে নিয়ে যাব।

রঘুয়া সংশয় প্রকাশ ক'রল, মগর ও লোক যাবে কি ?

কেন ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে রঘুয়া বলল, চল দিলুদা যাই। পাশেই তো থাকে, দুটো দল আছে। রতনাকে বলে যদি ওরা যায়। রত্নার মা তো খানকি ছিল, ও নিজেও এ পাড়ায় প্রায় আসে।

কথা বলতে বলতেই বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীটে পেঁাছে গেল, চিৎপুর রোড থেকে ঢুকেই ডানদিকে বসাকদের একটা বিশাল বাড়ীর জীর্ণ ধ্বংসাংশ, একটা শীর্ণকায় মিশকালো লোক সামনেই বসে বিড়ি ফুঁকছিল তাকেই রঘুয়া প্রশ্ন ক'রল, এ দাদা, রত্না কাঁহা ?

লোকটি বিড়িটা মুখ থেকে সরিয়ে কাশতে কাশতে প্রতিপ্রশ্ন ক'রল, কেন ?

ঘাটে যেতে হবে।

ক'জনের দল চাই ?

রঘুয়া বা নীরব শ্রোতা দিলু কেউ একথার অর্থ খুঁজে পেল না বলে চুপ ক'রে প্রশ্ন কর্তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। লোকটিই নিজের কথা ভেঙ্গে বলল, তিন-জনের দল হ'লে ছটাকা লাগবে। চারজনের আটটাকা।

দিলু শুনে কেমন হকচকিয়ে গেল তার মনে এল বহুদিনের পুরানো স্মৃতি, দেশে সুপুরের শ্রীদাম ঘোষেরা কীর্তন গাইতো, দল ছিল। তাদের ডাকলেই হ'ল। আশে পাশের দশবিশ খানা গ্রামের যেখানেই হোক ডাকলেই গিয়ে কীর্তন গেয়ে আসত এমন কি দুদিন তিনরাতও গান ক'রেছে, কোন টাকা পয়সা নিত না তো! কেবল ডাকলেই হ'ল। তবে হঁ্যা গ্রামের লোক তাদের ভক্তি ক'রত বটে;

শ্রীদাম ঘোষ যখন গলায় কলকে ফ‍ুলের মালা দ‍ুলিয়ে আসরে উঠে শ্রী গৌরাঙ্গের চরণ বন্দনা ক'রতেন তখন গ্রাম স‍ুদ্ধ শ্রোতা আপন পরিচয়ের অভিমান ভুলে যে যেখানে থাকত গড় হয়ে প্রণাম ক'রত সেই ম‍ুল গায়েনের দিকে। এমনিতে শ্রীদাম ঘোষের সঙ্গী সাথীরা সকলেই যে যার মত চাষবাসের কাজ ক'রত। তখন তারা যে যেমন মান‍ুষই থাক কীর্তনের স‍ুবাদে সবাই হতেন মর্যাদার মান‍ুষ।

কিন্তু এলোকগ‍ুলোকে দেখলে তেমন সম্ভ্রমবোধ জাগা তো দ‍ূরের কথা কেমন বিশ্রীই লাগে। ততোধিক খারাপ এদের দরকষার ভঙ্গি। রঘ‍ুয়াকে নীরব দেখে লোকটি বলল, রতনের সঙ্গে কথা বললে সে এই দরই বলবে। মড়া কোথায় ?

কাছেই।

কাছে হোক দ‍ূরে হোক ট্যাকা এই লাগবে।

রঘ‍ুয়া ব‍ুঝল অনেক বেশি বলছে লোকটা। সে তাই জানতে চাইল, কি বল গো দিল‍ুদা ইতিমধ্যে ? রতনকে আসতে দেখে এগিয়ে গিয়ে বলল, এই যে রতনাদা তোমার তালাশে এসেছি।

কেন ? —অস্থি চর্মসার লোকটির দেহবর্ণ অনেকটা পোড়া র‍ুটির মত। কালো, তবে তা কেমন যেন, তামাটে কালো। সামনের ওপরপাটি দাঁতগ‍ুলো ম‍ুখমণ্ডলের সম্পর্ক ত্যাগ করবার জন্যে ব্যাগ্র হয়ে আছে, স্থির ক'রেই নিয়েছে তারা কোন আবরণ মানবে না। ফলে যত কদর্য একজন লোককে দেখাতে পারে তার কোন খামতি নেই।

রঘ‍ুয়া বলল, ম‍ুর্দা পার্টি আছে।

রতন রঘ‍ুয়াকে যে চিনতে পেরেছে সেটা বোঝা গেল তার কথায়, ব্যাটাছেলে না মেয়েলোক ?

মেয়েলোক।

খানকি মড়ায় আমরা যাই না। বলে দেখ, কেউ যাবে না। নিম‍ুদের দলও যাবে না। ইচ্ছে হলে বলে দেখতে পার।

ব্যাস, শেষ। আর কথা কি ? তাছাড়া যা টাকা এরা চাইছে সম্ভবও হ'ত না দিল‍ুর পক্ষে। দিল‍ুর মনের ভার একট‍ু বাড়ল। সরমা—নায়েলেখোলা গ্রামের সেই ছোট্ট পবিত্র মেয়েটা দ‍ুর্ভাগ্য যাকে সারাটা জীবন চেপে ধরে থেকেছে কি পরিচয় নিয়ে তার অন্তিম যাত্রা! দিল‍ুর সমস্ত মনজ‍ুড়ে নতুন এক হাহাকার দৌড়ে বেড়াতে লাগল বৈশাখের ধ‍ুলোর ঝড়ের মত। হায় হায়, এই হ'ল ওর শেষ পরিচয়! আর সমস্ত কিছ‍ুর জন্যে দায়ী দিল‍ু নিজে! এই দিল‍ুই ওকে নিমতলার গঞ্জে এনে হাজির ক'রেছিল বলেই না ওর এই অন্তিম পরিচয়! নইলে সেই স‍ুন্দর গ্রামের আরও তো অসংখ্য মান‍ুষ আছে কার বা এমন অভিশপ্ত জীবন, কাকে বইতে হ'ল এমন জঘন্য পরিচয় ? কি কুক্ষণেই যে বাঁচতে এসেছিল মেয়েটা—এর চেয়ে মরত তো অনেক স‍ুন্দর ভাবে মরতে পারত। সেই স‍ুন্দর গ্রাম কতমান‍ুষ সেখানে,

যত জন্মায় ততই মরে ; ঠাকুমা, ঠাকুর্দা, তরু পিসি, বিজয় বসু—কত মানুষকে দিলুই তো মরতে দেখেছে কি সুন্দর ভাবে মরেছে সব। গ্রামের লোক ভেঙ্গে এসেছে সেই মৃত্যুর সামনে—কেউ কিছু ক'রতে পারেনি কিন্তু সকলের নীরব উপস্থিতি মৃত্যুকেও ঐশ্বর্য দিয়েছে আজ দিলু সবই যেন নতুন ক'রে বুঝতে পারল, এই অবহেলিত অসহায় মৃত্যুর মাধ্যমে সরমা অল্প সময়ের জন্যে হলেও তাকে ছেলেবেলার নায়েলেখোলাতে পেঁৗছে দিল যেখানে দুজনেরই সুন্দর শৈশব তারা জমা রেখে এসেছে। আর সারাটা জীবন ধরে প্রতি মুহূর্তে অতি কদর্য মৃত্যু মরল যে মেয়েটা সে যে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল এবং কেবল বাঁচতে চেয়েছিল এ কথা কে ভাববে বা জানবে কে, জানলেই বা মানবে কে! সবাই তো ঐ একটা কথাই বলবে সরমা বেশ্যা ছিল। দিলু আর ভাবতেই পারছিল না। অন্তর্বাষ্পের ফল্গুস্রোত তার সমস্ত অন্তরে চোরা বানের বেগে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সব ভাবনা।

কোনক্রমে বাড়ী ফিরে এল হতাশাদীর্ণ বিধ্বস্ত দিলু মিত্তির। দিলু মিত্তির নয় সোনাগাছির দিলুদা, সোদামিনী লন্ড্রীওয়ালা। ফিরে এল এক নাম হীন, গোত্রহীন প্রাণহীন শবদেহের সামনে এবং জীবনে অর্থাৎ জ্ঞানে প্রথম সেই দেহটি স্পর্শ করল —আত্মসম্বরণ ক'রতে না পেরে হাঁটু ভেঙ্গে বসে খাটে শোয়ানো শবের ওপরে মাথা রেখে উদ্দাম বেগে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল। এমন ভাবেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল যে মঙ্গলার মত যন্ত্রমানবীও তা ব্যাহত ক'রতে সাহস ক'রল না। অনেক দেখেছে মঙ্গলা, অনেক দুঃখ শোক বেদনা তার সামনে এসেছে, এমনটি কখনও নয়, এমন দেখেনি। সে স্তব্ধ হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল একজন পুরুষ মানুষকে এমন ভাবে কাঁদতে দেখে। সে জানে কান্না একমাত্র নারী ও শিশুর জন্যে। আজই প্রথম নতুন কথা জানল।

সোহাগবালা অধৈর্য হয়ে উঠল। তার এই বাড়ী হ'ল অপসরাদের আবাস, এখানে যৌবন অন্তহীন তাই মৃত্যুর সঙ্গে এ বাড়ীর কোনই সম্পর্ক হয়নি। যে এ বাড়ী থেকে যৌবন রেখে বেরিয়ে গেছে সে যে কবে কোথায় নিঃশব্দে মরেছে জানতে যায় নি সোহাগবালা। সে যৌবন জমা রাখে আর বিক্রি করে, কি কুক্ষণে যে মোতি দালালের মন রাখতে এই মেয়েটিকে রেখেছিল—। মরাটরা ভাল লাগে না। মঙ্গলা এখনও যে কেন দেরি ক'রছে-কে জানে? মড়াটা নিয়ে গেলেই তো পারে। এক সময় বলেই উঠল, অযথা দেরি ক'রে কি হবে, লোকবলও কম, নিমতলা গিয়েও তো সময় লাগবে। নে তোরা বেরো!

মঙ্গলা সচেতন হয়ে উঠল। নিজেকে ফিরে পেয়ে বলল, ওঠ গো মানুষটা। চল। মড়া গঙ্গায় দিয়ে আবার ঘর ফিরতে হবে তো। সেখানেও কত হ্যাপা।

দেরি ক'রতে হলে কেবল আপত্তি ছিল না একমাত্র করালীর। তার না যেতে

হলেই ভাল হয়। তাই মনে হচ্ছিল কোনভাবে যদি এ যাত্রা বন্ধ হয়—

মঙ্গলার তাড়নাতেই খাটিয়া কাঁধে তুলতে হ'ল তিন দিকে তিন মহিলা এবং সামনে মাথার দিকে এক কোণে দিল্ন মিত্তিরকে। হরিই একমাত্র শবান্নুগমনকারী পঞ্চম জন। চিৎপুর নিমতলা স্ট্রীট সংযোগ স্থলে একজন উন্মাদিনী ওদের সঙ্গ নিল। মহিলা শববাহিকার দল পেয়ে তার অসুস্থ চেতনার মধ্যে হঠাৎ নারী সত্তা জেগে উঠল, সেই প্রথম ধ্বনি দিল, বল হরি—হরিবোল। এ পথে অবিরাম শব যাত্রার ধ্বনি শুনে শববাহনের স্বর তাকে অনুপ্রাণিত ক'রল, এমন একটা সুযোগের আনন্দে সে ধ্বনি তার মনে আনন্দধ্বনি হয়ে উঠল।

সরমা কবে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না তার ছেড়ে যাওয়া জড় মূর্তির সমাপ্তি ঘটাতে অসম বাহকেরা যখন দেহটি নিয়ে চলল তখন পথচলার দোলনে তার মাথা সমানে দুলতে লাগল নেতিবাচক ইঙ্গিতে—যাবে না। যত দুঃখ যত কষ্ট যত বেদনাই বয়ে যাক এ জীবন, যত আঘাত বিশ্বাসঘাতকতা জর্জরিত ক'রে থাক জীবনকে, তবু এই পৃথিবীকে ছেড়ে যাবে না।